ষাটের দশকে জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ ও বাংলাদেশের কবিতা
(১৯৬১-১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ)

মোহাম্মদ কুদরত-ই-হুদা
পিএইচ ডি গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৬
সেশন : ২০১১-২০১২
পুনঃভর্তি : ২০১৭-২০১৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ
আগস্ট ২০১৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোহাম্মদ কুদরত-ই-হুদা কর্তৃক উপস্থাপিত 'ষাটের দশকে জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ ও বাংলাদেশের কবিতা (১৯৬১-১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্যে উপস্থাপন করেননি। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করেননি।

(ভীষ্মদেব চৌধুরী)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

'ষাটের দশকে জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ ও বাংলাদেশের কবিতা (১৯৬১-১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব রচনা। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্যে উপস্থাপন করা হয়নি। সহায়ক যে-সব তথ্য ও উপাত্ত অন্য উৎস থেকে গৃহীত হয়েছে সেগুলোর সূত্র যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশিষ্ট বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত আমার নিজস্ব।

(মোহাম্মদ কুদরত-ই-হুদা)
পিএইচ ডি গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৬
সেশন : ২০১১-২০১২
পুনঃভর্তি : ২০১৭-২০১৮
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
মাউশি পরিচিতি নম্বর : ০১৬০৬৪
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
শ্রীনগর সরকারি কলেজ
শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

আমি ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষে বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ ডি কোর্সে নাম নিবন্ধন করি এবং ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে পুনঃভর্তি হই। আমার গবেষণার শিরোনাম 'ষাটের দশকে জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ ও বাংলাদেশের কবিতা (১৯৬১-১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ)'। আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রফেসর ভীষ্মদেব চৌধুরী। বাংলাদেশের সাহিত্যে বিশেষ করে কবিতায় জাতীয়তাবাদী চিন্তার শৈল্পিক রূপায়ণের স্বরূপ অন্বেষণের প্রতি আমার আগ্রহ অনুধাবন করে আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক উল্লেখিত বিষয়টি নির্ধারণ করে দেন। এ জন্য আমি তাঁর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা-প্রণয়ন ও রূপরেখা-নির্মাণে গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ভীষ্মদেব চৌধুরীর নিরন্তর প্রেরণা ও নির্দেশনায় আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গবেষণা-কর্মে নিমগ্ন থাকতে পেরেছি। আমার ব্যক্তিগত অসুবিধা ও পঠন-চিন্তনের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার শক্তি যুগিয়েছেন তিনি। আধুনিক বাংলা কবিতার প্রতি তাঁর আন্তরিক আগ্রহ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। কবিতা বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও নির্দেশনা আমার গবেষণায় গতি সঞ্চার করেছে। আমি তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারও ব্যবহার করেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক সৈয়দ আকরম হোসেন এই গবেষণাকর্মের নানা বিষয়ে আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আমি অন্তহীন ঋণের সম্পর্কে আবদ্ধ।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে বই ও উৎসাহ-অনুপ্রেরণা দিয়ে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বেগম আকতার কামাল, বর্তমানে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ, শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক রফিকউল্লাহ খান, অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক, অধ্যাপক সৌমিত্র শেখর; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক হাকিম আরিফ, বাংলাদেশ বেতারের আঞ্চলিক পরিচালক এএসএম মামুন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাহ্ ইফতেখার আহমেদ, সাতক্ষীরা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শাহ্ আবদুল সাদী এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মুস্তাফিজুর রহমান বাবুল ও মো. মিজানুর রহমান। এঁদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যাঁদের সান্নিধ্য আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে, তাঁদের মধ্যে দৈনিক প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক কবি সাজ্জাদ শরিফ, অরুণ বসু, কবি জাফর আহমেদ রাশেদ, কবি আলতাফ শাহনেওয়াজ, কবি মজিদ মাহমুদ, শ্রীনগর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ গোলাম মোস্তফা সরকার ও বাংলা বিভাগের প্রধান ড. মুহম্মদ জিল্লুর রহমান, আমার বন্ধু ঔপন্যাসিক তারেক খান, তরুণ প্রকাশক কবি মাহাবুবুর রাহমান, সরকারি কুমুদিনী কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক শারমিন জাহান, আমার অনুজ

Dhaka University Institutional Repository

কুদরত-ই-বাহার, কুদরত-ই-গুল, স্নেহভাজন প্রকৌশলী সিফাত হোসেন হিমেল অন্যতম। এঁদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

আমি বিশেষভাবে স্মরণ করি আমার বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক প্রাবন্ধিক-গবেষক মোহাম্মদ আজম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কবি-প্রাবন্ধিক-গবেষক তারেক রেজা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক প্রাবন্ধিক-গবেষক তারিক মনজুর, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সরকার সোহেল রানা এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কবি-প্রাবন্ধিক মামুন অর রশিদ-কে, যাঁরা কেবল গ্রন্থ ও পরামর্শ দিয়েই নয়, সময় এবং শ্রম দিয়েও আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। এঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঋণ স্বীকারের নয়।

গবেষণাকালে আমি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সেমিনার গ্রন্থাগার, শ্রীনগর সরকারি কলেজের গ্রন্থাগার ও সরকারি দেবেন্দ্র কলেজের গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এসব গ্রন্থাগার-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

আমার এই গবেষণাকর্ম একেবারেই অসম্ভব ছিল যদি এই গবেষণার ব্যাপারে আমার স্ত্রী ডা. তানজিন জাহানের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে না থাকত। আমার কৃতিত্বকে তিনি নিজের কৃতিত্ব মনে করে ছয় বছর তিনি আমাকে সংসারের নানা কাজকর্ম থেকে দূরে রেখেছেন। শুধু এই গবেষণা নয়, আমার লেখালেখির ভুবনকে তিনি নিজের ভুবন মনে করে নিরন্তর উৎসাহ দেন। তিনি এই অভিসন্দর্ভের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়ে দিয়ে হতাশ সময়ে সাহস ও সান্ত্বনা দিয়েছেন। আমার মা মহুয়া হকের দীর্ঘ সময় কেটেছে উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগের মধ্য দিয়ে। তাঁর ক্লান্তিহীন সেবা আর নিরন্তর উৎসাহ আমাকে প্রাণিত করেছে। আমার মেয়ে নুদরাত-ই-হুদা কাকাতুয়ার বয়স এখন এগার মাস। তার প্রাপ্য সময় চুরি করে আমাকে এই গবেষণাকর্ম করতে হয়েছে। এ গবেষণাকর্মে তার অবদানকেই-বা খাটো করে দেখি কিভাবে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা ০৭-১৩

প্রথম অধ্যায় ১৪-৩৭
জাতি, জাতীয় চেতনা ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত ধারণা

দ্বিতীয় অধ্যায় ৩৮-১৫০
প্রথম পরিচ্ছেদ ৩৯-১০৯
ষাটের দশকের বাংলাদেশের কবিতায় জাতীয়তাবাদী চিন্তা বিকাশের পরিপ্রেক্ষিত
এক. অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত : প্রাক্-পাকিস্তান পর্ব
দুই. অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত : পাকিস্তান পর্ব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১০৯-১৫০
বাংলাদেশের কবিতায় জাতীয়তাবাদী চিন্তার স্ফুরণ ও রূপায়ণ
এক. প্রাক্-ভাষা আন্দোলন পর্ব
দুই. ভাষা আন্দোলন পর্ব

তৃতীয় অধ্যায় ১৫১-১৯২
ষাটের দশকের জাতীয়তাবাদী চিন্তার স্বরূপ

চতুর্থ অধ্যায় ১৯৩-৩১৪
ষাটের দশকের কবিতায় জাতীয়তাবাদী চেতনার রূপ ও রূপান্তর
প্রথম পরিচ্ছেদ ১৯৪-২৪৯
ষাটের দশকের প্রথমার্ধের কবিতায় জাতীয়তাবাদী চেতনার স্বরূপ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২৪৯-৩১৪
ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধের কবিতায় জাতীয়তাবাদী চেতনার স্বরূপ

পঞ্চম অধ্যায় ৩১৫-৩৬৩
ষাটের দশকের কবিতায় জাতীয়তাবাদী চেতনার শিল্পরূপ

উপসংহার ৩৬৪-৩৬৬
গ্রন্থপঞ্জি ৩৬৭-৩৭৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাসে ষাটের দশক খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটি অধ্যায়। কারণ, এই সময়পর্বে বাংলাদেশের কবিতা যত নিরীক্ষা, ভাঙচুর আর নতুনত্বের মুখোমুখি হয়েছে অন্য সময়ে ততটা হয়নি। কবিতার সৃষ্টিবৈচিত্র্যে ষাটের দশক বোধ করি সবচেয়ে মুখর সময়। এ-সময়ের কবিতা যেমন নিম্নকণ্ঠ তেমনি ধারালো-উচ্চকণ্ঠ; যেমন ভীত-সন্ত্রস্ত তেমনি নির্ভয়-দিগ্বিজয়ী। এই কালপর্বের কবিতাই সবচেয়ে বেশি 'উৎকেন্দ্রিক ও রাজনীতিমুক্ত', আবার একই সঙ্গে সবচেয়ে বেশি দেশকেন্দ্রিক ও রাজনীতি মুখর। এই দশকে কবিতা স্বদেশকে ভুলে গিয়ে ব্যক্তির মনোলোকের গহন-গভীর অন্ধকার প্রদেশে ঢুকে পড়েছে, আবার এই দশকেই কবিতা ব্যক্তির মনোলোক থেকে বেরিয়ে এসে হয়ে উঠেছে সমষ্টি আর স্বদেশের 'দর্পিত দর্পণ'। এই সময়পর্বে বাংলাদেশের কবিরা সবচেয়ে অবরুদ্ধতার শিকার হয়েছেন, আবার এই সময়পর্বেই বাংলাদেশের কবিরা অবরুদ্ধতার দেয়াল ভেঙে বের হয়ে এসেছেন। এভাবে ষাটের দশক বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাসে নানা 'স্ববিরোধ' আর বৈচিত্র্যকে ধারণ করে অনন্য হয়ে উঠেছে। বলে রাখা ভালো যে, এই অভিসন্দর্ভে ষাটের দশকের কবিতা বলতে শুধু ষাটের দশকে আবির্ভূত কবিদের কবিতাকে শুধু বোঝানো হয়নি, বরং বোঝানো হয়েছে ষাটের দশকে বাংলাদেশের কবিদের রচিত সব কবিতাকে।

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে, ষাটের দশকে রচিত কবিতায় এত বৈচিত্র্য আর স্ববিরোধের উৎস কোথায়? এক কথায় এর উত্তর দিতে গেলে বলতে হবে, ষাটের কবিতার এত বৈচিত্র্য আর স্ববিরোধের উৎস নিহিত রয়েছে এই সময়ের রাজনীতির মধ্যে। ষাটের দশকের রাজনীতির পারদের উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে এই দশকের বাংলাদেশের কবিতার স্বর-সুর-মেজাজও ওঠা-নামা করেছে; কবিতার নানা বাঁক-বদল ঘটেছে। জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে ষাটের দশকে কবিতার স্বর, সুর আর মেজাজের ওঠানামার স্বরূপ সন্ধানের মধ্য দিয়ে সার্বিকভাবে জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা এই সময়ের কবিতায় কিভাবে রূপায়িত হয়েছে তার অনুসন্ধান করাই মূলত এই অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য।

ষাটের দশকেরই একটা বড় সময় পূর্ব বাংলার রাজনীতি ছিল সামরিক স্বৈরশাসনের বুটের তলায় চাপা। বাক্-স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকার সবই ছিল ভূলুণ্ঠিত। তৎকালীন পূর্ব বাংলা এই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসন দ্বারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক দিক থেকে সবচেয়ে বেশি অন্যায্যতার শিকার হয়েছে; জাতিগত বৈরিতার শিকার হয়েছে। ষাটের দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই বিষয়গুলো শিক্ষিত-সচেতন মহলে বেশি উপলব্ধ হয়েছে। এই সময়ে এইসব অন্যায্যতার বিরুদ্ধে তেমন কোনো রাজনৈতিক জোরদার আন্দোলন পূর্ব বাংলার পক্ষ থেকে চালানো সম্ভব হয়নি। ছাত্র আন্দোলন আর সাংস্কৃতিক আন্দোলনই এসময় মূল ধারার রাজনীতির জায়গা দখল করে নিয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে বাঙালি তার কণ্ঠস্বর জারি রেখেছিল; আত্মপরিচয় ও আত্ম-মর্যাদা জারি

Dhaka University Institutional Repository

রেখেছিল। সব মিলিয়ে সে-ছিল এক ভীত-সন্ত্রস্ত-নষ্ট সময়। জাতীয়তাবাদী রাজনীতির এই অবরুদ্ধতার মধ্যে কবিতার আচরণ ও উচ্চারণ আবিষ্কার করার প্রয়াস এই অভিসন্দর্ভের অর্থবহ দিক।

ষাটের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে রাষ্ট্রীয় এই অনাচার আর পীড়নের বন্ধন শিথিল হতে শুরু করে। বলা ভালো, পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠী এই পীড়নের বন্ধন শিথিল করে দেয় প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, আন্দোলন, সংগ্রাম আর গণজোয়ারের মাধ্যমে। পূর্ব বাংলা গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে। কারণ, ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে রাজনীতির সীমানা বিস্তৃত হতে শুরু করে। সাধারণ মানুষের মধ্যে বঞ্চনার বোধ জাগ্রত হতে শুরু করে। পূর্ব বাংলার গণমানুষ জাতীয়তাবাদী চেতনায় জাগ্রত হতে থাকে; নিজেদের 'নিজ' বলে খুব স্পষ্টভাবে শনাক্ত করতে শুরু করে। অবশ্য ভাষাকে কেন্দ্র করে ১৯৫২ সালেই জাতীয়তাবাদী চেতনা বা 'আমরা আলাদা' এই চেতনা তার মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল । কিন্তু স্বৈরশাসনের দোর্দণ্ড প্রতাপে তা কিছুটা চাপা পড়েছিল। এই সুপ্ত অগ্নিগিরির উদ্‌গিরণ শুরু হয় ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে গিয়ে। এরপর আত্মত্যাগ আর অর্জনের যুগল পথ চলার মধ্য দিয়ে এই জাতীয়তাবাদী চেতনা সর্বব্যাপী রূপ লাভ করে। জেগে ওঠে পূর্ব বাংলা। অবশেষে জয় হয় বাঙালি জাতির। বাঙালি প্রতিষ্ঠা করে একটি জাতিরাষ্ট্র। রাষ্ট্রের নাম বাংলাদেশ। এভাবে বাঙালি জাতির মহোত্তম রাজনৈতিক সিদ্ধি ঘটে ষাটের দশকেই। মূলত ষাটের দশক বাঙালি জাতির জাতীয়তাবাদী চেতনায় শিহরন জাগানো করা একটি দশক। রাজনীতি আর কবিতায় জাতীয়তাবাদী চেতনার এই বাস্তবতা তুলে আনার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা বর্তমান অভিসন্দর্ভের বিশেষ দিক।

পৃথিবীতে আন্দোলন-সংগ্রাম করে যেসব জাতি স্বাধীন হয়েছে, সেসব জাতির সাহিত্যে জাতীয়তাবাদী সাহিত্যের আবির্ভাব লক্ষ করা যায়। এই সাহিত্য ওই জাতির সংগ্রাম ও জাতীয় জাগরণকে প্রাণ দেয়। আবার কখনো কখনো জাতীয়তাবাদী জাগরণ ওই জাতির সাহিত্যকে প্রভাবিত করে। প্রকৃতপক্ষে পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও কবিতার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ষাটের দশকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম আর অর্জনের ছাপ খোদাই করা আছে বাঙালির এই দশকে রচিত কবিতায়। এই দশকের কবিতা জাতীয়তাবাদী রাজনীতির আগুনেও বিভিন্ন সময়ে ঘি-ঢেলেছে। পরস্পর পরস্পর থেকে রসদ নিয়ে ঋদ্ধ হয়েছে। এই আদান-প্রদানের বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে এই অভিসন্দর্ভে। শুধু তাই নয়, ষাটের কবিতা কিভাবে ষাটের দশকের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে ধারণ করে ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করেছে, বাঙালির আত্মমর্যাদার সংগ্রামের দলিলে পরিণত হয়েছে তার তত্ত্ব-তালাশও করা হয়েছে এই গবেষণাকর্মে।

বাংলাদেশের কবিতা ষাটের দশকে এসে হঠাৎ জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ধারণ করেনি। এর আছে একটি ইতিহাস। রাজনীতির মতো কবিতা গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গিয়েছে; পরিণত ও সাবালক হয়েছে। সংগত কারণেই বর্তমান অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের আর কবিতার ইতিহাসের সেই দুর্গম যুগল-পথচলাও অনুসন্ধিৎসার বিষয় হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী রাজনীতি আর কবিতার এই ইতিহাস পরিক্রমাকে এই অভিসন্দর্ভে আমরা 'পরিপ্রেক্ষিত' চিহ্নিত করেছি।

কবিতা কেবল বিষয়ের ব্যাপার নয়। কবিতা আঙ্গিক, প্রকরণ-পরিচর্যা আর শিল্পিতারও ব্যাপার। তাই বিষয়ের আলোচনা ততক্ষণ পর্যন্ত অসম্পূর্ণ রয়ে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত-না এর শিল্পিতা আলোচিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ কোনো কবিতা কিভাবে লেখা হয়েছে, সে-আলোচনা কবিতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, কোনো কোনো তাত্ত্বিকমহলের মতে, কিভাবে বলা হয়েছে তা কী বলা হয়েছে তার চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, বলার ধরনের মধ্যেই বিষয়ের তাৎপর্য, গুরুত্ব ও স্বয়ং বিষয় নিহিত থাকে। বিষয়ের গভীরতা ও যথার্থতা বোঝার জন্যে শিল্পরূপের বিশ্লেষণ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এ-কারণে বর্তমান অভিসন্দর্ভে ষাটের কবিতা তার শিল্পিতার মধ্যে, প্রকাশভঙ্গির মধ্যে, আঙ্গিকের মধ্যে কিভাবে জাতীয়তাবাদকে ধারণ করেছে সেই বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। ষাটের কবিতার শিল্পরূপকে কিভাবে জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও আন্দোলন-সংগ্রাম প্রভাবিত করে

অবশেষে আত্মস্থ করেছিল, তাও এই অভিসন্দর্ভের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ। শিল্পিতার এই অনুসন্ধিৎসায় এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, কবিতার শিল্পরূপেরও রাজনৈতিকতা আছে। কবিতার নন্দনতত্ত্ব দেশকাল ও জনগোষ্ঠী ব্যতিরিক্ত কিছু নয়।

জাতীয়তাবাদ একটি রাজনৈতিক বিষয়, কিন্তু এর বসবাস একটি জনেগোষ্ঠীর মনে। এ-কারণে এর প্রকাশ সব সময় প্রত্যক্ষ নয়। জাতীয়তাবাদী চেতনার রাজনৈতিক অভিপ্রকাশ অনেক সময় দৃষ্টিগ্রাহ্য কিন্তু এই চেতনার কাব্যিক প্রকাশ অনেক সময় সরাসরি ধরা যায় না। কবিতায় কবির চেতনার টুকরো-টুকরো ইশারা ছেঁকে কবির জাতীয়তাবাদী চেতনার পাঠ নির্মাণ করতে হয়। অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, কবির সমগ্র কবিতার একটি ইমেজের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে কবির জাতীয়তাবাদী আবেগ ও চৈতন্য। আবার দেখা গিয়েছে, একটি কবিতায় কবির শব্দচয়নের ধরনের মধ্যে বা ভাষার এক বিশেষ রীতির আশ্রয় গ্রহণের মধ্যে লুকায়িত থাকে কবির জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রদেশ। আবার অনেক সময়, বলার ভঙ্গি বা দৃষ্টিকোণ থেকেও আভাসিত হয় কবির মনোলোকের ভেতরে থাকা জাতীয়তাবাদী চেতনা। এইসবের অনুসন্ধান করা ছিল এই অভিসন্দর্ভের একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জের দিক। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ফসল এই অভিসন্দর্ভ।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের শিরোনাম lv‡Ui ‘k‡K RvZxqZvev‘x wPšÍvi weKvk I evsjv‡‘‡ki KweZv (1961-1970 wL÷vã)। শিরোনাম বিষয়ে একটু আলোকপাত করা আবশ্যক। আমরা অভিসন্দর্ভে যে-সময়ের কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছি সে-সময় বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডের রাষ্ট্রীয় নাম ছিল ‘পূর্ব পাকিস্তান’। তখন এটি ছিল পাকিস্তানের একটি প্রদেশ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এই ভূখণ্ডের নাম ছিল ‘পূর্ব বাংলা’। রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ষাটের দশকের কবিতা পূর্ব পাকিস্তানের কবিতা। কিন্তু বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাসের মূলধারার আলোচনায় বাংলাদেশের সাহিত্য বলতে ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ-পরবর্তী সময় থেকে বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডের নাগরিকদের রচিত সাহিত্যকে বোঝানো হয়। সেই হিসেবে এই অভিসন্দর্ভের শিরোনামে ‘বাংলাদেশের কবিতা’ শব্দবন্ধটি বিবেচিত হবে। আবার এও সত্য যে, ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্যের দিক থেকে বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডটি পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে খুব কমই সম্পর্কিত ছিল। ইতিহাসের একটি বিশেষ মুহূর্তের রাষ্ট্রীয়

Dhaka University Institutional Repository

আকাঙ্ক্ষার মিল ছাড়া পাকিস্তানের সঙ্গে জাতিগত, ভাষাগত, ঐতিহ্যগত, সংস্কৃতিগত তেমন কোনো সাদৃশ্য বর্তমান বাংলাদেশের কখনোই ছিল না। এই ভূখণ্ডের বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চা এর নিজস্ব নিয়মে ও মেজাজে অব্যাহত থেকেছে। সেটা ১৯৪৭ সালের প্রায় অব্যবহিত পর থেকেই অব্যাহত থেকেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার খুব অল্পকালের মধ্যেই বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডের কবিতা পাকিস্তানবাদী চেতনার স্তর অতিক্রম করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ধারণ করে অগ্রসর হয়েছে। ষাটের দশকে এই চেতনা একটি চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। ষাটের দশকের উপান্তে বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডের রাজনীতির মধ্যে এবং কবিতার মধ্যে তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের আওতার ভেতর অবস্থান করা সত্ত্বেও স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল। সেই হিসেবে অভিসন্দর্ভের শিরোনামে 'বাংলাদেশের কবিতা' শব্দবন্ধ যথার্থ বলেই আমরা মনে করি। তবে উল্লেখ্য যে, অভিসন্দর্ভে 'বাংলাদেশের কবিতা' শব্দবন্ধের পরিবর্তে অনেক জায়গায় 'পূর্ব বাংলার কবিতা'; বাংলাদেশের পরিবর্তে 'পূর্ব বাংলা' ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে, চেতনাগত দিক থেকে

বাংলাদেশের বাঙালি জনগোষ্ঠীর কাছে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে 'পূর্ব বাংলা' অভিধাটিই বেশি প্রচলিত ছিল। তাছাড়া 'পূর্ব বাংলা' ওই কালে যথেষ্ট জাতীয়তাবাদী আবেগ ও আদরে পূর্ণও ছিল বটে।

অভিসন্দর্ভটিতে যেহেতু ষাটের দশকে রচিত কবিতায় জাতীয়তাবাদী চিন্তার স্বরূপ সন্ধান করা হয়েছে, তাই প্রথম অধ্যায়ে 'জাতি, জাতীয় চেতনা ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত ধারণা' শিরোনামে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাত্ত্বিক ধারণা স্পষ্ট করা হয়েছে। জাতি, জাতীয় চেতনা আর জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত ধারণা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে উদাহরণের ক্ষেত্রে ভারতীয় উপমহাদেশকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ, বর্তমান অভিসন্দর্ভের সঙ্গে ভারতের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ইতিহাসের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এর ফলে, ভারতীয় উপমহাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিশেষত্বটি বেশি স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে।

অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'ষাটের দশকের বাংলাদেশের কবিতায় জাতীয়তাবাদী চিন্তা বিকাশের পরিপ্রেক্ষিত'। এই অংশে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক– এই ত্রিমাত্রিক পরিপ্রেক্ষিত অন্বেষণই ছিল আমাদের লক্ষ। এই পরিচ্ছেদ ষাটের দশকের রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতায় প্রকাশিত জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে সংযোজিত হয়েছে। এখানে লাহোর প্রস্তাবের পর থেকে ষাটের দশকের শুরু পর্যন্ত সময়ের আর্থ-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস পর্যালোচিত হয়েছে। এইসব ইতিহাসের রাজপথ-অলিগলিতে অনুসন্ধান করা হয়েছে লাহোর প্রস্তাব থেকে ষাটের দশকের শুরু পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব বাংলার মানুষের আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ, বঞ্চনা-বোধের ব্যাকরণ। একই সঙ্গে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে সমকালীন আর্থ-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ঘটনাধারার অভিঘাতে পূর্ব বাংলার বাঙালির মধ্যে কিভাবে জাতীয়তাবাদী চিন্তা দানাদার হয়ে উঠেছে। এই পর্যায়ের আবিষ্কৃত জাতীয়তাবাদী চিন্তাকে আমরা বলেছি এটি তৎকালীন পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদী চিন্তার স্ফুরণ-পর্ব। কারণ এই স্ফুরণটিই নানা ঝড়-ঝঞ্ঝা মোকাবিলা শেষে ষাটের দশকে গিয়ে প্রজ্বলন্ত রূপ ধারণ করেছে। ফলে, ১৯৪০ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত সময়ের আর্থ-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক গতিপ্রকৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভটির ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে, যে-ভিত্তির ওপর ষাটের দশকের জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনার প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে। এই পরিচ্ছেদের আলোচনা– বিশেষত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আলোচনা– কোথাও কোথাও দীর্ঘ ও খুঁটিনাটি করার প্রয়াস পেয়েছি। এর কারণ, বিশেষ ঘটনাধারার মধ্য দিয়ে কিভাবে জনচৈতন্যে জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা আকরিত হচ্ছিল সেই সত্য আবিষ্কারই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। যেহেতু জাতীয়তাবাদ একটি সূক্ষ্ম গণচৈতন্যনির্ভর বিষয়, সেহেতু রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ঘটনাধারার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ অনিবার্য হয়ে পড়েছে। তবে একথা বলতেই হবে যে, আমাদের সকল আলোচনা-গবেষণা-অনুসন্ধান অভিসন্দর্ভের কেন্দ্রীয় বিষয় জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। আর দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'বাংলাদেশের কবিতায় জাতীয়তাবাদী চিন্তার স্ফুরণ ও রূপায়ণ' শিরোনামের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একই সময়পর্বের অর্থাৎ লাহোর প্রস্তাবের পর থেকে ষাটের দশকের শুরু পর্যন্ত সময়ের তৎকালীন পূর্ব বাংলার কবিতার গতিপ্রকৃতি অনুসন্ধান করা হয়েছে। এই অনুসন্ধানে কবিতায় মূলত জাতীয়তাবাদী চেতনার রূপায়ণের অনুসন্ধানকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কবিতাকে প্রকৃতি অনুসারে 'প্রাক্-ভাষা আন্দোলন পর্ব' ও 'ভাষা আন্দোলন পর্ব'-এই দুই ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। কারণ ভাষা আন্দোলনের আগের কবিতায় মূলত পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। আর ভাষা আন্দোলনের পরে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ প্রধান হয়ে উঠেছে। মধ্যপথে এই দুয়ের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাধ্যমে কবিতায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। কবিতায় জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ আর রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ প্রায় সমান্তরালে চলেছে। রাজনীতি আর কবিতার এই পথ পরিক্রমার মাত্রা আর স্বরূপ উঠে এসেছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ও ষাটের দশকের কবিতায় জাতীয়তাবাদী চেতনাকে বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এই ভিত্তির ওপরই তো গড়ে উঠেছে ষাটের দশকের জাতীয়তাবাদী কবিতাধারার প্রাসাদ। কারণ বাংলাদেশের কবিতায় মূলত ভাষা আন্দোলনের পর থেকে নতুন জাতীয়তাবাদী চেতনা নতুন ভাবে ও নতুন ভাষায় অভিপ্রকাশিত হতে শুরু করেছে। এই অভিপ্রকাশের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে ষাটের দশকে।

'ষাটের দশকের জাতীয়তাবাদী চিন্তার স্বরূপ' শিরোনামের তৃতীয় অধ্যায়ে ষাটের দশকের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাধারার মধ্যে কিভাবে ও কোন স্বভাবে তৎকালীন পূর্ব বাংলায় জাতীয়তাবাদী চিন্তা প্রকাশিত হয়েছিল তা দেখানো হয়েছে। এরই সাহিত্যিক প্রকাশ অনুসন্ধানে আমরা ব্যাপৃত হয়েছি এই অভিসন্দর্ভের 'ষাটের দশকের কবিতায় জাতীয়তাবাদী চিন্তার রূপ ও রূপান্তর' শিরোনামের চতুর্থ অধ্যায়ে। এই অধ্যায়েটিকে বলা যায় অভিসন্দর্ভের মূল-অধ্যায়। এই অধ্যায়টিকে সংগত কারণেই দুটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে ষাটের প্রথমার্ধে রচিত কবিতায় জাতীয়তাবাদী চেতনার স্বরূপ দেখানো হয়েছে। আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চিহ্নিত করা হয়েছে ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের কবিতায় জাতীয়তাবাদী চেতনার স্বরূপ। ষাটের দশকে প্রকাশিত কবিতাকে দুটি ভাগে ভাগ করে নেয়ার কারণটি পূর্ববর্তী অধ্যায়ের অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায়ের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেই নিহিত আছে। ষাটের দশকের দুই অংশে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতি চর্চার মধ্যে যেমন একটা মাত্রাগত ভিন্নতা আছে তেমনি কবিতার মধ্যকার জাতীয়তাবাদী চেতনার মধ্যেও এই ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। ষাটের প্রথমার্ধের রাজনীতি, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা

Dhaka University Institutional Repository

যতটা প্রচ্ছন্ন ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে ততটাই ব্যক্ত। কবিতায়ও বিষয়টি এমন বলে পুরো ষাটের কবিতাকে একসঙ্গে আলোচনা না করে দুই অংশে ভাগ করা হয়েছে। তবে, একই ধরনের জাতীয়তাবাদ প্রকাশক কবিতা ষাটের দশকের প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধেও রচিত হয়েছিল। এসব কবিতাকে ষাটের দুই পর্বের যেকোনো এক পর্বের মধ্যে একটি উপশিরোনামের অধীনে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, রবীন্দ্রনাথ ষাটের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার অন্যতম অনুষঙ্গ ছিল। কবিরা ষাটের দুই অংশেই রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক কবিতা লিখে তাঁদের জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, উপশিরোনামটি প্রথমার্ধের কবিতার আলোচনা-অংশে হলেও এর মধ্যে আলোচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক উভয়ার্ধের কবিতাই। অভিসন্দর্ভে এরকম আরো কিছু উপশিরোনাম লক্ষ করা যাবে। এক্ষেত্রে আলোচনার সময় কালের পার্থক্যের সূত্রটি স্পষ্ট রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

'ষাটের দশকের কবিতায় জাতীয়তাবাদী চিন্তার শিল্পরূপ' শিরোনামের পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ষাটের জাতীয়তাবাদী চেতনা কিভাবে ষাটের কবিতার শিল্পরূপকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে এই বিষয়টি। এই অধ্যায়ে আমরা লক্ষ করেছি, ষাটের প্রথমার্ধের জাতীয়তাবাদী চেতনার মতোই এই সময়ের কবিতার শিল্পরূপের মধ্যেও কিছুটা নিম্নকণ্ঠ ছিল। ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে গিয়ে কবিতার ভাষা-চিত্রকল্প-উপমা-ইমেজ ইত্যাদিতে একটা ঘোরতর পরিবর্তন এসেছে। কবিরা ক্রমাগত উচ্চকণ্ঠ হয়েছেন, ভাষা চড়ে গিয়েছে, উপমা-রূপক এবং অপরাপর অলংকার সশস্ত্র হয়ে উঠেছে। এ-সময়ের কবিদের প্রকাশভঙ্গির মধ্যে একটা শ্লোগানধর্মিতাও এসেছে। ষাটের কবিতার মধ্যকার জাতীয়তাবাদী চিন্তার শিল্পরূপ বিবেচনার ক্ষেত্রে এই প্রবণতাটির সূত্র আবিষ্কারের প্রয়াস পাওয়া গিয়েছে। এটি ঠিক বিষয়ের মতো অত প্রত্যক্ষ নয় বলে ষাটের প্রথমার্ধ আর দ্বিতীয়ার্ধের কবিতার শিল্পরূপ আলাদা ভাগে ভাগ করা হয়নি। তবে গবেষণার সময় এই বিষয়টি মাথায় রেখেই অধ্যায়টি সম্পন্ন করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রকরণ বিষয়ক আলোচনার মধ্যে প্রথমার্ধ আর দ্বিতীয়ার্ধের প্রকরণের পার্থক্যের সূত্রটি স্পষ্ট রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। আর অভিসন্দর্ভের উপসংহারে প্রতিপাদ্য ও প্রমাণিত বিষয়ের মৌলসূত্রগুচ্ছ উপস্থাপিত হয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভে যেহেতু ষাটের দশকে রচিত কবিতায় জাতীয়তাবাদী চিন্তার স্বরূপ অনুসন্ধান করা হয়েছে সেহেতু ষাটের দশকে ক্রিয়াশীল সব কবির প্রকাশিত কবিতাই আমাদের গবেষণার আওতাভুক্ত ছিল। কিন্তু সব কবিকে গবেষণার আওতাভুক্ত করলে কবির সংখ্যা এত বেশি হয়ে যাবে যে, তাতে গবেষণার ভারই শুধু বাড়বে ধার বাড়বে না। তাছাড়া ষাটের দশকে সক্রিয় সব কবির সব কবিতা নিয়ে গবেষণা অসম্ভব ব্যাপারও বটে। তাই ষাটে ক্রিয়াশীল বাংলাদেশের শুধু গুরুত্বপূর্ণ, প্রতিনিধিস্থানীয় কবিদের কবিতাই আলোচিত হয়েছে।

অভিসন্দর্ভটিতে আলোচিত ষাটের দশকের কবিদের মূলত প্রকাশিত গ্রন্থই আলোচিত হয়েছে। সমকালে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাকে এই আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে। কিন্তু চল্লিশের দশকে রচিত অনেক কবিতার মূলপাঠ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ, সেই সময় অনেক কবির কবিতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি, শুধু পত্রস্থ হয়েছিল মাত্র। অথবা উত্তরকালে প্রকাশিত গ্রন্থে ওই সময়ের সাক্ষ্য বহন করে এমন অনেক কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কিন্তু কবিতাগুলো সময়ের বাস্তবতাকে

Dhaka University Institutional Repository

ধারণ করেছে। আবার অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে, ওই সময়ে প্রকাশিত গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই সমকালের পত্র-পত্রিকার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কবিতার উদ্ধৃত মূলপাঠের পাশেই পত্র-পত্রিকার নাম, সংখ্যা ও প্রকাশসাল দিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ থেকে অভিসন্দর্ভে উদ্ধৃত মূলপাঠের পাশেই প্রথমে কবির নামের প্রথমাংশ, তারপর যে-সালে মুদ্রিত গ্রন্থ ব্যবহৃত হয়েছে সেই সাল এবং সবশেষে পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। আর যেসব কবির বা লেখকের কোনো কবিতার বা অন্যান্য রচনার মূলপাঠ কাব্যসমগ্র বা রচনাবলি থেকে নেয়া হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে প্রথমে কবির/লেখকের নামের প্রথমাংশ, তারপর ব্যবহৃত গ্রন্থের মুদ্রণ সাল, এরপরে প্রথমে পৃষ্ঠাসংখ্যা ও সবশেষে খণ্ডসংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, ২০০১ সালে প্রকাশিত শামসুর রাহমান রচনাবলির প্রথম খণ্ডের ৬৯ পৃষ্ঠা থেকে কোনো কবিতার মূলপাঠ গ্রহণ করা হলে মূলপাঠের পাশেই লেখা হয়েছে 'শামসুর ২০০১ : ৬৯/১'।

প্রথম অধ্যায়

জাতি, জাতীয় চেতনা ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত ধারণা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

জাতি, জাতীয় চেতনা ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত ধারণা

জাতি, জাতীয় চেতনা এবং জাতীয়তাবাদ পরস্পর খুব কাছাকাছি তিনটি ধারণা। কিন্তু তিনটি এক বিষয় নয়। বরং বলা যায় প্রথম দুটি শেষোক্তটির দুটি ধাপ বা শর্ত। একটি সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠী এক সঙ্গে বসবাস করলেই, এমনকি একই চেহারার হলেই তারা একটি জাতি হিসেবে বিবেচিত হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় চেতনা জাগ্রত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ওই জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায় জাতি হিসেবে পরিচিত হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

জাতি

'জাতি' শব্দটি অন্তত ভারতবর্ষে একটু ব্যাখ্যার দাবি রাখে। কারণ এখানে 'জাতি' শব্দটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহারের বাইরে অন্য ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে। 'জাতি' শব্দটি ভারতবর্ষে বর্ণ বা caste অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবার Race-এর প্রতিশব্দ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। একারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) তাঁর 'জাতি' বিষয়ক প্রবন্ধে শব্দটির একাধিক অর্থযোগ্যতা বিবেচনা করে 'জাতি'-র পরিবর্তে ইংরেজি 'নেশন' (Nation) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আমরা Nation অর্থেই এখানে জাতি শব্দটি ব্যবহার করেছি।

একটি জনগোষ্ঠী যখন নিজেদের নানা কারণে এক মনে করে, তখন তাদের মধ্যে যে পারস্পরিক ঐক্যের ক্রিয়াশীল বোধ জন্ম নেয় তাই-ই জাতির বোধ; তখনই ওই জনগোষ্ঠী একটি জাতিতে রূপান্তরিত হয়। সাধারণভাবে জাতি গঠনের প্রক্রিয়া এবং উপাদান হিসেবে কয়েকটি বিষয়কে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কেউ কেউ মনে করেন জাতি গঠনের অন্যতম উপাদান বর্ণ (Race)। সমবর্ণের মানুষেরা বর্ণগত সাদৃশ্যের কারণে নিজেদের অন্যদের থেকে আলাদা মনে করে। ক্রমে এই সমবর্ণের জনগোষ্ঠী একটি জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আবার অনেকে জাতিগঠনের নিয়ামক হিসেবে ভাষাকেও গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। একই ভাষায় সাহিত্যরচনা, চিন্তার প্রকাশ ও ভাব বিনিময়, পরস্পরকে জানা এবং বোঝার একটি সহজ পথ তৈরি করে দেয়। এই পরস্পরকে জানা-বোঝার ধারাবাহিক ইতিহাস ওই বিশেষ জনগোষ্ঠীর মনে নিজেদের অভিন্ন ভাবার অবসর তৈরি করে দিয়ে তাদেরকে জাতিতে পরিণত করে তোলে। ভাষা ও বর্ণের মতো একই ধর্মবিশ্বাস, নির্দিষ্ট ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক সীমারেখা, একই সংস্কৃতি, একই ধরনের বৈষয়িক স্বার্থ-বন্ধনও একটি জনগোষ্ঠীকে একটি স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত করতে পারে; একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'নিজ' (Self)-এর বোধ তৈরি করে নিজেদের স্বতন্ত্র জাতির দাবিদার করে তুলতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। উপর্যুক্ত নিয়ামকগুলোর একটি দুটি এমনকি, সবগুলোর প্রযোজনায় একটি জাতি গঠিত হতে পারে। জাতি বিষয়ক পুরনো ধ্যান-ধারণার অধিকারীরা অনেকে একটু বেশি এগিয়ে গিয়ে বলেন, ওপরের সবগুলোর ক্রিয়াশীলতায়-ই কেবল একটি জাতির উদ্ভব সম্ভব। কারণ এই নিয়ামকগুলি একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক ধরনের আত্মিক যোগসূত্র তৈরি করে। একই সঙ্গে তাদেরকে অন্য জনগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র এবং অপরিচিত করে তোলে; অবশিষ্ট মানবজাতি থেকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। তারা মনে করেন, এই নিয়ামকগুলি ক্রিয়াশীল থাকলে স্বাভাবিকভাবেই একটি জাতি তৈরি হয়ে যায়। এদিক বিবেচনায় রেখে অনেকে বলেন– জাতি বিষয়টি নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক। আবার এটিও মনে রাখা দরকার যে, 'কেবলমাত্র একই নরগোষ্ঠীজাত 'জন' হলেই তারা জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না। জাতি হিসেবে গড়ে-ওঠার নানাবিধ উপাদানের মধ্যে ভৌগোলিক ঐক্য, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং রাষ্ট্রীয় ঐক্য গুরুত্বপূর্ণ...।' (সৈয়দ আকরম ২০১৩ : ৩৪)

কিন্তু আধুনিক বিশ্বে জাতিগঠনের উপর্যুক্ত প্রক্রিয়া, উপাদান ও নিয়ামককে কম গুরুত্ব দেয়া হয়। কারণ ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, প্রাকৃতিক সীমারেখা বা ভূগোল এক– অথচ অভিন্ন জাতি না হয়ে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির উদ্ভব হয়েছে, এমন উদাহরণ পৃথিবীতে বিরল নয়। আবার ওপরের নিয়ামকগুলো নেই কিন্তু খুব শক্তিশালী জাতি

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করেছে এমন উদাহরণও প্রচুর। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের ভাষা এক, স্পেন ও স্পেনীয় আমেরিকার ভাষা এক, কিন্তু তারা এক জাতি নয়। অন্যদিকে সুইজারল্যান্ডে তিন-চারটি ভাষা আছে, তবু সেখানে এক জাতি–

> জাতিমিশ্রণ ঘটে নাই য়ুরোপে এমন দেশ নাই। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি কোথাও বিশুদ্ধ জাতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, একথা সকলেই জানেন। ... রাষ্ট্রতন্ত্রে জাতিবিশুদ্ধির কোনো খোঁজ রাখে না। রাষ্ট্রতন্ত্রের বিধানে যে জাতি এক ছিল তাহারা ভিন্ন হইয়াছে, যাহারা ভিন্ন ছিল তাহারা এক হইয়াছে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২ : ৬২০/২)

জাতি গঠনের ক্ষেত্রে ভাষা, বর্ণ, ধর্ম, সংস্কৃতি, ভূগোল, অর্থনৈতিক স্বার্থ ইত্যাদিকে গৌণ করে আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় জাতির ধারণাকে অন্যতর জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে–

> ভূখণ্ডে, জাতিতে (Race), ভাষায় নেশন গঠন করেনা। ভূখণ্ডের উপর যুদ্ধক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্রের পত্তন হইতে পারে, কিন্তু নেশনের অন্তঃকরণটুকু ভূখণ্ডে গড়ে না। জনসম্প্রদায় বলিতে যে পবিত্র পদার্থকে বুঝি, মনুষ্যই তাহার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। সুগভীর ঐতিহাসিক মন্থনজাত নেশন একটি মানসিক পদার্থ, তাহা একটি মানসিক পরিবার, তাহা ভূখণ্ডের আকৃতির দ্বারা আবদ্ধ নহে। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২ : ৬২০/২)

ভেদবিচারহীন যেকোনো মানবসম্প্রদায় একটি জাতি হয়ে উঠতে পারে। তবে এক্ষেত্রে দুটি উপাদানের প্রয়োজন হয়; প্রথমত, 'প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ' এবং দ্বিতীয়ত, পরস্পর সম্মতি বা এক সঙ্গে বসবাস করার ইচ্ছা। জাতি গঠনের এই দুটি উপাদানের একটি অতীতভিত্তিক, অন্যটি বর্তমাননির্ভর। অর্থাৎ যে মানবগোষ্ঠীর একটি সুদীর্ঘ, সমন্বিত, গোষ্ঠীগত, অখণ্ড উত্তরাধিকার রয়েছে এবং তা বর্তমানে ও ভবিষ্যতে উপযুক্তভাবে রক্ষা করার ইচ্ছা রয়েছে, সেই মানবগোষ্ঠীকেই একটি জাতি বলা যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জাতি একটি মানসিক এবং অন্তর্গত ধারণা। এখানে একটি মানবগোষ্ঠীকে একত্র করে রাখে দীর্ঘ সুখ-দুঃখের জৈবিক ইতিহাস এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে সেই সুখ-দুঃখ একত্র যাপন ও ভাগ করে নেয়ার মানসিকতা–

> অতীতে সকলে মিলিয়া ত্যাগদুঃখ-স্বীকার এবং পুনর্বার সেই জন্য সকলে মিলিয়া প্রস্তুত থাকিবার ভাব হইতে জনসাধারণকে যে একটি একীভূত নিবিড় অভিব্যক্তি দান করে তাহাই নেশন। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২ : ৬২১/২)

কোনো কোনো পণ্ডিত, জাতি বিষয়টিকে রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত করে দিয়েছেন। তারা বলতে চেয়েছেন, তারাই জাতিগঠন করতে পারে যারা সার্বভৌমত্ব অর্জন করার চেষ্টা করে অথবা অর্জিত সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যত্নশীল হয়। তবে জাতি হওয়ার জন্য রাজনৈতিকতা কোনো আবশ্যিক শর্ত নয়।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, ভূগোল, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক স্বার্থ ইত্যাদির দিক থেকে অমিল থাকা সত্ত্বেও কেবল অতীত দুঃখ-ত্যাগের উত্তরাধিকার আর বর্তমানে তাকে লালন, রক্ষণ আর বর্ধনকেন্দ্রিক মানসিক ঐক্যের ফলে গড়ে ওঠা জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রে পরবর্তীতে ভূগোল, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক স্বার্থ, ভাষা ইত্যাদিকেন্দ্রিক ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়তাবাদের অস্তিত্ব থাকাটা অসম্ভব কিছু নয়। যেমন– বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পাকিস্তান রাষ্ট্রে এমনটি ঘটেছে। অবিভক্ত ভারতে মুসলিম জনগোষ্ঠী দীর্ঘকাল ধরে নির্মাণ করেছে দুঃখ ও ত্যাগের ইতিহাস। শুধু তাই নয়, তারা একই সঙ্গে এই দুঃখ ও ত্যাগের ইতিহাসের উত্তরাধিকারও বহন করেছে। লাহোর প্রস্তাবোত্তরকালে তথা পাকিস্তান আন্দোলন পর্বে স্বতন্ত্র জাতির বোধ জাগ্রত হওয়ায় তারা অর্জন এবং প্রতিষ্ঠা করেছে সাময়িক সার্বভৌমত্ব। কিন্তু পরবর্তীতে ভূগোল, ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

স্বার্থ ইত্যাদির ভিন্নতা বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে, বিশেষ করে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে জন্ম দিয়েছে নতুন জাতি এবং জাতীয়তাবাদের বোধ। এদিক বিবেচনায় নিলে দেখা যাবে, আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় জাতি প্রত্যয়টির সঙ্গে রাজনৈতিকতার একটি গভীর যোগ রয়েছে।

জাতীয় চেতনা

জাতীয় চেতনা একটি অধরা আইডিয়া। এটি হচ্ছে একরকমসূচক ভাবানুভূতি। আমরা এক– এই অনুভূতি হচ্ছে জাতীয় চেতনা। একটি জনগোষ্ঠী যখন তাদের নিজেদের মধ্যে কোনো ঐক্যকে, একত্বের ধারণাকে লালন, পালন এবং অনুভব করে, তখন ওই একত্বের চেতনাকে বলা যায় জাতীয় চেতনা। জাতীয় চেতনা সাধারণত দেখা দেয় একই নৃতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে। নৃতাত্ত্বিক, ভাষিক এবং সাংস্কৃতিক একরূপতার যেকোন একটি দুটি বা তিনটিরই বিদ্যমানতায় তৈরি হতে পারে জাতীয় চেতনা। এই তিনটি নিয়ামকের ক্রিয়াশীলতায় যে জাতীয় চেতনার উদয় হয়, তাকে বর্তমানের উত্তর-উপনিবেশ যুগে বলা যায় জাতীয় চেতনার নিরীহ রূপ। জাতীয় চেতনা বোধের আরো জটিল মনস্তত্ত্ব ক্রিয়াশীল থাকতে পারে। যেমন– উপনিবেশিত জাতিরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে জাতিগত, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, ধর্মগত এমন কি বর্ণগত সাদৃশ্য না থাকা সত্ত্বেও সকল উপনিবেশিতের মধ্যে একরূপতা বা আমরাসুলভ জাতীয় চেতনা ক্রিয়াশীল থাকতে পারে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামের সময় নানা সংস্কৃতি ও ধর্মের মধ্যে মানুষ নিজেদের মধ্যে ঐক্য অনুভব করেছিল। নানা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সংস্কৃতির মানুষ একত্র হয়েছিল। একারণে অনেকে মনে করেন জাতীয় চেতনা ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, নৃগোষ্ঠী, সংস্কৃতি, নির্দিষ্ট ভূগোল এমন কি জাতি-সাপেক্ষ নাও হতে পারে। যেহেতু জাতীয় চেতনা একটি বিমূর্ত ধারণা, ফলে এর ব্যাপ্তিও অনির্দিষ্ট।

যারা আমাদের মতো নয়, তারা ভিন্ন জাতীয়। এই ভিন্নতাকে আত্মসাৎ না করার চেতনা বা নিজেদের সঙ্গে এক মনে না করার চেতনাই জাতীয় চেতনা। অন্যকে অস্বীকার করে নিজের মধ্যে একাকার করে ফেলার জবরদস্তি জাতীয় চেতনার পরিপন্থি। জাতীয় চেতনা মূলত একটি স্বতঃস্ফূর্ত গোষ্ঠীগত ভাবানুভূতি। আপাতদৃষ্টিতে জাতীয় চেতনাকে অরাজনৈতিক মনে হলেও আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এটি সম্পূর্ণ একটি রাজনৈতিক ধারণা। ঐতিহাসিকভাবে দেখা গেছে জাতির মতো জাতীয় চেতনাও জাতীয়তাবাদের ভিত্তিভূমি।

জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় বহুল আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। জাতীয়তাবাদ পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের মানচিত্রকে নানা সময় নানাভাবে নাড়া দিয়েছে; আকার-আকৃতিতে পরিবর্তন এনেছে; কখনো কখনো কোনো কোনো জাতির বা রাষ্ট্রের দাপটকে বাড়িয়ে দিয়েছে, আবার কারো ক্ষমতাকে খর্ব করেছে। আবার এই জাতীয়তাবাদই কখনো কখনো সারা পৃথিবীকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে; মানবিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, এই জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম দিয়েছে বাংলাদেশের মতো অনেক নতুন নতুন রাষ্ট্র; অনেক ভূখণ্ড ও সেই

Dhaka University Institutional Repository

ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করেছে ঔপনিবেশিক শাসন আর শোষণ থেকে। একারণে জাতীয়তাবাদ সারা পৃথিবীর এক দাপুটে রাজনৈতিক তত্ত্ব–

> Nationalism has been, indeed, the chief motivating idea of political development throughout the modern era...the whole trend of modern history has been towards the development and the culmination in the twentieth century, of nationalism as a political theory and a political fact. (Hyslop 1968 : 22-23)

একারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্ব-গবেষকদের অনেকে মনে করেন, রাষ্ট্রতত্ত্ব সম্পর্কিত খুব কম তত্ত্বই আছে যে-তত্ত্বকে জাতীয়তাবাদ নামক মতবাদটি প্রভাবিত করেনি–

> Nationalism is an ideology of an unusual sort in that it affects all other ideologies. all ideologies, even anarchism, have been tinged by nationalism from time to time, and currently all ideologies are constantly affected by nationalism with the possible exception of anarchism. And thus nationalism may be the most important of the ideologies. (Sargent 1981 : 15)

জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞার্থ ও প্রকৃতি

জাতি, জাতীয় চেতনা ও জাতীয়তাবাদ খুব কাছাকাছি ধারণা হলেও ধারণাগুলোর মধ্যে পার্থক্য ব্যাপক। তবে জাতি জাতীয়তাবাদের আধার। আর জাতীয় চেতনা জাতীয়তাবাদের দ্বিতীয় ধাপের অগ্রগমন। জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণত একটি রাজনৈতিক ধারণা। জাতীয় উপলব্ধিকে শক্তিশালী করার একটি সাধারণ বোধ বা কখনো কখনো এই বোধজাত আন্দোলনই হচ্ছে জাতীয়তাবাদ। রাজনৈতিক ধারণা হলেও জাতীয়তাবাদ একটি মনোগত আবেগী ব্যাপারও বটে। জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে কোনো একটি জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়। এটি সাধারণত ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভৌগোলিক সীমারেখা ইত্যাদিকে আশ্রয় করে আকরিত হয়। অধিকাংশই মনে করেন, জাতীয়তাবাদ একটি রাজনৈতিক শক্তি, যে-শক্তি প্রোথিত হয় একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীর মনে। এর ফলে ওই জনগোষ্ঠী একটি নির্দিষ্ট ভূগোলে গোষ্ঠীবদ্ধ হতে সমান ইচ্ছা পোষণ করে এবং এই সমান ইচ্ছার ভিত্তিতে বসবাস করার সুযোগ পায় বা সুযোগ সৃষ্টি করে নেয়। অনেকে মনে করেন জাতীয়তাবাদ মূলত এক অদৃশ্য অথচ ক্রিয়াশীল আদর্শ। একে কেন্দ্র করেই কোনো জনগোষ্ঠী বা জাতি তার দুর্যোগে, দুঃখে একত্র হয় এবং কার্যক্ষেত্রে আন্দোলিত হয়।

স্থান, কাল, জাতিভেদে জাতীয়তাবাদ বিচিত্র রূপে গঠিত ও বিকশিত হতে পারে। কে, কে, আজিজ (১৯৬৭) তাঁর *The Making of Pakistan* গ্রন্থে বলেছেন, জাতীয়তাবাদ হতে পারে একটি ভাবানুভূতি, একটি আদর্শ অথবা একটি কল্পনা অথবা একটি গোড়া মতবাদ অথবা একটি উদার মতবাদ–

> Nationalism can be a sentiment or a policy, or a myth or a dogma or a doctrine. It is a sentiment when it is the love of a common soil, race, language or culture. It is a policy when it is a desire for independence, security or prestige. It is a myth when it is a mystical devotion to a vague social whole. (Aziz 1967 : 15)

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা বা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার বিষয় বিবেচনায় না নিয়ে ভাষা, ভূগোল, সাহিত্য, ঐতিহ্য আর ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে প্রায় একই ধরনের কথা বলেছেন লুইস এল. স্নাইডার (১৯৬৪)। স্নাইডার জাতীয়তাবাদকে দেখছেন এভাবে–

> a condition of mind, feeling or sentiment of a group of people living in a well-defined geographical area, speakin a common language, possessing a literature in which the aspirations of the nation have been expressed, being attached to common tradition, and in some cases, having a common religion (Snyder 1964 : 29)

আবার কোনো কোনো তাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন জাতীয়তাবোধ এবং স্বদেশপ্রেমকে। যেমন, J. H. Hayes বলেছেন–

> Nationalism consists of modern emotional fusion and exaggeration of two very old phenomena- nationality and patriotism. (Hayes 1926 : 6)

জাতীয়তাবাদের উৎস, এর কাজ ও পরিণতি সম্পর্কে নানা পণ্ডিত নানা মত দিয়েছেন। তবে জাতীয়তাবাদ যে অধিকাংশ সময় বিদেশি শাসন বা যেকোনো অপশাসনের বিপরীতে জন্মলাভ করে এতে কোনো সন্দেহ নেই। জাতীয়তাবাদী চেতনা একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে অলিখিত চুক্তির কাজ করে। জাতীয়তাবাদী চেতনার মাধ্যমে একটি সমমনা জনগোষ্ঠীর বা একটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, নিরাপত্তা অথবা সম্ভ্রম রক্ষিত হয়। এই চেতনার ক্রিয়াশীলতায় কোনো জনগোষ্ঠীর সংকটে ওই জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকেই আত্মোৎসর্গের প্রণোদনা লাভ করে। সংকট উত্তরণের শক্তির উৎস হিসেবেও কাজ করে জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদ কখনো কখনো ধর্মের বিকল্প ধর্ম হয়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদের স্বরূপ বোঝা যাবে নিম্নোক্ত উক্তিতে–

> জাতীয়তাবাদের জন্যে দরকার কিছু অন্ধ আদিম আবেগ, যা কোনো যুক্তি না মেনে বয়ে চলে একই অভিমুখে, এবং ওই মানুষগুলোকে জড়িয়ে দেয় পরস্পরের সাথে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদের জন্যে প্রেম দরকার। আবার জাতীয়তাবাদের জন্যে ঘৃণাও দরকার, শত্রুও দরকার, শত্রু পাওয়া না গেলে, শত্রুকে ঘৃণা করতে না পারলে অন্ধ আবেগ সহজে উদ্বেল হয় না। অন্ধ আদিম আবেগ সব সময় খারাপ নয়; কখনো কখনো তা চমৎকার, অনেক বেশি পুষ্টিকর, বুদ্ধিবিবেচনার চেয়ে। তবে সব সময় অন্ধ আদিম আবেগ দিয়ে চলা অত্যন্ত বিপজ্জনক। জাতীয়তাবাদ যে এক বিশেষ সময়ে অত্যন্ত ভালো, তার উদাহরণ বাঙলাদেশ। (হুমায়ুন ১৯৯৩ : ২৮-২৯)

জাতীয়তাবাদের ভিত্তি মজবুত হলে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ জাতি বা জনগোষ্ঠীর দ্বারা অনেক সময় গঠিত হয় শক্তিশালী জাতিরাষ্ট্র (nation-state)।[১] একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে যখন এক বা একাধিক ঐক্যের অনুষঙ্গ তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা দানাদার করে তোলে, তখন ওই জনগোষ্ঠী নিজেদের আরো সন্নিকটবর্তী করার জন্য আরো ঐক্যের অনুষঙ্গ অনুসন্ধান ও নির্মাণ করার কাতরতা প্রদর্শন করে। এ কারণে জাতীয়তাবাদ তার জাতিকে তার গৌরবময় অতীত ইতিহাস নির্মাণে এবং আবিষ্কারে উৎসাহী করে তোলে। এই ইতিহাস-ঐতিহ্যের ওপর জাতীয়তাবাদী চেতনা আরো মজবুতভাবে দাঁড়ায়। ওয়াল্টার হাচিনসন বলেন– 'এটি জাতীয় উপলব্ধিকে শক্তিশালী করার একটি সাধারণ আন্দোলন। শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে জাতিগত ঐতিহ্য এবং একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রক্রিয়া জোরদার হয়।' (উদ্ধৃত, নেহাল ২০১১ : ২২-২৩)

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয়তাবাদ একটি সম্পূর্ণত রাজনৈতিক আন্দোলন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করেই সাধারণত জমে ওঠে। এই আন্দোলনের ব্যাপ্তি এবং গভীরতা নির্ভর করে বিদেশিদের বিরুদ্ধে জমে ওঠা দুঃখ-দুর্দশাজাত ক্ষোভের ওপর। এই দুঃখ-দুর্দশার দীর্ঘ ইতিহাসই একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী মানসিকতা জমাট বাঁধিয়ে তোলে। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জাতীয়তাবাদ কেবল বিদেশিদের বিরুদ্ধে কিংবা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল একটি বিষয় নয়। বর্তমানে এটি একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণ বা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত।

জাতীয়তাবাদের প্রকারভেদ

জাতীয়তাবাদ একটি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কিত আবেগ। এই আবেগ স্থান-কাল-পাত্র-পরিস্থিতি-ভেদে ভিন্ন রকম হতে বাধ্য। প্রকৃতপক্ষে একথা হলফ করে বলা যায় না যে, একই তত্ত্ব বা দর্শন বা মতবাদ পৃথিবীর সব জায়গায় একই রকম ঘটবে। আদতে পৃথিবীর প্রত্যেক ভূখণ্ডে জাতীয়তাবাদ তার নিজস্ব স্বরূপে কাজ করেছে–

> Nationalism is a set of ideas, but as they travel from continent to continent, these ideas add up less to a theory than to a rhetoric, a form of self-expression by which a certain kind of political excitement can be communicated from an elite to the masses. These ideas are chameleons that take on the colour of the locality around them; we say that German and nationalist might use the same words and mean quite different things, and that nationalism combined with socialist ideas in Africa in radically different from nationalism combined with religion or state worship in modern Europe. (Minogue 1967 : 153)

একারণে জাতীয়তাবাদের সুনির্দিষ্ট প্রকারভেদ করা অসম্ভব। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ের জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশের চারিত্র্য-লক্ষণ দেখে Luis L. Snyder (1968) তাঁর *The New Nationalism* গ্রন্থে কাল বিবেচনায় জাতীয়তাবাদকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত, তিনি উল্লেখ করেছেন সংহতিমূলক জাতীয়তাবাদ (Intergrative Nationalism)-এর কথা। এই জাতীয়তাবাদের সময়কাল হিসেবে তিনি নির্দেশ করেছেন ১৮১৫ থেকে ১৮৭১। এই সময়ে যে জাতীয়তাবাদ পৃথিবীতে ছিল তা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছিল। বলা বাহুল্য, এই ঐক্যবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর জাতীয়তাবাদী জাগরণের বলি হয়েছিল অ-ইউরোপীয় অনেক দেশ। এই জাতীয়তাবাদের আরেক নাম হতে পারত হয়তো উপনিবেশকের জাতীয়তাবাদ। কারণ, এই জাতীয়তাবাদী জাগরণ শুধু ইউরোপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর তাদের জাগরণ অন্য অনেকের পরাধীনতার কারণ হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, তিনি বলেছেন পৃথকীকরণ জাতীয়তাবাদ (Disruptive Nationalism)-এর কথা, যার সময়কাল ১৮৭১ থেকে ১৮৯০। এসময় পৃথিবীর বিভিন্ন উপনিবেশিত দেশগুলোতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম হয়েছে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে। তৃতীয়ত রয়েছে আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদ (Aggressive Nationalism), যার সময়কাল হিসেবে স্নাইডার উল্লেখ করেছেন ১৯০০ থেকে ১৯৪৫। এসময়ে জাতীয়তাবাদ ব্যবহৃত হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন শক্তিশালী

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের হাতিয়ার হিসেবে। উল্লেখ্য যে, এই বাস্তবতা থেকেই ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটে। আর সর্বশেষ তিনি যে জাতীয়তাবাদের কথা বলেছেন তা হচ্ছে, সমসাময়িক জাতীয়তাবাদ (Contemporary Nationalism)। এই জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত সময় হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন ১৯৪৫ থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত। এসময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম হয়েছে তা মূলত ইউরোপের উপনিবেশের বিরুদ্ধে অ-ইউরোপীয় দেশের আন্দোলন-সংগ্রাম। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে জাতীয়তাবাদী জাগরণের মাধ্যমে ইউরোপীয় উপনিবেশিত দেশ ও জাতিগুলো নতুন নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, অন্যকথায় ভারত-পাকিস্তানের স্বাধীনতার সময়কাল ও প্রক্রিয়া এটিই। কাকতালীয় হলেও সত্য যে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মও প্রায় একই সময়ে। এও যেন এক ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম আর জাগরণের ফল। পার্থক্য শুধু একটি ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপার অন্যটি আর পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তি থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপার।

J. H. Hayes (1926) তাঁর *Essays on Nationalism* গ্রন্থে জাতীয়তাবাদকে প্রবণতা অনুসারে মানবিক জাতীয়তাবাদ, জ্যাকুবিয়ান জাতীয়তাবাদ,[২] সনাতন জাতীয়তাবাদ, উদার জাতীয়তাবাদ এবং সংহতিমূলক জাতীয়তাবাদ– এসব শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে জাতীয়তাবাদ এত বৈচিত্র্যময় যে, জাতীয়তাবাদের রকম সম্পর্কে কোনো মন্তব্যই যথেষ্ট এবং যথার্থ নয়। কারণ জাতীয়তাবাদকে ঐক্য-বর্ধন, সার্বভৌমত্ব অর্জন, উপনিবেশ বিস্তার, আধিপত্য বিস্তার, অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি, উপনিবেশবিরোধিতা, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি পরস্পরবিরোধী কাজে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে। (Luis L. Snyder 1968 : 3-5) পাকিস্তান আমলে অর্থাৎ ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত– বিশেষভাবে ষাটের দশকে পূর্ব বাংলায় জাতীয়তাবাদ ব্যবহৃত হয়েছে স্নাইডার কথিত ঐক্য-বর্ধন ও সার্বভৌমত্ব অর্জনের কাজে তো বটেই, এমনকি উপনিবেশবিরোধিতার কাজেও।

জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ

জাতীয়তাবাদের উদ্ভব নিয়ে মতভেদ আছে। Luis L. Snyder মনে করেন ১৬৮৮ সালে আধুনিক জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়। কারণ এটি ছিল ইংরেজ বিপ্লবের গৌরবময় একটি সময়। তিনি এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন পরবর্তী কালে সংঘটিত ১৭৭৬ সালের আমেরিকান বিপ্লব এবং ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবকে। এসব ঘটনা ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে যেমন সচেতনতা দান করেছে, তেমনি অভিন্ন চেতনার সূতায় বাঁধা পড়বার পরিস্থিতি তৈরি করে দিয়েছে। জি. পি. গুচ একারণেই বলেছেন 'Nationalism is the child of the French Revolution.' (Gooch 1931 : 217) জি. পি. গুচের মতো অধিকাংশ পণ্ডিতই মনে করেন যে, ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের দান জনমনের সচেতনতা। আর জনমনে এই সচেতনতাই জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশকে সম্ভবপর করে তুলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টাদশ শতকে জাতীয়তাবাদের বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পর ক্রমে এটি সমগ্র ইউরোপব্যাপী জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং জাতীয়তাবাদের ভাবাদর্শ জনগণকে নানা অভ্যুত্থানে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। উল্লেখ্য, এসব অভ্যুত্থান-আন্দোলনের অধিকাংশই ব্যাপক সংখ্যক জনগণের অংশগ্রহণে গণতান্ত্রিক বিপ্লব আকারে আবির্ভূত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শের প্রেরণা ছিলেন জ্যাঁ জ্যাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮) এবং জোহান হার্ডার (১৭৪৪-১৮০৩)। জাতীয়তাবাদের ধারণা উন্নত করতে তাঁদের অবদান রয়েছে; তাঁদের লেখা বিভিন্নভাবে জাতীয়তাবাদী সচেতনতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। ১৮৪০ থেকে ১৮৯০ পর্যন্ত ইউরোপে যতগুলো গণভিত্তিক অভ্যুত্থান হয়েছে এর প্রত্যেকটির সঙ্গে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রত্যক্ষ ক্রিয়াশীলতা লক্ষ করা যায়। মোটামুটিভাবে বলা যায়, ১৮৯০ বা এর কাছাকাছি সময়ে মধ্য, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে জাতীয়তাবাদের এক প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। ফরাসি বিপ্লব ও আমেরিকান বিপ্লবের পর জাতীয়তাবাদ ওই উনিশ শতকেই ল্যাটিন আমেরিকার নতুন দেশগুলোতে অনুপ্রবেশ করে। বিশ শতকে এসে জাতীয়তাবাদ একটা বৈশ্বিক ব্যাপ্তি লাভ করে। এই বিশ শতকে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদের অভ্যন্তরীণ চরিত্রের পরিবর্তন সাধিত হয়। জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যুক্ত হয় বিপ্লবের চেতনা; অর্থনৈতিক-সামাজিক সাম্যের চেতনা। আবার এই বিংশ শতাব্দীতেই জাতীয়তাবাদ আবির্ভূত হয়েছে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের রূপে। আর এই শতকেই মার্কিন জাতীয়তাবাদ ক্রমে সাম্রাজ্যবাদের দিকে ধাবিত হয়েছে।

জাতীয়তাবাদ ও আধিপত্যবাদ

শুরুতে জাতীয়তাবাদ জাতির আত্ম-উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হলেও ক্রমে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে নানা মাত্রা যুক্ত হতে থাকে। স্থান-কাল এবং জাতিভেদে ক্রমে জাতীয়তাবাদ হয়ে ওঠে আধিপত্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ আর উপনিবেশবাদের হাতিয়ার। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিত্তবান শাসকশ্রেণির আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ার হিসেবে দেখা দেয় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ। এই জাতীয়তাবাদ আপাতদৃষ্টিতে গণমুখী মনে হলেও মূলত তা ক্ষমতাসংশ্লিষ্ট শ্রেণির স্বার্থে মগ্ন। একারণে, বিশেষত পাশ্চাত্য দুনিয়ায়, বিভিন্ন জাতির মধ্যে জাতীয়তাবাদ এমন উগ্রতা নিয়ে আবির্ভূত হয় যে, তা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। কারণ জন্মলগ্ন থেকেই জাতীয়তাবাদ শিল্পোৎপাদন, শিল্পায়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল। (Kohn 1945 : vii) ফলে স্ব-স্ব দেশ ও জাতির উন্নয়নের জন্য এবং নিজস্ব জাতির গর্ব ও আধিপত্য বৃদ্ধি ও বজায় রাখার কাজে জাতীয়তাবাদী আবেগ ক্রমাগত ব্যবহৃত হয়েছে। পৃথিবীর দুটি বিশ্বযুদ্ধের মর্মমূলে ক্রিয়াশীল ছিল মূলত কিছু কিছু জাতির মধ্যকার উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনা। শুধু বিশ্বযুদ্ধ নয়, পৃথিবীর উপনিবেশায়নের ইতিহাসের সঙ্গেও কিছু কিছু জাতির তীব্র জাতীয়তাবাদী অহং প্রধানভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। একারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ আর জাতীয়তাবাদকে অভিন্ন মনে করতেন। তাই রবীন্দ্রনাথের *Nationalism* (১৯১৭) গ্রন্থে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে গবেষক বলেছেন–

> তাঁহার আক্রমণের উদ্দেশ্য যদিও শুধুই ‘জাতীয়তবাদ নহে– ইউরোপের ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতা-সংস্কৃতিই কবির আক্রমণের মূল লক্ষ্য, তবু জাতীয়তাবাদকেই তিনি যত কিছু অনিষ্টের মূল বলিয়া আক্রমণ

Dhaka University Institutional Repository

> করিয়াছেন। Nationalism, Nationalist state অর্থাৎ state monopoly capitalism বা imperialism-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য তিনি দেখিতে পারেন নাই; পরন্তু এইগুলির সম্মিলিত একটিমাত্র রূপকে তিনি ন্যাশনালিজম্ নামে অভিহিত করিয়াছেন। (নেপাল ১৯৮৩ : ৩৫২/১)

রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবেই বলেছেন–

> when this organization of politics and commerce, whose other name is the Nation, becomes all-powerful at the cost of the harmony of the higher social life, then it is an evil day for the humanity. (Rabindranath 1918 : 12)

স্মরণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থে জাতীয়তাবাদ অর্থে 'Nation' শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। জাতীয়তাবাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন–

> In this war the death-throes of the Nation have commenced. suddenly, all its mechanism going mad, it has begun the dance of the Furies, shattering its own limbs, scattering them into the dust. It is the fifth act of the tragedy of the unreal. (Rabindranath 1918 : 44)

প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর– বিশেষত বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের পর থেকে, আরো সুনির্দিষ্ট করে বললে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময় থেকে– আস্থাশীল ছিলেন আন্তর্জাতিকতাবাদে। তিনি নিজেকে এবং মানুষকে বিশ্বের নাগরিক বলে মনে করতেন; পরস্পর মানবিক সম্পর্কে আবদ্ধ বিশ্ব-নাগরিক। তিনি মনে করতেন, 'মানুষের শ্রেষ্ঠতার সর্বপ্রধান পরিচয়ই হচ্ছে এই যে, মানুষ সকলের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। সে মিলন মূঢ়তার মিলন নয়, সে মিলন চিত্তের মিলন, সুতরাং আনন্দের মিলন।' (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২ : ৬৯৯/৭) পাশ্চাত্য দুনিয়ায় বিকশিত জাতীয়তাবাদ এই বিশ্বব্যাপী মানব-মিলনের বিরোধী বলে তিনি জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করেননি। তিনি ভারতের জাতীয়তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করতে পিছ পা হননি–

> আমাদের দেশের কতকগুলি বিশেষ সংস্কার, আমাদের জাতের কতকগুলি লোকাচার, এইগুলি দ্বারা সীমাবদ্ধ করে আমাদের স্বাজাত্যের অভিমানকে অত্যুগ্র করে তোলবার উপায়কে আমি কোনোমতে ন্যাশনাল শিক্ষা বলে গণ্য করতে পারি নে। জাতীয়তাকে আমরা পরম পদার্থ বলে পূজা করি নে এইটেই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তা। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২ : ৭০২/৭)

ভারতবর্ষ যে সত্য সহজেই লাভ করতে পারে বলে তিনি মনে করতেন, তা 'বণিগ্‌বৃত্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়; সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা।...কারণ প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই।...পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগে, এই যোগ অহংকারকে দূর করে বিনম্র হয়। (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২ : ৭০৩-৭০৪/৭) রবীন্দ্রনাথ মূলত আন্তর্জাতিকতাবাদকেই বলতে চেয়েছেন 'বিশ্বজাগতিকতা'।

কিন্তু একথা স্বীকার্য যে, রবীন্দ্রনাথ উপনিবেশিত অঞ্চলসমূহের রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার-প্রত্যয়ে করা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামের বিষয়টি পরিপূর্ণরূপে তাঁর ভাবনার মধ্যে আনেননি। বিশেষত, জাতীয়তাবাদ বিষয়ক আলোচনা-সমালোচনার সময় বিষয়টি তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ শতকেই জাতীয়তাবাদের হাত ধরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রক্ষিতে আবির্ভূত হয় আন্তর্জাতিকতাবাদ। জাতীয়তাবাদী চেতনা যখন বিশ্বে আধিপত্যবাদের মোড়কে ঢুকে পড়ে, তখন বিশ্বে দেখা দেয় আন্তর্জাতিকতাবাদ। তবে আন্তর্জাতিকতাবাদ জাতীয়তাবাদের বিপরীত কোনো প্রত্যয় নয়। বরং এটিকে মনে করা হয় জাতীয়তাবাদের খুব কাছাকাছি একটি ধারণা। আন্তর্জাতিকতাবাদ জাতিরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষার জন্যে বিশ্বের বিভিন্ন জাতি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক শান্তি ও প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করতে প্রচেষ্ট হয়। জাতীয়তাবাদ যখন উগ্র হয়ে ওঠে, তখন ওই উগ্র জাতীয়তাবাদের ধারক জাতি, পৃথিবীর অপরাপর জাতিকে নিকৃষ্ট এবং নিজেদের উৎকৃষ্ট ভেবে থাকে। সেই বিচারে আন্তর্জাতিকতাবাদ যথেষ্ট পরমত সহিষ্ণু ও সবার স্বার্থ সংরক্ষণে অধিক আগ্রহী। এখানে প্রত্যেক জাতির স্বাতন্ত্র্য যেমন রক্ষা হয়, তেমনি আন্তঃজাতি সম্পর্ক এক ভারসাম্যের মধ্যে চলে আসে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আন্তর্জাতিকতাবাদকে বলা যায় 'বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য'। কিন্তু আন্তর্জাতিকতাবাদ বিশ্বে তেমন বিকাশ লাভ করেনি। মোটামুটি বিশ শতকেই আন্তর্জাতিকতাবাদের কবর রচিত হয়।

জাতীয়তাবাদ ও ধর্ম

একটি জাতির মধ্যে যখন জাতীয়তাবাদী চেতনা দানা বাঁধতে থাকে, তখন তা নানা বিষয়কে আশ্রয় করে দানাদার হয়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদী চিন্তা সম্ভাব্য কোন কোন উপাদান-উপকরণের আশ্রয়ে পরিপুষ্টি লাভ করে থাকে সে-বিষয়ে আগেই বলা হয়েছে। এখানে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক বিষয়েই শুধু আলোকপাত করা যায়। একথা বলাই বাহুল্য যে, ধর্ম মানুষের জীবন, চিন্তা, আচরণ, আবেগ, কর্মকাণ্ডকে নানাভাবে প্রভাবিত করে থাকে। এমনকি ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির গভীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু জাতীয়তাবাদ একটি আধুনিক চেতনা। এর সঙ্গে ইহজাগতিকার সম্পর্কই বরং বেশি। কোনো জাতি যখন জাতীয়তাবাদী চেতনায় জাগ্রত হয়ে রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার বাসনা লালন করে, তখন ধর্ম সেই আন্দোলন-সংগ্রামে অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী জাগরণে সহায়ক অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করতে পারে।[৩] কিন্তু শুধু ধর্মকে বা ধর্মীয় পরিচয়কে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী আদর্শে জাগ্রত হয়ে রাষ্ট্রগঠনের উদাহরণ পৃথিবীতে জাতীয়তাবাদী চেতনার আবির্ভাবের পর থেকে বিরল। শুধু ধর্ম একটি জাতিকে একত্র করতে পারে না। এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ বোধ করি আরব বিশ্ব। সেখানে সব রাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষের ধর্ম ইসলাম। কিন্তু সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেকগুলো রাষ্ট্র। ধর্ম যদি জাতীয়তাবাদকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারত তবে অন্তত আরববিশ্বে একটি রাষ্ট্র গঠিত হতো, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সুতরাং ধর্ম জাতীয়তাবাদের ক্ষুদ্র কোনো প্রভাবক হিসেবে হয়ত কাজ করতে পারে। কিন্তু প্রধান নিয়ামক হিসেবে সক্রিয় থেকে কোনো রাষ্ট্র গঠন করতে পারে না। ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামের দিকে দৃষ্টি দিলে বিষয়টি স্পষ্টভাবে বোঝা যেতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শুরুতে হিন্দুধর্ম এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এক্ষেত্রে 'হিন্দু মেলা' (১৮৬৭)-উৎসবের কথা স্মরণ করা যায়। 'রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-৯৯), নবগোপাল মিত্র (১৮৪০?-৯৪), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬), মনোমোহন ঘোষ (১৮৪০-৯৬), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫) প্রমুখ উদ্যোক্তা 'হিন্দু মেলা'-উৎসব আয়োজনের মাধ্যমে 'হিন্দু জাতীয়তার আদর্শ

Dhaka University Institutional Repository

জনসমক্ষে তুলে' ধরে ব্রিটিশ কলোনি-শাসন সম্পর্কে স্বশ্রেণীর মোহভঙ্গের প্রকাশ ঘটান। সর্বভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে 'হিন্দু মেলা'র তাৎপর্য 'স্বাধীনতার' ধারণা সৃজন ও বিকাশে, এবং ভারতীয় অবরুদ্ধ পুঁজির স্বাধীন-বিকাশের পথকে অন্তরায় মুক্ত করার প্রয়াস গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।' (ভীষ্মদেব ১৯৯৮ : ৭) মূলত 'হিন্দুমেলা হিন্দু সম্প্রদায়ের বাহিরে অন্য কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের কথা ভাবিতে পারে নাই। বস্তুত হিন্দুমেলার সময় হইতেই বাংলাদেশে হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রবল হইতে শুরু করে।'[৪] (নেপাল ১৯৮৩ : ২৮) উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদী চেতনার দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, ধর্ম এবং ধর্মীয় সম্প্রদায় সেখানে এত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে যে, তার নামকরণই হয়েছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ। সমকালীন কবি-সাহিত্যিকদের রচনা দেখলে দেখা যাবে, সেখানে হিন্দু বীর ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মাহাত্ম্যগাথা রচনা করা হয়েছে। একারণে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)-এর 'আনন্দ মঠ ও দেবী চৌধুরাণীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এক বীরপ্রসবিনী হিন্দু জাতি গড়িতে চাহিলেন।' (নেপাল ১৯৮৩ : ৪৪) কিন্তু ক্রমে জাতীয়তাবাদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম এবং ধর্মীয় সম্প্রদায় থেকে সরে এসে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনা অপরাপর বিষয়ের ওপর আশ্রয় করেছে। কংগ্রেসের রাজনীতি ক্রমে যতদূর সম্ভব ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের দিকে অগ্রসর হয়েছে, বিশেষত মহাত্মা গান্ধীর প্রযোজনায়।

মুসলিম লিগের রাজনীতিতেও প্রথমাবধি ধর্ম খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এমনকি 'দ্বিজাতিতত্ত্ব', যার ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলো, সেখানেও ধর্মের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু একটু গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, ধর্মই এখানে প্রধান হলেও একমাত্র নিয়ামক ছিল না। পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের মূলে তাৎক্ষণিকভাবে ধর্ম ক্রিয়াশীল থাকলেও অর্থনৈতিক বিষয়টি মুসলমানদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। (দ্রষ্টব্য টীকা-৩) অর্থনৈতিক বিষয়টিকে ধর্মের খোলসে আড়াল করা হয়েছে। ধর্মকে এবং ধর্মীয় পরিচয়কে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ গঠনের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। একটু গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের মূলে ক্রিয়াশীল ছিল মুসলমানদের অর্থনৈতিক বঞ্চনার ইতিহাস। ধর্মের পাশাপাশি এটিও মুসলমানদের একত্র করেছিল। ধর্ম এবং ধর্মভিত্তিক জাতি ও জাতীয়তার জিগির ছিল একটি রাজনৈতিক কূটচাল। এর প্রমাণ, পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই এর অধিকাংশ প্রদেশই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিল, যার সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদির সম্পর্ক গভীর; ধর্মের নয়। বিশেষত পূর্ব বাংলা তো প্রথমই যে বিষয়টিকে উপেক্ষা করেছিল তা হচ্ছে, ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ। কারণ পাকিস্তান-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা যখন বলল, যেহেতু মুসলমানরা এক জাতি তাই তাদের সংস্কৃতি ও ভাষাও হবে এক। কিন্তু পূর্ব বাংলার মানুষ সেটা মানেনি। তারা ওই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে অস্বীকার করে উত্তরকালে প্রতিষ্ঠা করে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। (মফিদুল ২০১২ : ৫৬-৫৭) পাকিস্তান রাষ্ট্র যতই ধর্মের দোহাই দিয়ে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার চেষ্টা করেছে ততই পূর্ব বাংলার সঙ্গে অপর অংশের দূরত্ব বেড়েছে। অর্থাৎ ধর্মীয় পরিচয়ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ তখন আর ক্রিয়াশীল থাকেনি। বাঙালি জাতীয়তাবাদ তথাকথিত ধর্মীয় ঐক্যকে অস্বীকার করেই প্রতিষ্ঠা করেছে বাংলাদেশ রাষ্ট্র। একারণে গবেষক বলেছেন–

Dhaka University Institutional Repository

> পাকিস্তান জাতীয়তাবাদের মূল বক্তব্য ছিল যে যারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করে, তারা ভাষা, ভৌগোলিক দূরত্ব ও জনগোষ্ঠী নির্বিশেষে এক জাতি। এর ফলে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়, তার দুটি অংশ প্রায় হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত। তার অধিবাসীরা বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলে এবং জনগোষ্ঠীর দিক থেকেও তারা ভিন্ন। ...ইসলামের জন্মভূমি মধ্যপ্রাচ্যে ভৌগোলিক নৈকট্য, ভাষাগত অভিন্নতা ও জনগোষ্ঠীর সাদৃশ্য সত্ত্বেও সেখানে রাজনৈতিক ঐক্যের কাছাকাছিও গড়ে তোলা যায়নি।...এরা একই ধর্মে বিশ্বাস করে, একই আরবি ভাষায় কথা বলে এবং একটি অবিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডে বাস করে। তবু আরব বিশ্বে ১৯টি মুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে। অথচ ভাষাগত ভিন্নতা এবং ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও সব ভারতীয় মুসলমান শুধু ধর্মের ভিত্তিতে কীভাবে একটি রাষ্ট্রে মিলিত হবে, তার কোনো যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা নেই। (আকবর ২০১৭ : ৫৬)

সুতরাং, ধর্ম জাতীয়তাবাদী চেতনা পরিগঠনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করলেও শুধু ধর্মীয় ঐক্য জাতীয়তাবাদের প্রধান নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে না; অল্প সময়ের জন্য কাজ করলেও স্থায়ী হয় না।

উপনিবেশিত অঞ্চলে জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদ ক্রমস্ফীত হয়ে যখন সাম্রাজ্য-বিস্তারী হয়ে উঠেছে, তখন উপনিবেশিত ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় চেতনা আর জাতির বোধ দানাদার হয়ে ক্রমে জন্ম দিয়েছে এক ধরনের প্রতিরোধী জাতীয়তাবাদ। এই ধরনের উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর প্রতিরোধী জাতীয়তাবাদী চেতনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মেক্সিকোর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (১৯১০-১৭)। একই সময়ে মহাত্মা গান্ধীর প্ররোচনায় ও নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী চেতনায় জেগে ওঠা শুরু করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারতেও চলেছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম। 'বৈদেশিক শাসন, দখলদারী শোষণ, অর্থনৈতিক একস্প্লইটেশন থেকে মুক্তির প্রেরণা হিসেবে এই আন্দোলন দিকদর্শন হয়ে ওঠে ...।' (মুহম্মদ মজির ১৯৯৩ : ১৭-১৮) জাতীয়তাবাদের প্রায় একই রূপ লক্ষ করা যায়, উপনিবেশিত ভারতবর্ষে এবং ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলায়।

পশ্চিমী দুনিয়ায় যে-প্রক্রিয়ায় এবং যে-রূপে জাতীয়তাবাদ দানা বেঁধেছে এবং বিকাশ লাভ করেছে, উপনিবেশিত দুনিয়ার জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও রূপকাঠামো ঠিক হুবহু সেরকম নয়। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপনিবেশগুলোতে জাতীয়তাবাদ আইডিয়া আকারে এসেছে পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক শক্তির হাত ধরে। এশিয়া-আফ্রিকার মতো উপনিবেশিত এলাকায় জাতীয়তাবাদ জ্ঞান আকারে এখানকার পশ্চিমা জ্ঞানকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রস্তুতকৃত শিক্ষিত শ্রেণির চেতনায় ধরা দিয়েছে। ফলে, এসব এলাকায় জাতীয়তাবাদ শুরুতে ছিল অধ্যয়নের বিষয়। পরে তা নানা বাস্তব পরিস্থিতির চাপে-তাপে-ভাঁপে একটা নিজস্ব রূপপ্রাপ্ত হয়েছে। সারকথা হচ্ছে, 'পৃথিবীর অ-পাশ্চাত্য দেশসমূহে এবং আধুনিক সমাজে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসার ঘটেছে মূলত আধুনিকীকরণের মাধ্যমে। এর সঙ্গে সার্বভৌমত্ব, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জনগণের-সরকার-তত্ত্বের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে।' (মুহম্মদ মজির ১৯৯৩ : ১৬) বলা বাহুল্য, 'সার্বভৌমত্ব, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জনগণের সরকার-তত্ত্ব' তথা 'আধুনিকতা'– এসবই ঔপনিবেশিকতা থেকে আহৃত চেতনা। তবে যেখান থেকে যেভাবেই আসুক না কেন, উপনিবেশিত অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক নাগাদ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জাতিকে সার্বভৌমত্ব অর্জনে, রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়,

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫১ থেকে ১৯৯০ এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রায় একশত রাষ্ট্র। (আকবর ২০১৭ : ৫৮)

ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ

ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী চিন্তার উদ্ভব ঘটেছে ইংরেজ উপনিবেশের মাধ্যমে। ঔপনিবেশিক ইংরেজের কাছ থেকে পাওয়া সচেতনা থেকেই ল্যান্ডহোল্ডার সোসাইটি (১৮৩৭), ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন (১৮৩৭), ব্রিটিশ ভারত সংঘ (১৮৪৩), ভারত লীগ (১৮৭৫) ইত্যাদি সংগঠনের অর্ধ-ব্যর্থ এবং ব্যর্থ তৎপরতার পর, ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভারতে জাতীয়তাবাদ নামক প্রত্যয়ের পথযাত্রা শুরু হয়। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এর নেতৃবৃন্দ এবং ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু শ্রেণি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান আর বর্ণপ্রথার কারণে বহুধাবিভক্ত হিন্দু জনগোষ্ঠীকে রেনেসাঁসের ধারণা দ্বারা পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস পান। হিন্দুর গৌরবময় ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে হিন্দু জনগোষ্ঠীকে একত্রীকরণের প্রয়াস পান স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩) এবং স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) প্রমুখ। অন্যদিকে প্রগতিশীল ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনের মাধ্যমে রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯৪), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) প্রমুখ হিন্দু ধর্মীয় অনাচারের সংস্কারে ব্রতী হন। এই দুয়ের সমন্বিত প্রয়াস হিন্দুদের মনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেতনা গড়ে তোলে এবং এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে জন্ম নেয় হিন্দু জাতীয়তাবাদ। এই হিন্দু জাতীয়তাবাদ কংগ্রেসের প্রযোজনায় ক্রমে ক্রমে ভারতীয় জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হয়ে এর আওতা বাড়িয়ে তোলে। হিন্দু জাতীয়তাবাদ দিয়ে শুরু হলেও গণতন্ত্র, উদারতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ইত্যাদির সহযোগে– যা কিনা কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িত নেতৃবৃন্দ ইংরেজের কাছেই শিখেছিলেন– ভারতীয় জাতীয়তাবাদে রূপলাভ করে। আদতে কংগ্রেসই ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূল ধারক, বাহক, রক্ষক ও উন্নয়নকারী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। বিশ শতকের দুই দশক পর্যন্ত কংগ্রেস শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইংরেজের কাছে তার জনগণের পক্ষে নানা দাবি-দাওয়া উত্থাপন ও আদায় করে আসছিল। কিন্তু ক্রমে আর তা সম্ভব না হওয়ায় এই সম্পর্ক দ্বন্দ্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এসময় অর্থাৎ দ্বিতীয় দশক থেকে কংগ্রেস তার নানা আন্দোলনের সঙ্গে ব্যাপক জনগণকে সম্পৃক্ত করে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলে। যেমন, অসহযোগ আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন। এই গণ-আন্দোলন ছিল মূলত জাতীয়তাবাদের রঙে রঙিন। এই জাতীয়তাবাদী গণ-আন্দোলন ক্রমে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপলাভ করে।

কিন্তু উপনিবেশিত ভারতের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করে হিন্দু জনগোষ্ঠীর তুলনায় ঐতিহাসিক কারণেই একটু পরে সচেতন হওয়া মুসলিম জনগোষ্ঠী। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের ধারাবাহিকতায় ১৯০৬ সালে ভারতের একটা বড় অংশ মুসলিম জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের জন্য এবং ইংরেজের সঙ্গে সৃষ্ট দীর্ঘ ঐতিহাসিক দূরত্ব ও ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাতে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লিগ নামক রাজনৈতিক সংগঠন। দীর্ঘ প্রায় দুই থেকে আড়াই দশক অম্ল-মধুর সম্পর্কের মধ্য দিয়ে চলার পর ক্রমে এই মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা দেয় স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদী চিন্তা। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রকাশ্যভাবে অন্তত ত্রিশের দশকের শেষদিকে বিশেষত লাহোর প্রস্তাবের পর থেকে ক্রমে দানা বেঁধে ওঠা পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ

স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দেখা দেয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে আর ধরে রাখতে পারেনি। ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আর রাজনৈতিক ইতিহাস ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে একটি স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদের আওতায় ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। অবশেষে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে এই পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ এক দৃশ্যমান অবয়ব লাভ করে।

অবিভক্ত বাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বাইরে বাংলাভাষী অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঔপনিবেশিক কালপর্বেই– আরো স্পষ্ট করে বললে ঊনবিংশ শতাব্দীতে– জন্ম নেয় বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এই বাঙালি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বাংলার নবজাগরণের একটি ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। আর, 'কলকাতা বা তার আশপাশের জেলাসমূহের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মানস-জাগরণকেই বলা হয় বাঙলার নবজাগরণ।' (সৈয়দ আকরম ২০১৩ : ৪১) তাছাড়া বাংলার এই নবজাগরণ, যাকে ভর করে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকশিত হয়, তাতে সংগত কারণেই পিছিয়ে থাকা বাঙালি মুসলমানের অন্তর্ভুক্তি ছিল না বললেই চলে। সুশোভন সরকারের কথায়–

> আমার মতে বাংলার রেনেসাঁসের প্রধান সীমাবদ্ধতা তিনটি : (১) আমাদের নবজাগরণের প্রতিনিধিস্থানীয়দের অধিকাংশই ব্রিটিশ শাসনকে প্রগতির সমার্থক হিসেবে দেখেছিলেন। আধা-ঔপনিবেশিক পরাধীনতা আর সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বাঁধনে যে আমাদের বেঁধে রেখেছিল ইংরেজরা, সেটার উপর তাঁরা জোর দেননি। (২) এদের ব্যাপক সংখ্যক সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমাদের রেনেসাঁসের কর্ণধারদের দূরত্ব ছিল যোজন সমান। নিজেদের একটা আলাদা জগতেই বাস করতেন তাঁরা। (৩) আমাদের আন্দোলনের আলোকপ্রাপ্ত ভদ্রলোকদের মধ্যে হিন্দুসুলভ প্রবণতাটা ছিল একান্তই স্পষ্ট; ফলে দূরে সরে গিয়েছিল মুসলিমরা। (সুশোভন ১৪০৪ : ১৮৭)[৫]

প্রকৃতপক্ষে রাজনীতি-সংস্কৃতিতে লক্ষযোগ্য হয়ে উঠতে বাঙালি মধ্যবিত্ত মুসলমানদের সময় লেগেছে প্রায় পুরো উনিশ শতক। 'কিন্তু যুক্তপ্রদেশীয় মুসলিম পুঁজিপতিদের শক্তিসঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে উঠেছিল বেশ কিছুকাল আগে থেকেই।' (সৈয়দ আকরম ২০১৩ : ৪১) কিন্তু অসমবিকশিত মুসলমান জনগোষ্ঠী বাংলার জাগরণের সঙ্গে যুক্ত না হওয়ায় বা হতে না পারায়, নবজাগরণের সঙ্গে যুক্তরা 'বাঙালির জাগরণ বলতে 'হিন্দুর পুনর্জাগরণ' বুঝলেন। কাজেই নবস্ফুরিত বাঙালি জাতীয়তাবাদের সম্ভাবনা বিঘ্নিত হলো। কারণ বাঙালি জাতীয়তাবাদ অচিরেই হিন্দু-জাতীয়তাবাদে পরিণত হলো; এর অঙ্গ হিসেবে যুক্ত হলো শ্রীকৃষ্ণ নিবেদন, ভবানী পূজা ইত্যাদি।[৬] প্রতিক্রিয়ায় ও হীনমন্যতায় বাঙালি মুসলমান সমাজ হলেন 'আরব-পারস্যমুখী'। এই দ্বিধাবিভক্ত বাঙালি জাতিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ব্যবহার করেছে ভারত ভাগ করার প্রাক্কাল পর্যন্ত।' (সৈয়দ আকরম ২০১৩ : ৪১-৪২) ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর গঠনোন্মুখ বাঙালি জাতীয়তাবাদ পরিপূর্ণভাবে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের বা বলা যায় পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সব বাঙালির মিলিত প্রবাহে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারেনি।[৭] ইতিহাস-গবেষক জানাচ্ছেন– ভবিষ্যতের সেই সম্ভাবনা রোধ করতে পরবর্তী ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ব্রিটিশ সরকার। এর প্রমাণ লক্ষ করা যায় ১৯০৫ সালে। বাংলা ভাগ করে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তির সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ ও খণ্ডিত হয়ে যায়। (Sumit 1994 : 17-20, সুনীতি ২০০৫ : ১৩৯-১৪০, রফিক ২০০৯ : ৪৮) তবে বিভক্ত বাংলায় বিশেষত পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমান নানা

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগসুবিধার হাতছানি দেখে ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থসমূহ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নে ১৯০৬ সালে ঢাকায় একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়। (মফিদুল ২০১২ : ৫) ফলে প্রায় স্থায়ীভাবে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাঙালি জনগোষ্ঠীর যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার চূড়ান্ত ও সদর্থক জাগরণ তা বাধাপ্রাপ্ত হয়। বাংলা আর ভারতবর্ষের পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ মাথায় রেখে বলা যায়, বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা আর এই ঘটনা নিয়তির মতো বাঙালি হিন্দু আর মুসলমান সম্প্রদায়ের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়। ১৯০৬ সালের পরে আরেকটি বড় ঘটনা ঘটে ১৯০৯ সালে। এই সালে ব্রিটিশ সরকার হিন্দু ও মুসলমানের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে শাসনতন্ত্রে। '১৯০৯ সালের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনে ভারতে প্রচলিত হল সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন। এর পর থেকে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান মিলিত সংগ্রামের আর তেমন সুযোগ পেল না।' (বদরুদ্দীন ২০১৫ : ১৫) এর পরবর্তী ইতিহাসে এই দুই জনগোষ্ঠীর প্রকৃত ও দীর্ঘমেয়াদি মিলন আর প্রায় সম্ভবই হয়নি। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে কংগ্রেস আর মুসলিম লিগ অবিভক্ত ভারতের রাজনীতির দরকষাকষি করেছে। ইতোমধ্যে ত্রিশের দশকে এসে মুসলিম লিগও সমগ্র ভারতের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী একক রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ফলে আলাদাভাবে বাংলা নিয়ে ভাববার অবসর ছিল না। আবার বিশের দশকের পর থেকে বাংলা অবিভক্ত ভারতের রাজনীতিতে বড় ভূমিকা রাখার মতো নেতৃত্বও যোগান দিতে পারেনি।[৮] ফলে অবিভক্ত ভারতে সম্ভাবনাময় বাঙালি জাতীয়তাবাদের বলা যায় একরকম অপমৃত্যুই হয়। এই অপমৃত্যুর বড় প্রমাণ, ১৯৪৭-এ পশ্চিম বাংলা বাঙালি জাতীয়তাবাদের উৎসভূমি বাংলাকে ভেঙে হাজার বছরের ভাষিক, ঐতিহাসিক, ঐতিহ্যিক আর নৃতাত্ত্বিক বন্ধন ছিন্ন করে যোগ দেয় ভারতে।[৯] আর পূর্ব বাংলার শিক্ষিত, রাজনীতি-সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণি এমনকি ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকারী মানুষেরাও প্রয়োজনে বাংলাকে ভাগ করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে রায় দিল; উল্লাস প্রকাশ করল পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠায়।[১০] এমনকি ভারত ভাগের প্রাক্কালে ১৯৪৬ সালে শরৎচন্দ্র বসু (১৮৮৯-১৯৫০), হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি (১৮৯২-১৯৬৩, আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪) প্রমুখের বাংলাভাষী এলাকা নিয়ে বৃহৎ বঙ্গের প্রচেষ্টায়ও পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার শিক্ষিত, রাজনীতি-সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণি, রাজনীতিবিদ কেউই কোনো সাড়া দেয়নি। তাছাড়া তাঁদের এই প্রচেষ্টা এবং জাতীয়তাবাদী প্রচেতনা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আর পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের প্রবল প্রতাপে এবং গণভিত্তি না পেয়ে চাপা পড়ে যায়। এটি তখন কোনো আন্দোলন বা সর্বাত্মক চেতনায় স্ফূর্তি লাভ করতে পারেনি; রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা। ফলে বাংলা ভাগ হয়ে যায়। এই ভাগের সঙ্গে সঙ্গে একটি অবিভক্ত শক্তিশালী জাতির উত্থানের, আলাদা জাতিরাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের সোনালি সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। বাঙালি জাতির এই দ্বিধাবিভক্তিকে অনেকে আত্মঘাতী এবং অপূরণীয় ক্ষতি বলে মনে করেন–

> বাঙালি বুদ্ধির দোষে, অন্ধ উত্তেজনার বশে, ভয়াবহ দ্বেষের তাড়নায় বাংলাকে ভাগ করিয়াছে। সেদিন হইতে যে মানসিক ও বৈষয়িক যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়াছে, উহার অবসান হয় নাই, কখনও হইবে না। (নীরদচন্দ্র ১৪১৭ : ৭৮)

পূর্ব বাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ

Dhaka University Institutional Repository

অবিভক্ত বাংলায় বাঙালি জাতীয়তবাদ দুই বার কাঙ্ক্ষিত পরিণতি লাভ করতে পারেনি। যদিও আগেই বলা হয়েছে, এই জাতীয়তবাদী চেতনার জাগরণের মধ্যে– অন্তত প্রথম জাগরণের মধ্যে– সর্বস্তরের বাঙালিকে নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা ছিল না। আর দ্বিতীয়টির মধ্যে সেই আকাঙ্ক্ষা থাকলেও জাতীয়তাবাদী আবেগের যেটি অন্যতম লক্ষণ, ব্যাপক গণ জাগরণ, তা ছিল না। তাই সেই আকাঙ্ক্ষা কার্যকর হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবের পর অবিভক্ত ভারতের রাজনীতি আবেগাত্মকভাবে আর জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিকতার মধ্য দিয়ে এত দ্রুত হিন্দু-মুসলমানের দ্বিভাজনের দিকে গড়াচ্ছিল যে, পূর্ব বাংলার নেতৃত্ব থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণ এমনকি লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিক পর্যন্ত অনেকেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে দ্বিধাহীন হয়ে ওঠেন।[১১] গবেষক সাতচল্লিশে পূর্ব বাংলার মানুষের জাতীয়তাবাদী চৈতন্যের তীব্রতা সম্পর্কে বলেছেন, 'সাতচল্লিশে এসে বাংলাদেশের মানুষ হয়ে গেল পাকিস্তানী, আর অল্প দিনের জন্য হলেও অধিকাংশের জন্যই পরিচয়টা ছিল গৌরবের ব্যাপার।' (আবদুল হক ১৯৮৭ : ৩৫) সেদিন পূর্ব বাংলার মানুষ পাকিস্তানের পক্ষে বিপুল আগ্রহ আর প্রত্যাশা আর পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী আবেগে ভোট দিয়েছিল। অবশ্য অনেকে মনে করেন, শুধু পূর্ব বাংলা নয়, দুই বাংলার মানুষই হিন্দু-মুসলমানের ভিত্তিতে ভারতভাগ তথা বাংলাভাগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় রাজনীতির শিকার ছিল–

> সাধারণ মানুষের কোনো ভূমিকাই ছিল না, তারা ছিল ভুক্তভোগী। দুর্বৃত্তের ভূমিকা যারা পালন করেছে তারা হলো তিন প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ। যেন পাশা খেলা, সেই প্রাচীনকালের, মহাভারতের যুগেরই, নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা চাপিয়ে দেওয়া জনগণের ওপরে। খেলেছে হিন্দু ও মুসলমানের প্রতিষ্ঠিত নেতারা, তাদের উৎসাহ দিয়েছে বৃটিশ। বঙ্গভঙ্গ রোধ করতে হলে সুবিধাভোগী নয়, প্রয়োজন ছিল জনস্বার্থবাদী নেতৃত্ব; সে নেতৃত্ব পাওয়া যায় নি।...সর্বভারতীয় নেতৃত্ব বাংলাকে গ্রাস করে ফেললো, একদিক দিয়ে গান্ধী এলেন, অন্যদিক দিয়ে জিন্নাহ। বাংলার ভাগ্য ভারতের ভাগ্যও রাজনীতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কাজেই ভারত যখন ভাগ হলো বাংলাও তখন ভাগ হলো। (সিরাজুল ২০১১ : ২৭৭)

বাংলাকে অবিভক্ত রেখে স্বাধীন স্বতন্ত্র বাংলা গঠনের চেষ্টা হয়েছে একথা আগেই বলা হয়েছে। সোহরাওয়ার্দি দুই বাংলার জনগণ, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদদের উদ্দেশে এও বলেছিলেন যে–

> যদি বাংলাদেশ ঐক্যবদ্ধ থাকে তাহলে বাংলাদেশ একটি মহান দেশে পরিণত হবে এবং ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী হবে। এখানকার অধিবাসীদের এক উন্নত জীবনযাত্রার অধিকারী করতে সক্ষম হবে। একটি মহান জাতি সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। (অমলেন্দু ১৯৭৫ : ৭)

কিন্তু তাঁর এই কথায় কেউই তেমন কর্ণপাত করেনি। এমনকি সোহরাওয়ার্দি, শরৎচন্দ্র বসু, আবুল হাশিম প্রমুখের এই স্বাধীন বাংলা গঠনের অনেক আগে থেকেই হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে বাংলা ভাগের দাবি তোলা হয় এবং এই দাবির পক্ষে মধ্যবিত্তের মধ্যে ব্যাপক প্রচারণাও চালানো হয়।[১২] (অমলেন্দু ১৯৭৫ : ৩; সিরাজুল ২০১১ : ২৮০) আর অন্যদিকে পূর্ব বাংলার নয় শুধু, বাঙালি শিক্ষিত মুসলমান তরুণরা মনে করত, 'পাকিস্তান আনতে না পারলে লেখাপড়া শিখে কি করব?' ১৯৪৭ সালের দেশভাগের আগের এবং দেশভাগের প্রাক্কালের একজন রাজনীতি সচেতন পূর্ব বাংলার শিক্ষিত মুসলিম তরুণের পর্যবেক্ষণ ছিল এরকম–

Dhaka University Institutional Repository

> অখণ্ড ভারতে যে মুসলমানদের অস্তিত্ব থাকবে না এটা আমি মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতাম। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হিন্দু নেতারা ক্ষেপে গেছেন কেন? ভারতবর্ষেও মুসলমান থাকবে এবং পাকিস্তানেও হিন্দুরা থাকবে। সকলেই সমান অধিকার পাবে। পাকিস্তানের হিন্দুরাও স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বাস করবে। ভারতবর্ষের মুসলমানরাও সমান অধিকার পাবে। পাকিস্তানের মুসলমানরা যেমন হিন্দুদের ভাই হিসাবে গ্রহণ করবে, ভারতবর্ষের হিন্দুরাও মুসলমানদের ভাই হিসাবে গ্রহণ করবে। এই সময় আমাদের বক্তৃতার ধারাও বদলে গেছে। অনেক সময় হিন্দু বন্ধুদের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এ নিয়ে আলোচনা হত। কিছুতেই তারা বুঝতে চাইত না। ১৯৪৪-৪৫ সালে ট্রেনে, স্টিমারে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তুমুল তর্ক-বিতর্ক হত। সময় সময় এমন পর্যায়ে আসত যে, মুখ থেকে হাতের ব্যবহার হবার উপক্রম হয়ে উঠত। এখন আর মুসলমান ছেলেদের মধ্যে মতবিরোধ নাই। পাকিস্তান আনতে হবে এই একটাই স্লোগান সকল জায়গায়। (শেখ মুজিবুর ২০১৬ : ৩৬)

তবে তারা মনে করতেন, 'ভবিষ্যতে পাকিস্তান পেলে অর্থনৈতিক কাঠামো কি হবে তাও থাকতে হবে।...পাকিস্তান আদায় করতে হবে এবং পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পরে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কি হবে তার একটা সুস্পষ্ট রূপরেখা থাকা দরকার।' (শেখ মুজিবুর ২০১৬ : ৩১) জমিদারি প্রথা উচ্ছেদসহ আরো নানা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক হিস্যার আশায় তারা অর্থাৎ বাংলার মুসলমানরা সেদিন পাকিস্তান আন্দোলন করেছিল। বাংলার অবিভক্ততা তাদের কাছে সেদিন তেমন গুরুত্ব পায়নি। একারণে ১৯৪৬-এর নির্বাচনে কংগ্রেসের 'অবিভক্ত ভারত'-এর পক্ষে পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠী ভোট দেয়নি।[১৩] বরং তারা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা আর স্বপ্ন নিয়ে ভোট দিয়েছিল মুসলিম লিগকে। (আতিউর ২০১২ : ২৮) তারা ভারতীয় জাতির পরিচয়ে আত্ম-বিলুপ্ত হতে অস্বীকৃতি জানিয়ে পাকিস্তানি জাতি সৃষ্টির উন্মাদনার জোয়ারে ভেসে গিয়েছিল। (সালাহ্উদ্দীন ২০১৪ : ২৭৬, আবদুর রাজ্জাক ১৯৮৭ : ৬) কারণ অবিভক্ত ভারতে ঐতিহাসিকভাবে পিছিয়ে থাকা পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠী নিজেদের 'অপর' (other) ভাবত। তারা চেয়েছিল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, বৈষম্যহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা। (আতিউর ২০১২ : ৩৪) এই আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়েই পূর্ব বাংলার বাঙালি তার স্বাতন্ত্র্যের সাধনা করেছে; সমন্বয়কে কম গুরুত্ব দিয়েছে বা উপেক্ষা করেছে। কারণ বৃটিশ শাসিত ভারতে বাঙালি নিজেকে অন্য অংশের তুলনায় বঞ্চিত আর বৈষম্যের শিকার বলেই জেনে এসেছে; নিজেকে দুর্বল ভেবেই এসেছে। পূর্ব বাংলার মানুষের পাকিস্তান সমর্থন ছিল মূলত আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা।[১৪] রাষ্ট্রক্ষমতায় নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ করার, নিজের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার বাসনার সঙ্গে যুক্ত। 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' বা 'মুসলমানি জিগির' পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল বলে মনে হয় না। কারণ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে পাকিস্তানি শাসকরা ধর্মের দোহাই পেড়ে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদকে যতই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে ততই প্রমাণিত হয়েছে যে, পূর্ব বাংলার বাঙালিরা মুসলমান হতে চায়নি, তারা আত্মমর্যাদাশীল নতুন এক বাঙালি জাতি হতে চেয়েছিল। একারণে আমরা লক্ষ করি, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠী পাকিস্তানের মধ্যে নিজের আত্মপরিচয়কে বিলীন করে দিয়ে পাকিস্তানি হতে চায়নি; যেমনটি আগেও ভারতীয় আত্মপরিচয়ের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিতে চায়নি। ১৯৪৭-এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৭১ অব্দি পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠী ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের মূলধারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠা করেছে। গবেষকও মনে করেন, '১৯৪৭ থেকে ১৯৭১– এ চব্বিশ বছরে

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান-অধিকৃত বাঙলার তথা প্রাচীন মধ্যযুগের বঙ্গ-বঙ্গালার সাহিত্য-শিল্প-দর্শন-সংস্কৃতি প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-সংরক্ষণগত কারণে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে বিকশিত ও বহুলাংশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' (সৈয়দ আকরম ২০১৪ : ৪৪) পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠীর এই নবতর স্বাতন্ত্র্যের সাধনা সম্পর্কে বলা যায়, 'যে কারণে পাকিস্তানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল সে কারণেই আজ বাংলার স্বাধীনতার প্রয়োজন হয়েছে।' (কামরুদ্দীন ২০০৪ : ১১৯) অর্থাৎ এক সময়ে পূর্ব বাংলার বাঙালিরা যে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য, আত্মমর্যাদার জন্য পাকিস্তান আন্দোলন করেছিল সেই একই আত্মপ্রতিষ্ঠা আর আত্মমর্যাদার জন্য আবার তারা নতুন জাতীয়তাবাদী চেতনার পতাকা তলে শামিল হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে তার এই দ্বিতীয়বারের আত্মপ্রতিষ্ঠার নিমিত্তে পরিচালিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামে সে বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেছে। কারণ ধর্মগত ভিন্নতা সত্ত্বেও এই জনগোষ্ঠীর রয়েছে হাজার বছরের অভিন্ন ভাষা, ভাষাসংশ্লিষ্ট ভাবসম্পদ আর নৃতাত্ত্বিক ঐক্য। পাকিস্তান রাষ্ট্রের পত্তনের পর তৎকালীন পূর্ব বাংলায় ভাষা, সংস্কৃতি আর ইতিহাস পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের বিপরীতে এক প্রবল প্রতাপী জাতীয়তাবাদী চেতনার জাগরণ ঘটায়। এই জাতীয়তাবাদী জাগরণ শেষ পর্যন্ত নতুন রাষ্ট্র গঠন করে এবং ১৯৭১ সালে সম্ভব করে তোলে বাংলাদেশ নামক এক স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়কে। এই বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও এর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিকতা লক্ষ করলে দেখা যায়, ভাষা আন্দোলনই বাঙালি জাতীয়তাবাদের সূচনাভূমি। এই আন্দোলনে ছাত্র, মধ্যবিত্ত, কৃষক, শ্রমিক, জনতার অভাবনীয় সক্রিয় অংশগ্রহণ একে জাতীয়তাবাদী স্বভাব দান করেছিল। এই জাতীয়তাবাদী চেতনাই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা পাওয়া পৃথিবীর অপরাপর সংগ্রামশীল জাতির মতোই পূর্ব বাংলায় নতুন মেজাজের, নতুন ইতিহাসের একটি জাতি ও জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকে সম্ভব করে তুলেছে। সেই জাতির নাম বাঙালি। আর তার রাষ্ট্রের নাম বাংলাদেশ।

টীকা

১. একই সংস্কৃতি, ভাষা, ইতিহাস-ঐতিহ্যের ভিত্তিতে কোনো জনগোষ্ঠী যখন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে রাষ্ট্র গঠন করে তখন সেই রাষ্ট্রকে জাতিরাষ্ট্র বলে। আবার আলাদা আলাদা ভাষা সংস্কৃতির অধিকারী জনগোষ্ঠীও যদি একটি জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে রাষ্ট্রগঠন করে তখনও ওই রাষ্ট্রকে জাতিরাষ্ট্র বলা হয়। Oxford Dictionary (1016)-এর মতে জাতিরাষ্ট্র হচ্ছে 'A large body of people united by a common decent, history, culture, or language inhabiting a particular state or territory'. Collins English Dictionary (2012)-এর মতে জাতিরাষ্ট্র হচ্ছে 'An independent state inhabited by the people of one nation and one nation only.' Random House Dictionary (2017) অনুসারে জাতিরাষ্ট্র হচ্ছে 'A sovereign state inhabited by relatively homogeneous group of people who share a feeling of common nationality.'

২. এই ধরনের জাতীয়তাবাদ কিছুটা অসহিষ্ণু। মানুষের মানবিক মূল্যবোধের চেয়ে জাতীয় ঐক্য, সংহতি আর শক্তি বাড়িয়ে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা ও সার্থক করতে চায়।

৩. ধর্ম জাতীয়তাবাদের সহায়ক হয়েছে এর ভালো উদাহরণ পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ। বিশেষত ত্রিশের দশকে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের জাতীয়তাবাদী চেতনা পরিগঠনের একটি অংশ জুড়ে ছিল ধর্ম। পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'পূর্ব বাংলার বিশাল ক্ষুদ্রকৃষক সম্প্রদায় যারা একই অর্থনৈতিক শর্তের নিচে বসবাস করত, ধর্ম তাদেরকে 'সম্প্রদায়'-এর ধারণা প্রদান করে; ফলে বাংলার ইতিহাসের এক জটিল সন্ধিক্ষণে ধর্ম 'জাতীয় বন্ধনের' বুনিয়াদরূপে আবির্ভূত হয়, পরবর্তীকালে এটি রাজনৈতিকভাবে আরো মজবুত হয় এবং শেষতক মুসলমানদের

Dhaka University Institutional Repository

স্বতন্ত্র মাতৃভূমির দাবি জানায়।' (পার্থ ২০১৪ : ১৩৯) তবে একই সঙ্গে পার্থ একথা বলতে ভোলেননি যে, 'মুসলমান কৃষকশ্রেণি তাদেরকে দমিয়ে রাখা দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং নৈতিক ব্যবস্থাকে বহু আগেই নীরবে প্রত্যাখ্যান করে।' প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয়োক্ত কাজটি আগে ঘটেছে আর প্রথমোক্ত বিষয়টি অর্থাৎ ধর্ম পরে সেখানে অনুঘটকের কাজ করেছে।

৪. তবে অনেকে মনে করেন 'হিন্দুমেলা' শুধু হিন্দুকেন্দ্রিক ছিল তা নয়। এটি প্রকৃতপক্ষে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের আকর ছিল। 'ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, হিন্দু মেলা 'চৈত্র মেলা' ও 'ভারত মেলা' হিসেবেও পরিচিত ছিল। হিন্দু মেলার উদ্ভব বঙ্গদেশে ঠিকই, কিন্তু তার প্রেরণা ছিল সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের উপলব্ধি।' (হায়াৎ ২০১৫ : ৩৯) হায়াৎ মামুদ তাঁর evsjv‡'k : mvs¯‥wZK AvZ¥cwiPq (২০১৫) গ্রন্থে এ মেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কিত গণেন্দ্রনাথ (?) ঠাকুরের ভাষণের যে বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা হচ্ছে– 'এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে, কোনও বিষয়সুখের জন্য নহে, কেবলমাত্র আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য– ইহা ভারতভূমির জন্য।' (প্রাগুক্ত) এ মেলা সম্পর্কে মনোমোহন বসুর একটি বক্তব্যও হায়াৎ উদ্ধৃত করেছেন– 'হিন্দু মেলা আমাদের স্বাদেশিকতার প্রথম সূচনা।... স্বজাতির উন্নতিসাধন, ঐক্যস্থাপন এবং স্বাবলম্বন অভ্যাসের চেষ্টা করাই এই সমাবেশের একমাত্র পবিত্র উদ্দেশ্য।' (প্রাগুক্ত) কিন্তু এসব কথা এবং হায়াৎ মামুদের বক্তব্য হিন্দু মেলার জাতিধর্ম নিরপেক্ষতার পক্ষে যথেষ্ট নয় বলেই মনে হয়। কারণ, মেলার নামকরণের মধ্যে এর উদ্যোক্তারা নিরপেক্ষতার কোনো ভান করেননি। তাছাড়া মুসলমান সমাজের পশ্চাৎপদতার কারণে এই ধরনের জাতীয়তাবাদী উদ্যোগ-আয়োজনের মধ্যে তাদের অন্তর্ভুক্ত না করার বিষয়টি সেকালে খুব বেশি অস্বাভাবিকও নয়।

৫. বাংলার নবজাগরণ সম্পর্কে প্রায় একই ধরনের মত পোষণ করেন বিনয় ঘোষ। তিনি ব্রিটিশ শাসকদের তৈরি তিনটি সামজিক শ্রেণির উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো (ক) নাগরিক comprador-শ্রেণি (খ) আধা-নাগরিক আধা-গ্রাম্য জমিদারশ্রেণি এবং (গ) গ্রাম্য বা নাগরিক নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণি। তিনি বলেন, ইংরেজসৃষ্ট এই তিনটি শ্রেণি-ই মূলত বাংলার নবজাগরণের সঙ্গে যুক্ত। এঁরা 'অধিকাংশই হিন্দু, এবং হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণভুক্ত আর তাঁদের নিয়েই প্রধানত এই তিনটি শ্রেণী গঠিত হয়েছিল। মুসলমান এবং অনুচ্চবর্ণ বলে হিন্দুসমাজে যারা উপেক্ষণীয়, তাঁদের সংখ্যা এই তিনটি শ্রেণীর মধ্যে খুই সামান্য।' (বিনয় ১৪২৩ : ১৭৯) ফলে বাংলার রেনেসাঁস ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মতো সর্বপ্লাবী ও স্বাভাবিক নয়। তিনি বলতে চেয়েছেন, 'বাংলার নবজাগৃতি একটি অতিকথা' বা myth. যদিও সুশোভন সরকার তাঁর evsjvi †i‡bmvm (১৪০৪) গ্রন্থে বাংলার রেনেসাঁসের যথেষ্ট সমালোচনা সত্ত্বেও বলেছেন 'তা সত্ত্বেও বাংলার রেনেসাঁসের একটা নিজস্ব আপেক্ষিক মূল্য আছেই।'

৬. ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিককার এই জাতীয়তাবাদী চেতনা সম্পর্কে গবেষকের মন্তব্য দেখা যেতে পারে। অমলেন্দু দে (১৯৭৪) বলেছেন– 'The influence of Hindu nationalism and Hindu revivalism became quite prominent in the religious and social outlook of the Hindus in the third quarter of the 19th century. To many people the meaning of the word 'nationalism' was nothing but Hindu nationalism. Hinduism and Nationalism became synonymous. It is needless to say that this attitude generated separatist feelings among the Hindus. (Amalendu 1974 : 70)

৭. অবশ্য অনেকে মনে করেন, অবিভক্ত ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তায় শুধু বাংলা বলে কিছু ছিল না। হায়াৎ মামুদ বলেছেন–'একটি ব্যাপার আমাদের প্রায়শই স্মরণ থাকে না যে, ... সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাঙালি শিল্পী-সাহিত্যিক-চিন্তানায়কেরা কেউই বঙ্গদেশকে, পৃথক, ভিন্ন, স্বতন্ত্র বলে কখনও বিবেচনা করেননি; তাঁরা সর্বভারতীয় চালচিত্রে সর্বদা বাংলাকে দেখেছেন, একটি সম্পূর্ণ ও বৃহৎ মোজাইক-ম্যুরালের অজস্র খণ্ড টুকরোর মধ্যে একটি হিসেবে। ... রবীন্দ্রনাথের সমকালে শিক্ষিত মানুষের মনোজগতে বাংলা ও ভারত সমার্থক ছিল ... ।' (হায়াৎ ২০১৫ : ৩৬-৩৭) একই ধরনের কথা অবশ্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও বলেছেন– 'বাঙালি জাতির বা বাংলা দেশের সম্বন্ধে কিছু কথা বলিতে হইলে ভারতবর্ষকে বাদ দেওয়া চলে না। ভারত হইতেছে সাধারণ, বাংলা হইতেছে বিশেষ। যাহা লইয়া বাঙালির বাঙালিত্ব, বাঙালির অস্তিত্ব তাহার মধ্যে বেশীর ভাগই ভারতবর্ষের অন্য জাতির

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যেও মিলে; ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেদের সঙ্গে সেই সব বিষয়ে বাঙালিদের সমতা আছে। বিশেষের উপর ঝোঁক দিয়া সাধারণকে ভুলিলে চলিবে না– সাধারণটাই যখন প্রধান। ভারতের সমস্ত প্রদেশ-সুলভ একটা সাধারণ ভারতীয়ত্ব আছে, বাংলাও তাহার অংশীদার।' (সুনীতি ২০১৬ : ৪৪১)

৮. একারণে সুশোভন সরকার তাঁর ewsjvi †i‡bmvm (১৪০৪) গ্রন্থে বাংলার রেনেসাঁসের শেষ সময় হিসেবে ধরেছেন অসহযোগ আন্দোলন অর্থাৎ ১৯২০-২২ পর্যন্ত।

৯. স্বাধীন অবিভক্ত বাংলার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়ে পশ্চিম বাংলার নেতৃত্ব ভারতের সঙ্গে থাকার যে সিদ্ধান্ত নেয়, সে সম্পর্কে জয়া চ্যাটার্জী ১৯৪৭ সালের ৩ জুনের 'মহারানীর বিবৃতি'র নথির বরাত দিয়ে জানিয়েছেন, 'লন্ডন ঘোষণা করে যে, বেঙ্গল বিধানসভাকে দু'ভাগে ভাগ করতে হবে। একভাগে থাকবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির নির্বাচিত সদস্য এবং অন্যভাগে থাকবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির নির্বাচিত সদস্য। যেকোনো ভাগের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য যদি প্রদেশ ভাগের পক্ষে ভোট দেয়, তাহলে বাঙলাকে ভাগ করা হবে। অতঃপর ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বেঙ্গল আইনসভাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয় এবং তারা প্রদেশভাগের ওপর ভোট দেয়। ঐতিহাসিক এই ভোটে 'হিন্দু' ভাগের অধিকাংশ সদস্য প্রদেশ ভাগের পক্ষে ভোট দেয়। আর যা আশা করা হয়েছিল ঠিক সেইভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম বাঙলাকে অবিভক্ত রাখার পক্ষে ভোট দেয়।' (জয়া ২০১৬ : ২২) তবে একথা অনস্বীকার্য যে, ১৯০৫ এর পরে নানা রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, অবিভক্ত বাংলায় সংখ্যায় কম হিন্দু জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের কাছে আর নিজেদের নিরাপদ বোধ করতে পারছিল না। একারণে মহাত্মা গান্ধীকে যখন অবিভক্ত বাংলার কথা জানানো হয়, তিনিও উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন এই ভেবে যে, সেখানে সংখ্যালঘু হিন্দুর অধিকার কিভাবে রক্ষিত হবে। এজন্য তিনি যেকোনো বিধান দুই তৃতীয়াংশের ভোটে পাশের বিধান রাখার প্রস্তাব রেখেছিলেন। কিন্তু তাতেও বাংলা ভাগ ঠেকানো যায়নি। বাঙালি জাতীয়তাবাদ কাজ করেনি।

১০. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পূর্ব বাংলার বাঙালিদের কত কাঙ্ক্ষিত ছিল তা বোঝা যায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দিনে– অন্য অর্থে বাংলা ভাগ হওয়ার দিনে– পূর্ব বাংলার বাঙালিদের প্রতিক্রিয়া দেখে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ঘোষণা হওয়ার পর অর্থাৎ সেই ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলায় যে জনপ্রতিক্রিয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে এক বর্ণনা দিয়েছেন আহমেদ কামাল (২০১৬) তাঁর গ্রন্থে। তাঁর গ্রন্থ থেকে সেই বর্ণনার কিছু কিছু অংশ দেখা যেতে পারে–

> At midnight of 14 August 1947, the eastern part of the Indian province of Bengal was partitioned and became what was later known as East Pakistan. Muslims all over East Bengal welcomed the birth of the new nation with the azan. ...The celebration was not confined to Dhaka. In the town of Barisal, victory gates were crected and musical soirees were organized. ...in Barisal at 12 midnight all steamers, steam launches, motor boats anchored in the river Kirtonkhola blared out the birth of the new nation; ...The day was observed with a public meeting in sylhet where the siren on 14 August midnight announced that the district had ceased the Indian province of Assam. ... Provash Chandra Lahiry, a prominent District Congress leader, recollects that 'every face of the vast population' that gathered at Rajshahi, a north Bengal town, showed 'signs of radiant glow of fulfillment of a long cherished desire of winning freedom. Even the tribal population of the border districts of East Pakistan were apparently 'inspired and joyous' on achieving political freedom from the Raj. A communist activist and a writer [Satyen Sen] observed that 'like the others they [farmers] too were overwhelmed with joy' at the imminent prospect of independence, On 15 August, meetings and processions were organized in Durgapur, Haluaghat, Nalitabari and Bhatpur in Mymenshing district by tribal leaders. They express their solidarity with the new nation state. (Ahmed 2016 : 11-12)

Dhaka University Institutional Repository

তাজউদ্দীন আহমদ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার রাত ও পরের দিনের এক বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর দিনলিপিতে। তিনি বলেছেন, ১৪ আগস্ট রাতে ঢাকাকে বিভিন্নভাবে সাজানো হয়। প্রচুর গেট করা হয়। আলোকসজ্জা করা হয়। বিশেষত বাবুবাজার ব্রিজ থেকে মোগলটুলি পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে আলোকসজ্জা করা হয়। গেটগুলো ছিল দর্শনীয়। সারারাত আতশবাজি, ককটেল ও হাতবোমা ফাটানো হয়েছে। হোটেল, মসজিদ, রেলওয়ে স্টেশন, এমনকি খোলা মাঠে লোক ধরছে না। অধিকাংশ সাধারণ লোক। তারা বেশিরভাগই ঢাকার বাইরে থেকে এসেছে, এমনকি জেলার বাইরে থেকে। পরদিন বিকাল সাড়ে তিনটায় ঢাকায় বিরাট শোভাযাত্রা বের হয়। 'হিন্দুরাও শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছেন। সাড়ে ৪টার দিকে শোভাযাত্রা ভিক্টোরিয়া পার্কে পৌঁছল। ...হিন্দু-মুসলমান মিলিয়ে প্রায় ১০০,০০০ (এক লাখ) লোক সভায় যোগ দিয়েছে। অনেক লোক এসেছে গ্রাম থেকে। ... অনুষ্ঠানে বি দাসগুপ্ত, বীরেন্দ্র পোদ্দার, নিখিল দাস, মিসেস লীলা রায়, নগেন্দ্র রায়, সালেক, আলাউদ্দিন, আতাউর রহমান, শামসুল হুদা, শামসুল হক এবং শাহ আজিজুর রহমান বক্তৃতা করলেন।' (তাজউদ্দীন ২০১৪ : ৫০-৫২)

১১. পাকিস্তান আন্দোলনকালীন সময়ে জিন্নাহ আর পাকিস্তানকে সমার্থক মনে করত একটা বড় অংশ ভারতীয় মুসলমান। সেই জিন্নাহর মৃত্যুর পরে একজন বাঙালি মুসলমানের চিঠিতে জিন্নাহ সম্পর্কিত মূল্যায়ন দেখলে বিস্মিত হতে হয়। এই কৌতূহল উদ্দীপক মূল্যায়ন থেকে পাকিস্তান আন্দোলনে শিল্পী-সাহিত্যিকদের মনোভাব কিছুটা আঁচ করা যাবে। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২০ তারিখে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর বন্ধু হৃষীকেশ লাহিড়ীকে লিখেছেন–

> কায়েদে আজমের মৃত্যু অপূরণীয়। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন এযাবৎ পৃথিবীর মহত্তম ব্যক্তিত্বদের একজন। কিন্তু তার মহত্ত্ব ছিল প্রধানত এই যে তিনি অধঃপতিত, প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া মুসলমানদের অনিশ্চিত অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তিনি ভারতবর্ষে তার স্বধর্মের কোটি কোটি মানুষের স্বার্থের পক্ষে যে বিশেষ অবদান রেখেছেন, সেখানে তার বড় মহত্ত্ব। গত দশ বছর যে তার জীবনের সবচেয়ে কীর্তিময় সময় ছিল এটা আপনিও নিশ্চয়ই মানবেন; এই সময়কালে তার সকল শক্তি ও মনোযোগ নিবদ্ধিত ছিল শুধু একটা লক্ষ্যের প্রতি : মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিশ্চিত করা। এর জন্য তিনি কঠিন পরিশ্রম করেছেন এবং সফলও হয়েছেন। তিনি যা কিছু করেছেন সেজন্য মুসলমানেরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ। ... আমরা দুই ভগিনীতুল্য জাতি, নিজ নিজ পিতাকে হারিয়ে আজ এতিম। (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ২০১৩ : ১০৭-১০৮)

১২. এর অবশ্য কারণও ছিল। অবিভক্ত বাংলায় হিন্দু জনগোষ্ঠী মুসলমানের তুলনায় সংখ্যায় কম ছিল। ১৯২৬ ও ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার পর বাংলার হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক বৈরিতায় ও প্রতিযোগিতামূলতায় পর্যবসিত হওয়ায় বাঙালি হিন্দু নিরাপত্তাহীনতা আর বিশ্বাসহীনতায় ভুগতে থাকে। একারণে '১৯০৫ সনে বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে সুরেণ ব্যানার্জী ও দেশবন্ধুর নেতৃত্বে বর্ণ হিন্দু সমাজ যে সংগ্রাম করেছিল– যারা ১৯১১ সনের বৃটিশ সরকারের ভাষাভিত্তিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাকে স্বাগতম জানিয়েছিল– তারাই যখন দেখল যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের হাতে গেল তখন তারা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের কথা ভুলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রচারে ব্যস্ত হলেন।' (কামরুদ্দীন ২০০৪ : ৯৬)

১৩. ১৯৪৬ সালের নির্বাচন বিষয়ে দেখা যেতে পারে শেখ মুজিবুর রহমান-এর Amgvß AvZ¥Rxebx (২০১৬) গ্রন্থের ৩৮ থেকে ৪৯ পৃষ্ঠা। এই নির্বাচন সম্পর্কে গবেষক বলেছেন, 'মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমির জন্যে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক গণভোটে পূর্ব বাংলার মানুষ পাকিস্তানের পক্ষে তাদের রায় দেয়।' (আতিউর ২০১২ : ২৮) এছাড়া দেখা যেতে পারে আবু জাফর শামসুদ্দীন-এর আত্মস্মৃতি (২০১৬) গ্রন্থের ১৯৬ পৃষ্ঠা।

১৪. বৃটিশ শাসনপর্বে পূর্ব বাংলা বরাবরই অবহেলিত ও গুরুত্বহীন ছিল। এমনকি রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছেও পূর্ব বাংলা খুব যে গুরুত্ব পেয়েছে তা নয়। কোনো এলাকা এবং তার জনগোষ্ঠী কতটা গুরুত্ব পাচ্ছে বা পাচ্ছে না, তা বোঝা যায়, রাজনৈতিক নেতৃত্বের সফর তালিকা দেখলে। গবেষক লক্ষ করেছেন, 'বাংলা চিরকালই পাণ্ডববর্জিত;

Dhaka University Institutional Repository

নেহেরু বলেছেন তিনি ভারতের সর্বত্র গেছেন, কিন্তু বাংলায় কলকাতার বাইরে যেতে পারেন নি; জিন্নাহর ব্যাপারেও এটা সত্য; তিনি ঢাকায় এসেছিলেন একবারই, পাকিস্তান হয়ে যাবার পরে।' (সিরাজুল ২০১১ : ২৮০) গান্ধী ১৯২৬ সালের দাঙ্গার উপলক্ষে ছাড়া আর আসেননি পূর্ব বাংলায়। শুধু যে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে পূর্ব বাংলা অবহেলা আর গুরুত্বহীনতায় ভুগেছে তা নয়, সুপ্রাচীন কাল থেকেই পূর্ব বাংলা অবজ্ঞা আর অবহেলার শিকার ছিল বলে গবেষকগণ জানাচ্ছেন– 'কৌলীন্যপ্রথা-গর্বী সেন রাজারা, গৌড়ীয় ব্রাহ্মণশ্রেণীরা বঙ্গজনদেরকে তুলনামূলকভাবে হেয়-চক্ষে দেখত; বঙ্গাল হিসেবে বিদ্রূপ করার সূত্রপাত বোধ করি সেন-আমলেই। সেইজন্যেই পূর্ব ও পশ্চিমের সমশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যেও বিবাহ ব্যাপারে অল্পদিন আগে পর্যন্ত নানাবিধ বাধার কথা শোনা যেত।... গৌড়ীয় সাধারণ জনের কাছেও, বঙ্গাল ও বঙ্গালী অসংস্কৃত অমার্জিত হিসেবে পরিগণিত হতে থাকল।' (সৈয়দ আকরম ২০১৩ : ৩৭-৩৮) ইতিহাস বিশ্লেষণ করে গবেষক পূর্ব বাংলার সঙ্গে বিশেষণ যুক্ত করে বলেছেন, 'প্রাগৈতিহাসিক কালের বঙ্গাঃ, শশাঙ্ক-পালরাজাদের উপেক্ষার বঙ্গ, সেন-রাজাদের অবজ্ঞার বঙাল এবং পদ্মা-মেঘনা-যমুনার উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে সংগ্রাম করা– বঙ্গজনের ইতিহাস ভিন্ন।' (সৈয়দ আকরম ২০১৩ : ৪২) বাঙালি জনগোষ্ঠীর কুলঠিকুজি নির্ণয় করতে গিয়েও ঐতিহাসিকগণ দেখেছেন পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠীর রক্তে ভোটচীন নামক জনগোষ্ঠীর রক্ত এসে মিশেছে। এই ভোটচীনদের বৈশিষ্ট্য ও এদের পূর্ব বাংলায় প্রবেশ সম্পর্কে ঐতিহাসিক বলেছেন– '... ভোট-ব্রহ্ম জাতির মানুষ বাংলার উত্তর ও পূর্ব সীমানায় এখন হইতে দুই হাজার বৎসরের পূর্বে আসিয়াছিল। তখন বাংলা দেশের মিশ্র-দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক জাতীয় লোকেরা, উত্তর-ভারতের আর্য ভাষা ও আর্য বা হিন্দু সভ্যতা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সঙ্ঘবদ্ধ ভোট-চীন জাতির যে লোকেরা ভারতে আসিয়াছিল, তাহারা অনুমান হয়, প্রকৃতিতে প্রফুল্ল-চিত্ত, কর্মঠ, শ্রমী ও কল্পনাবিহীন ছিল; ... কিন্তু তাহাদের কোন বড় সংস্কৃতি ভারতে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তাহারা বাংলা দেশের অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-আর্য সভ্যতা মানিয়া লইয়া উত্তর ও পূর্ব বাংলায় বাঙালি জনগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে এবং এখনও হইতেছে।' (সুনীতি ২০১৬ : ৪৪৯) শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসে নয়, নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসে নয়, ইংরেজ শাসনামলে নয়, পাকিস্তানিদের চোখেও পূর্ব বাংলার বাঙালি জাতি সব সময় হেয় বলে কীর্তিত হয়েছে। আইয়ুব খানের আত্মজীবনীতেও এমনটি লক্ষ করা যায়। আইয়ুব খান বাঙালিদের সেনাবাহিনীর অফিসার পদে সচরাচর নিয়োগ দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ হিসেবে তিনি মনে করতেন, বাঙালি শারীরিকভাবে যোগ্য নয়। তাছাড়া সরকারি অফিসার বা বড় আমলা পদেও নিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী মনে করত, পূর্ব বাংলার বাঙালিরা এসবের যোগ্য নয়। (মুনতাসীর, মহিউদ্দিন ২০১৪ : ২১-২৫) ফলে পূর্ব বাংলার বাঙালি ঐতিহাসিকভাবে নিজেদের ভিন্ন ভেবেই এসেছে। নিজেকে এই ভিন্ন ভাবার একটা বড় অংশ জুড়ে আছে অবহেলা, উপেক্ষা আর বৈষম্যের বোধ। একারণেই বোধ করি হাজার বছরের নৃতাত্ত্বিক আর ভাষাগত ঐক্যের বন্ধন ছিন্ন করে পূর্ব বাংলার বাঙালি আত্মপ্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যেও সেই জাতিগত অবহেলা, শোষণ, বঞ্চনা আর উপেক্ষার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় সে আবার আত্মমর্যাদার প্রশ্নে প্রতিষ্ঠা করেছে নতুন জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী ধাপ ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। আসলে পাকিস্তান আর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা দুটিই ছিল পূর্ব বাংলার বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠা আর আত্মমর্যাদার প্রশ্ন।

সহায়কপঞ্জি

অমলেন্দু দে (১৯৭৫), ¯vaxb e½fwg MV‡bi cwiKíbv : cqvm I cwiYwZ, রত্না প্রকাশন, কলিকাতা।

আকবর আলি খান (২০১৭), AevK evsjv‡'k : weePÎ Qjbv Rv‡j ivRbxwZ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

আতিউর রহমান (২০১২), 'মুক্তিযুদ্ধের আর্থ-সামাজিক পটভূমি', evsjv I evOwji BwZnvm, চতুর্থ খণ্ড (তৃতীয় পর্ব), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আবদুর রাজ্জাক (১৯৮৭), 'বাঙলাদেশ : জাতির অবস্থা' (অনু. তানভীর মোকাম্মেল), RvZxqZvev'-weZK (সম্পা. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর), দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল হক (১৯৮৭), ‘দ্যোদুল্যমান জাতীয়তা’, RvZxqZvev‘-wеZK (সম্পা. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর), দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

আবু জাফর শামসুদ্দীন (২০১৬), AvZ¥¯§wZ, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

কামরুদ্দীন আহমদ (২০০৪), evsjvi ga¨we‡Ëi AvZ¥weKvk, অখণ্ড সংস্করণ, ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন, ঢাকা।

জয়া চ্যাটার্জী (২০১৬), †`kfv‡Mi ARb : evOjv I fviZ 1947-1967, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

তাজউদ্দীন আহমদ (২০১৪), ZvRDÏxb Avng‡`i Wv‡qwi : 1947-1948, প্রথম খণ্ড (অনু. বেলাল চৌধুরী), দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রতিভাস, ঢাকা।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী (১৪১৭), evOvjx Rxe‡b igYx, অষ্টাদশ মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।

নীহাররঞ্জন রায় (১৪১৬), ev½vjxi BwZnvm : Aw`ce, সপ্তম সংস্করণ, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা।

নেপাল মজুমদার (১৯৮৩), fvi‡Z RvZxqZv I AvšÍRwZKZv Ges iex›`bv_, প্রথম খণ্ড, প্রথম দে’জ সংস্করণ, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা।

নেহাল করিম (২০১১), RvZxqZvev` : D‡b¥l I weKvk, কৃষ্ণচূড়া প্রকাশনী, ঢাকা।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় (২০১৪), ‘দ্বিতীয়বারের বাংলা ভাগ’ (অনু.সাব্বির আজম), GKwesk (সম্পা. কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়), সংখ্যা ২৮, অক্টোবর ২০১৪, ঢাকা।

বদরুদ্দীন উমর (২০১৫), mv¤ú`wqKZv, নবম মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

বিনয় ঘোষ (১৪২৩), evsjvi beRvMwZ, দ্বিতীয় সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, প্রকাশ ভবন, কলকাতা।

ভীষ্মদেব চৌধুরী (১৯৯৮), Zvivk¼i e›`¨vcva¨v‡qi Dcb¨vm : mgvR I ivRbxwZ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মফিদুল হক (২০১২), †`kfvM, mv¤ú`wqKv Ges m¤úxwZi mvabv, পুনর্মুদ্রণ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ (২০১৪), cwK¯Ívb‡`i `wó‡Z GKvËi, পঞ্চম মুদ্রণ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

মুহম্মদ মজিরউদ্দীন (১৯৯৩), cm½ : RvZxqZvev` I ms¯‹wZ (সম্পা. আমিনুর রহমান সুলতান), নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা।

রফিক কায়সার (২০০৯), evsjvi gwU evsjvi Rj, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪০২), iex›`ª iPbvejx, রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ সুলভ সংস্করণ, ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

(১৪০২), iex›`ª iPbvejx, রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ সুলভ সংস্করণ, ৭ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

শেখ মুজিবুর রহমান (২০১৬), Amgvß AvZ¥Rxebx, সুলভ সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

সালাহ্উদ্দীন আহমদ (২০১৪), BwZnvm HwZn¨ RvZxqZvev` MYZš¿, দ্বিতীয় মুদ্রণ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০১১), evOvjxi RvZxqZvev`, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, বর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা।

সুনীতি কুমার ঘোষ (২০০৫) evsjv wefvR‡bi A_bxwZ-ivRbxwZ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (২০১৬), ‘জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য’, evOwji ms¯‹wZwPšÍv (সম্পা. আবুল কাসেম ফজলুল হক), তৃতীয় মুদ্রণ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

সুশোভন সরকার (১৪০৪), evsjvi †i‡bmvm, দ্বিতীয় সংস্করণ, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সৈয়দ আকরম হোসেন (২০১৩), ‘বাঙলাদেশ’, evOjv‡`k (সম্পা. মনসুর মুসা), তৃতীয় মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (২০১৩), AMïšZ iPbv, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ (১৯৯৩), cm½ : RvZxqZvev' I ms¯‹…wZ (সম্পা. আমিনুর রহমান সুলতান), নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা।

হায়াৎ মামুদ (২০১৫), evsjv‡'k : mvs¯‹…wZK AvZ¥cwiPq, চন্দ্রাবতী একাডেমি, ঢাকা।

Ahmed kamal (2016), *State Against The Nation : The Decline of the Muslim League in Pre-independence Bangladesh, 1947-54*, First paper back edition, The University Press Limited, Dhaka.

Amalendu Dey (1974), *Roots of Separatism In Nineteenth Century Bengal*, Ratna Prakashana, Calcutta.

Hyslop, Beatrice Fry (1968), *French nationalism in 1789*, Octagon books, New York.

Hayes, Carlton J. H. (1926), *Essays on nationalism*, The macmillan Company, New York.

Gooch, G. P. (1931), *Study in Modern History*, Longmans, Green and Co. London.

Khon , Hans (1945), *The Idea of Nationalism : A Study in Its Origin and Background*, scond print, The Macmillan Company, New York.

Minogue, Kenneth R. (1967), *Nationalism*, Basic books, New York.

Aziz, K. K. (1967), *The Making of Pakistan : A Study of Nationalism*, Chatto and Windus, London.

Snyder, Luis L. (1964), *The Dynamics of Nationalism : Readings In Its Meaning and Development*, Van Nastrand Reinhold Inc., U.S.A

Snyder, Luis L. (1968) *The New Nationalism*, Cornell University Press, New York.

Sargent, Lyman Tower (1981), *Contemporary Political Ideologies : A Comparative analysis*, Dorsey press, wales

Mohammad Ayub Khan (2008), *Friends Not Masters*, The University Press Limited, Dhaka.

Nehal Karim (2004), *The Emergence of Nationalism in Bangladesh*, Adhuna prakashan, Dhaka.

Rabindranath Tagore (1918), *Nationalism*, reprint, The Macmillan company, New York.

Semanti Ghosh (2017), *Defferent Nationalism : Bengal 1905-1947*, Oxford University Press, New Delhi.

Sumit sarkar (1994), *The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908*, Reprint, Peoples' publication, New Delhi.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ষাটের দশকের বাংলাদেশের কবিতায় জাতীয়তাবাদী চিন্তা বিকাশের পরিপ্রেক্ষিত

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

এক. অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত : প্রাক্-পাকিস্তান পর্ব

ক. অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত : প্রাক্-পাকিস্তান পর্ব

ভারতে পাকিস্তান আন্দোলন যে সম্ভবিত হয়ে উঠেছিল তার অন্যতম কারণ ভারতীয় মুসলমানদের অর্থনৈতিক বঞ্চনার বোধ। ধর্ম দিয়ে এই মুসলিম সম্প্রদায়কে আলাদা করলেও, এমন কি নিজেরা আলাদা বলে চিহ্নিত হলেও, অর্থনীতিই ছিল এই আলাদা বোধের অন্যতম কারণ। উপনিবেশিত ভারতে মুসলমান নিজেদের 'অপর' এবং 'বঞ্চিত' জ্ঞান করেছে। তবে, অন্তত বিংশ শতাব্দীর বিশ-ত্রিশ দশকের দিকে, আরো সুনির্দিষ্ট করে বললে বলা যায়, পাকিস্তান আন্দোলনের সময়, ভারতের সব এলাকার মুসলমানদের একই অবস্থা ছিল না। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে মুসলমানরা রাজনৈতিকভাবে প্রবল ছিল এবং অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত ছিল না। পাঞ্জাবের নুন-তিওয়ানা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের উপজাতি সর্দার ও সিন্ধুর ওয়াদেরা বা অভিজাত ভূস্বামীরা আদৌ বঞ্চিত মুসলমান ছিল না। তবে অন্যান্য জায়গায় মুসলমানদের অবস্থা ছিল হিন্দুদের তুলনায় খারাপ। ধরা যাক ব্যবসা-বাণিজ্যের কথাই। অবিভক্ত ভারতের ব্যবসাজগতে মুসলিম ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের স্থান ছিল অতি নগণ্য। করাচীর হারুন, কলকাতার আদমজী-ইস্পাহানীদের মতো ব্যবসায়ী পরিবার মোটামুটি প্রভাবশালী থাকলেও, তাঁরা ছিলেন অধিকতর শক্তিশালী হিন্দু ব্যবসায়ীদের প্রভাব বলয়ের অধীন। একারণে করাচীর হারুন, কলকাতার আদমজী-ইস্পাহানীদের মতো ব্যবসায়ী পরিবার পাকিস্তান-সংগ্রামে মুসলিম লীগকে সমর্থন করে। (রেহমান ২০০৭ : ১০) কিন্তু পূর্ব বাংলার মুসলমানদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি তাও ছিল না। এখানকার অবস্থা ছিল অধিকাংশ জায়গার তুলনায় খারাপ। একারণে '১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সাধারণভাবে পূর্ব বাংলার জনগণ এবং বিশেষত বাঙালি মুসলমানরা কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা ও হিন্দু সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের তুলনায় নিজেদেরকে বঞ্চিত বোধ করত।' (রেহমান ২০০৭ : ৫) অবিভক্ত বাংলায় পাকিস্তান আন্দোলনকালীন মুসলমান আর হিন্দুদের অর্থনৈতিক সম্পৃক্তির বাস্তবতা সম্পর্কে মুসলমানরা মনে করত যে, 'বাংলার জমিদার হিন্দু প্রজা মুসলমান; বাংলার মহাজন হিন্দু খাতক মুসলমান; উকিল হিন্দু মক্কেল মুসলমান; খেলোয়াড় হিন্দু দর্শক মুসলমান; ডাক্তার হিন্দু রোগী মুসলমান; হাকিম হিন্দু আসামী মুসলমান; জেইলার হিন্দু কয়েদী মুসলমান ... মুসলমান চাষী-মজুরের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া রোযগার করা টাকায় হিন্দুরা সিন্দুক ভরিয়াছে; দালান-ইমারত গড়িয়াছে; গাড়ী-ঘোড়া দৌড়াইতেছে।' (আবুল মনসুর ২০০১ : ৯৭-৯৮/৩) বক্তব্যটি রাজনীতির রঙে রাঙানো সন্দেহ নেই। কিন্তু এর সঙ্গে পাকিস্তান আন্দোলনে সমর্থনকারী বাঙালি মুসলমানের বোধ-বিশ্বাসের একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় বিশেষত বাংলার মুসলমানদের মধ্যে বঞ্চনা ও বিপন্নতার বোধ এত প্রবল ছিল যে, শেখ মুজিবুর রহমান (১৯১৭-১৯৭৫)-এর মতো রাজনীতিকও বলেছেন, 'অখণ্ড ভারতে যে মুসলমানদের অস্তিত্ব থাকবে না এটা আমি মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতাম।' (শেখ মুজিবুর ২০১৪ : ৩৬)

বাঙালি মুসলমান শুধু রাজধানী কলকাতার অর্থনীতির মধ্যে নিজেদের বঞ্চিত মনে করত তা নয়। তারা পূর্ব বাংলার অর্থনীতির মধ্যেও নিজেদের বঞ্চিত মনে করত। কারণ পূর্ব বাংলাতেও মুসলমানরা অনুভব

Dhaka University Institutional Repository

করত যে, অর্থনৈতিক জীবনে তাদের নিয়ন্ত্রণ ও প্রাধান্য নেই। সেখানে রয়েছে অপর সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণ ও প্রাধান্য–

> ভূমির মালিকানা ছিল প্রধানত হিন্দু জমিদারদের হাতে। মুসলিমরা ছিল হিন্দু জমিদারদের রায়ত কিংবা ক্ষুদ্র চাষী। মধ্যবর্তী আর্থিক কায়-কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও গ্রামীণ শিল্পের নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রধানত বাঙালি হিন্দুদের হাতে এবং কোনো কোনো ব্যবসা-বাণিজ্যের উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ ছিল মাড়োয়ারীদের হাতে। পুঁজিবাদী শিল্প বলতে যা-কিছু ছিল তার মালিকানা ছিল বৃটিশদের হাতে। যেমন, সিলেটের চা-শিল্প এবং পূর্ব-বাংলার নদীপথে সংযোগ রক্ষাকারী যান্ত্রিক নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থা। কয়েকটি কাপড়ের কল ও একটি চিনিকল নিয়ে যে সামান্য আধুনিক পণ্য উৎপাদনশিল্প গড়ে ওঠে তার মালিক ছিল বাঙালি হিন্দুরা। শহরাঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যও তারাই নিয়ন্ত্রণ করত। আমলাতন্ত্র, শিক্ষকতা ও আইন ব্যবসাতেও তাদেরই প্রধান্য ছিল। (রেহমান ২০০৭ : ৫-৬)

১৮৭১ সালের এক সরকারি খতিয়ানে দেখা যায় যে, 'মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুরা অনেক বেশি সংখ্যায় বড়ো পদগুলিতে এসময় অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। প্রকৃত অর্থে মুসলমানদের প্রায় কোনো প্রবেশাধিকারই দেওয়া হয়নি গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রশাসনিক, নিরাপত্তা, বিচার, কিংবা বাণিজ্য সম্পর্কিত কাজে। ... ১৮৭১ সালের হিসেব অনুযায়ী দেখা যায় বাংলাদেশের হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা সরকারী গুরুত্বপূর্ণ কোনো পদে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছে মাত্র ৪ ভাগ।' (আতিউর ও লেনিন ২০০০ : ৩৪) ঊনবিংশ শতাব্দীর এই পর্যায়ে মুসলমানদের এহেন পরিস্থিতিকে তাত্ত্বিকগণ দুটি কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করেন, (এক) মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ হিন্দুদের মতো করে পায়নি বা নেয়নি বলেই তারা শিক্ষিত হতে পারেনি। (দুই) ইংরেজদের চূড়ান্ত ধরনের বিরোধিতার কারণে ইংরেজি শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়েও সরকারি উচ্চপদে মুসলমানদের চাকরি পাওয়া সম্ভব হয়নি। ক্রমে শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা বাড়লেও সরকারি বড় পদে তাদের নিয়োগের হার সেই তুলনায় বাড়েনি। '১৮৮১ সালে কলিকাতার বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ২২ জনই ছিলেন মুসলমান কিন্তু সরকারী কাজে নিয়োজিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ১৮৯৬ সালে এ-হার ছিল শতকরা ১ ভাগেরও কম।' (আতিউর ও লেনিন ২০০০ : ৩৭) এসময় শিক্ষকতা ও অধ্যাপনায় মুসলমানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বেশি ছিল। ভালো চাকরি না পেয়ে তারা শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন বলে অনেক গবেষক-ঐতিহাসিক মনে করেন।[১] ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে শুধু নয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও মুসলমানদের উচ্চ পদে চাকরি পাওয়া নিয়ে হতাশা বিরাজ করত। ১৯০৩ সালের bebi পত্রিকার বরাত দিয়ে গবেষক বলেছেন, 'নিজেদের আধিপত্য নষ্ট হবে এই আশঙ্কায় হিন্দু অফিসারেরা মুসলমানদের সরকারী পদে নিয়োগের পথ বন্ধ করে দেন। অথচ বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে মুসলমান অফিসারেরা হিন্দু অফিসারদের চেয়ে কম যোগ্য নন।' (অমলেন্দু ২০১১ : ১৪৩) এসময় শিক্ষিত মুসলমানদের সরকারি চাকরি প্রাপ্তির ব্যাপারে হতাশার বিষয়টি মুসলিম পরিচালিত বিভিন্ন পত্রিকার প্রায় নিয়মিত আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। ১৯০৩ সালে bebi পত্রিকায় ১৯০১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানের সরকারি পদে কর্মরত কর্মকর্তাদের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়। সেখানে দেখা যায়, হাইকোর্ট জজ ৩ জনের ১ জন, ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ১০ জনে ১ জন, সাব-

জজ ৬২ জনে ১ জন, মুন্সেফ ৩৪৩ জনে ১৮ জন, প্রভিন্সিয়াল জজ ৩ জনে ০ জন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর ৫২৯ জনে ৭৬ জন, এডিশনাল জজ ৭ জনে ০ জন মাত্র মুসলমান। (অমলেন্দু ২০১১ : ১৪৩)

এহেন পরিস্থিতির মধ্যে বাঙালি মুসলমানের অবিভক্ত ভারত রাষ্ট্রে নিজেদের বঞ্চিত ও বিপন্ন মনে না করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। এই বঞ্চনা, বিপন্নতা আর পরিচয়হীনতার মধ্যে বাঙালি মুসলমানরা এমন একটা শাসনব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকে এগোতে চাচ্ছিল, যেখানে তারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে তারা ভূমিস্বত্বলাভ থেকে শুরু করে শিক্ষা, সরকারি চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পায়নে নিজেদের যুক্ত করার প্রবল তাগিদ ও স্বপ্ন থেকে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নেয়। এই স্বপ্ন শুধু বাঙালি মুসলমানের ছিল না, ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণেরও এটি ছিল অন্যতম কারণ। (সিরাজুল ২০১১ : ৪, মওদুদ ২০১৫ : ৫)

অর্থনৈতিক বঞ্চনার বোধ থেকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের বাসনায় পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদে বাঙালি মুসলমানের শামিল হওয়ার অর্থাৎ উদ্বুদ্ধ হওয়ার অন্তত দুটি কারণ শনাক্ত করা যায়। একটি মুসলমানদের মধ্যে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান ঘটা, আর অন্যটি মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠা।

মূলত কৃষিনির্ভর পূর্ব বাংলায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থানের পেছনে উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত পাটের উৎপাদন ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের অস্বাভাবিক মূল্য ও চাহিদা বৃদ্ধির একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। পাটের অস্বাভাবিক মূল্য ও চাহিদা বৃদ্ধির ফলে পূর্ব বাংলার কৃষিব্যবস্থা খুব দ্রুত সরল স্বয়ংসম্পূর্ণ স্তর অতিক্রম করে বাণিজ্যিক অর্থনীতির দিকে ধাবিত হয়। ধনি কৃষকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। পাটকলগুলোতে মুসলমানরাই পাট সরবরাহ করতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা শুধু পাট সরবরাহ না করে পাট ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। অনেকে পাটকলে বিভিন্ন পদে চাকুরিতেও ঢুকে পড়ে। পাট ব্যবসাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় এক বিপুল সংখ্যক ফড়িয়া, যারা কলকাতা বা অন্য নগর-বন্দরের সঙ্গে নানাভাবে সম্পর্কিত হয়। পাট বিক্রির উদ্বৃত্ত টাকায় অনেক পূর্ব বঙ্গীয় মুসলমান রায়ত জমিদারি ক্রয় করে। এভাবে পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজে সামাজিক স্তরবিন্যাসে এক ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। পায়ের নিচে মাটি পেয়ে খুব দ্রতই মুসলমান ধনি কৃষকগণ হিন্দু জমিদারের প্রতিপক্ষ একটি সামাজিক স্তর হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে। আর এটিই বাংলাতে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণি-বিকাশের ক্ষেত্রে চালিকাশক্তির ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পূর্ব বাংলার অধিকাংশ জেলায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান কৃষকরা তাদের ছেলেমেয়েদেরকে মক্তব মাদ্রাসায় না পাঠিয়ে ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠাতে শুরু করে।[২] (কামরুদ্দীন ১৩৭৬ : ৪১, আতিউর ও লেনিন ২০০০ : ৪৫, আকবর ২০১৫ : ১২০-১২১) লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, পাটের সূত্রে গড়ে ওঠা এই টাকাওয়ালা শ্রেণির ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সন্তানরাই উপনিবেশিত ভারত রাষ্ট্রে বাঙালি মুসলমানের অর্থনৈতিক বঞ্চনাকে একটি রাজনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর প্রয়োজন অনুভব করে অপরাপর প্রদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শরিক হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করেছিল। এ প্রসঙ্গে গবেষক বলেছেন–

Dhaka University Institutional Repository

> ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত মুসলমানরা খুব কমই সরকারী চাকুরী পেত। কারণ চাকুরীতে মনোনয়ন করার ভার হিন্দু কর্মচারীদের উপর ছিল। এইসব কর্মচারীরা মুসলমান প্রার্থীদের সব সময়েই চাকুরী পাবার অযোগ্য মনে করত। প্রকৃতপক্ষে চাকুরীর ব্যাপারে এই প্রতিযোগিতা এবং হিন্দু-মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে বিদ্বেষের ভাবই মুসলিম লীগ আন্দোলনকে অধিকতর জোরদার করে তোলে। (কামরুদ্দীন ১৩৭৬ : ৪৪-৪৫)

জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত হওয়ার অন্য কারণটি রাজনৈতিক সংগঠন ও তৎপরতার মধ্যে নিহিত। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এখানকার অর্থনীতিসহ সার্বিক পরিস্থিতিতে মুসলমানদের জন্যে একটা ইতিবাচকতার বাতাস বইয়ে দেয়। এটা বুঝতে পেরেই সেদিন পশ্চিম বাংলার বাঙালিদের সঙ্গে 'হাজার বছরের নাড়ীর বন্ধন' কাটাতেও পূর্ব বাংলার মুসলমানরা পিছ পা হয়নি। এমন কি সেদিন তারা রবীন্দ্রনাথের আবেগকেও পায়ে ঠেলেছিল। এর মূল কারণ একটাই 'অর্থনৈতিক মুক্তি বা স্বাচ্ছন্দ্য।' কিন্তু এই মুক্তি বা স্বাচ্ছন্দ্যের স্বাদ পূর্ব বাংলার মুসলমানদের বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। 'স্বদেশী আন্দোলনের আবেগঘন আবহ, কংগ্রেসের সাংগঠনিক তৎপরতা, সংবাদপত্র, ইংরেজ বণিক গোষ্ঠীর চাপ এবং জমিদারদের দাবীর ফলশ্রুতিতে ঔপনিবেশিক সরকারের ওপর রাজনৈতিক চাপ সফল হওয়ায় বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা রদ হয়।' (রফিক ১৯৮৭ : ১৯৯) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং বঙ্গভঙ্গ রদ– এই দুটি ঘটনাই রাজনৈতিক সন্দেহ নেই। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, এর সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের সম্পৃক্তি ও ক্রিয়াশীলতার মূলে ছিল অর্থনীতি। যা হোক, এ-যাত্রায় বাঙালি মুসলমান তার অর্থনৈতিক সুবিধাকে ধরে রাখতে না পারলেও, সে তার রাজনৈতিক অসহায়ত্ব ঠিকই অনুধাবন করতে পারে। সে ক্রমে রাজনৈতিক হয়ে ওঠে অর্থনীতির প্রশ্নে। বঙ্গভঙ্গ রদ পরোক্ষভাবে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে নেতৃত্ব বিকাশের পথকে সুগম করে দিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাঙালি মুসলমানকে অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় প্রাণিত করেছিল। এরপর থেকে তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের সংগ্রামে পরিণত হয়। এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২)-এর রাজনৈতিক সংগ্রাম একারণেই বাঙালি মুসলমানের অর্থনৈতিক ও অথনীতি-সংশ্লিষ্ট নানা হিস্যা আদায়ের সংগ্রামের সমার্থক হয়ে উঠেছিল। 'কৃষকের দাবী দাওয়া, মধ্যবিত্তের পেশাগত সুযোগ সুবিধা, তাদের শ্রেণী হিসাবে হিন্দু মধ্যবিত্তের সমপর্যায়ে আনা এবং প্রয়োজনে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দানের প্রশ্নে তাঁর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য।' (রফিক ১৯৮৭ : ২০০) এভাবে ফজলুল হকসহ পরবর্তী নানা নেতার প্রযোজনায় বাঙালি মুসলমান অর্থনৈতিকতার প্রশ্নে রাজনৈতিকতার দিকে অগ্রসর হয়েছে। পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ এবং এমনকি পরবর্তীতে পূর্ব বাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের অন্যতম উপাদান হিসেবে কাজ করেছে বাঙালি মুসলমানের অর্থনৈতিক মুক্তির অভিপ্রায়।

খ. রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত : প্রাক্-পাকিস্তান পর্ব

লাহোর প্রস্তাব

ভারতবর্ষের মুসলিম জনগোষ্ঠী যখন রাজনৈতিকতার প্রশ্নে সচেতন, স্বাধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার আর নতুন সুপ্ত রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল, ঠিক তখনই ১৯৪০ সালে এ. কে. ফজলুল হক এক যুগান্তকারী প্রস্তাব দেন। ১৯৪০ সালে জিন্নাহর সভাপতিত্বে মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে এ. কে. ফজলুল হক যে-প্রস্তাব দেন, তা 'লাহোর প্রস্তাব' নামে খ্যাত। এই প্রস্তাবে তিনি ভারতের উত্তর-পূর্বে এবং উত্তর-

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিমাংশে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ গঠনের প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে তিনি একাধিক রাষ্ট্রের কথা বলেন। তবে এই একাধিক রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হবে, সে-বিষয়ে খোলাসা করেননি। তবু লাহোর প্রস্তাবের মধ্যকার মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসমূহ গঠনের প্রস্তাবটি পরবর্তী বছর নিখিল ভারত মুসলিম লিগের মাদ্রাজ অধিবেশনে মুসলিম লিগ সম্মিলিতভাবে সমর্থন করে।

ফজলুল হকের এই প্রস্তাব ছিল অস্পষ্ট কিন্তু যুগান্তকারী। তিনি ভারতবর্ষের মুসলমানদের অকথিত, অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করে ফেলেন। ফলে, এতকাল ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে মুসলমানদের ও মুসলিম লিগের যে-সম্পর্ক ছিল, তা এক নতুন মাত্রা পেল। পাশাপাশি এই প্রস্তাব কংগ্রেস ও ভারতবর্ষের হিন্দু জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মুসলিম লিগ ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর সম্পর্কের মধ্যে একটা নতুন সুর ও স্বরের সংযোজন করল। এই প্রস্তাবের আগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের অভিন্ন, একক, সামগ্রিক স্বাধীনতার কথা ভাবা হতো। কিন্তু এই প্রস্তাবের পর থেকে একাধিক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতার প্রশ্ন উত্থাপিত হলো। এই প্রস্তাবের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে ইতিহাসবিদ বলেন–

> এতে বাংলার মুসলিম লীগের শক্তি আরও বেড়ে যায় এবং ভারতের রাজনৈতিক জীবনে একটি নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। ... লাহোর প্রস্তাব মুসলিম ভারতের রাজনৈতিক আদর্শকে সমস্ত ভারতের রাজনৈতিক দাবির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলে (sic)। ক্রমশ মুসলিম লীগ ভারতের স্বাধীনতার অন্যতম দাবিদার হয়ে ওঠে। (মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য ২০১০ : ৪৩৪)

এই প্রস্তাব অভিন্ন ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষীদের স্বভাবতই হতাশ এবং হতবাক করেছে। তারা এটিকে 'রাজনৈতিক দিক থেকে অসম্ভব' এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে 'পাগলামি' বলে অভিহিত করেন। এছাড়া 'মুসলিম লীগ প্রস্তাবটিকে লাহোর প্রস্তাব' নামে অভিহিত করলেও বৃটিশ ও হিন্দু পরিচালিত পত্রিকাগুলোর প্রচারণার ফলে সেটা সাধারণ্যে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' বলে পরিচিত হয় এবং এর চারিত্র্য সাম্প্রদায়িক হবে বলে ধারণা সৃষ্টি হয়। (সাঈদ-উর ২০০১ : ১০) কিন্তু অনেকে বলার চেষ্টা করেছেন যে, 'আদতে লাহোর প্রস্তাব খণ্ড ভারতের প্রস্তাব– ইসলামিক রাষ্ট্রের নয়।' (কামরুদ্দীন ২০০৪ : ১৩৩)

কিন্তু কালক্রমে ঘটনা অনেকাংশে তা-ই ঘটে। এটি ওই একই বছর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত আইনসভার মুসলিম লিগের সদস্যদের কনভেনশনে সংশোধিত হয় এবং 'মুসলিম প্রধান পাকিস্তান অঞ্চল নিয়ে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র' গঠনের প্রস্তাব বঙ্গীয় মুসলিম লিগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিমের বিরোধিতা সত্ত্বেও গৃহীত হয়। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজের সঙ্গে থাকা না থাকা নিয়ে মুসলিম লিগের টানাপড়েন, ১৯৪৬ সালের শেষ ও ১৯৪৭ সালের শুরুতে ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে থেকে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা একত্র করে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা গঠনের জন্য শরৎ বসু, সোহরাওয়ার্দি, আবুল হাশিম প্রমুখের প্রচেষ্টা ও ব্যর্থতা, পাকিস্তান সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৪৬ সালের ভোটে মুসলমানদের অকুণ্ঠ সমর্থন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট জন্ম হয় পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র। বর্তমান বাংলাদেশ তথা পূর্ব বাংলা 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে এই নব গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পাকিস্তান আন্দোলন ও দ্বিজাতিতত্ত্ব

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গভঙ্গের পর থেকে অবিভক্ত ভারতের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বাস্তবতা থেকে জিন্নাহ দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্ভাবন করেন। লাহোর প্রস্তাবের পর এই দ্বিজাতিতত্ত্ব পাকিস্তান রাষ্ট্র দাবির অন্যতম ভিত্তি। বঙ্গভঙ্গ-পরবর্তী আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের নির্যাস থেকে মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮) তথা মুসলিম লিগ এই দ্বিজাতিতত্ত্বকে রাজনৈতিক এজেন্ডা আকারে উত্থাপন করেন। জিন্নাহ অবিভক্ত ভারতে কংগ্রেসের রাজনৈতিক ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে মুসলমানের স্বার্থ রক্ষার সম্ভাবনা না দেখেই দ্বিজাতিতত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। তিনি মনে করেছেন, কংগ্রেসের পক্ষে অবিভক্ত ভারতে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করা অসম্ভব। তাই দুটি জাতির পৃথক অথচ বৃহত্তর উন্নতির জন্য প্রয়োজন স্বতন্ত্র দুটি রাষ্ট্র। দুটি জাতিকে জিন্নাহ আলাদা করেছিলেন শুধু ধর্ম দিয়ে নয়। দুটি জাতির ভিন্নতার মাপকাঠি ছিল তাদের সংস্কৃতি, অর্থনীতিও। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিবেচনা করলেও দেখা যাবে ঐতিহাসিক কারণেই ভারতের মুসলমান জনগোষ্ঠী ছিল নানা অর্থেই পিছিয়ে। সংখ্যানুপাতিক সুযোগ-সুবিধার ন্যায্যতা থেকেও তারা ছিল বঞ্চিত। একারণে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পরের মুসলমান জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ইতিহাস মূলত মুসলমানদের জন্য সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য ইংরেজ ও কংগ্রেসের সঙ্গে দরকষাকষির ইতিহাস। ফলে, দ্বিজাতিতত্ত্বের বাস্তবতা যতটা না ধর্মীয় তার চেয়ে বেশি আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ছিল বলে অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন। তবে দুটি সমপ্রদায়কে আলাদা করার দৃশ্যমান উপাদান হিসেবে কাজ করেছিল ধর্ম এবং তজ্জাত সংস্কৃতি। রাজনৈতিক উদ্ভাবনা হিসেবে দ্বিজাতিতত্ত্ব সেদিন পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের পক্ষে অসামান্য ফলদায়ক হয়েছিল। তবে তা কার্যক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা ছড়ায়নি একথা বলা যায় না। একাংশের মধ্যে ক্রিয়াশীল এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব সেদিন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিকে ত্বরান্বিত করেছিল। আবার অঞ্চলভেদে অসংখ্য হিন্দু এবং মুসলমানের প্রাণ হারানোর কারণও হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্র ঘোষিত হওয়ার মুহূর্তে রাষ্ট্রীয় আদর্শের মধ্যে দ্বিজাতিতত্ত্ব 'স্বীকৃত, গৃহীত ও প্রযুক্ত হয় নাই। সোজা কথায় দ্বিজাতি তত্ত্ব অগ্রাহ্য বা ডিস্মিস্ হইয়াছে' বলে অনেকে মনে করেন। কারণ–

> পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় ভারতের অধিবাসীরা ভাগ হয় নাই। আদম এওয়ায হয় নাই। ভারতের ভূখণ্ড ভাগ হইয়াছে মাত্র। একই বেতারের মুখে দাঁড়াইয়া দুই পক্ষের নেতারা সে মাটি-বাটোয়ারা গ্রহণ করিয়াছেন এবং যাঁর-তাঁর পক্ষের লোককে তা মানিয়া লইতে নির্দেশ দিয়াছেন। সে নির্দেশে তাঁরা বলিয়াছেন: হে হিন্দু ও হে মুসলমান, তোমরা যার তার জন্মভূমি ত্যাগ করিও না। যে যেখানে আছ, সেইখানে থাক। নয়া দুই রাষ্ট্র কায়েম হইল বটে, কিন্তু কোনোটাই শুধু হিন্দুর বা মুসলমানের নয়। উভয় রাষ্ট্রই হিন্দুর ও মুসলমানের। (আবুল মনসুর ১৯৯৯ : ৭৭)

দ্বিজাতিতত্ত্ব যে মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র অর্জনের জন্যে একটি রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল, কোনো রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় ছিল না, তা পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয় প্রায় সবাই মনে করতেন–

> পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হিন্দু নেতারা ক্ষেপে গেছেন কেন? ভারতবর্ষেও মুসলমান থাকবে এবং পাকিস্তানেও হিন্দুরা থাকবে। সকলেই সমান অধিকার পাবে। পাকিস্তানের হিন্দুরাও স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বাস করবে। ভারতবর্ষেও মুসলমানরাও সমান অধিকার পাবে। পাকিস্তানের মুসলমানরা যেমন হিন্দুদের ভাই হিসাবে গ্রহণ করবে, ভারতবর্ষের হিন্দুরাও মুসলমানদের ভাই হিসাবে গ্রহণ করবে। (শেখ মুজিবুর ২০১৪ : ৩৬)

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিজাতিতত্ত্ব পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনে তথা ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনে খুব শক্তিশালী রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেছিল। অনেকে অবশ্য জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। যেমন, আবুল হাশিম দ্বিজাতিতত্ত্বে আস্থাশীল ছিলেন না।[৩] তবে একথা স্বীকার্য যে, দ্বিজাতিতত্ত্বের সবচেয়ে সম্ভাব্য অসুবিধা ও সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী ছিল পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠী। কারণ অবিভক্ত ভারতে পূর্ব বাংলা ছিল অর্থনৈতিক ও উন্নতির নানা মাপকাঠিতে মুসলিম অধ্যুষিত অবিভক্ত ভারত অঞ্চলের তলানিতে থাকা অঞ্চলগুলোর অন্যতম। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অন্যতম রাজনৈতিক নিয়ামক দ্বিজাতিতত্ত্বের ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাই উত্তরকালে বাংলাদেশের জন্মকে সম্ভবিত করে তুলেছে। আবার অসুবিধা এজন্য যে, যে-স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা নিয়ে পূর্ব বাংলার মানুষেরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত দিয়েছিল, তা তো বাস্তবায়িত হয়-ই-নি, উপরন্তু দীর্ঘ ২৩ বছর শাসন-শোষণ আর চরম নির্যাতনের শিকার হয়েছে। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এই পূর্ব বাংলার মানুষকে আবার প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

দ্বিজাতিতত্ত্বের কারণে ভারত ভাগ হয়েছে, এবিষয়ে অনেক ঐতিহাসিকের সায় নেই। যেমন, যশোবন্ত সিংহ মনে করেন, পাকিস্তান-প্রস্তাব আসলে রাজনীতির কৌশলমাত্র। ছয় বছর পরেই যেভাবে লাহোর প্রস্তাবের সীমারেখা থেকে সরে এসে কাটাছেঁড়া পাকিস্তানকে মেনে নিলেন জিন্না, সেটাই প্রমাণ করে, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ ছিল তাঁর কাছে শুধুই কংগ্রেসের সঙ্গে দর কষাকষির রাজনৈতিক খেলা। (আবুল হাশিম ২০১২ : ৩০, যশোবন্ত ২০১৪ : ২৪৫-২৪৬, সালাহ্উদ্দীন ২০১৪ : ২৩৯) জিন্নাহর রাজনৈতিক খেলায় জয়লাভের অন্যতম হাতিয়ার ছিল দ্বিজাতিতত্ত্ব। অন্যদিকে ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত কংগ্রেসের রাজনীতি দেখলে বোঝা যায়, যত দিন ঘনিয়েছে কংগ্রেসও তত অখণ্ড ভারতের দাবি থেকে সরে এসেছে। অর্থাৎ মুসলমানদের সঙ্গে থাকতে চায়নি। আর পশ্চিম বাংলার বাঙালিরা যে চায়নি তার প্রমাণ সোহরাওয়ার্দি, আবুল হাশিম, শরৎচন্দ্র বসুদের ডাকে পশ্চিম বাংলার বাঙালিরা সাড়া দেয়নি, বিরোধিতা করেছে। ১৯০৫ সালে যারা আলাদা হতে চায়নি তারাই অবিভক্ত বাংলায় সংখ্যা লঘুতার ভয়ে আলাদা হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়েছে।

এই দ্বিজাতিতত্ত্বের রাজনীতি ও কংগ্রেস-মুসলিম লিগের রাজনীতিতে ভারত ভাগ হয়েছে বটে, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে প্রাণ দিতে হয়েছিল লক্ষ মানুষকে। সেকথা রাজনীতি বা দ্বিজাতিতত্ত্ব বা কংগ্রেস বা জিন্নাহর জানার কথা নয়। সেকথা জেনেছে ভারতবর্ষের হিন্দু আর মুসলমান!

দ্বিজাতিতত্ত্বের রাজনৈতিক বাস্তবতা বাদ দিয়ে একে শুধু ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িকতার দিক থেকে দেখা একটি ঐতিহাসিক ভ্রান্তি বলে অনেকে মনে করেন। কারণ, দ্বিজাতিতত্ত্ব ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট সময়ে কাজ করলেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নব গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে তা আর কাজ করেনি। কারণ ইতোমধ্যে ওই রাজনৈতিক এজেন্ডা তার উপযোগিতা হারিয়েছে। যে-মুসলিম জনগোষ্ঠী এক সময় নিজেদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য দ্বিজাতিতত্ত্বের সহায়তায় নতুন রাষ্ট্র গঠন করেছিল, তারাই নব গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে নিজেদের কাঙ্ক্ষিত মুক্তির জন্য, কখনো স্বায়ত্তশাসন, কখনো স্বাধিকারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতিত্বের দাবি নিয়ে উচ্চকিত হয়েছে। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ পূর্ব বাংলা; বর্তমান বাংলাদেশ। দ্বিজাতি তত্ত্বের মধ্যে লুকিয়ে ছিল নানা ভাল-মন্দ সম্ভাবনা–

Dhaka University Institutional Repository

> জিন্নার কাছে পাকিস্তান প্রস্তাব ছিল একটি সুচিন্তিত রণকৌশলের অংশ। তিনি জানতেন, ভারতে এবং ভারতের বাইরে মুসলিম রাষ্ট্রের মোড়কে সব রকম সম্ভাবনাকে পুরে দেওয়া যাবে। পাকিস্তান বলতে ঠিক কী বোঝানো হচ্ছে, সেটা তিনি খোলসা করে বলেননি, তার প্রধান কারণ এই যে, সেটা তিনি নিজেও জানতেন না এবং তাঁর অনুগামীদের নিজেদের পছন্দ মাফিক এই প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করার স্বাধীনতা দিলেন তিনি। কট্টরপন্থীরা স্বপ্ন দেখলেন এমন এক রাষ্ট্রের, বিশুদ্ধ ইসলাম হবে যার প্রাণ। তুলনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি'(!) যাঁদের, তাঁরা 'নিজেদের রাষ্ট্র' তৈরি হলে যে সব আর্থিক সুবিধা পাওয়া যাবে তার আকর্ষণে ভুললেন। তা ছাড়া, একটি সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রের সম্ভাবনা অনেকের মনে অতীত মুসলিম শাসনের মহিমময় স্মৃতি জাগিয়ে তুলল। (যশোবন্ত ২০১৪ : ২৩৮)

আদতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এর সবকটি চিন্তাধারার ফলই ফলেছিল।

স্বাধীন অবিভক্ত বাংলার প্রয়াস

পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল– বাংলা ভাগ হলো। ১৯০৫ সালের পর ১৯৪৭ সালে বাংলা স্থায়ীভাবে বিভক্ত হলো। এই শেষ বিভক্তি থেকে রক্ষার চেষ্টা শরৎচন্দ্র বসু, আবুল হাশিম, সোহরাওয়ার্দি প্রমুখ করেছিলেন তা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। জিন্নাহভিত্তিক কেন্দ্রীয় মুসলিম লিগের কাছে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লিগের চিন্তা-ভাবনার গুরুত্ব না থাকাকে এর অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। তাছাড়া কেন্দ্রের আলোচনায় বাংলার মুসলমান নেতাদের কার্যকরভাবে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। (জয়া ২০০৩ : ২৬০) আবার একই সঙ্গে প্রাদেশিক বঙ্গীয় কংগ্রেসের ভারত নামক কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে থাকার অদম্য ইচ্ছাও অবিভক্ত বাংলার প্রয়াসকে বাস্তবায়িত হতে দেয়নি। অধিকন্তু অবিভক্ত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলায় হিন্দু জনগোষ্ঠীর অনিরাপত্তার বোধ ছিল এক ঐতিহাসিক সত্য। (গোলাম মুরশিদ ২০১৭ : ২৬) বিশেষত কলকাতার হিন্দু ভদ্রলোক, হিন্দু মহাসভা আর প্রাদেশিক কংগ্রেসের যৌথ আন্দোলনে বাংলা শেষ পর্যন্ত ভাগই হয়। কলকাতার যে-হিন্দু জনগোষ্ঠী ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে আন্দোলন করেছে, তারাই স্বাধীন অবিভক্ত বাংলা গঠনের উদ্যোগের বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সালে বাংলা ভাগের জন্য আন্দোলন করেছে। 'ভদ্রলোকেরা ছিল এ আন্দোলনের মূল শক্তি, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বস্তুত ভদ্রলোক রাজনীতির মূলস্রোত যে দিকে প্রবাহিত হয় তাতে বাঙলা ভাগ ছিল তার যৌক্তিক পরিসমাপ্তি।' (জয়া ২০০৩ : ২৮৮-২৮৯) এছাড়া "উনিশ শতকের শেষে বিশ শতকের গোড়ার দিকে হিন্দু কবি সাহিত্যিক ও রাষ্ট্র নেতারা 'বাঙালী জাতিত্ব', 'বাংলার বৈশিষ্ট্য', 'বাংলার স্বাতন্ত্র্য' ইত্যাদি প্রচার করিতেন। অনেকে বিশ্বাসও করিতেন। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় ভোটাধিকার প্রসারে বাংলার রাষ্ট্রীয় অধিকার মেজরিটি মুসলমানের হাতে চলিয়া যাইবে এটা যেদিন পরিষ্কার হইয়া গেল, সেই দিন হইতেই হিন্দুর মুখে বাঙ্গালী জাতিত্বের কথা, বাংলার কৃষ্টির কথা আর শোনা গেল না। তার বদলে 'ভারতীয় কৃষ্টি' 'মহাভারতীয় মহাজাতি' ও 'আর্য সভ্যতার কথা' শোনা যাইতে লাগিল।" (আবুল মনসুর ২০০১ : ৯৭/৩, কামরুদ্দীন ২০০৪ : ৯৬)

জিন্নাহর উচ্চাভিলাষ ও কূটচাল আর হিন্দু ভদ্রলোকদের আন্দোলন যা-ই হোক না কেন, বাংলা যে ভাগ হলো, তাতে দুই বাংলার অসংখ্য মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার ক্ষত তৈরি করল এবং অভিন্ন ভাষী দুটি অঞ্চলের একত্রবাসের দীর্ঘ ইতিহাসের ছেদ ঘটল। উত্তরকালে আমরা দেখব পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে বিরূপ

Dhaka University Institutional Repository

আচরণের শিকার পূর্ব বাংলা অঞ্চলে সেই বিচ্ছেদ আবার অভিন্নতার অনুভূতির জন্ম দিয়ে জাতীয়তাবাদকে কিভাবে উস্কে দিয়েছে।

পাকিস্তান রাষ্ট্র ও সাম্প্রদায়িকতা

১৯৪৬ সালে ভারত বিভক্তির প্রশ্নে অর্থাৎ পাকিস্তানের প্রশ্নে যখন ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়, তখন মুসলিম লিগ সাধারণ জনগণকে পাকিস্তানের পক্ষে ভোটে অংশগ্রহণ করানোর জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করেছে। 'সেই সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছিল এবং লীগ নেতারাও ক্রমশ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পোষকতা শুরু করেন। পাকিস্তান প্রস্তাবের ভিত্তিতে নির্বাচন করতে গিয়ে ১৯৪৬ সালে লীগ পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক ভিত্তির ওপর গুরুত্ব দেয় এবং নির্বাচনে সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।' (সাঈদ-উর ২০০১ : ১১) পাকিস্তান প্রশ্নে গণভোট এবং সাধারণ নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রয়োগ হলেও অনেকে মনে করেন ভারতভাগ ছিল মূলত হিন্দু ও মুসলিম তথা কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের একটি সমঝোতা। কারণ ১৯২৬ এবং ১৯৪৬ সালের দুই ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যবর্তী সময়ের হিন্দু-মুসলিম বৈরী-তিক্ত সম্পর্ক উভয় সম্প্রদায়েরই ধর্ম এবং জীবনকে শঙ্কিত করে তোলে। এই শঙ্কা ও অনিরাপত্তা থেকে মুক্তির জন্য 'কংগ্রেস ও লীগ, হিন্দু ও মুসলমান একমত হইয়া চুক্তি করিয়াই ভারত ও পাকিস্তান এই দুই দেশে ভারত উপমহাদেশকে ভাগ করিয়াছে।' (আবুল মনসুর ১৯৯৯ : ৪৩) এটিকে একটু ঘুরিয়ে কোনো কোনো তাত্ত্বিক বলেন, 'ইতিহাসের প্রয়োজনেই পাকিস্তান আসিয়াছিল।' (হায়াৎ ১৯৮৯ : ৫, কামরুদ্দীন ২০০৪ : ১১৮)

পাকিস্তানের প্রশ্নে যখন গণভোট অনুষ্ঠিত হয় তখন ভারতবর্ষের মুসলমানরা পাকিস্তানের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে বিপুল উৎসাহ নিয়ে ভোট দেয়। এর কারণ ছিল মূলত দুটি। প্রথমত, ভারত রাষ্ট্রে মুসলিম জনগোষ্ঠী নিজেদের খুব কম ক্ষেত্রেই নিজেদের 'নিজ' (Self) আকারে ভাবতে পেরেছে। তারা অধিকাংশই নিজেদের 'অপর' (other) জ্ঞান করেছে। '১৯৪৭ সালের আগে আমাদের বাসস্থান ছিল, কিন্তু দেশ ছিল না। আমরা জাতি ছিলাম কিন্তু নেশন ছিলাম না। কারণ আমাদের রাষ্ট্র ছিল না। (আবুল মনসুর ১৯৯৯ : ১০৫) এই 'অপর'-এর বোধ তাদের পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নিতে সহায়তা করেছে। গবেষকের ভাষায়, 'পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবির পেছনে ছিল আদতে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি। মুসলমানের হিন্দু-প্রভুত্বের ভয়ের মধ্যে নিহিত ছিল পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার কারণ।' (অশ্রুকুমার ২০১৪ : ২৬) তাছাড়া ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পরে বিশেষত পূর্ব বাংলা যে সুযোগ-সুবিধা এবং গুরুত্ব ভোগ করেছে, সেই স্মৃতি তাদেরকে পাকিস্তান নামক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষায় আরো বেশি করে উদ্বেলিত করেছে ১৯৪০-এর দশকে এসে। এ প্রসঙ্গে কামরুদ্দীন আহমদ বলেন–

> ...পূর্ব থেকেই সুপতিষ্ঠিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের স্বার্থে নবাগত মুসলমান মধ্যবিত্তের স্থান করে দিতে রাজী হয়নি– যার ফলে তাদের পক্ষে আত্ম প্রতিষ্ঠার লড়াইতে নামতে হয়েছিল– এমনকি জিন্নাহ্ সাহেব যখন তাদের (পূর্ব বাংলার মুসলমানদের) প্রিয় নেতা ফজলুল হককে রাজনীতি ছাড়তে বাধ্য করলেন তখনো তারা পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিল। অটল হয়ে দাঁড়িয়েছিল নতুন জাতীয়ভূমি সৃষ্টি করতে– তা নইলে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হতো। হিন্দু ছাত্ররা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি যতটা আকৃষ্ট ছিল আমরা তা ছিলাম না, কেবল ১৯৪০

Dhaka University Institutional Repository

> সনের পর থেকে আমাদের মধ্যে সে অনুপ্রেরণা এসেছিল। সুতরাং আমাদের পথ ভ্রান্ত ছিল না বলে আজো আমি বিশ্বাস করি– যদিও আজ আমি পাকিস্তান সরকার কর্তৃক নির্যাতীত (sic), কারাগারে আবদ্ধ– মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। (কামরুদ্দীন ২০০৪ : ১১৯)

এছাড়া ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক বিষবাষ্প দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সৌহার্দ্য। এই সম্প্রীতি-সৌহার্দ্য অসহযোগ আর খেলাফত আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অন্তত বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে কাজ করেছিল ১৯১৯ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধী (১৯৬৯-১৯৪৮), চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫) প্রমুখের প্রযোজনায়। একারণেই এই কাল পরিসরে এবং এর অল্প কিছুকাল পরেও কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)-এর অসাম্প্রদায়িক কথাবার্তা এবং কাব্যশৈলী দারুণভাবে বাঙালি মধ্যবিত্ত দ্বারা সমাদৃত হয়েছে। নজরুল বিবেচিত হয়েছেন বহু মানুষের গোপন ভাবনার প্রকাশ্য কণ্ঠস্বর হিসেবে। (হুমায়ুন ২০১২ : ৬২) কিন্তু এর পর বাংলার শুধু নয় সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি আর কাজ করেনি। ফলে ভারত ভাগ হয়েছে; হিন্দুস্তান আর পাকিস্তানে।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসেই পাকিস্তান গণপরিষদের উদ্বোধনী বক্তৃতায় জিন্নাহ যে-বক্তব্য দেন তা ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির ডামাডোলের মধ্যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে– এ বিষয়ে তিনি ছিলেন সচেতন। ফলে আদর্শিকভাবে এই বিষ মুক্ত করার জন্য তিনি ঘোষণা করলেন– 'আজ হইতে আমরা আর হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খৃস্টান-পার্শি জাতি নই। আমরা সকলে এক পাকিস্তানী জাতি।' (উদ্ধৃত, আবুল মনসুর ১৯৯৯ : ১০৬) একই চেতনা লালন করতেন পাকিস্তান হওয়ার আগে আরো অনেক পাকিস্তানবাদী ইন্টেলেকচুয়ালও। তারা মনে করতেন–

> শুধু ধর্মের ডাকে পাকিস্তান আসিলে মোল্লাদের প্রাধান্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মোল্লাদের প্রভাবে মুসলমানরা কেবল পিছন ফিরিয়া রাস্তা চলে। ... ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের নামে রাষ্ট্র গঠিত হইলে তাতে কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থ বিপন্ন হইতে পারে। (আবুল মনসুর ২০০১ : ১৪৪/৩)

এমনকি পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্কালে মুসলিম লিগের অন্যতম নেতা মাহমুদাবাদের তরুণ রাজা সাহেব এক বক্তৃতায় পাকিস্তানকে কোরআনের আইন অনুসারে চালানোর কথা বললে 'জিন্না সাহেব পরদিন তার প্রতিবাদে খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়া রাজা সাহেবকে ধমকাইয়া দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, পাকিস্তান একটি মডার্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইবে।' (আবুল মনসুর ২০০১ : ১৪৪/৩) কিন্তু পরবর্তী পাকিস্তান রাষ্ট্রের ইতিহাস দেখলে দেখা যাবে যে, জিন্নাহর এসব ধর্ম নিরপেক্ষতার বাণী, বাণী আকারেই রয়ে গিয়েছে। পাকিস্তান রাষ্ট্র ও এর শাসন ক্ষমতায় থাকা মুসলিম লিগ ধর্মতন্ত্র তথা ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার রাষ্ট্রনীতি ও রাজনীতিই জারি রেখেছে।

পাকিস্তান আন্দোলন ও বামপন্থী ধারা

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ৪০-এর দশকে প্রধানতম রাজনৈতিক সংগঠন ছিল মুসলিম লিগ। কিন্তু বঙ্গীয় মুসলিম লিগের মধ্যে স্পষ্টত ছিল একাধিক চেতনা ধারা। বঙ্গীয় মুসলিম লিগের একটি ধারা ছিল মার্কসবাদ বা সাম্যবাদ ঘেঁষা। এই অংশের নেতৃত্বে ছিলেন মূলত আবুল হাশিম। '১৯৪৩ সনে আবুল

Dhaka University Institutional Repository

হাসিম (sic) সাহেব মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হবার পর মুসলিম লীগ বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীতে ভাগ হলো। মাওলানা আকরাম খান, হাসান ইস্পাহানী ও খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযান আরম্ভ হয়– এ অভিযান প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে ... ।' (কামরুদ্দীন ২০০৪ : ১০৭) প্রথম দিকে আবুল হাশিমের এই বামঘেঁষা চেতনার অনুসারী হিসেবে ছিলেন হাবিবুল্লাহ বাহার (১৯০৬-১৯৬৬), নূরুদ্দীন (১৯২৩-১৯৮১), শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫), কামরুদ্দীন আহমদ (১৯২২-১৯৮২) প্রমুখ। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ সালের তেভাগা বিল প্রত্যাখ্যাত হওয়া পর্যন্ত, এই পর্যায়টিকে অনেকে গণপ্রতিষ্ঠান হিসেবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লিগের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় বলে মনে করেন। পরবর্তীতে আবুল হাশিমের রাজনৈতিক আদর্শ পরিবর্তন ও সাংগঠনিক নিষ্ক্রিয়তার কারণে এই ধারা আর স্ফীত হয়নি। তবু সংখ্যায় কম হলেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে মুসলিম লিগের এই 'বামপন্থী' উপদলভুক্ত যুবকরাই পূর্ব বাংলার বিরোধী শক্তিকে সংহত ও সাংগঠনিকভাবে শক্ত হতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। সংখ্যায় কম হলেও তাদের মধ্যকার কোনো কোনো যুবক বামপন্থী রাজনীতির গঠনকার্যে সচেষ্ট হন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই চেতনার সঙ্গে যুক্ত কোনো কোনো রাজনীতিবিদ মুসলিম লিগ বিরোধী হিসেবে তৎপর হয়ে ওঠেন এবং পরবর্তীতে কখনো এককভাবে, আবার কখনো আওয়ামী লীগের সঙ্গে থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রবিরোধী, পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদবিরোধী নানা আন্দোলন-সংগ্রামে ভূমিকা পালন করেছেন।

পাকিস্তান আন্দোলন ও বাঙালি মুসলমানের সচেতনতা

পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমান অন্তত ইংরেজ শাসনামল থেকে বরাবরই রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে পশ্চাৎপদ ছিল। কৃষি, বিশেষত পাটের উৎপাদন আর হস্তশিল্পই এখানকার প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল। কিন্তু ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পর থেকে ক্রমে বদলাতে থাকে পূর্ববাংলা। বিশেষত ১৯০৬ সালে মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এখানে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি ক্রমে বিকশিত হতে থাকে। কিন্তু ১৯৩৬-৩৭ সালের দিক থেকে ঢাকায়, বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা দেখা দেয়। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে এই ঘটনাটি ঘটে। এ সময়ের ছাত্রদের রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পর্কে কামরুদ্দীন আহমদ বলেন–

> ঢাকায় মুসলমান ছেলেদের মধ্যে তখনো রাজনৈতিক চেতনা আসেনি। আবদুল ওয়াসেফ কয়েকবার ঢাকা এসেছে কিন্তু ছাত্র সংগঠন করতে পারেনি। তবে ১৯৩৬ সন থেকে এক নতুন উন্মাদনা সৃষ্টি হয়– ১৯৩৭ সনের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষ্য করে। তখনই দৈনিক আজাদ বের হয়, নজরুল ইসলাম, কবি জসীম উদ্‌দীন, গায়ক আব্বাস উদ্দীন এদের সাফল্যে মুসলমানরা গৌরবান্বিত বোধ করতে থাকে। (কামরুদ্দীন ২০০৪ : ৯১-৯২)।

১৯৩৭ সালের মুসলিম লিগ মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পূর্বে মুসলমান ছেলেদের পক্ষে চাকুরি পাওয়া ছিল প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাই ১৯৩৭ সালের প্রথম দিকে সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লিগের সাফল্যে উদ্দীপিত হয়ে অনেক শিক্ষিত শ্রেণি মুসলিম লিগে যোগ দেয়। যে-সমাজ এতদিন সম্পূর্ণ ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল

Dhaka University Institutional Repository

সে-সমাজ সমস্যা-সচেতন হয়ে আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য সংকল্পবদ্ধ হলো। (কামরুদ্দীন ২০০৪ : ৯৩, ৯৬) এরপর ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব পাশ হবার পর মুসলিম যুব সমাজ এক নতুন প্রেরণা পেল– তারা আর একটা সম্প্রদায় নয়– তারা নিজেরাই একটা জাতি। 'সাম্প্রদায়িক রক্ষাকবচের জন্যে যে সংগ্রাম করছিল প্রায় দুই শতাব্দী ধরে তার যেন পরিসমাপ্তি ঘটল।' (কামরুদ্দীন ২০০৪ : ১১৭) এরপর পাকিস্তান আন্দোলন যত বেগবান হয়েছে, ১৯৪৭ সাল যত কাছে এসেছে, ততই এর সঙ্গে ব্যাপক সংখ্যক মুসলিম তথা বাঙালি মুসলমান সম্পৃক্ত হয়েছে। এই বহুমানুষের সম্পৃক্তি আর পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি সব সময় সরল একরৈখিকভাবে চলেনি। এর মধ্যে তৈরি হয়েছে নিজেদের মধ্যেই মত-প্রতিমত, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, দল-উপদল। এই বহুমাত্রিক দ্বন্দ্ব প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সচেতন হয়ে উঠেছে বাঙালি মুসলমান। এই সচেতনতা তাদের পরবর্তীতে নব্য গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রেও নিজেদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, ঐতিহাসিক ন্যায্যতার পক্ষে দাঁড়িয়ে সংগ্রামী হতে সাহায্য করেছে, জাতীয়তাবাদে সমাবিষ্ট হতে সহায়তা করেছে; নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রকে সম্ভব করে তুলেছে।

পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম লিগে অভিজাত-বিরোধী ধারা

১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবের পর থেকে যত দিন গিয়েছে, পাকিস্তান আন্দোলন তত জোরদার হয়েছে। এই পাকিস্তান আন্দোলনকে বেগবান করার ব্যাপারে অধিকাংশ রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে তেমন বড় কোনো অমিল ছিল না। এমন কি যারা ছাত্র এবং ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল, তারা মনে করত যে, 'পাকিস্তান আনতে না পারলে লেখা পড়া শিখে কি করব?' (শেখ মুজিবুর ২০১৪ : ৩২) এমনকি দলের অভ্যন্তরে উপদলীয় কোন্দল, মতান্তর বা বিবাদের আশঙ্কা দেখা দিলে কেন্দ্রীয় নেতারা বলতেন, 'এখন গোলমাল করার সময় নয়। পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। নিজেদের মধ্যে গোলমাল হলে পাকিস্তান দাবির সংগ্রাম পিছিয়ে যাবে।' (শেখ মুজিবুর ২০১৪ : ৩২) কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও নতুন প্রজন্মের আগমনে মুসলিম লিগের অভ্যন্তর কাঠামোর মূল প্রবণতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয় এবং একই সঙ্গে এর বিরুদ্ধে চলতে থাকে বিপরীত চেতনার গঠন। মুসলিম লিগ ব্যতিক্রম ছাড়া জন্মাবধি ছিল একটি অভিজাততান্ত্রিক ও কোটারিভিত্তিক নেতাদের সংগঠন। এটির নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রধানত অভিজাত মুসলিম নবাব-নাইটদের হাতে।[৪] বিশ শতকের ত্রিশের দশকে নতুন প্রজন্মের শিক্ষিত ছাত্রশ্রেণি মুসলিম লিগের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর থেকে এই অভিজাততন্ত্র প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকে। ঢাকায় এবং কলকাতায় মুসলিম লিগের এই অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে যারা সক্রিয় ছিলেন তাঁদের মধ্যে শামসুল হক (১৯১৮-১৯৬৫), শামসুদ্দিন আহমেদ, আজিজ আহমেদ, নজীর আহমেদ, শেখ মুজিবুর রহমান, নুরুদ্দীন প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। মুসলিম লিগের অভিজাততন্ত্রের বিপরীতে নতুন গণমুখী ধারার স্বরূপ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের স্মৃতি স্মরণসূত্রে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন–

> এই সময় থেকে মুসলিম লীগের মধ্যে দুইটা দল মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। একটা প্রগতিবাদী দল, আর একটা প্রতিক্রিয়াশীল। শহীদ সাহেবের নেতৃত্বে আমরা বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা মুসলিম লীগকে জনগণের লীগে পরিণত করতে চাই। মুসলিম লীগ তখন পর্যন্ত জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় নাই। জমিদার, জোতদার ও খান

> বাহাদুর নবাবদের প্রতিষ্ঠান ছিল। কাউকেও লীগে আসতে দিত না। জেলায় জেলায় খান বাহাদুরের দলেরাই লীগকে পকেটে করে রেখেছিল। (শেখ মুজিবুর ২০১৪ : ১৭)

পাকিস্তান আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক সচেতনতার উপর্যুক্ত বাস্তবতা নবসৃষ্ট পাকিস্তানেও অব্যাহত থাকে। পূর্ব বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সঙ্গে খোদ পাকিস্তানি শাসকচক্র– যারা মূলত ছিল অভিজাত তন্ত্রেরই পক্ষের শক্তি– বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমানদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালীন অভিজাততন্ত্রবিরোধী চেতনা যে বেশ ভূমিকা পালন করেছে তাতে সন্দেহ নেই।

গ. সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত : প্রাক্-পাকিস্তান পর্ব

পাকিস্তান আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না, রাজনীতির বাইরে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডও পাকিস্তান আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছে। আবার পাকিস্তান আন্দোলনও বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক সংঘ-সংগঠনের চেতনা এবং তৎপরতাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। ফলে এ সময়ের সাংস্কৃতিক সংঘ-সংগঠন আর তার কর্মকাণ্ড হয়ে উঠেছে রাজনৈতিকতা স্পৃষ্ট। এ সময়ের সাংস্কৃতিক গতিধারার আলেখ্য থেকে রাজনীতি এবং এর মধ্যকার বিচিত্র সুর ও স্বর শোনা যেতে পারে; বোঝা যেতে পারে পাকিস্তান-পরবর্তী সাংস্কৃতিক রাজনীতির গতি-প্রকৃতি আর এর সঙ্গে জাতীয়তাবাদী চেতনার যোগসূত্র।

বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়টাতে ভারতে সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির ধারা ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তরুণদের আগ্রহে এ সময়ে গড়ে ওঠে কমিউনিস্ট রাজনৈতিক সংগঠন এবং সাহিত্য-শিল্প-সাংস্কৃতিক সংগঠন। এরই অংশ হিসেবে ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ'। তার আগে একই বছরের এপ্রিল মাসে লক্ষ্মৌতে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের প্রথম কমিউনিস্ট রাজনৈতিক আদর্শে গড়া সাংস্কৃতিক সংগঠন 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৩৯ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'প্রগতি লেখক সংঘ'। এদের চেতনা আর উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল, 'সাম্যবাদী আদর্শে পরিচালিত হয়ে সমাজের মূল সমস্যা ক্ষুধা দারিদ্র্য সামাজিক পশ্চাদমুখিতা ও রাজনৈতিক পরাধীনতাকে সাহিত্যের উপাদান করার এবং সামাজিক পরিবর্তনকে প্রগতিশীলতার খাতে প্রবাহিত করার কথা।' (সাঈদ-উর ২০০১ : ২৪) প্রগতি লেখক সংঘের ঢাকার সংগঠনটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন সোমেন চন্দ (১৯২০-৪২), সতীশ পাকড়াশী (১৮৯৩-১৯৭৩), কিরণশংকর সেনগুপ্ত (১৯১৮-১৯৯৮৯) ও রণেশ দাশগুপ্ত (১৯১২-১৯৯৭)। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে এই সংগঠনের কোনো কোনো কর্মকাণ্ডে উপস্থিত থেকেছেন কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৯-১৯৭০), ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯) প্রমুখ।

সংগঠনটির তৎপরতা ছিল শুরুতে চোখে পড়ার মতো। ১৯৪০ সালে সংঘের সভ্যদের লেখার সমন্বয়ে প্রকাশ করা হয় 'ক্রান্তি' নামের সংকলন; প্রকাশিত হয় সোমেন চন্দের গল্পসংকলন ms‡KZ I Ab¨vb¨ (১৯৪৩); পাক্ষিক মুখপত্র cÖZ‡iva (১৩৪৯)। এছাড়া প্রতিষ্ঠার অল্প সময়ের মধ্যে এই সংগঠনটি জন

সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে এবং সমাজতান্ত্রিক সেভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সমাজ ও সভ্যতার বহুমুখী অগ্রগতির বিষয়টি তুলে ধরবার জন্যে ঢাকা শহরের সদরঘাটের সন্নিকট ব্যাপটিস্ট মিশন হলে সপ্তাহব্যাপী একটি চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। এতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার অসংখ্য মানুষের অভাবনীয় সমাগম ঘটেছিল। শুধু তাই নয়, এই সংগঠনের পক্ষ থেকে গণসঙ্গীত রচনা ও গাওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে এর সঙ্গে গণমানুষের সম্পৃক্তি ঘটে। (কিরণশঙ্কর ২০১২ : ৫৬-৫৯) 'এভাবে, বিবিধ সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে দেশবিভাগের পূর্বে ঢাকায় একটি প্রগতিশীল সাহিত্যপরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।' (সাঈদ-উর ২০০১ : ২৫)

পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি

এই সংগঠনটি পাকিস্তান আন্দোলনের সাংস্কৃতিক প্রকাশ। সংগঠনটি ১৯৪০ সালে কলকাতায় স্থাপিত হয়। কারণ পূর্ব বাংলার শিক্ষিত অগ্রবর্তী শ্রেণির অবস্থান এবং অধ্যয়ন দুই-ই ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক। সংগঠনটির প্রথম আহ্বায়ক ছিলেন মুজীবর রহমান খাঁ (১৯১০-১৯৮৪)। আপাতদৃষ্টিতে শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক সংগঠন বলে মনে হলেও এটি ছিল অন্তর্গতভাবে শিল্প-সাহিত্যের রাজনৈতিক সংগঠন। কারণ সংগঠনটির উদ্দেশ্য ছিল, 'জাতীয় রেনেসাঁর উদ্বোধক পাকিস্তানবাদের সাহিত্যিক রূপায়ণ, পাকিস্তানবাদ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ও মননমূলক আলোচনার ব্যবস্থা করা, সাহিত্যে পাকিস্তান বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারাকে প্রতিহত করা।' (সাঈদ-উর ২০০১ : ২৫) এই সোসাইটি বাঙালি মুসলমানের জীবনভিত্তিক সাহিত্য রচনায় উৎসাহী ছিল। সাহিত্যের ভাষার প্রশ্নে তাঁরা ফারসি-উর্দু শব্দের মিশেলে এক নতুন বাংলা ভাষা-কাঠামো নির্মাণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যকে কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্য-কাঠামোর বাইরে এনে এক স্বতন্ত্র স্বাদ-গন্ধের সাধনায় লিপ্ত ছিলেন। এই স্বাতন্ত্র্যের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে তাঁরা বাঙালি মুসলমানের স্বতন্ত্র ধর্ম এবং সংস্কৃতির আশ্রয় নিতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁরা ধর্মের চেয়ে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে বেশি গুরুত্ব দিতেন।[৫] 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'-র এসব চিন্তা-চেতনা মুসলমান সাহিত্যিকদের একটা বড় অংশের কাছে বেশ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিল। এর প্রমাণ, এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠার প্রথম দুই বছরে চল্লিশটি আলোচনা-সভা হয়েছিল। এমনকি এর কোনো কোনো সভায় গোপাল হালদার (১৯০২-১৯৯৩) ও এম. এন. রায় (১৮৮৭-১৯৫৪)-সহ অনেক হিন্দু সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী অংশগ্রহণ করতেন। এই সংগঠনটির উদ্দেশ্যের মধ্যে যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ছিল, তা ১৯৪৪ সালের সম্মিলনীর উপস্থিতি এবং সভাপতির ভাষণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। এই সম্মিলনীতে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) থেকে শুরু করে আবুল কালাম শামসুদ্দিন (১৮৯৭-১৯৭৮), অধ্যাপক সুশোভন সরকার (১৯০০-১৯৮২), ডা. সাদেক, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়ন (১৯২০-১৯৯৫), অধ্যাপক আদমুদ্দিন, হাবিবুল্লাহ বাহার, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। আর সম্মিলনীতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে এ. কে. ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দি, হাসান সোহরাওয়ার্দি (১৮৮৪-১৮৪৬), আবুল হাশিম, খাজা নাজিমুদ্দিন (১৮৯৪-১৯৬৪)-সহ তাঁর মন্ত্রিসভার সকল মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। আর ওই সম্মিলনীতে সভাপতির ভাষণে আবুল মনসুর

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯) যা বলেন তাও সংগঠনটির শিল্প-সাহিত্য-শ্লিষ্টতার নামে রাজনৈতিক সক্রিয়তাকেই স্পষ্ট করেছে–

> পাকিস্তান দাবীটা প্রধানতঃ কালচারেল অটনমির দাবী। ... রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার চেয়েও কালচারেল অটনমি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই দিক হইতে পাকিস্তান দাবী শুধু মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দাবী নয় এটা গোটা ভারতের কালচারেল মাইনরিটির জাতীয় দাবী। ... ভারতীয় মুসলমানরা হিন্দু হইতে আলাদা জাত ত বটেই বাংলার মুসলমানরাও পশ্চিমা মুসলমানদের হইতে পৃথক জাতি। ... শুধুমাত্র ধর্ম জাতীয়তার বুনিয়াদ হইতে পারে না। (আবুল মনসুর ২০০১ : ১৪৫/৩)

সংগঠনটির এই ধরনের চিন্তাচেতনা, কর্মকাণ্ড ও উদ্দেশ্য-আদর্শ সমকালের বাংলাদেশের কবিতাকে যেমন প্রভাবিত করেছিল, তেমনি পাকিস্তান আন্দোলনকেও আরো বেশি বেগবান করে তুলেছিল– এতে সন্দেহ নেই।

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ

এটি পাকিস্তান আন্দোলনের উপজাত আরেকটি সংগঠন। এই সাংগঠনটিরও মূল উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান আন্দোলনকে আরো বেশি বেগবান ও অর্থবহ করা। আর পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরে বাংলার মুসলমানদের সাহিত্যকর্মে নিজস্ব সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন নিশ্চিত করা। বলা যায়, এটি ছিল এক ধরনের জাতীয়তাবাদী সংগঠন; পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ। সংগঠনটি ১৯৪২ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিকে অনেকাংশে বলা যায়, 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'-র ঢাকা শাখা। 'ইসলামের প্রবহমান ঐতিহ্য থেকে উপাদান আহরণ করা, মুসলমানী পুঁথিকে পরিমার্জিত করে শালীন সাহিত্যের অঙ্গীভূত করা এবং পাকিস্তানের গ্রামীণ জীবনকে বেশি করে সাহিত্যের বিষয়ীভূত করাই ছিল এই সংগঠনের লক্ষ্য।' (সাঈদ-উর ১৯৮৩ : ১৩)

'বঙ্গ দেশীয় মুসলিম সংস্কৃতিকে নবগতি প্রদান করার আশায়' প্রতিষ্ঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ'-এর সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন এবং সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২)। ১৯৪৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে সংসদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনের মূল সভাপতি ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন আর উদ্বোধন করেন কবি কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১)। সংগঠনটির মুখপত্র ছিল পাক্ষিক cvwK¯Ívb। পত্রিকাটির 'উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যবোধ সৃষ্টির সঙ্গে জাতীয় সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করা, লোকসাহিত্য থেকে উপাদান নিয়ে নতুন কবিতা লেখা এবং সাহিত্যে ইসলামী আদর্শের প্রচার করা।' (সাঈদ-উর ২০০১ : ২৬)

পাকিস্তান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত 'পূর্ব বাংলা রেনেসাঁ সোসাইটি' এবং 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ'-নামক শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক সংগঠন দুটির স্থায়িত্ব বেশি দিন ছিল না। 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সংগঠন দুটি আর সক্রিয় থাকেনি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাতেই কর্তব্য শেষ হয়েছে বলে সংগঠন দুটির কর্মকর্তারা ভাবতে থাকেন এবং ১৯৪৭ উত্তরকালে সংগঠন দুটি ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।' (নিতাই ২০০৭ : ৫৬) কিন্তু সংগঠন দুটির প্রভাব সমকালীন বাংলাদেশের কবিতার মানচিত্রে পড়েছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সংগঠন সক্রিয় না থাকলেও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাহিত্যিকদের অনেকের একই চেতনার শিল্প

Dhaka University Institutional Repository

তৎপরতা অব্যাহত ছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের আনুকূল্যে বাংলাদেশের কবিতার মধ্যে তাঁদের প্রয়োজনায় একটি ধারা অব্যাহত ছিল; যদিও এই ধারাটি ক্রমাগত ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশের কবিতায় ও রাজনীতিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারা-ই ক্রমাগত স্ফীত থেকে স্ফীততর হয়ে ওঠায় ওই ধারাটি ক্রমে শুকিয়ে যায়। তবু পাকিস্তানবাদী কাব্যধারা এবং রাজনীতির উপস্থিতি এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী কাব্যধারা ও রাজনীতির সঙ্গে এর সাংঘর্ষিক অবস্থান শেষোক্ত কাব্যধারা ও রাজনীতিকে বেগবান ও সক্রিয় করেছিল সন্দেহ নেই। কারণ সংঘর্ষ এবং বৈপরীত্যই প্রাণের স্পন্দনের খোরাক।

দুই. অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত : পাকিস্তান পর্ব

ক. অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত : পাকিস্তান পর্ব

আগেই বলা হয়েছে অবিভক্ত ভারতের সব প্রদেশের মুসলমানদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এক রকম ছিল না। যেমন, ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে মুসলিমরা রাজনৈতিকভাবে প্রবল ছিল এবং অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত ছিল না। পাঞ্জাবের নুন-তিওয়ানা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের উপজাতীয় সর্দার এবং সিন্ধুর ওয়াদেরা ভূস্বামীদের অবস্থা খারাপ ছিল না। একারণে তারা চেয়েছিল হিন্দু প্রাধান্যযুক্ত কেন্দ্রের অনধিকারমূলক হস্তক্ষেপ থেকে তাদের প্রাদেশিক ক্ষমতাকাঠামোর প্রাধান্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় আঞ্চলিক ক্ষমতা। অন্যদিকে আইন পরিষদের নির্বাচনে বাঙালি মুসলমান প্রজারা পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিল তাদের দৈনন্দিন জীবনের ওপর থেকে হিন্দু জমিদার-মহাজনদের কর্তৃত্ব অপসারণের জন্য। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শ্রেণি, জাতি, বর্ণ ও ভূখণ্ডগত বিচিত্র অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। এক্ষেত্রে সমগ্র ভারতে মুসলমানদের গড় পরিস্থিতি বিবেচনা করে উত্তর-পশ্চিমাংশের সংখ্যাগুরু ও অর্থনৈতিকভাবে প্রতাপশালী মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ভারতের অপরাপর অংশের সংখ্যালঘু মুসলমানদের সঙ্গে বা আপেক্ষিকভাবে বঞ্চিত ও পশ্চাৎপদ বাংলার মুসলমানদের সঙ্গে এক নৌকায় তুলে দেয়া হয়েছে। (রেহমান ২০০৭ : ৬) এক নৌকায় তুলে দিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনকে সফল করে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্ম লাভ করল।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পূর্ব বাংলার মুসলমানরা যে-রাষ্ট্র লাভ করল সেই একই রাষ্ট্র লাভ করে সাবেক ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের পূর্বোল্লেখিত প্রতাপশালী মুসলমানরা। রেহমান সোবহান তাঁর 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি' (২০০৭) শীর্ষক রচনায় দেখিয়েছেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙার ফলে সেখানকার ব্যবসা নিয়ন্ত্রণকারী হিন্দু ও শিখরা ভারতে চলে আসে। সেই শূন্যতা দূর করে ভারত থেকে আসা অভিবাসী উচ্চাকাঙ্ক্ষী মুসলিম ব্যবসায়ীরা। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পূর্ব বাংলায় হলেও এখানকার অর্থনীতিতে প্রভুত্বকারী হিন্দু ও মাড়োয়ারিরা এ অঞ্চল ত্যাগ করার কোনো তাগিদ অনুভব করেনি। ফলে ভারতের উদ্বাস্তু মুসলিম ব্যবসায়ীরা এ অঞ্চলে আসার প্রয়োজন অনুভব করেনি। ইস্পাহানি আর আমিন পরিবার এক্ষত্রে ব্যতিক্রম। ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক বাস্তবতায় বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন আসেনি। আবার নতুন রাষ্ট্রে স্বায়ত্তশাসন লাভের মাধ্যমে 'হিন্দু সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক প্রাধান্য খর্ব করে নিজেদের অর্থনৈতিক বঞ্চনার অবসান ঘটানো'-র

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রনৈতিক বাস্তবতাও তৈরি হয়নি। ফলে পূর্ব বাংলার জনগণের চিত্তের আপাত মুক্তি ঘটলেও বিত্তের মুক্তি রইল অধরা। একারণে 'পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান থেকে স্বায়ত্তশাসন লাভের দিকে দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করে।' (রেহমান ২০০৭ : ৭) এবং অবশেষে পূর্ব বাংলা স্বায়ত্তশাসন থেকে ক্রমে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হয়েছে। কারণ, নব গঠিত কাঙ্ক্ষিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে দিন যত গিয়েছে, বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক বৈষম্য তত বেড়েছে। দুই পাকিস্তানের মধ্যকার এই অর্থনৈতিক বৈষম্য রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহের মতো বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার পরিগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপ

ভারত ভাগ হওয়ার নানাবিধ কারণ ছিল। সাধারণভাবে এর প্রধান কারণ হিসেবে ধর্মকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু একটু গভীরভাবে দেখলে দেখা যাবে যে, ধর্মীয় বিষয়টি উঠে এসেছে অর্থনীতির গর্ভ থেকে। ভারতে ধর্মীয় পরিচয়ে যারা মুসলিম তারা অর্থনৈতিকভাবে উপনিবেশিত রাষ্ট্রে ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে নিজেদের বঞ্চিত অনুভব করছিল। অবশ্য গোড়ার দিকে মুসলমানদের শিক্ষাগত পশ্চাৎপদতাও একটি কারণ ছিল তাদের এই বঞ্চনার পেছনে। কিন্তু বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিত শ্রেণির আবির্ভাব ঘটলেও তারা যখন তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে মনে করেছে, তখন তাদের মধ্যে ক্রমে দানা বাঁধে নতুন রাষ্ট্রের স্বপ্ন। সংগত কারণেই প্রাপ্ত নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে তারা অর্থনৈতিক ন্যায্যতা আশা করেছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তারা আশা করেছিল এমন এক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, যে-পরিকল্পনার আওতায় ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবাই তার অর্থনৈতিক সুবিধাটুকু পাবে। অর্থনৈতিক বঞ্চনার বোধ থেকেই পাকিস্তানের মানুষেরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছি। ফলে এই নব গঠিত রাষ্ট্রের পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা ন্যায্যতার ভিত্তিতে নতুন রাষ্ট্রের নতুন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেবেন এটাই স্বাভাবিক। সঙ্গে সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাটি এমন হওয়া দরকার, যেখানে সবাই তাদের পূর্ববর্তী অর্থনৈতিক বঞ্চনার স্মৃতি ভুলে থাকবেন। গবেষক বাঙালি মুসলমানের পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নেয়ার যথার্থ কারণই নির্দেশ করে বলেছেন, 'বাঙালী মৃসলমান পাকিস্তান চেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা ইসলামের জন্য নয়, উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য তো নয়ই, চেয়েছিল নিজেদের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যই।' (সিরাজুল ২০১১ : ৪)

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর একটু দেরিতে হলেও পাকিস্তান সরকার নতুন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তৈরির জন্য নিয়োগ দেন বিশ্বখ্যাত বৃটিশ অর্থনীতিবিদ কলিন ক্লার্ক (১৯০৫-১৯৮৯)-কে। কলিন ক্লার্ক অক্সফোর্ডের ছাত্র, ক্যাম্ব্রিজের অধ্যাপক ছিলেন। অস্ট্রেলিয়া সরকার তাদের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে কলিন ক্লার্কের সাহায্য গ্রহণ করেছিল। অস্ট্রেলিয়ার অর্থনৈতিক পুনর্গঠন কাজে সহায়তার পর তিনি বৃটিশ সরকার ও 'কলম্ব প্লান'এর সকল সদস্যের অনুরোধে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে যোগ দেন ১৯৫৩ সালে। এই অর্থনীতিবিদ বহু ঘেঁটেঘুটে ১৯৫৩ সালেই পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কেমন হওয়া উচিত, এ-বিষয়ক একটি রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেন। পাকিস্তানের

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক রূপরেখার সুপারিশ সংবলিত রিপোর্টটি পুস্তকাকারে ছাপা হয়। কিন্তু সরকার কলিন ক্লার্কের সেই সুপারিশ কিছুকাল পরেই বাতিল করে দিয়ে ওই পুস্তকের বিতরণ ও প্রচার বন্ধ করে দেয়।

কলিন ক্লার্ক পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় পূর্ব বাংলায় শিল্পায়ন আর পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষি বিস্তার করার কথা বলেছিলেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেছিলেন, পূর্ব বাংলার আয়তন কম এবং এখানে ঘন বসতি। এটি কৃষির জন্য উপযোগী ভূমিপ্রধান এলাকা হলেও, এখানে কৃষির প্রসারণের সুযোগ কম। এখানে শিল্পায়ন ঘটালে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের প্রচুর কাঁচামাল পাওয়া যাবে। এতে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় কমবে। ফলে কম খরচে উৎপাদিত পণ্য দিয়ে বিদেশি বাজার ধরা সহজ হবে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের আয়তন বেশি কিন্তু ঘন বসতি কম। প্রাথমিক শিল্প হিসেবে কৃষির উন্নতি ও প্রসারণের অবকাশ এখানে অনেক বেশি। তাছাড়া রাষ্ট্রের রাজধানীসহ যাবতীয় কেন্দ্রীয় সংস্থা, প্রতিরক্ষাবাহিনী ও বিদেশি মিশন সবই পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে রাষ্ট্র পরিচালনার খরচের সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানেই খরচ হয়। এর ওপর আবার শিল্পায়নের খরচও পশ্চিম পাকিস্তানে করা হলে সকল সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানেই কেন্দ্রীভূত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ পূর্ব বাংলা শুকিয়ে মরার উপক্রম হবে; দুই অঞ্চলের মধ্যে স্পষ্ট বৈষম্য দেখা দেবে। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পায়ন ঘটালে শিল্পের পর্যাপ্ত কাঁচমাল সেখানে পাওয়া যাবে না। ফলে কাঁচামাল আমদানির জন্য ব্যাপকহারে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়িত হবে। উৎপাদন খরচও এতে বেড়ে যাবে। ফলে এসব পণ্য দেশি ভোক্তাদের নাগালের বাইরে যেমন চলে যাবে, তেমনি বেশি দামের কারণে প্রতিযোগিতামূলক বিদেশি বাজারে টিকে থাকা মুশকিল হয়ে পড়বে। পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষায়ণ ঘটালে সেখানে কৃষি সহায়ক শিল্পের উন্নয়নও ঘটবে। পূর্ব বাংলায় শিল্পায়ন ঘটালে দেশের উন্নয়ন লগ্নি (Development Investment) দুই অঞ্চলের মধ্যে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়বে। কারণ সরকারি ব্যয়, কৃষি উন্নয়ন ও বিদেশি মিশনের খরচ পশ্চিম পাকিস্তানে আর শিল্পায়নের খরচ পূর্ব বাংলায় হলে লগ্নি ও সম্পদ এক অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হবে না। এটি ছিল ১৯৫৩ সালে দেয়া কলিন ক্লার্কের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সুপারিশের মূল বিষয়বস্তু। কলিন ক্লার্কের সেদিনের সেই সুপারিশ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাস্তবায়ন তো করেইনি, বরং পরবর্তীতে তার উল্টোটাই করেছে। তারা পশ্চিম পাকিস্তানে 'অখণ্ড মনোযোগে' শিল্পায়ন করেছে। বিপরীতক্রমে পূর্ব বাংলায় শিল্পায়নের পরিবর্তে কৃষিতেও যথাযথ মনোযোগ দেয়নি। '... কৃষায়ণে অবহেলা করার দরুনই পূর্ব পাকিস্তান অবহেলিত হউক, আর পূর্ব পাকিস্তানকে অবহেলা করার দরুনই হউক, ফল দাঁড়াইল এই যে, ১৯৪৯-৫০ সালে যেখানে জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান ছিল শতকরা ষাট টাকা, ১৯৬৫-৬৬ সালে সেখানে দাঁড়াইল শতকরা ছেচল্লিশ টাকা।' (আবুল মনসুর ১৯৯৯ : ১২৭)

কলিন ক্লার্কের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাদ দেয়ার মূল কারণ ছিল বোধ করি পশ্চিম পাকিস্তানের একক অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটানো। রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা থেকে পূর্ব বাংলাকে বাদ দিতে গিয়ে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার শুধু কলিন ক্লার্কের সুপারিশই বাতিল করেনি, রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনো বড় পদে কখনো পূর্ব বাংলার কাউকে স্থান দেয়নি। ক্লার্কের সুপারিশ না মানা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার উচ্চপদে পূর্ব বাংলার কাউকে স্থান না দেয়া সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদ যথার্থ বলেছেন–

Dhaka University Institutional Repository

> তাঁরা জাতীয় অর্থনীতিকে আঞ্চলিক রাজনীতি করিয়াছিলেন। পলিটিক্যাল ইকনমিকে তাঁরা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি না করিয়া রাজনীতিক অর্থনীতি করিয়াছিলেন। অধ্যাপক ক্লার্কের সুপারিশ মানিতে হইলে পি,আই,ডি,সি, হেড অফিস করাচী হইতে ঢাকায় আনিতে হইত। অতএব কর্মচারীকে হয় দেশ ছাড়িয়া 'বাংলা মুল্লুকে' আসিতে হইত অথবা পদত্যাগ করিতে হইত। যে মনোভাব হইতে তেইশ বছরের জীবনেও পাকিস্তান একজন পূর্ব পাকিস্তানীকে অর্থমন্ত্রী পাইল না, যে মনোভাবের দরুন প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান ডেপুটি চেয়ারম্যান একজন পূর্ব পাকিস্তানী হইতে পারে নাই, যে মনোভাবের হইতে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আমলের প্রাদেশিক প্ল্যানিং বোর্ড প্রথম সুযোগেই ভাংগিয়া দেওয়া হইয়াছিল, ... ১৯৫৩ সালে কলিন ক্লার্কের সুপারিশ সেক্রেটারিয়েটের কবুতরের খোপে ভরিয়াছিল সেই মনোভাবে। (আবুল মনসুর ১৯৯৯ : ১২৪)

এভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় পদের বাইরে থাকায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ব বাংলা অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার হয়েছে। ঠিক যেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেও উপনিবেশিত ভারতে পূর্ব বাংলার অবস্থা ও অবস্থান যেমন ছিল, তারই পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকল। ফলে যে-অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা নিয়ে পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমান পাকিস্তান আন্দোলন করেছিল, তা অধরাই রয়ে গেল–

> পূর্ব-বাংলা ১৯৪৭-৫২ কালপর্বে কারো কাছ থেকেই কোন রকম সহযোগিতা পায়নি, বরং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে সে পায় বিমাতাসুলভ আচরণ। কেন্দ্রীয় সরকার সে সময় পূর্ব-বাংলাকে কোনো রকম সাহায্য তো করেই নি বরং পূর্ব-বাংলার অর্জিত টাকা পয়সা পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে সেখানকার উন্নয়ন-কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করেছে। (আতিউর ও লেনিন ২০০০ : ১২০)

রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদে বাঙালির অনুপস্থিতি

পূর্ব বাংলা বরাবরই শিক্ষায় ছিল পশ্চাৎপদ। এর অন্যতম কারণ ছিল এখানকার বাঙালি মুসলমানের অর্থনৈতিক অবস্থা। তবে বিশের দশকে এসে পাটের দাম ও ফলনের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে এখানে গড়ে উঠতে থাকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। কিন্তু এই মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ পূর্ব বাংলায় হয়েছে ধীর গতিতে। ফলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতার কাছাকাছি সরকারি পদে তাদের অবস্থান ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় তথা অবাঙালিদের তুলনায় কম। পশ্চিম পাকিস্তানের এদিক থেকে এগিয়ে থাকার কারণ সেখানে শিল্পায়নের আধিক্য আর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ও আগত অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল শ্রেণির ঘনত্ব।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ৯৫ জন মুসলমান সিভিল সার্ভিস অফিসার পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেয়। এদের নিয়েই পাকিস্তানের জন প্রশাসন গঠিত হয় এবং যাত্রা শুরু করে। এই কর্মকর্তাদের এক তৃতীয়াংশ ছিলেন পাঞ্জাবি। বাকিরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, বিশেষত যুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজ থেকে অপশান দিয়ে পাকিস্তানে এসেছিল। তারা বসবাসের এবং চাকরির জন্য অপশন দিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান। এসব সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল, তারা প্রায় সবাই ছিল অবাঙালি এবং নব্য পরিচয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি। অপশন দিয়ে আসা এবং আগে থেকেই থাকা মিলিয়ে মোট ৯৫ জন সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তার মধ্যে মাত্র একজন ছিল বাঙালি। পশ্চিম পাকিস্তানি এসব অবাঙালি কর্মকর্তাদের প্রায় অর্ধেক ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে আসীন ছিল। এছাড়া ১৯৪৭ সালের পর প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের ১৫ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দিয়ে কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এদের মধ্যে বাঙালি ছিল মাত্র ৪ জন। পাকিস্তান সৃষ্টির আট বছরের মাথায় অর্থাৎ ১৯৫৫ সাল নাগাদ কেন্দ্রীয়

Dhaka University Institutional Repository

বেসামরিক প্রশাসনে ১৯ জন সচিবের মধ্যে একজনও বাঙালি ছিল না। শুধু বড় পদে নয়, নিচের পদগুলোতেও বাঙালি কর্মকর্তার সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে কম ছিল। ১৯৫৫ সাল নাগাদ প্রশাসনে ৩৮ জন যুগ্মসচিব, ১২৩ জন উপসচিব, ৫১০ জন সহকারী সচিবের মধ্যে বাঙালি যথাক্রমে ৩ জন (৭.৩%), ১০ জন (৭.৫%) এবং ৩৮ জন (৭%)। একথা সত্য যে, পূর্ব বাংলায় এসময়ে উচ্চশিক্ষিতের হার ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় কম। এর একটি কারণ দেশ বিভাগকালীন পূর্ব বাংলায় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল একটি আর পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল দুটি। যদিও ১৯৬০ এর দশকের শেষ পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় বিশ্ববিদ্যালয় বেড়ে হয়েছে চার। কিন্তু অপর দিকে পশ্চিম পাকিস্তানে তা থেমে থাকেনি। সেখানে এর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছয়। 'বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির হার পশ্চিম পাকিস্তানের ২৮৬০% এর বিপরীতে পূর্ব পাকিস্তানে ৫৪৫.১২%। ১৯৬৮-৬৯ সাল নাগাদ পশ্চিম পাকিস্তানে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রসংখ্যা যেখানে ছিল ১৮৭০৮, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানে এই সংখ্যা ৮৮৩১।' (মোরশেদ ২০১৪ : ১২৩) সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে পূর্ব বাংলার উচ্চ শিক্ষিতের হার বরাবরই কম। এদিক থেকে মনে হতে পারে পূর্ব বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে যেহেতু সিভিল সার্ভিসে চাকুরির উপযোগী শিক্ষিত বের হওয়ার সংখ্যা কম সেখান থেকে অফিসারও কম হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মূল বিষয়টি তা নয়। সমস্যা হচ্ছে নিয়োগ প্রক্রিয়াটিই ছিল অতিরিক্ত সীমিত এবং সীমাবদ্ধ। একারণে দেখা যায় পূর্ব বাংলায় সাতচল্লিশ পরবর্তী সময়ে যে-হারে উচ্চশিক্ষিতের হার বেড়েছে, সেই হারে নিয়োগ প্রাপ্তির হার বাড়েনি–

> one limitation of the bureaucracy as an "integrative" force during the Ayub period was its narrowly oligarchic nature. Recruitment to the CSP was extremely limited and selective. In 1963 in East Pakistan of 3905 students receiving a B.A. degree in liberal arts (the vast majority of whom undoubtedly wished to enter the CSP) only 503 were admitted to the qualifying examination, 127 qualified, and 13 were taken into the CSP. During the period 1957-67, college enrollment in East Pakistan increased by 162 percent, whereas the Bengali percentage in the CSP increased by only 10 percent. The civil service could thus accommodate only a fraction of the Bengali vernacular elite, and hence could hardly be regarded as an adequate substitute for an "integrative" political insisuation like a political party, where recruitment is broader, more rapid, and less selective. (Rounaq 2015 : 106-107)

একারণে দেখা যায়, বাঙালি মুসলমান চাকরি-বাকরির দিক থেকে ব্রিটিশ আমলের চেয়ে তুলনামূলক বেশি সুযোগ সুবিধা পেলেও, বঞ্চনা ও বৈষম্য থেকে মুক্তি পায়নি। ফলে কাঙ্ক্ষিত পাকিস্তান পেলেও রাষ্ট্রের ক্ষমতা-কাঠামোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদে ন্যায্য পরিমাণে না যেতে পারায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও ন্যায্য বাটোয়ারা থেকে দারুণভাবে বঞ্চিত হয়েছে। এই বঞ্চনা দিন দিন যত স্পষ্ট হয়েছে ততো পূর্ব বাংলায় জাতীয়তাবাদী রাজনীতি এবং আন্দোলন-সংগ্রাম দানাদার হয়ে উঠেছে।

বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈষম্য

বৈদেশিক ঋণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্য ছিল আকাশ-পাতাল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৩-৫৪ অর্থবছর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশ থেকে পাকিস্তান যে

Dhaka University Institutional Repository

ঋণ পায়, তার প্রায় ৯৯% পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়েছে। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত অর্থের মোট ৩ কোটি ৯৫ লাখ ৫৪ হাজার ডলার মূল্যের প্রকল্প-সাহায্য বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যয় করা হয়। এই অর্থের দ্বারা মোট ২৯টি প্রকল্পের কাজ করা হয়। এর মধ্যে মাত্র দুটি প্রকল্প বরাদ্দ ছিল পূর্ব বাংলার জন্য। বাকি ২৭টি প্রকল্প বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। এ-সময়ে অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত ৫৭ কোটি ৫৩ হাজার অস্ট্রেলিয়ান পাউন্ডের অর্থ-সাহায্যের বিপরীতে ১১টি প্রকল্পের মাত্র একটি প্রকল্প– পাওয়ার পাম্প ইরিগেশন প্রজেক্ট– পূর্ব বাংলায় বরাদ্দ দেয়া হয়। এই একটি প্রকল্পের জন্য অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৯০ হাজার অস্ট্রেলিয়ান পাউন্ড। অথচ ওই একই সাহায্যের বাকি অর্থ ব্যয় করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রাপ্ত অর্থের মাত্র ১.৪ ও ১.৫৬ ভাগ ব্যয়িত হয় পূর্ব বাংলায়। একইভাবে কানাডা ও নিউজিল্যান্ড থেকে আগত অর্থের পুরোটাই খরচ করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। বৈদেশিক সাহায্যের ব্যয় বরাদ্দের এই বেহাল বৈষম্যের মূল কারণ পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পায়ন আর শুরু থেকে সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে পূর্ব বাংলাকে গুরুত্ব না দেয়া।

রাজস্ব আয়-ব্যয়ে বৈষম্য

উত্তরাধিকারসূত্রে এবং ভারত থেকে আগতসূত্রে পশ্চিম পাকিস্তান অর্থনৈতিক শ্রেণির দিক থেকে পূর্ব বাংলার তুলনায় এগিয়ে ছিল। তাছাড়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের অতিরিক্ত মনোযোগ এ-অঞ্চলের উন্নয়নের গতিকে আরো বেগবান করেছে। সে তুলনায় পূর্ব বাংলার তেমন কোনো অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার শ্রেণি ও আগত শ্রেণি ছিল না। ফলে এখানকার অর্থনৈতিক উন্নতি পশ্চিম পাকিস্তানের মতো হয়নি। সঙ্গত কারণেই পূর্ব বাংলা থেকে সরকারের রাজস্ব আয় বরাবরই কম হয়েছে। তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তান ছিল এগিয়ে। তাছাড়া উন্নয়ন পদক্ষেপের কম-বেশির কারণেও পাকিস্তানের দুই অংশের রাজস্ব খাতের আয়ের তারতম্য ঘটেছে। ১৯৫০-৫১ সাল নাগাদ পাকিস্তানে রাজস্ব সংগ্রহ হতো এমন খাত ছিল ১৩টি। এরমধ্যে অন্তত ৬টি খাতই পূর্ব বাংলায় অনুপস্থিত ছিল। বাকি ৭টি খাতের মাত্র ৩টি খাত থেকে সরকার পূর্ব বাংলায় রাজস্ব আদায় করতে পারত। এমন কি 'Irrigation, Navigation, Embankment and Drainge work' এবং 'Civil work'-এর মতো দুটি খাতও পূর্ব বাংলায় ছিল না।' (আতিউর ও লেনিন ২০০০ : ১২৪) এই রাজস্ব খাতের অনুপস্থিতি পূর্ব বাংলার কেবল অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাই প্রমাণ করে না, পাশাপাশি এটি এ-অঞ্চলে উন্নয়ন পদক্ষেপ ও তৎপরতার অভাবকেও প্রকটিত করে।

পূর্ব বাংলা থেকে রাজস্ব কম আদায় হতো। কিন্তু এই রাজস্বের অধিকাংশই ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তানের পেছনে। ১৯৪৮-৪৯ সালে পূর্ব বাংলা থেকে রাজস্ব ও কর বাবদ সংগ্রহ করা হয় ১৬ কোটি ২৩ লাখ রুপি। অথচ এই অর্থের ২০ ভাগেরও কম হিসাবে মাত্র ৩ কোটি ১৯ লাখ রুপি ব্যয় করা হয়েছে পূর্ব বাংলার উন্নয়নে। অন্যদিকে একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সংগৃহীত ৪৪ কোটি ৭৩ লাখ রুপির বিপরীতে সেখানে ব্যয় করা হয়েছে ৭৯ কোটি ৫১ লাখ রুপি। অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের পেছনে তার নিজস্ব সংগৃহীত যাবতীয় রাজস্ব তো ব্যয় করা হয়েছেই, তার সঙ্গে পূর্ব বাংলার সংগ্রহ ছাড়াও আরো অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৯৪৯-৫০, ১৯৫০-৫১ অর্থ বছরেও রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রায়

Dhaka University Institutional Repository

একই রকম ছিল। অর্থাৎ পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আকাশ-পাতাল বৈষম্য অব্যাহত থেকেছে। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলা থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করা হয়েছে মোট ৯৬ কোটি ৮৮ লাখ রুপি। এই অর্থ থেকে পূর্ব বাংলার উন্নয়নে ব্যয় হয়েছে মাত্র ৫ কোটি ২১ লাখ রুপি; মোট রাজস্ব আয়ের মাত্র ৫ ভাগের কিছু বেশি।

আমদানি-রপ্তানিতে বৈষম্য

পূর্বেই আমরা দেখেছি যে, পূর্ব বাংলা শুরু থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের বড় রকমের উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে বাদ পড়েছে। তারা পাকিস্তান বলতে– অন্তত উন্নয়নের প্রশ্নে– বোঝাত পশ্চিম পাকিস্তানকে। অর্থনৈতিক বণ্টন ব্যবস্থা আর উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে তাই-ই স্পষ্ট হয়।

কিছু খাতে অর্থ উপার্জনের দিক থেকে পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানিদের কাছে ছিল সোনার ডিম দেয়া হাঁস। যেমন, রপ্তানি আয়। শিল্পায়নে পূর্ব বাংলা পশ্চাৎপদ হলেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই পাট উৎপাদনে পূর্ব বাংলা ছিল বিশ্বখ্যাত। শুধু এই পাট এবং অন্যান্য কাঁচামাল রপ্তানি করে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সময় পর্বে সমগ্র পাকিস্তানের মোট রপ্তানি আয়ের ৫৬ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে পূর্ব বাংলা। ১৯৪৮-৪৯ সালে পাকিস্তানের মোট রপ্তানি আয় ছিল ২১৫ কোটি ৪৪ লাখ রুপি। এর মধ্যে ১৪৭ কোটি ৪৭ লাখ রুপিই অর্জন করে পূর্ব বাংলা। এভাবে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত পাকিস্তান রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে যে ৮৪৫ কোটি ২ লাখ রুপি অর্জন করে, তার মধ্যে ৪৬৪ কোটি ২৫ লাখ রুপিই অর্জিত হয় পূর্ব বাংলা থেকে। রপ্তানি বাণিজ্যে পূর্ব বাংলার এই যুগান্তকারী অবদান থাকা সত্ত্বেও উক্ত সময়ে পূর্ব বাংলার জন্য সরকারিভাবে তেমন কিছুই আমদানি করা হয়নি। এ-সময়ে সরকারিভাবে পূর্ব বাংলায় মাত্র ১৬ কোটি ১১ লাখ রুপি মূল্যের পণ্য আমদানি করা হয়। অথচ একই সময় পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারিভাবে আমদানি করা হয় পূর্ব বাংলার প্রায় ৫ গুণেরও বেশি। আবার যেহেতু পূর্ব বাংলায় শিল্পায়নের তেমন কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি– যা-ও দুএকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান ছিল তা-ও ছিল অবাঙালিদের হাতে– সেহেতু এখানে বেসরকারি আমদানির পরিমাণও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় উদ্বেগজনকভাবে কম। পূর্বোল্লেখিত সময়ে পাকিস্তানের মোট বেসরকারি খাতে আমদানির শতকরা ৭১.৪৬ ভাগই হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত পূর্ব বাংলা যে ৪৬৪ কোটি ২৫ লাখ রুপি অর্জন করেছিল, তার মধ্যে ১৭৭ কোটি ৫২ লাখ রুপি মূল্যের আমদানি পণ্য প্রধানত ভোগ্যপণ্য হিসেবে পূর্ব বাংলায় ফিরে আসে। বাকি ২৮৬ কোটি ৭৩ লাখ রুপি পূর্ব বাংলায় কোনোভাবেই ফিরে আসেনি। পূর্ব বাংলার রপ্তানি বাণিজ্যের অর্জিত অতিরিক্ত 'এই অর্থ আসলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ও অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা পশ্চিম-পাকিস্তানভিত্তিক শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের কাজে লাগিয়েছিল। ... শক্তিশালী কেন্দ্র গড়ে তোলার নাম করে এই অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল করাচী নগর উন্নয়ন ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন সূত্রে সামরিক কেন্দ্র গঠনের কাজে।' (আতিউর ও লেনিন ২০০০ : ১২৩)

শিক্ষাখাতে বরাদ্দে বৈষম্য

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে 'শিক্ষাসম্পদের দিক পূর্ব-পাকিস্তান পশ্চিম-পাকিস্তানের চাইতে নিকৃষ্ট ছিল না। শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের স্তর এখানে উৎকৃষ্টতর ছিল, যদিও পশ্চাৎপদতার মাত্রায় তেমন ইতরবিশেষ ছিল না।' (রেহমান ২০০৭ : ১২) প্রায় একই রকম শিক্ষা পরিস্থিতি নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও শিক্ষায় বরাদ্দের বৈষম্যের কারণে পূর্ব বাংলায় শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের মতো উন্নয়ন হয়নি। ১৯৪৭-৪৮ সালে অর্থাৎ দেশবিভাগের সময় পূর্ব বাংলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৯ হাজার ৬৬৩। একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে ওই সংখ্যা ছিল ২৮ হাজার ৪১৩। কিন্তু ১৯৬৮-৬৯ সাল নাগাদ পূর্ব বাংলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা না বেড়ে বরং কমে হয়েছে ২৮ হাজার ৩০৮। বিপরীতক্রমে পশ্চিম পাকিস্তানে একই সময়ে অর্থাৎ ১৯৬৮-৬৯ সাল নাগাদ এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৯ হাজার ৪১৮-তে। একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে মাধ্যমিক, কলেজ, মেডিকেল-ইঞ্জিনিয়ারিং-কৃষি কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১৭৬%, ৬৭৫% ও ৪২৫%। আর পূর্ব বাংলায় এই হার ছিল যথাক্রমে ১১.৪%, ৩২০%, ও ৩০০%। ১৯৪৮-৫৫ পর্যন্ত শিক্ষাখাতে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ হয়েছে মোট ১৫৩০ কোটি টাকা আর পূর্ব বাংলার জন্য বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ২৪০ কোটি টাকা। বরাদ্দের হার নির্ধারণ করলে দেখা যায় পূর্ব বাংলায় মোট বরাদ্দের হার ছিল ১৩.৫%।

জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য

পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যকে এক কথায় ন্যায্য মনোযোগহীনতা, সদিচ্ছার অভাব আর গুরুত্বহীনতা দিয়ে সহজেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কেন্দ্রীয় শাসন-ক্ষমতায় মূলত পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রায় একাধিপত্য পাকিস্তান রাষ্ট্রটিকে প্রায় শুরু থেকেই তাদের নিজেদের রাষ্ট্র বলে মনে করার এক মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতি তৈরি করেছে। ফলে পূর্ব বাংলা মূলত অপরায়নের (othering) শিকার হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানিদের এই 'নিজ' (self) এবং 'অপর' (other)-এর মানসিকতার কারণে রাষ্ট্রের যাবতীয় বাস্তবতা থেকে পূর্ব বাংলার জনগণ ক্রমে রাষ্ট্রীয় অংশগ্রহণমূলকতা থেকে বাদ পড়েছে। পূর্ব বাংলার জনগণের কাছে এই বাদ পড়ার বিষয়টি যত স্পষ্ট হয়েছে, ততোই এখানে বঞ্চনার অনুভূতিজাত জাতীয়তাবাদী চেতনা ও আন্দোলন-সংগ্রাম মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বঞ্চনার অনুভূতি তথা জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত হওয়ার দৃশ্যমান সহজ অনুঘটক ছিল নানা ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বৈষম্য।

অর্থনৈতিক বৈষম্যকে নানা দিক থেকে দেখানো সম্ভব। এর তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি করাও সম্ভব। পাকিস্তান আমলে বিশেষত ষাটের দশকে সেই চর্চাও হয়েছে। কিন্তু জনগণ অর্থনৈতিক বঞ্চনা আর বৈষম্যের শিকার হলে তা আর তাত্ত্বিক প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। জনগণ তার জীবনযাত্রাকে তুল্য জনগণের জীবনযাত্রার সঙ্গে তুলনা করলেই তার সঙ্গে চলমান বৈষম্যকে সহজে বুঝতে পারে। পাকিস্তান আমলে এই বাস্তবতা পূর্ব বাংলার মানুষ সহজেই বুঝতে পেরে এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে।

পূর্ব বাংলা আর পশ্চিম পাকিস্তানের জীবনযাত্রার মান লক্ষ করলে সহজেই বোঝা যায়, এ দুটি প্রদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য কত প্রবল। আসলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যেখানে যত বেশি পরিমাণে ক্রিয়াশীল, সেখানকার মানুষ ততো বেশি পরিমাণে সেই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়। ফলে সেখানকার জনগণের জীবনযাত্রার মানও টাকার গতিশীলতার সূত্র ধরেই উন্নত হয়। শুধু তাই নয়, বহুমুখী অর্থনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকাণ্ড অনিবার্যভাবে জীবনযাত্রার মান-সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ের উন্নয়নকে আবশ্যিক করে তোলে। যেমন, শিল্পায়ন আবশ্যিকভাবে যোগাযোগ-সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো, চিকিৎসা, বিদ্যুতায়ন, নিরাপত্তা ইত্যাদির উন্নয়নকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। আর এগুলোর উন্নতি হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান স্বাভাবিকভাবেই উন্নত হয়ে যায়। যেহেতু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দেশটির কেন্দ্রীয় সরকার মূলত পশ্চিম পাকিস্তানকেন্দ্রিক বহুমুখি উন্নয়ন করেছে পূর্ব বাংলা থেকেছে তুলনামূলক অবহেলিত, সেহেতু সেখানকার জনগণের জীবনযাত্রার মান পূর্ব বাংলার চেয়ে বেশি উন্নত হয়েছে। মাথাপিছু আয়ের হিসাবের দিকে তাকালে দেখা যায়, পাকিস্তান রাষ্ট্রের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের দুই অংশের মানুষের মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য দিন দিন যেন পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। '১৯৫০-এর দশকে বৈষম্যের বৃদ্ধি ঘটে ৫০ শতাংশ এবং ১৯৬০-এর দশকে তা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। ১৯৫৯-৬০ সালে বৈষম্য ছিল ৩২.৫ শতাংশ, ১৯৬৯-৭০ সালে এটা দাঁড়ায় ৬১ শতাংশ।' (রেহমান ২০০৭ : ১০) মাথাপিছু আয়ে বৈষম্য থাকলে স্বভাবতই বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য, সেবা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রেও দেখা দেবে বৈষম্য। কৃষিজাত ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে– পরিশোধিত ও অপরিশোধিত চিনি বাদে; কারণ এক্ষেত্রে বৈষম্য দিনদিন বেড়েছে– বৈষম্য তেমন তাৎপর্যপূর্ণ না হলেও কারখানাজাত দ্রব্যাদি ভোগের দিক থেকে বৈষম্য ছিল লক্ষণীয় মাত্রায়। কাপড়, কাগজ, সিগারেট, দিয়াশলাই ও বিদ্যুৎশক্তির মাথাপিছু ব্যবহারের মাত্রা পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বেশি। 'এতে পশ্চিম-পাকিস্তানে উচ্চতর হারে মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি তথা শিল্পায়নের দ্রুততর গতি প্রতিফলিত হয়। এ বৈষম্য বছর বছর বেড়ে চলে। ... ভোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য বৃদ্ধি পায় ১৯৬০ ও ১৯৬৬ সালের মধ্যে।' (রেহমান ২০০৭ : ১০)

ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের মতো একই ধরনের বৈষম্য লক্ষ করা যায় জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানাদির সুযোগ লাভের ক্ষেত্রেও। পশ্চিম পাকিস্তানের জনস্বাস্থ্যসেবামূলক প্রতিষ্ঠান পূর্ব বাংলার চেয়ে অনেক ভালো ছিল। হাসপাতাল, মাতৃসদন, শিশুকল্যাণকেন্দ্র, হাসপাতালের বেডসংখ্যা, ডিসপেনসারির সংখ্যা, ডাক্তার, নার্স ইত্যাদির সুযোগ-সুবিধা জনসংখ্যার অনুপাতে পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল পূর্ব বাংলার তুলনায় অনেক বেশি। ভোগ্যপণ্যের বৈষম্যের মতোই রাস্তাঘাটের সুযোগ-সুবিধা পশ্চিম পাকিস্তানে যে-হারে বৃদ্ধি পেয়েছে পূর্ব বাংলায় সে-হারে বৃদ্ধি পায়নি। ১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৬৬-৬৭ সালের মধ্যে পূর্ব বাংলায় রাস্তাঘাট বৃদ্ধি পায় ১০ গুণ। কিন্তু একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে রাস্তা ২০ হাজার মাইল বেশি ছিল পূর্ব বাংলার তুলনায়। পূর্ব বাংলায় রাস্তাঘাট কম থাকার একটা কারণ অবশ্য এর অতিমাত্রায় জলাবদ্ধতা। কিন্তু বৈষম্য ধরা পড়ে পাকিস্তানের উভয় অংশে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারের মনোযোগ ও বরাদ্দে। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে রাস্তা যে-পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই তুলনায় পূর্ব বাংলায় নদীপথের অনুরূপ সম্প্রসারণ ঘটেনি।

জীবনযাত্রার মানের এই বৈষম্য পাকিস্তান রাষ্ট্রের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার বাঙালিদের কাছে স্পষ্ট হতে থাকে। এটি তাদের মধ্যে বঞ্চনার বোধকে ঘনীভূত করে তোলে–

> বাঙালিদের বিশ্বাস জন্মে যে, পশ্চিম-পাকিস্তানিরা ভালো খায়, ভালো পরে, উন্নততর স্বাস্থ্যপরিচর্যা ও শিক্ষা লাভ করে, উন্নততর যানবাহন, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাসহ অধিকতর উন্নত পরিবেশে বাস করে। এ

Dhaka University Institutional Repository

> বিশ্বাস তাদের আপেক্ষিক বঞ্চনার ধরণাকে তীব্র করে। এমনি করে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানসমূহ অধিকাংশ বাঙালির এ বিশ্বাসকেই শুধু বদ্ধমূল করে যে, স্বাধীনতার সুযোগগুলো পশ্চিম-পাকিস্তানের লোকেরাই অনেক বেশি পরিমাণে ভোগ করছে। (রেহমান ২০০৭ : ১১)

খ. রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত : পাকিস্তান পর্ব

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বেকার বাংলার রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে মূলত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা, আবেগ-উদ্দীপনা আর কেন্দ্রীয় মুসলিম লিগের ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বারা। তখন রাজনীতির সবচেয়ে বড় লক্ষ ছিল পাকিস্তান হাসিল। এই বৃহত্তর প্রশ্নে ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবের পর মুসলিম অধ্যুষিত প্রস্তাবিত পাকিস্তান অঞ্চলে বড় কোনো দ্বিমত বা বহুমত দেখা দেয়নি। তখন ছিল এমনই ঘোরতর উন্মাতাল সময় যে, স্থানীয় রাজনৈতিক কোন্দল, ভালো-মন্দ, পাওয়া-না-পাওয়া এসবের কোনটাই মুখ্য হয়ে ওঠেনি। রাজনৈতিক সব পক্ষই এক ধরনের উৎসর্গ আর সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। 'দেশবিভাগের পূর্বে শুধু পাকিস্তান অর্জনের ওপর গুরুত্ব দেওয়ায় অন্যান্য প্রশ্ন চাপা পড়ে গিয়েছিল। পাকিস্তান কায়েম হলে সেসব প্রশ্ন মাথা চাড়া দেয়' (সাঈদ-উর ২০০১ : ১৩) এবার আবার প্রয়োজন পড়ে নতুন ধরনের সমন্বয় এবং উৎসর্গের মানসিকতার; পুরনো প্রশ্নগুলোর মীমাংসার; নিদেন পক্ষে পুরনো প্রশ্নগুলোকে আমলে নেওয়ার। কারণ পাকিস্তান অর্জনের রাজনৈতিক অভিযাত্রার মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমানসহ সমগ্র ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেছে। বিশেষত রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত বাঙালি মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে যে-সংগ্রামী চেতনা, অধিকার সচেতনতা, দাবি আদায়ের মানসিকতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, জাতীয়তাবোধ ইত্যাদি পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাগ্রত হয়েছে, তা এই শ্রেণিকে যেমন আত্মবিশ্বাসী করেছে, তেমনি পাকিস্তান-পরবর্তী রাজনীতিকে জটিল করে তুলেছে। প্রসঙ্গত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বকালীন রাজনীতির কয়েকটি উপসর্গ– যা এই অভিসন্দর্ভের প্রাক্-পাকিস্তান পর্বের রাজনীতি বিষয়ক আলোচনার অংশে আলোচিত হয়েছে– উল্লেখ করা যেতে পারে। পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব বাংলার সম্পর্কের ধরন, মুসলিম লিগকে অভিজাততন্ত্রের কবল থেকে মুক্ত করা, মুসলিম লিগে মার্কসবাদী চেতনার ধারা, অবিভক্ত বাংলার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর বিভক্ত বাংলার পারস্পরিক সম্পর্ক, মুসলিম লিগের সাম্প্রদায়িক চেতনাধারী ও ধর্মনিরপেক্ষ চেতনাধারীদের অবস্থান ইত্যাদি বিষয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নতুন করে সামনে চলে আসে। এর সঙ্গে দেখা দেয় সাংস্কৃতিক নানা নতুন প্রবণতা। পাকিস্তানবাদী সাহিত্য-সংস্কৃতির বিপরীতে উদার প্রগতিবাদী ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা পাকিস্তান আন্দোলন উপজাত 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' ও 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ'-এর মুসলমানী সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চাকে এক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় রাষ্ট্রভাষার বিতর্ক। এভাবে পাকিস্তান পূর্ববর্তী নানা রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক চেতনার পুনরাবির্ভাব এবং পাকিস্তান পরবর্তী নতুন নতুন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক চেতনার আবির্ভাব– এ দুয়ের সংঘর্ষ মিলনের মধ্য দিয়ে ৪৭-পরবর্তী বাংলার রাজনীতি এক অভূতপূর্ব রূপপ্রাপ্ত হয়। ১৯৪৭-পূর্ববর্তী রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহের কথা স্মরণে রেখে ১৯৪৭-উত্তর রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ঘটনা প্রবাহকে আমরা দেখতে চাই, যা ষাটের দশকের বাংলাদেশের কবিতার জাতীয়তাবাদী চেতনা রূপায়ণের প্লাটফর্ম বা ভিত্তিভূমি তৈরি করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

বুর্জোয়া নেতৃত্বকে দূরে সরিয়ে রাখা

পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন নানা চেতনার নেতৃবৃন্দ। এর মধ্যে সাম্প্রদায়িক ও সামন্ত চেতনার একটা শ্রেণি যেমন ছিল, তেমনি ছিল প্রগতিশীল বুর্জোয়া চেতনার নেতৃত্ব। শুধু তাই নয়, সাম্যবাদী চেতনার নেতৃত্বও মুসলিম লিগের অভ্যন্তরে দুর্লভ ছিল না। বিশেষত, বাংলা অঞ্চলের মুসলিম লিগের নেতৃত্বের মধ্যে এই ত্রিবিধ চেতনাই ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু প্রবল পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের জোয়ারে এই ত্রিচেতনা খুব একটা প্রকাশ্য সাংঘর্ষিক পরিস্থিতির মধ্যে যায়নি। বরং মোটামুটিভাবে একস্বরে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আওয়াজ তুলেছিল। কিন্তু সমস্যা তৈরি হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর। পাকিস্তান আন্দোলনে বুর্জোয়া চেতনার অন্যতম নেতা ছিলেন হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি।

বাংলার মুসলিম লিগ নেতৃত্বের অগ্রভাগের এই নেতা অবিভক্ত বাংলার সর্বশেষ মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরিকল্পিতভাবে তাঁকে সরিয়ে রাখা হয়। তাঁর বদলে পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করা হয় সামন্ত ও সাম্প্রদায়িক চেতনার খাজা নাজিমুদ্দিনকে। অথচ প্রাপ্যটা সোহরাওয়ার্দিরই ছিল। কারণ নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় সীমানা ভাগাভাগিতে বাংলা এবং পাঞ্জাব দুই অঞ্চলই ভাগ হয়েছিল। দুই প্রদেশরই কিছু অংশ হিন্দুস্তান এবং কিছু অংশ পাকিস্তানে বিভক্ত হয়। পাঞ্জাবের পূর্বতন প্রধানমন্ত্রীই নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হলেও বাংলার ক্ষেত্রে তা হলো না। হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দিকে তথা বুর্জোয়া রাজনীতিকে নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের বাংলা অঞ্চল থেকে নির্বাসিত করার ক্ষেত্রে জিন্নাহ এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান (১৮৯৬-১৯৫১) ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সোহরাওয়ার্দির বদলে বাধ্য অনুগত 'ভাল মানুষ' খাজা নাজিমুদ্দিনকেই বেশি সমর্থন করবেন তা সোহরাওয়ার্দির অজানা ছিল না। কিন্তু কায়েদে আযমও এ ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব করবেন, এটা সোহরাওয়ার্দি কিছুতেই বিশ্বাস করতেন না। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল জিন্নাহও সোহরাওয়ার্দির হক প্রাপ্য সমর্থনটুকু তাঁকে দেননি। (আবুল মনসুর ২০০১ : ১৬২-১৬৩/৩) পাকিস্তানের জন্মলগ্নেই এই রাজনৈতিক হঠকারিতা কেবল ব্যক্তি বিদ্বেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং নেতৃত্ব বেছে নেয়ার এই ঘটনাটি উত্তরকালে পাকিস্তানে, বিশেষত বাংলার রাজনীতির অভিমুখ ও গুণগত মান নির্ধারণে, অন্যতম নিয়ামক হয়ে উঠেছে। এ সম্পর্কে সমকালীন রাজনীতিবিদের মত–

> সুহরাওয়ার্দীকে বাদ দিয়া প্রধানমন্ত্রী পূর্ব বাংলায় যে 'তাবেদার জিহুযুর' প্রধানমন্ত্রী ও মুসলিম লীগ পার্টি খাড়া করিলেন, তাঁদের 'তাবেদারি' পূর্ব বাংলাকে এবং পাকিস্তানকে কোথায় নিয়াছে, আজকাল ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দিতেছে এবং ভবিষ্যতেও দিবে।' (আবুল মনসুর ২০০১ : ১৬৩/৩)

মূলধারার মুসলিম লিগের রাজনীতি খাজা নাজিমুদ্দিনকেন্দ্রিক হওয়ায়, এতে বহু মত এবং পথের প্রবেশের পথ সংকুচিত হয়ে যায়। ফলে ক্রমে বাংলার রাজনীতিতে নানা বিকল্প মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। এই নানা বিকল্পই পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের বাইরে গিয়ে বিকল্প– বাঙালি জাতীয়তাবাদ– জাতীয়তাবাদের স্বরকে স্পষ্ট করে তোলে।

কমুনিস্টদের নব-উত্থান

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব বাংলা বৃটিশ আমল থেকেই কমিউনিস্ট বা বিপ্লবী ঘরানার রাজনৈতিক তৎপরতার জন্য উর্বর ভূমি বলে পরিচিত। বৃটিশ বিরোধী তৎপরতার অংশ হিসেবে পূর্ব বাংলার চরমপন্থীদের চেতনা বরাবরই বিপ্লবের আদর্শে চালিত হয়েছে। চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুমিল্লা, বরিশাল, ময়মনসিংহ অঞ্চলের চরমপন্থীদের অসমসাহসিকতার কথা সর্ব ভারতে প্রচলিত ছিল। এমনকি পূর্ব বাংলার মেয়েদের মধ্যেও এই বিপ্লবী চেতনার সঞ্চার হয়েছিল। সুভাষ বোসের 'যুগান্তর', 'অনুশীলন', 'বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স' দল ঢাকায় যথেষ্ট ক্রিয়াশীল ছিল। (কামরুদ্দীন ২০০৪ : ৬০, ৬১, ৮৩; কামরুদ্দীন ১৩৭৬ : ২৬,২৭)

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় পাকিস্তান কমুনিস্ট পার্টির পূর্ব বাংলা শাখা গঠিত হয়। পূর্ব বাংলা শাখা গঠিত হওয়ার আগে অর্থাৎ দেশবিভাগের প্রাক্কালে কমুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে কংগ্রেস-লিগ সরকারকে সহযোগিতার কথা বলা হয়। কিন্তু ১৯৪৮ সালে অর্থাৎ পূর্ব বাংলা কমুনিস্ট পার্টি গঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দুই দেশের সরকারকে উৎখাত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। এরই অংশ হিসেবে পশ্চিম বাংলা থেকে মুজাফ্ফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩), মনসুর হাবিব (১৯১৭-১৯৯৬)-সহ কিছু কমুনিস্ট নেতা ঢাকায় আসেন এবং পার্টি অফিস খোলেন। (বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ২৪২, ২৪৩/১) মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১), রণেশ দাশগুপ্ত, সরদার ফজলুল করিম (১৯২৫-২০১৪), সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১) প্রমুখের প্রযোজনায় কমুনিস্ট পার্টির অফিস এবং কর্মকাণ্ড বেশ সরগরম হয়ে ওঠে। পূর্বোক্ত কিছু কর্মী ও নেতা প্রকাশ্যে কাজ চালিয়ে যান আর অধিকাংশই গোপন কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠার মাসেই অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসেই 'মুসলিম লিগের গুন্ডা' কমুনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক ও শহর অফিস আক্রমণ করে; গ্রেফতার হন একাধিক নেতাকর্মী। পরবর্তীতেও কমুনিস্ট পার্টির নানা কর্মকাণ্ডে বিভিন্নভাবে বাধা প্রদান করা হয়। কমুনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা না করলেও শুরুতে নানা উপায় ও নির্যাতনের মাধ্যমে পার্টির কাজকে বাধাগ্রস্ত করা হয়।[৬] (বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ২৪৪/১, জ্ঞান ২০১৬ : ১২০, অজয় ২০১৭ : ৪৭) ফলে কমুনিস্ট পার্টির বিশেষত মুসলিম অংশ অল্পকাল পরেই নবগঠিত আওয়ামী মুসলিম লিগে যোগদান করে, অনেকে বিভিন্ন কৃষক-শ্রমিক সংগঠনে যোগ দেয়। আবার যারা কমুনিস্ট চেতনার কিন্তু কমুনিস্ট পার্টির কর্মী ছিল না বা হয়নি, তারা পরবর্তীতে ভিন্ন নামে নতুন সংগঠন তৈরি করেছে। যেমন, 'পাকিস্তান যুবলীগ' এমনই একটি সংগঠন। শুধু 'পাকিস্তান যুবলীগ' নয়, কমুনিস্ট দলের প্রতি খাজা নাজিমুদ্দিন সরকারের বিরূপ ও নিবর্তনমূলক মনোভঙ্গির কারণে বামপন্থী চেতনার কর্মীরা ১৯৫১ সালে 'গণতন্ত্রী দল' নামেও একটি দল প্রতিষ্ঠা করে। তারও আগে মুসলিম লিগের সংকীর্ণ রাজনীতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শামসুল হক, মহম্মদ তোয়াহা (১৯২২-১৯৮৭), কামরুদ্দীন আহমদ, তাজউদ্দীন আহমদ (১৯২৫-১৯৭৫) ও অলি আহাদ (১৯২৮-২০১২) প্রমুখ সাম্যবাদী চেতনার নেতা-কর্মীরা মিলে গঠন করেছিলেন 'গণতান্ত্রিক যুবলীগ'। কিন্তু এর কোনোটিই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত সমর্পিত হয়েছে 'আওয়ামী মুসলিম লিগে'।

আওয়ামী মুসলিম লিগের জন্ম

Dhaka University Institutional Repository

অবিভক্ত ভারতরাষ্ট্রে ঐতিহাসিক কারণেই মুসলমানরা ছিল ‘অপর’। দীর্ঘ ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংগ্রাম, বিসর্জন, উত্থান আর পতনের মধ্য দিয়ে তারা লাভ করে নিজ বাসভূমি; ‘নিজ’ রাষ্ট্র পাকিস্তান। নবগঠিত এই ‘নিজ’ রাষ্ট্রে এবং রাজনৈতিক সংগঠনে সংগত কারণেই তারা প্রত্যাশা করেছে দিগন্তবিস্তারী পরিসর, স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র আর যথার্থ মূল্যায়ন। এই প্রত্যাশা বিশেষ করে সচেতনভাবে কাজ করেছে পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের মধ্যে। আদতে তাই হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। অগণিত মানুষের ত্যাগ আর আকাঙ্ক্ষার রঙে রাঙানো যে-পাকিস্তান রাষ্ট্র আর তার রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লিগ, তা সর্বতোভাবে গ্রহিষ্ণু ও গণতন্ত্রপ্রবণ হবে তা-ই স্বাভাবিক। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে রাষ্ট্র আর তার রাজনৈতিক সংগঠনটি হয়ে ওঠে অগ্রহিষ্ণু ও অগণতান্ত্রিক। বিশেষত পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লিগ সংগঠনটি সকলের আশ্রয় স্থল না হয়ে সরকার অনুসারী একটি বিশেষ শ্রেণির পকেট-সংগঠনে পরিণত হয়। অথচ এই সময়েই সংগঠনটির সবচেয়ে বেশি উদার আর গ্রহিষ্ণু হওয়ার কথা। বিচিত্র মত পথের মুসলিম লিগারদের বিচিত্র স্বরের ঐকতান ধ্বনিত হওয়ার কথা মুসলিম লিগের পার্টি অফিসে। কারণ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপর পূর্ব বাংলার স্থানীয় নেতাকর্মী ছাড়াও কলকাতায় পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী অসংখ্য সক্রিয় নেতাকর্মীরা ঢাকায় ফিরে আসে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, পূর্ব বাংলা মুসলিম লিগ এই অসংখ্য উদ্যমী, আশান্বিত, দেশগড়ার নেশায় আতুর নেতাকর্মীদের গ্রহণ করতে পারেনি।

১৫০ নম্বর মোগলটুলিতে ছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লিগের শাখা অফিস। মোগলটুলির অফিসকে কেন্দ্র করে মুসলিম লিগের যেসব কর্মী একত্র হতেন এবং তৎপর ছিলেন তাঁদের মধ্যে শামসুল হক, কামরুদ্দীন আহমদ, মহম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, শওকত আলী, তাজউদ্দীন আহমদ, আতাউর রহমান (১৯০৫-১৯৯১), শামসুজ্জোহা, মহম্মদ আলমাস, মহম্মদ আউয়ালের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা মূলত পূর্ব বাংলাকেন্দ্রিক মুসলিম লিগের রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। এর সঙ্গে যুক্ত হন কলকাতায় সক্রিয় মুসলিম লিগের তুখোড় কর্মী শেখ মুজিবুর রহমানসহ আরো কয়েকজন। আবুল হাশিম ও সোহরাওয়ার্দির আদর্শে প্রাণিত এসব তরুণ তুর্কি মুসলিম লিগকে নতুনভাবে সংগঠিত করে তার মধ্যে নিজেদের অবস্থান তৈরি করতে চেয়েছিলেন—

> মোগলটুলীর অফিসকে কেন্দ্র করে মুসলিম লিগের যে সমস্ত কর্মীরা একত্রিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে নানাপ্রকার রাজনৈতিক চিন্তা এলেও মুসলিম লিগ থেকে সরাসরি বিচ্ছিন্ন হওয়ার ইচ্ছা তাঁদের অধিকাংশেরই মধ্যেই ছিলো না। তারা প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম লিগকে নতুনভাবে সংগঠিত করে তার মধ্যেই নিজেদের শক্তিকে সংহত করতে চেয়েছিলেন। এজন্যেই শামসুল হক এবং শেখ মুজিবর [মুজিবুর] রহমান ওয়াকার্স ক্যাম্প নামে অভিহিত মুসলিম লিগ কর্মী সম্মেলন আহ্বান করে রশিদ বই দেওয়ার জন্যে আকরম খানের [তৎকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লিগের সভাপতি] উপর চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করেছিলেন। আকরম খান কিন্তু ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের কর্মীদেরকে লিগ বিরোধী রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দিয়ে তাদেরকে রশিদ বই দিতে অস্বীকার করেন। (বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ১৭৯/১)

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লিগের এটি দ্বিতীয় রাজনৈতিক সংকীর্ণতা। প্রথমটি ছিল, সোহরাওয়ার্দিকে ভালোভাবে গ্রহণ না করা[৭], আর দ্বিতীয়টি মুসলিম লিগের ত্যাগী, উদ্যমী, স্বপ্নস্পৃষ্ট সত্যিকার কর্মীদের গ্রহণ না করে বর্জনের পথে হাঁটা। আকরম খানের ‘মুসলিম লিগের সত্যিকার সম্পদ’ এই তরুণ কর্মীদের

Dhaka University Institutional Repository

'মুসলিম লিগের আওতার বাইরে' রাখার মূল কারণ ব্যক্তিগত। কারণ তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, এরাই এক সময় 'তাঁর নেতৃত্বের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে'। তিনি তাদেরই রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দিলেন, পাকিস্তান অর্জনের ক্ষেত্রে যাদের অবদান ও পরিশ্রম তাঁর থেকে কোনো অংশেই কম ছিল না। (বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ১৭৯/১) দুঃখজনক এবং বিস্ময়কর হচ্ছে আকরম খানের এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মকাণ্ড ছিল 'পূর্ব বাংলা মুসলিম লিগ পার্লামেন্টারি পার্টির দ্বারা পুরোপুরি সমর্থিত।' প্রাদেশিক মুসলিম লিগ ও সরকার তথা পার্লামেন্টারি পার্টির এই অগ্রহিষ্ণু, সংকীর্ণ, সামন্তবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মুসলিম লিগের সাংগঠনিক কাজকর্মের জন্য বলিষ্ঠ কর্মীর অভাব দেখা দেয়। ফলে সংগঠনটির সম্প্রসারণ এবং শক্তিবৃদ্ধি তো হয়-ই-নি উপরন্তু সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিই ধীরে ধীরে পার্লামেন্টারি পার্টির লেজুড়ে পরিণত হয়।

এরই মধ্যে ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে টাঙ্গাইল দক্ষিণ (মুসলিম) কেন্দ্রের পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচনে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬) মুসলিম লিগ সমর্থিত খুররম খান পন্নীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। কিন্তু খুররম খান পন্নীর আবেদনের ভিত্তিতে প্রাদেশিক গভর্নর নির্বাচন বাতিল করেন এবং ভাসানী ও পন্নীসহ চারজনকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত সমস্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করেন। এটি মুসলিম লিগের কর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণকে বিস্ময়ে হতবাক করেছে এবং পাকিস্তান অর্জনের সার্থকতাকে একটি বড় সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিল একই এলাকার পুনরায় উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুসলিম লিগ ও সরকারের কর্মকাণ্ডের মধ্যে। গভর্নরের বিশেষ ক্ষমতা বলে খুররম খানের নির্বাচন সংক্রান্ত পূর্ববর্তী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কিন্তু ভাসানীর নিষেধাজ্ঞা যথারীতি বলবৎ থাকে এবং খুররম খান প্রার্থী হন উপনির্বাচনে। 'নূরুল আমীন সরকারের এই চরম অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং নির্লজ্জ দলীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে সমগ্র প্রদেশে কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। মুসলিম লিগ নেতৃত্ব এবং প্রতিষ্ঠানটির সামগ্রিক চরিত্রও এই অদৃষ্টপূর্ব সরকারি সিদ্ধান্তের ফলে জনসাধারণের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়'। (বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ১৮১/১)

মুসলিম লিগের এবং সরকারের এই ইনসাফ বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের কারণে মূল মুসলিম লিগে স্থান না পাওয়া ত্যাগী কর্মীষ্ঠদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। এই ক্ষোভের অংশ হিসেবে তারা উপনির্বাচনে শামসুল হককে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ঘোষণা দেয়। নির্বাচনে খুররম খান পন্নীর পক্ষে প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন (১৮৯৩-১৯৭৪)-সহ অন্যান্য মন্ত্রী তৎপর ছিলেন। নির্বাচনী প্রচারণাকালে তারা যে 'আদর্শ' প্রচার করেন, তা পাকিস্তান রাষ্ট্রের কদর্য, অনভিপ্রেত, নীতিহীন, সাম্প্রদায়িক, অগণতান্ত্রিক এবং সামন্তবাদী চরিত্রকে প্রথমবারের মতো খোলাসা করে দেয়। তাদের ভাষ্য ˆ'wbK AvRv' পত্রিকায় ২০শে এপ্রিল ১৯৪৯ ছাপা হয়েছিল এরকম–

> লাখো মোজাহেদের ত্যাগ ও কোরবানীর ফলে আমরা পাকিস্তান লাভ করিয়াছি। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মোসলেম রাষ্ট্র আমাদের পাকিস্তান। পাকিস্তানের গঠনতন্ত্র আইন-কানুন তৈরী হইতেছে ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক। ... কত জানী দুষমন শৈশবেই ইহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। ... আপনি যদি মুছলিম রাষ্ট্রকে মজবুত দেখিতে চান দুনিয়ায় পাকিস্তানের ও মুছলিম জাতির ঝাণ্ডা চলন্ত হোক এ যদি আপনার কামনা হয় আপনি নিশ্চয়ই লিগ প্রার্থী খুররম খাঁ পন্নির জন্য মুছলিম লিগের সাইকেল মার্কা বাক্সে ভোট দিবেন। (উদ্ধৃত, বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ১৮২-১৮৩/১)

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য, ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার ছাড়া তাদের প্রচারণায় গণমুখী কোন বক্তব্য নেই। আরো লক্ষণীয় যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রকৃত সামন্তবাদী আর সাম্প্রদায়িক খাসলত এই প্রথম স্পষ্ট হলো টাঙ্গাইল উপনির্বাচনকে সামনে রেখে। পরবর্তী মুসলিম লিগ আর পাকিস্তান রাষ্ট্র এই একই পথে এগিয়েই ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে গেছে। অন্যদিকে স্বতন্ত্র প্রার্থী শামসুল হকের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেন তরুণ মুসলিম লিগ কর্মীরা, স্থানীয় স্কুল ও করটিয়া কলেজের ব্যাপক সংখ্যক ছাত্র এবং সাধারণ জনগণ। নির্বাচনী প্রচারণায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে মুসলিম লিগ ও সরকারের গণবিরোধী নীতিসমূহকে তুলে ধরা হয়। নির্বাচনের আগে সাপ্তাহিক bl‡ejvj পত্রিকার 'একটি দৃষ্টান্ত' নামক এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে মুসলিম লিগ ও সরকারের স্বরূপ উন্মোচন করে বলা হয়–

> মুসলিম লীগ গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই জনসাধারণ জানিত এবং সেই জন্য তাহাদের সমর্থনও দান করিয়াছেন। কিন্তু মুসলিম লীগের বর্তমান অগণতন্ত্রী নীতির ফলে জনসাধারণ যদি তাহাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে, তাহা হইলে দায়িত্ব কাহার হইবে। ... পাকিস্তান লাভের পর মুসলিম লীগের কর্তব্য ছিল জনগণের সত্যিকারে প্রতিনিধি হিসাবে সদ্য জাগ্রত এক জাতির সামনে রাষ্ট্রগঠনমূলক পরিকল্পনা লইয়া আগাইয়া আসা। কিন্তু মুসলিম লীগ সে কর্তব্য মোটেই পালন করে নাই। বরং দলীয় উপদলীয় স্বার্থ নিয়ে কোন্দল করিতেই রত রহিয়াছে। (উদ্ধৃত, বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ১৮১/১)

টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে অবশেষে বিপুল ভোটের ব্যবধানে স্বতন্ত্র প্রার্থী অর্থাৎ বিদ্রোহী মুসলিম লিগ প্রার্থী জয়লাভ করে। কিন্তু সরকারি প্রভাব খাটিয়ে মামলা-মকদ্দমা করে শামসুল হককে ব্যবস্থাপক সভায় আসন গ্রহণ করতে দেয়া হয়নি। স্বতন্ত্র প্রার্থীর বিজয় আর তারপরও সরকারি জবরদস্তি, অগণতান্ত্রিক আচরণ, মুসলিম লিগকে ক্রমাগত জনবিচ্ছিন্ন করে ফেলে। কারণ টাঙ্গাইলে লিগের পরাজয় কেবল লিগের পরাজয় নয়, এটা ছিল এক হিসেবে সরকারের ওপর অনাস্থা। (রফিকুল ২০১৬ : ৪৩) ˆ'wbK AvRv' পত্রিকা নির্বাচনের পরে মন্তব্য করেছিল যে–

> টাঙ্গাইলের পরাজয়কে এক প্রকাণ্ড বিপদ সঙ্কেত বলিয়া সকলকে আজ গ্রহণ করিতে হইবে। লীগের বিরুদ্ধে উত্তোলিত বিদ্রোহের পতাকা একদিন সমগ্র পাকিস্তানকে আচ্ছন্ন করিবে কিনা; লীগ এবং পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বস্ত হইবে কি না, এ কথাও হয়ত এখন হইতেই চিন্তা করিতে হইবে। (উদ্ধৃত, বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ১৮৬/১)

সত্যিকার অর্থে তাই-ই হয়েছিল। টাঙ্গাইল উপ-নির্বাচনের পর তিনটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে। প্রথমত, এই উপনির্বাচনের পর পূর্ব বাংলার বহু এলাকায় উপনির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে নূরুল আমীন সরকার পরাজয়ের আশঙ্কায় আর কোনো উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করেননি। ফলে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতাকর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ সচেতন জনগণ সবাই পাকিস্তান রাষ্ট্র, এর সরকার ও মুসলিম লিগের সদিচ্ছা, গণতান্ত্রিক মনোভাব ইত্যাদির প্রশ্নে সংশয়ী হয়ে ওঠে। যা প্রকৃতপক্ষে পূর্ব বাংলায় বিকল্প রাজনৈতিক দলের সম্ভাবনাকে স্পষ্ট করে তোলে। দ্বিতীয়ত, টাঙ্গাইলের উপ-নির্বাচনের পরপরই অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের জুন মাসে মুসলিম লিগের কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লিগ ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে এবং কাউন্সিল সভায় ব্যাপক হট্টগোল হয়। অসন্তোষ আর হট্টগোলের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হওয়ায় মুসলিম লিগের অভ্যন্তর সংকট ও দুর্বলতা আরেক দফা প্রকাশ পায়। অনেক কর্মী-সদস্য এই সভার পর থেকে মুসলিম লিগের

Dhaka University Institutional Repository

ওপর আগ্রহ ও আস্থা দুই-ই হারিয়ে বিকল্প মানসিকতায় তৈরি হন। তৃতীয়ত, এই নির্বাচন এবং কাউন্সিল সভার পরেই ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন মাওলানা ভাসানীকে সভাপতি, শামসুল হককে সম্পাদক, শেখ মুজিবুর রহমান ও খোন্দকার মুশতাক আহমদ (১৯১৮-১৯৯৬)-কে যুগ্ম সম্পাদক করে প্রায় ৪০ সদস্যের এক কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামি মুসলিম লিগ নামক রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম হয়।

সংগঠনটি শুরুতেই এত কাঙ্ক্ষিত এবং জনপ্রিয় ছিল যে, ১৯৪৯ সালের ২৪শে জুন তারিখের আরমানিটোলার প্রথম জনসভায় প্রায় চার হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব বাংলার পরবর্তী রাজনীতির গতিবিধি লক্ষ করলে আমরা দেখা যাবে যে, এই সংগঠনটিকে কেন্দ্র করে বাঙালির আশা আকাঙ্ক্ষা, আন্দোলন-প্রতিরোধ, অধিকার আদায়ের সংগ্রাম, সর্বোপরি স্বাধীনতার স্পৃহায় প্রোজ্জ্বল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-চিন্তা উন্মেষিত-বিকশিত হয়েছে। কারণ শুরুতেই সংগঠনটির মূল দাবিতে 'কোটি কোটি নর-নারীর সমবেত চেষ্টায় গণ-আজাদ হাসিল করিয়া সোনার পূর্ব পাকিস্তানকে সুখী, সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গড়িয়া তোলার আহ্বান জানানো হয়।' (বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ২০৪/১)

কৃষক-শ্রমিক পার্টির জন্ম

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করতে করতে বাঙালি মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে এক ধরনের রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি হয়। বিশেষত নব্য শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান নেতাকর্মীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা এবং বুর্জোয়া চেতনা ক্রমবিকাশের একটা পথ খুঁজে পায়। একারণে আমরা লক্ষ করি, ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত আওয়ামি মুসলিম লিগের মেনিফেস্টোতে আরো অনেক কিছুর সঙ্গে স্থান পেয়েছিল মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ইত্যাদি। এই রাজনৈতিক সচেতনতা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারসহ পূর্ব বাংলা সরকার এবং এর রাজনৈতিক সংগঠন নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে উঠে আসা নেতাকর্মীদের গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া চেতনাকে সবক্ষেত্রে উদারতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেনি। এই অগ্রহিষ্ণুতার ছিদ্রপথে ক্রমাগত গড়ে উঠেছে বিচিত্র রাজনৈতিক সংঘ-সংগঠন। পূর্বোক্ত গণতান্ত্রিক যুবলীগ (১৯৪৭), আওয়ামি মুসলিম লিগ (১৯৪৯) পাকিস্তান যুবলীগ (১৯৫১) গণতন্ত্রী দল (১৯৫১)-এর উত্থানের পেছনেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই কারণ ক্রিয়াশীল।

প্রায় একই কারণে ১৯৫৩ সালে পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় কৃষক-শ্রমিক পার্টি। ১৯৫৩ সালের মে মাসে প্রাদেশিক মুসলিম লিগের কাউন্সিল অধিবেশনে মুসলিম লিগের সভাপতি নূরুল আমীনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় মুসলিম লিগ সেই অনস্থা প্রস্তাবকে আমলে নিয়ে কার্যকর করেনি। এর প্রতিক্রিয়ায় কিছু লিগ কর্মী বিদ্রোহী হয়ে মুসলিম লিগ ত্যাগ করেন এবং নতুন দল গঠন করেন। এই দলটিই কৃষক-শ্রমিক পার্টি। এই পার্টির কেন্দ্রে রাখা হয় এ. কে. ফজলুল হককে। এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টি বিভাগোত্তর কালে নিরস্তিত্ব হয়ে গিয়েছিল। সেই পার্টির নামানুসারে এই পার্টির নামকরণ করা হয় কৃষক-শ্রমিক পার্টি। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হওয়ায় 'প্রজা' শব্দটির প্রাসঙ্গিকতা লোপ পায়। এজন্য 'প্রজা'র স্থলে শ্রমিক শব্দ যুক্ত করে পার্টির নামকরণ করা হয় 'কৃষক-শ্রমিক পার্টি'। প্রকৃতপক্ষে, এটি ছিল

Dhaka University Institutional Repository

'কৃষক-প্রজা পার্টির'ই একটি পুনর্গঠিত রূপ। দলটি অনেকটাই সমাজতন্ত্র ঘেঁষা নীতি-আদর্শে বিশ্বাসী ছিল।

পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রয়াস ও প্রতিক্রিয়া

যেকোনো রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এবং এর জনগণের অধিকার ও কর্তব্যের সীমারেখা নির্দেশের জন্য শাসনতন্ত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রের আদর্শ উদ্দেশ্য এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনই আকরিত হয় শাসনতন্ত্রে। শাসনতন্ত্রহীন রাষ্ট্র ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারের শিকার হতে বাধ্য। একারণে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে একটি শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে, যেখানে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকালীন জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে বলে সবাই আশাবাদ পোষণ করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রায় দুই বছরেও কোনো শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়নি।

দীর্ঘ প্রায় দুই বছর পর ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তান গণ পরিষদে ভবিষ্যতে প্রণীত ও বাস্তবায়িত হতে যাওয়া শাসনতন্ত্রের লক্ষ্য ও আদর্শ কী হবে, সে বিষয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, সমগ্র জগতের মালিক আল্লাহ এবং তিনি পাকিস্তানের মাধ্যমে এর অধিবাসীদের ওপর এক পবিত্র দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। তাই ইসলাম ধর্মে গণতন্ত্র, সাম্য, স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের যে-আদর্শ রয়েছে, পাকিস্তানে তা সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করা হবে। এবং কোরান-সুন্নাহর আলোয় যাতে পাকিস্তানের জনগণের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন যাপিত হতে পারে, সেই মতো পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। (সাঈদ-উর ২০০১ : ১৯-২০) এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি নির্ধারক কমিটি গঠিত হয় ১৯৪৯ সালের ১২ই মার্চ। এই কমিটি দীর্ঘ প্রায় দেড়বছর পর ১৯৫০ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর সংবিধান বিষয়ক সভায় তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন। মূলনীতি নির্ধারক কমিটির এই রিপোর্ট সমগ্র পূর্ব বাংলা ব্যাপী প্রবল বিক্ষোভের ঝড় তোলে।

মূলনীতি নির্ধারক কমিটির সুপারিশে আইনসভাকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করার প্রস্তাব করা হয়। এছাড়া সশস্ত্র বাহিনী, নির্বাচন, প্রদেশের শাসনকর্তা এবং মন্ত্রীদের নিয়োগ ও বরখাস্তের কর্তৃত্ব প্রেসিডেন্টের হাতে রাখা হয়। প্রদেশের চেয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভাকে সর্বাত্মক ক্ষমতা দেওয়া হয়। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর প্রস্তাব করা হয় মূলনীতি নির্ধারক কমিটির সুপারিশে। 'মূলনীতি নির্ধারক কমিটির উপরোক্ত সুপারিশসমূহ এতো নগ্নভাবে অগণতান্ত্রিক এবং পূর্ব বাঙলার প্রতি বৈষম্যমূলক যে মুসলিম লীগ সমর্থক ব্যক্তি ও পত্রপত্রিকাসমূহ, এমনকি মুসলিম লীগের সদস্য পর্যায়ের ব্যক্তিরাও এইসব সুপারিশের বিরুদ্ধে সমালোচনায় অন্যান্যদের মতোই অংশগ্রহণ করেন।'[৮] (বদরুদ্দীন ১৯৯৬ : ২৭২/২) বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সংগঠন যুক্তিতর্ক দেখিয়ে, পাকিস্তান অর্জনের জন্য দেশময় যে-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার চেয়ে শতগুণ বেশি জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে আহ্বান জানায়। 'পাকিস্তানে ফ্যাসিস্ট শাসনতন্ত্র চাই না', 'একনায়কত্ব ধ্বংস হউক', 'কনফেডারেশন চাই', 'পূর্ববঙ্গের গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে হবে', 'মূলনীতি নির্ধারক কমিটির সুপারিশ বাতিল চাই'– এই বলে সমস্বরে আওয়াজ তোলার আহ্বান জানানো হয় কোনো কোনো সংগঠনের পক্ষ থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫০ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর মূলনীতি নির্ধারক কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার রাজনীতিতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও কর্মতৎপরতা দেখা দেয়। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিস্থানীয় নাগরিকদের নিয়ে গঠিত হয় 'ডেমোক্রাটিক ফেডারেশনের সংগ্রাম কমিটি।' এই সংগ্রাম কমিটি ৪ঠা ও ৫ই নভেম্বর জাতীয় মহাসম্মেলনের আয়োজন করে। এই মহাসম্মেলন থেকে বিকল্প এবং কাঙ্ক্ষিত শাসনতান্ত্রিক সুপারিশ করা হয়। এতে ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব'-এর ওপর ভিত্তি করে যে-সুপারিশসমূহ করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–

(ক) রাষ্ট্রের নাম হবে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের দুটি অংশ থাকবে– পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান।

(খ) উভয় অঞ্চল থেকে একই সংখ্যক লোকের ভোটে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে একটি আইন পরিষদ গঠিত হবে। পার্লামেন্ট হবে এক কক্ষ বিশিষ্ট। পার্লামেন্টের অধিবেশন পর্যায়ক্রমে একবার পশ্চিম পাকিস্তানের এবং তারপর পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হবে।

(গ) পাকিস্তানের একটি সুপ্রিম কোর্ট থাকবে এবং তার সেশন পর্যায়ক্রমে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঘ) রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু ও বাংলা।

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা পার্লামেন্টের কাছে দায়ী থাকবেন। পার্লামেন্টের সদস্যরাই মন্ত্রী হবেন। সদস্য নন এমন নাগরিক মন্ত্রী হলে, মন্ত্রিত্ব নেয়ার ছয় মাসের মধ্যে তাঁকে পার্লামেন্ট সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হতে হবে।

(চ) শুধু বৈদেশিক সম্পর্ক আর দেশরক্ষার দায়িত্ব থাকবে কেন্দ্রের হাতে। তবে এ দুটিরই আঞ্চলিক অফিস থাকতে হবে। দেশরক্ষার জন্য দুই অঞ্চলের যুবকদের দ্বারা গঠিত স্বতন্ত্র দুটি বাহিনী থাকবে।

(ছ) মুষ্টিমেয় ক্ষেত্র ছাড়া, করারোপের মূল ক্ষমতা থাকবে প্রদেশের হাতে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সংবিধান প্রণয়নকে কেন্দ্র করে এই প্রথম পাকিস্তান রাষ্ট্রের গঠন-প্রকৃতি, পূর্ব-পশ্চিমের আন্তঃসম্পর্ক, শোষণ-আধিপত্য-কোলোনিবিস্তার, সরকারের সামন্তবাদী-ফ্যাসিস্ট আচরণ ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলো আলোচিত হলো। এমনকি এই প্রথম পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয়ের প্রশ্ন উঠল। মূলনীতি কমিটির সুপারিশকে কেন্দ্র করেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুসলিম লিগ কর্মীরা মুসলিম লিগের সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিন্ন না করলেও কার্যত মুসলিম লিগ ত্যাগ করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই মুসলিম লিগের কেন্দ্রীয় সরকারের অনুগত অংশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ অংশের মধ্যে বিরোধ ও অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ প্রকট ও খোলাখুলি আকার ধারণ করে। শুধু তাই নয়, ১৯৫০ সালের মূলনীতি নির্ধারক কমিটির সুপারিশকে কেন্দ্র করে এই প্রথম সমগ্র পূর্ব বাংলার মধ্যে অভিন্ন বিপন্নতার বোধ জন্ম নেয়। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, আলিয়া মাদ্রাসা, ইডেন কলেজসহ বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাই শুধু

Dhaka University Institutional Repository

বিক্ষোভ আর পূর্ণদিবস ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেনি; কুমিল্লা, বগুড়া, পাবনা, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশালসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিবাদ-বিক্ষোভ হয়। (বদরুদ্দীন ১৯৯৬ : ২৮৬-২৮৭/২) ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পূর্বে এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে এর চেয়ে গভীর, বহুমাত্রিক, বিস্তৃত এবং গণমুখী ঘটনা আর ঘটেনি। এর আগে যেসব সংকট তৈরি হয়েছে তা পূর্ব বাংলার মানুষ এবং রাজনৈতিক কর্মীদের পশ্চিম পাকিস্তান তথা পাকিস্তান রাষ্ট্রের মুখোমুখি দাঁড় করায়নি। ফলে পূর্ব বাংলার স্বাতন্ত্র্য আবিষ্কার এবং উপলব্ধির জন্ম দেয়ার ক্ষেত্রে অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী বোধ-বোধির সূচনার ক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশ এবং এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-প্রতিবাদের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।[৯]

১৯৫০ সালের শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের তীব্রতা কেন্দ্রীয় সরকার বেশ ভালো মাত্রায়ই আমলে নেয় এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান তাঁর প্রস্তাব স্থগিত রাখেন। তাঁর পর খাজা নাজিমুদ্দীন দ্বিতীয় রিপোর্টও পাঞ্জাবের বিক্ষোভের প্রেক্ষিতে বাতিল করতে বাধ্য হন। তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯৫৩ সালে আবার সংবিধানের মূলনীতি বিষয়ক রিপোর্ট পরিষদে পেশ করেন। এতে ভাষার প্রশ্নে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে নমনীয়তা প্রদর্শন করে উর্দু ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু এই রিপোর্টে লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব বাংলার জন্যে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা না থাকায় তা পূর্ব বাংলার পক্ষ থেকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। এটি মূলত কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত বিক্ষোভের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যাত হয়। অবশেষে শেষোক্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং ১৯৫৪ সালে নতুন শাসনতন্ত্র জারির কথা বলা হয়। কিন্তু তৎকালীন গভর্নর জেনারেল গণপরিষদ বাতিল করে দেওয়ায় শাসনতন্ত্র রচনার ও বাস্তবায়িত হওয়ার সমস্ত প্রচেষ্টা ভেস্তে যায়।

তবু, শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক কর্মী এবং সচেতন জনসাধারণের মধ্যে যে-সচেতনতার জন্ম দিয়েছিল, তা উত্তরকালে সমগ্র পূর্ব বাংলার মানুষকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় যূথবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা জুগিয়েছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই।

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ও জাতীয়তাবাদী চেতনার বিস্তার

জাতীয়তাবাদের শর্ত যদি হয় একত্বের অনুভব এবং নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর একই দুঃখভোগের ইতিহাসের ঐক্যবদ্ধ ফলশ্রুতি, তাহলে তা পূর্ব বাংলায় সুস্পষ্টভাবে, সংগঠিতভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। এই নির্বাচনে সমগ্র পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক কর্মী থেকে শুরু করে গ্রামের সাধারণ কৃষক পর্যন্ত একই চেতনার সূতায় গাঁথা পড়ে। এর ফল হয়েছিল মুসলিম লিগের ভরাডুবি এবং যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ জয়লাভ। প্রকাশ্য এই জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের পেছনে ১৯৪৯ সালের টাঙ্গাইল উপনির্বাচন, ১৯৫০ সালের শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন সম্মিলিতভাবে ক্রিয়াশীল ছিল এতে সন্দেহ নেই।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৫৪ সালের নির্বাচনই পূর্ব বাংলায় অনুষ্ঠিত সবচেয়ে বড় নির্বাচন। নির্বাচনটি ছিল পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করার নির্বাচন। এতকাল ১৯৪৬

Dhaka University Institutional Repository

সালের নির্বাচিত সদস্যরাই পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসেবে কাজ করছিলেন। গণতান্ত্রিক নিয়মানুযায়ী এদের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ১৯৫১ সালে। কিন্তু মুসলিম লিগ সরকারের অগণতান্ত্রিক সামন্তসুলভ মনোভঙ্গির কারণে যথাসময়ে নির্বাচন হয়নি। নানা অজুহাতের পর প্রথমে ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। পরে অবশ্য এই নির্বাচনের তারিখ একমাস পিছিয়ে নির্ধারণ করা হয় ৮ই মার্চ।

প্রকৃতপক্ষে, পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দেশে প্রায় একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়। ‘পাকিস্তান হাসিলের সঙ্গে সঙ্গেই মুসলিম লীগের দরজা জনগণের মুখের উপর বন্ধ করিয়া দেওয়া শুধু রাজনৈতিক অপরাধ ছিল না, নৈতিক মর‍্যাল ও এথিক্যাল অপরাধও ছিল।’ (আবুল মনসুর ২০০১ : ১৮৮/৩) কিন্তু মুসলিম লিগ সরকার এই কাজটি করেছিলেন। এমনকি তারা মুসলিম লিগের সদস্য সংখ্যাও বাড়ানোর পক্ষপাতী ছিলেন না। তাদের মতে, এতে বিশৃঙ্খলা বাড়বে. নতুন রাষ্ট্রে বহুমত আর বিশৃঙ্খলার চেয়ে জরুরি গঠনমূলক কাজ করা। এজন্য তারা মুসলিম লিগকে মুসলমানদের ‘একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান’ হিসেবে দাবি করে। এই একদলীয় মনোভঙ্গি যাতে তৈরি না হয় এজন্য ১৯৪৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি জিন্নাহ এক সরকারি প্রেসনোটে মুসলিম লিগকে দেশ ভাগ হওয়ার আগের মতো মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী দল হিসেবে গণ্য না করে, শুধু একটি দল হিসেবে গণ্য করার ঘোষণা দেন। (আবুল মনসুর ২০০১ : ২৮৯-২৯০/৩) কিন্তু পূর্ব বাংলা মুসলিম লিগ শুধু নয়, সমগ্র পাকিস্তানের মুসলিম লিগ এটিকে শুধু একটি দল হিসেবে না দেখে মুসলিম জাতির জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখেছে এবং অন্য যেকোনো দলীয় তৎপরতাকে মুসলমানদের তথা পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরোধী তৎপরতা হিসেবে দেখেছে। ফলে, দেশ যেমন এক দলীয় শাসনের খপ্পরে পড়েছে, তেমনি সাম্প্রদায়িকতাই হয়ে উঠেছে লিগ সরকার তথা পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রধান রাজনৈতিক হাতিয়ার। এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে জিইয়ে রাখার জন্য ১৯৫৪-এর নির্বাচনের আগে এক সময়ে ‘পাকিস্তান-বিরোধী ঐতিহ্য-ওয়ালা কংগ্রেস’ বলে গালি দেওয়া কংগ্রেসকে টিকিয়ে রেখে হিন্দুদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন করার প্রণোদনা যুগিয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দু এবং মুসলমানকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে রাজনীতিতে ধর্মানুভূতিকে প্রয়োগ করার হীন তৎপরতা। এভাবে নানা কায়দায় পূর্ব বাংলায় মুসলিম লিগ সরকার মূলত একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে দেশ পরিচালনায় রত ছিল। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে সরকার ও সরকারি দলের নানামুখী চাপের মধ্যেও গঠিত হয় আওয়ামি মুসলিম লিগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, গণতন্ত্রী দলের মতো বেশ কয়েকটি দল ও ছাত্র-সংগঠন। ১৯৫৪ সালে সরকার-বিরোধী এবং সরকার-অস্বীকৃত এসব প্রগতিবাদী সকল শক্তি সম্মিলিত হয়েছিল এবং অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছিল একদলীয় শাসনব্যবস্থার বিপরীতে। এছাড়া এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো লিগ সরকার পূর্ব বাংলায় শক্তিশালী বহুদলের অস্তিত্বকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। ফলে এই নির্বাচন পূর্ব বাংলার মানুষের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষারও এক দারুণ প্রকাশ।

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লিগের বিপরীতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য পূর্ব বাংলায় আওয়ামি লিগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেযামে-ইসলাম, গণতন্ত্রী দল ও খেলাফতে-রাব্বানির সমন্বয়ে একটি যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। এর মধ্যে নেযামে-ইসলাম দলটি ছিল মূলত এ. কে. ফজলুল হকের আনুকূল্য প্রাপ্ত দল। ঘোষিত দল আকারে কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচন না করলেও বা যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে না

Dhaka University Institutional Repository

থাকলেও এই দলের কোনো কোনো জনপ্রিয় নেতা কোনো কোনো এলাকায় নির্বাচন করেছিলেন। এসব ক্ষেত্রে ঐসব নির্বাচনী এলাকায় যুক্তফ্রন্ট তাদের কোনো প্রার্থী দেয়নি। ফলে পরোক্ষত কমিউনিস্ট পার্টিও যুক্তফ্রন্টেরই অংশ ছিল।

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে নির্বাচনী মেনিফেস্টো রচনা করেন আবুল মনসুর আহমদ। (আবুল মনসুর ২০০১ : ১৯৪-১৯৫/৩) ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে আবুল মনসুর আহমদ বিরচিত এই ইশতেহারে মোট ২১টি দফা ছিল। এটিই ইতিহাস খ্যাত ২১ দফা। এই একুশ দফার মধ্যে প্রধান প্রধান নির্বাচনী ওয়াদাগুলোর মধ্যে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা, মুক্ত সাংবাদিকতা, বাক স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, ২১শে ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস ঘোষণা, পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা, ভাষা শহিদদের স্মরণে শহিদ মিনার নির্মাণ করা, শহিদের পরিবারগুলোকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া, ২১শে ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ করা, মন্ত্রীর বেতন এক হাজার টাকার বেশি নির্ধারণ না করা, যথাসময়ে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা, কার্যকাল শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বে পদত্যাগ করে নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা, কোনো কারণে নির্বাচনী আসন শূন্য হলে তিন মাসের মধ্যে উপ-নির্বাচনের ব্যবস্থা করা, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান আইন বাতিল করে এগুলোকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা, পাটশিল্পকে জাতীয়করণ করে একে পূর্ব বাংলা সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা। (সাঈদ-উর ২০০১ : ২২)

একুশ দফার সব দফা ভালোভাবে লক্ষ করলে এর মধ্যে দুটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, একুশ দফার মধ্যে সেই বিষয়গুলো চিহ্নিত হয়েছে, যে-বিষয়গুলোতে পূর্ব বাংলার জনগণ প্রায় আট বছর যাবত, অর্থাৎ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে, বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছিল। দ্বিতীয়ত, এর দফাগুলোর মধ্যে সেই বিষয়গুলো চিহ্নিত হয়েছিল যে-বিষয়গুলো পূর্ব বাংলার জনগণের ভবিষ্যৎ আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন পূরণের নিশ্চয়তা দিতে পারে; প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাদের স্বাধিকার আর ন্যায্যতাকে।[১০] একুশ দফা সত্য-সত্যই পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে নব জীবনের একটা স্বপ্ন সৃষ্টি করেছিল। একুশ দফার ভিত্তিতে সংঘটিত নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনসাধারণের মধ্যে যেন এক গণ জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল। এই নির্বাচন পূর্ব বাংলার জন সাধারণকে কী পরিমাণ ঐক্যবদ্ধ ও জাগরিত করেছিল তা নিম্নোক্ত উদ্ধৃতির মাধ্যমে বোঝা যায়–

> জনগণের উৎসাহ পল্লীগ্রামের নারীজাতির মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িল। আমার নিজের এলাকায় দেখিয়াছি পর্দা রক্ষা করিয়াও দলে-দলে মেয়েরা ভোট কেন্দ্রে আসিয়াছে। পর্দা রক্ষার জন্য তারা এইরূপ অভিনব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে : চারজন যুবক একটা মশারির চার কোনা ধরিয়াছে। পনর বিশ জন মেয়ে-ভোটার এই মশারির নিচে ঘিচি-ঘিচি করিয়া ঢুকিয়াছে। তারপর মশারি চলিয়াছে। মশারির মধ্যে মেয়েরা চলিয়াছে। প্রতি গ্রাম হইতে মিছিল করিয়া ভোটাররা ভোট-কেন্দ্রে আসিয়াছে। কাগজ ও বাঁশের খাবাসি দিয়া যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন-প্রতীক বিশাল আকারের নৌকা বানাইয়া লইয়াছে জনসাধারণ নিজেরাই। ... ভোটাররা এই ভোট-যুদ্ধকে একটা পবিত্র জেহাদ

> মনে করিয়াছে। ... শুধু যুক্তফ্রন্টকে ভোট দেওয়াই তারা পবিত্র কর্তব্য মনে করে নাই। অপর পক্ষে ভোট দেওয়াকে তারা জনগণের দুশমনি মনে করিয়াছে। (আবুল মনসুর ২০০১ : ১৯৯-২০০/৩)

এটিই ছিল ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং রাজনৈতিক হয়ে ওঠার বাস্তবতা।

১৯৫৪ সালের পাকিস্তান রাষ্ট্র তথা পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং অভিমুখ উপলব্ধির জন্যে যুক্তফ্রন্ট এবং ক্ষমতাসীন মুসলিম লিগের নির্বাচনী প্রচার ও এর ভাষা বোঝা জরুরি। পূর্ব বাংলার এই নির্বাচনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে মুসলিম লিগের প্রচারকার্যে মাঠে নামেন পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিন। তাঁদের নেতৃত্বে মুসলিম লিগের কর্মীবাহিনী নিয়ে গঠিত হয় 'গ্রিন শার্ট' নামক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। এছাড়া ছিলেন ফাতেমা জিন্নাহ (১৮৯৩-১৯৬৭), মাওলানা এহতেশামুল হকসহ পাকিস্তানের বড় বড় আলেম-ওলামা। শুধু তাই নয় পুলিশের আই.জি, ডি. আই. জি, জেলা মেজিস্ট্রেট, কমিশনাররাও মুসলিম লিগের কর্মীবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা পাকিস্তানের সংহতি ও ইসলামের নামেই মূলত প্রচার কার্য চালান। তাদের নির্বাচনী ওয়াদার মধ্যে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা, পূর্ব বাংলায় নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কোরানশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, মসজিদকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা, কোরান-সুন্নাহ কেন্দ্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা ও ইসলামি সমাজ গঠন করা ছিল উল্লেখযোগ্য। তারা মূলত ধর্মানুভূতি এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি আবেগকে কেন্দ্রে রেখেই প্রচার কার্য চালিয়েছে। অন্যদিকে যুক্তফ্রন্টের প্রচারকার্যে ছিলেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি, মাওলানা ভাসানী, আবুল মনসুর আহমদ, এ. কে. ফজলুল হকসহ সাধারণ নেতাকর্মী। এছাড়া যুক্তফ্রন্টের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করতে পূর্ব বাংলার বাইরে থেকে আসেন সীমান্ত গান্ধী আব্দুল গাফফার খান (১৮৯০-১৯৮৮) ও গোলাম মোহাম্মদ লুন্দঘোর। গাফফার খান তাঁর বক্তৃতায় বিভিন্ন জায়গায় সীমান্ত প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের জন্য তাঁর দাবি ও সংগ্রামের কথা পূর্ব বাংলার মানুষদের সঙ্গে বিনিময় করেন। এতে যুক্তফ্রন্টের অন্যতম দাবি পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি জনগণের কাছে আরো জোরদার হয়ে ওঠে।

নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয়। ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৮টিতেই জয়লাভ করে। নির্বাচনের এই ফলাফলের প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। এর ফলাফল সম্পর্কে গবেষক যথার্থই বলেছেন–

> the Outcome of the election can be interpreted as a clear cut expression of not only regionalism but also of conversion of regional into Bengalee nationalism (Nehal 2004 : 129)

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন পরবর্তী ঘটনাবলি

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের জয় এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার ফসল যুক্তফ্রন্ট সরকার শেষ পর্যন্ত ঘরে তুলতে পারেনি। এর কারণ দ্বি-মাত্রিক। প্রথমত, যুক্তফ্রন্টের মধ্যকার অন্তর্কলহ এবং দ্বিতীয়ত মুসলিম লিগ সরকারের কূটচাল। যুক্তফ্রন্টের অন্তর্কলহ ছিল মন্ত্রিপরিষদে সদস্য অন্তর্ভুক্তি নিয়ে। কোন দল থেকে কাকে

কাকে মন্ত্রিপরিষদে অন্তর্ভুক্ত করা হবে তা নিয়ে এ. কে. ফজলুল হকের সঙ্গে আওয়ামি মুসলিম লিগের শহিদ সোহরাওয়ার্দির মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য রূপ লাভ করেছিল। অবশেষে সে-দ্বন্দ্বের প্রাথমিক মীমাংসাও হয়েছিল। কিন্তু ফজলুল হকের প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পরেই আদমজি জুট মিলে এক ভয়াবহ দাঙ্গায় অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এই সংখ্যা ছিল প্রায় ছয়শত (শেখ মুজিবুর ২০১৪ : ২৬৪) শুধু তাই নয়, মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হওয়ার কয়েকদিন আগেও (২৩শে মার্চ) চন্দ্রঘোনা কাগজের মিলে বাঙালি ও উর্দুভাষী শ্রমিকদের মধ্যেও হয়েছিল এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। এই সব দাঙ্গা-সংঘর্ষকে মুসলিম লিগ নেতারা অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেছিল। বিশেষত আদমজি জুট মিলের দাঙ্গায় অসংখ্য মানুষ হতাহত হওয়ার পর কোনো কোনো বিষয়ে পূর্ব বাংলা সরকারের ক্ষমতা হ্রাস করে কেন্দ্রীয় সরকার এক নির্দেশ জারি করে। এর বিরুদ্ধে কেবিনেট মিটিংয়ে পূর্ব বাংলার মন্ত্রীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে একে অযৌক্তিক এবং অগণতান্ত্রিক আখ্যা দেন। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় না। এ. কে. ফজলুল হককে এর দিন কয়েকের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার তলব করে। সেখানে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে পাকিস্তান-বিরোধিতার অভিযোগ আনা হয়। কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়, ১৯৫৪ সালের মে মাসে কলকাতা সফরে গিয়ে ফজলুল হকের দেয়া বক্তৃতাকে।[১১] যদিও এ. কে. ফজলুল হক ঢাকায় ফিরে এসে তাঁর এই বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা হচ্ছে বলে দাবি করেন। মুসলিম লিগ ও কেন্দ্রীয় সরকারের ভুল ভাঙাতে তিনি ঢাকায় এসে এক বিবৃতিতে পাকিস্তানের ঐক্যের প্রশ্নে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেন–

> He affirmed his belief in Pakistan and reiterated that the members of the United front believed in the integration of Pakistan, and why they wanted for the province was internal autonomy not total independence. (Keith Callard 1957 : 58)

কিন্তু এতেও শেষরক্ষা হয়নি। আদমজি জুট মিলের দাঙ্গা, চন্দ্রঘোনা কাগজ কলের সংঘর্ষকে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা হিসেবে প্রচার করতে থাকে। এ. কে. ফজলুল হকের কলকাতায় দেয়া বক্তব্যকে প্রামাণিক করে তাঁকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' আখ্যা দেয়া হয়। যুক্তফ্রন্টের তাৎপর্যপূর্ণ নেতা শেখ মুজিবকে 'দাঙ্গাকারী' আখ্যা দেয়া হয়। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ও যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাতিল ঘোষণা করে। ৩০শে মে মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করে পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর গোলাম মোহাম্মদ প্রতিরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা (১৮৯৯-১৯৬৯)-কে পূর্ব বাংলার গভর্নর এবং এন. এম. খানকে চিফ সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব দেন। প্রকৃতপক্ষে, কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার স্বাধীন মত প্রতিষ্ঠার বিস্ফোরণের বা মহাকাব্যিক গণজাগরণের ট্রাজিক পতন সুনিশ্চিত হয়।

হয়ত অসম্ভব ছিল না কেন্দ্রীয় সরকারের এই অন্যায্য ও হঠকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তোলা। গণ আন্দোলন যে সম্ভব ছিল, তার প্রমাণ নির্বাচনের ফলাফল। জাতীয়তাবাদী চেতনা দানাদার হয়েই ছিল ১৯৪৯-এর টাঙ্গাইল উপ-নির্বাচন, ১৯৫০-এর শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। জনগণের মধ্যে বঞ্চনার অভিন্ন বোধ তখনও বর্তমান ছিল। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে ভাঙন, অদূরদর্শিতা, সমন্বয়হীনতা, নীতিহীনতা আর কাপুরুষতার কারণে কোনো প্রতিবাদ-আন্দোলনই দানা বাঁধেনি। যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে দেয়ার পরের বাস্তবতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে–

> আমাদের নেতারা যারা বাইরে (কারাগারের) রইলেন, তারা এর প্রতিবাদ করারও দরকার মনে করলেন না। দেশবাসী ৬ই জুনের দিকে চেয়েছিলেন, যদি নেতারা সাহস করে প্রোগ্রাম দিত তবে দেশবাসী তা পালন করত যেসব কর্মী গ্রেফতার হয়েছিল তারা ছাড়াও যারা বাইরে ছিল তারাও প্রস্তুত ছিল। আওয়ামীলীগের সংগ্রামী ও ত্যাগী কর্মীরা নিজেরাই প্রতিবাদে যোগ দিতে পারত। যুক্তফ্রন্টের তথাকথিত সুবিধাবাদী নেতাদের মুখের দিকে চেয়ে থেকে তাও তারা করতে পারল না। অনেক কর্মীই চেষ্টা করে গ্রেফতার হয়েছিল। যদি সেইদিন তারা জনগণকে আহ্বান করত তবে এতবড় আন্দোলন হত যে কোনোদিন আর ষড়যন্ত্রকারীরা সাহস করত না বাংলাদেশের উপর অত্যাচার করতে। শতকরা সাতানব্বই ভাগ জনসাধারণ যেখানে যুক্তফ্রন্টকে ভোট দিল ও সমর্থন করল, শত প্রলোভন ও অত্যাচারকে তারা ভ্রূক্ষেপ করল না– সেই জনগণ নীরব দর্শকের মত তাকিয়ে রইল। কি করা দরকার বা কি করতে হবে, এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করা উচিত হবে কি না, এ সম্বন্ধে নেতৃবৃন্দ একদম চুপচাপ। ... এই দিন থেকেই বাঙালিদের দুঃখের দিন শুরু হল। অযোগ্য নেতৃত্ব, নীতিহীন নেতা ও কাপুরুষ রাজনীতিবিদদের সাথে কোনোদিন একসাথে হয়ে দেশের কোনো কাজে নামতে নেই। তাতে দেশসেবার চেয়ে দেশের ও জনগণের সর্বনাশই বেশি হয়। (শেখ মুজিবুর ২০১৪ : ২৭৩)

দুটি বিষয় খুবই স্পষ্ট; যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় জাতীয়তাবাদী জাগরণ ঘটেছিল এবং বিপরীতক্রমে নেতৃত্বের সংকটে তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছিল।

জাতীয়তাবাদী জাগরণের ফসল ঘরে তুলতে না পারার পরের বাস্তবতা নেতৃত্বের বারবার অদূরদর্শিতা আর পদ ও ক্ষমতার বশবর্তী হয়ে পাকিস্তানি শাসকচক্রকে আরো স্বেচ্ছাচারী ও অগণতান্ত্রিক হয়ে উঠতে সাহায্য করার বাস্তবতা। যুক্তফ্রন্ট সরকার বিলুপ্তির পর নেতৃবৃন্দের বাস্তবাবস্থা সম্পর্কে গবেষক বলেছেন–

> তারা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও আমলাতন্ত্রের খেলার পুতল হয়ে গেলেন, তাদেরই ইঙ্গিতে তারা রাজনীতির মঞ্চে উঠে ভালুক-নাচ নাচতে লাগলেন। যুক্তফ্রন্টের দুই প্রধান শরিক দল আওয়ামী লীগ ও কেত্রসপিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে পাকিস্তানি আমলাতন্ত্র বেশ মজার খেলা শুরু করলো। আজ আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খানকে মুখ্যমন্ত্রী বানায় তো কাল বানায় কেত্রসপির আবু হোসেন সরকারকে। ... শুধু ফজলুল হক, আতাউর রহমান খান বা আবু হোসেন সরকাররাই নন, হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীর মতো ধুরন্ধর নেতাকেও পাকিস্তানি আমলাতন্ত্র নাকে রসি লাগিয়ে ঘুরালো। (যতীন ২০১৩ : ২১২)

ফলাফল যা হল, তা পূর্ববাংলার জন্যে সুখকর হলো না। যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন নেতাকে বিভিন্ন সুবিধাজনক পদে বসিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের যাবতীয় রাষ্ট্রনৈতিক ইচ্ছা পূরণ করতে লাগল। শহিদ সোহরাওয়ার্দিকে তারা বানাল আইনমন্ত্রী। তাঁকে দিয়েই কেন্দ্রীয় সরকার ও পাঞ্জাবি আমলারা 'পাঠান বেলুচি ও সিন্ধি জাতির অধিকারকে পর্যুদস্ত করে ... এক ইউনিট সমর্থন করিয়ে নিলো; পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে পদদলিত করে পাকিস্তানের পার্লামেন্টের আসনে সংখ্যাসাম্যের ব্যবস্থা করে নিলো। আইনমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীকে দিয়েই ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সংবিধানের খসড়া তৈরি করালো।' (যতীন ২০১৩ : ২১২)

সোহরাওয়ার্দিকে প্রধানমন্ত্রী করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আইনমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব করেন গোলাম মোহাম্মদ। উদ্দেশ্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন। সোহরাওয়ার্দি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বোঝালেন 'প্রধানমন্ত্রিত্বটা বড় কথা নয়, বড় কথা শাসনতন্ত্র রচনা'। সোহরাওয়ার্দি আইনমন্ত্রী হওয়ার সময় শেখ মুজিবুর রহমান, আবুল মনসুর আহমদ, আতাউর রহমান খান, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া (১৯১১-১৯৬৯)-সহ অনেকেই হতাশ হয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে এও বলেছিলেন যে, মুসলিম লিগ সরকার তাঁকে 'ট্র্যাপ

Dhaka University Institutional Repository

করেছে’। তিনি যে ষড়যন্ত্রের রাজনীতির শিকার হয়েছেন তাও শেখ মুজিব তাঁকে বলেছিলেন। কিন্তু শহিদ সোহরাওয়ার্দির কাছে গোলাম মোহাম্মদ মারফত খবর ছিল যে, সোহরাওয়ার্দি এবং তাঁর মতো আরো কেউ কেউ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করার পরের নতুন মন্ত্রিসভায় যোগ না দিলে রাষ্ট্র ক্ষমতা সামরিক বাহিনীর হাতে দিয়ে দেয়া হবে। এটা যাতে না হয়, সেজন্য সোহরাওয়ার্দি তাঁর এক সময়কার প্রাইভেট সেক্রেটারি মোহাম্মদ আলি (১৯০৯-১৯৬৩)-এর অধীনে আইনমন্ত্রী হয়েছিলেন। যদিও শেখ মুজিবসহ অনেকে তা মানতে পারেননি। (আবুল মনসুর ২০০১ : ২০৮, ২০৯/৩, শেখ মুজিবুর ২০১৪ : ২৮৬, ২৮৭, যতীন ২০১৩ : ২১২) তাঁদের না মানার কারণটাই শেষ পর্যন্ত সত্য হয়েছিল। গোলাম মোহাম্মদ সোহরাওয়ার্দিকে প্রধানমন্ত্রিত্বের ওয়াদা করে যথাসময়ে নানা নাটকের মধ্য দিয়ে সেই ওয়াদার বরখেলাফ করেন। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে আরো বহু ফাটল দেখা যায়। মন্ত্রিত্ব, পদ, ক্ষমতা ইত্যাদির বশবর্তী হয়ে এবং আওয়ামি মুসলিম লিগের কিছু রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার কারণে আওয়ামী লীগ থেকে অনেকে দলবদল করে চলে যায়। আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। সোহরাওয়ার্দি নানা রাজনৈতিক কূটকৌশলের কাছে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অধিকাংশ রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য এই ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হয়ে যায়। পূর্ব বাংলার রাজনীতি থেকে গণ-সংশ্লিষ্ট উদ্দীপনা ক্রমে থিতিয়ে যায়। ফলে, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টকে কেন্দ্র করে জেগে ওঠা জাতীয়তাবাদী জাগরণের এক ধরনের অপমৃত্যু ঘটে । বাকি পড়ে থাকে শুধু হতাশা আর রাষ্ট্রীয় নির্যাতন, অনাচার আর বৈষম্য। এরই মধ্যে উদ্যোগ আয়োজন চলতে থাকে নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের।

পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনা

১৯৫৬ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রায় আট বছর পর শাসনতন্ত্র রচনা সম্পন্ন হয়। এতে বলা হয় রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হবেন ইসলাম ধর্মাবলম্বী, রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু ও বাংলা, কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাসাম্য থাকবে। শুধু তাই নয় জাতীয় পরিষদের সদস্য অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারেও সংখ্যাসাম্যের বিধান রাখা হয়। এছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশ মিলে এক ইউনিট পশ্চিম পাকিস্তান করার পাশাপাশি পূর্ব বাংলা প্রদেশের নাম পরিবর্তন করে করা হয় পূর্ব পাকিস্তান। সংসদীয় গণতন্ত্রের বিধান সংবলিত ‘পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের নতুন এই শাসনতন্ত্র ১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চ জারি করা হয়। এই সংবিধানের আওতায় ‘পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের’ প্রথম প্রেসিডেন্ট হলেন ইস্কান্দার মির্জা। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের এই শাসনতন্ত্র প্রণয়ের পূর্বে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দেয়া প্রধান পাঁচটি শর্তের গুরুত্বপূর্ণ অন্তত দুটি শর্তই মান্য করা হয়নি। এর একটি ছিল পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং অন্যটি যুক্ত নির্বাচন। তবু এই শাসনতন্ত্র নিয়ে ১৯৫০ সালের শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের মতো গণসম্পৃক্ত কোনো আন্দোলন হয়নি। শুধু গণপরিষদে সংবিধান প্রস্তাব আকারে উত্থাপিত হলে সংশোধনী মূলতবি ও অধিকার প্রস্তাব এবং ‘ধারাবাহিকতার নুক্তা’ (পয়েন্টস্-অব অর্ডার) ইত্যাদিতে সরকার পক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে আওয়ামী লীগের গণপরিষদ সদস্যবৃন্দ। এই পরিস্থিতিকে গণ-পরিষদে সংবিধান বিষয়ক বিতর্ক-আলোচনার অন্যতম সভ্য আবুল মনসুর আহমদ বলেছেন, ‘পাহারা কুত্তা’র মত সর্বদা হাজির থাকিয়া চব্বিশ ঘণ্টা ঘেউ-ঘেউ করিতে থাকিলাম।’ কিন্তু তাতে তেমন কোনো

Dhaka University Institutional Repository

ফল হয়নি। 'হক সাহেবের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের পূর্ব বাংলায় মুসলিম মেম্বাররা একুশ দফার নির্বাচনী ওয়াদা খেলাফ করিয়া এই শক্তিশালী কেন্দ্রের পক্ষে ভোট দিলেন। ১৯৫৪ সালের বিপ্লবী নির্বাচন বিষয়টা এইভাবে সমাধিস্থ হইয়া গেল।' (আবুল মনসুর ২০০১ : ২৩৭/৩) উল্লেখ্য পাকিস্তানের এই সংবিধান রচিত হয়েছিল মাত্র দেড় মাসে। এর জন্য রাষ্ট্র সময় নিয়েছে নয় বছর।[১২]

নতুন শাসনতন্ত্র মোতাবেক কেন্দ্রীয় সরকার গঠন

নতুন শাসনতন্ত্র মোতাবেক পাকিস্তান রাষ্ট্রে চালু হল রাষ্ট্রপতির শাসিত সরকার। প্রথম রাষ্ট্রপতি হন ইস্কান্দার মির্জা। কিন্তু রাষ্ট্রপতির বাইরে অভ্যন্তরীণ ক্ষমতাকেন্দ্রে দ্রুত নানা পটপরিবর্তিত হতে থাকে কেন্দ্রীয় সরকারে। নতুন শাসনতন্ত্র জারির এক মাস পরে গঠিত হয় নতুন দল 'রিপাবলিকান পার্টি'। এর প্রধান ছিলেন তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ডা. খান সাহেব (১৮৮২-১৯৫৮)। এই নতুন দল গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতায় থাকা মুসলিম লিগের বেশ কয়েকজন পরিষদ-সদস্য এতে যোগ দেন। ফলে, কিছুদিন পূর্বে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর স্থলাভিষিক্ত প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী (১৯০৫-১৯৮৩)-এর ক্ষমতা এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ে যে, ১৯৫৬ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর জাতীয় পরিষদের বৈঠকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে ব্যর্থ হয়ে তিনি পদত্যাগ করেন। ফলে নতুন করে ক্ষমতাকেন্দ্র ঝুঁকে পড়ে রিপাবলিকান পার্টির দিকে। এই রিপাবলিকান পার্টির সঙ্গে সমঝোতা করে শহিদ সোহরাওয়ার্দি প্রধানমন্ত্রী হন। তাঁর প্রধান মন্ত্রিত্ব ছিল আরো আগে থেকেই আওয়ামী লীগের কাঙ্ক্ষিত। ফলে এখন তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব আওয়ামী লীগের এক অর্জনই বটে। শুধু আওয়ামি লিগই নয়, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাজনীতির জন্যও তাঁর এই পদে অভিষিক্ত হওয়া ছিল দারুণ সুখবর। তাঁর আগমনে জাতীয় পরিষদ বিচিত্র খোলামেলা আলোচনা ও মত প্রকাশে সরগরম হয়ে উঠল। তিনি এমনকি 'পররাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জাতিক চুক্তির মত স্পর্শকাতর বিষয়েও পরিষদে বিতর্কের ব্যবস্থা করেন'। (সাঈদ-উর ২০০১ : ৪৯) কিন্তু আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি, পশ্চিম পাকিস্তানের চারপ্রদেশের এক ইউনিট করা ইত্যাদির প্রশ্নে ক্ষমতার শরিক বিভিন্ন দল, এমনকি আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ তৈরি হয়। উপরন্তু রিপাবলিকান পার্টির বিরাগভাজন হয়ে পড়ায় সোহরাওয়ার্দিকেও শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়। এরপর ১৯৫৭ সালের ১৭ই অক্টোবর মুসলিম লিগের আই. আই. চুন্দ্রীগড় (১৮৯৯-১৯৬০) প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু তিনি পাকিস্তানে অভিন্ন নির্বাচনের পরিবর্তে পৃথক নির্বাচনের বিধি জাতীয় পরিষদে উত্থাপন করে তা পাস করাতে চরমভাবে ব্যর্থ হন। এর ফল হিসেবে মাত্র দুই মাসের মাথায় তিনিও পদত্যাগ করেন। এবার নানা দল এবং সম্ভাবনা ঘুরে আবার প্রধানমন্ত্রিত্ব গেল রিপাবলিকান দলের প্রতিনিধির হাতে। এই দলের মালিক ফিরোজ খান নুন (১৮৯৩-১৯৭০) হলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মন্ত্রিসভায় ন্যাপ, কংগ্রেস ও তফসিলী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি তো ছিলই, এমনকি আওয়ামি লিগও ছিল তাঁর মন্ত্রিসভার বলিষ্ঠ সমর্থক। তিনিই ১৯৫৪ সালের পর প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি সর্বদলীয় সম্মেলন ডেকে ১৯৫৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের চূড়ান্ত তারিখ নির্ধারণ করেছিলেন। এজন্যে ১৯৫৮ সালে ২রা অক্টোবর তিনি মন্ত্রিসভায় রদ-বদলও ঘটান। এর পাঁচ দিন পর অর্থাৎ ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর রাতেই দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা রাজনৈতিক অস্থিরতার অবসান ঘটিয়ে পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি

Dhaka University Institutional Repository

হয়। সামরিক আইন জারির কারণ হিসেবে ইস্কান্দার মির্জা যথারীতি ক্রমাগত বাড়তে থাকা রাজনৈতিক অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত, রাজনীতিবিদদের অসাধুতা ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া ত্রুটিপূর্ণ শাসনতন্ত্র ও মালিক ফিরোজ খান নুন কর্তৃক প্রস্তাবিত ১৯৫৯ সালের নির্বাচনে সহিংসতার আশঙ্কার কথাও তিনি বলেছিলেন সামরিক শাসন জারির কারণ হিসেবে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গঠিত হওয়া যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে দেওয়ার পর থেকে পূর্ব বাংলার শুধু নয়, পুরো পাকিস্তানের রাজনীতি ক্রমাগত জনবিশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছে। ১৯৫৮ সালের সামরিক আইন জারির মধ্য দিয়ে সমস্ত প্রকার রাজনীতি এবং সাধারণ মানুষের নানা অধিকার চরমভাবে হুমকির মধ্যে পড়ে গিয়ে দীর্ঘকাল কেবল ধূমায়িত ও অন্তর্দগ্ধ হয়েছে।

ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টির উদ্ভব

১৯৪৯ সালে যখন মুসলিম লিগের বাইরে এসে আওয়ামি মুসলিম লিগ গঠিত হয়, তখন তার সভাপতি হন মাওলানা ভাসানী। কিন্তু ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের পর পূর্ব বাংলায় সরকার গঠন নিয়ে যুক্তফ্রন্ট-সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শুরু হয় নানা মতদ্বৈধতা। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার নানা কূটচাল চেলে, প্রলোভনের ফাদে ফেলে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নানা ফাটল সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। নির্বাচিত মন্ত্রিসভা বাতিল করে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী নির্বাচিত করতে থাকে। এই ধারাবাহিকতার এক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী হন শহিদ সোহরাওয়ার্দি– একথা আগেই বলা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী হয়েই তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আমেরিকা ও বৃটেনের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় নানা চুক্তি। এসব চুক্তিতে আমেরিকা ও বৃটেনের মতো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতি পাকিস্তান সরকারের অতিরিক্ত পক্ষপাত প্রকাশিত হয়। এছাড়া সোহরাওয়ার্দি বিভিন্ন সভায় বলতে থাকেন যে, দুর্বল রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি বা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক মানে শূন্যের সঙ্গে শূন্যের যোগ ছাড়া কিছুই নয়। এসব নিয়ে আওয়ামী লীগের এই গুরুত্বপূর্ণ নেতা সোহরওয়ার্দির সঙ্গে আওয়ামী লীগের সভাপতি মাওলানা ভাসানীর সুস্পষ্ট মতবিরোধ দেখা দেয়। ভাসানী বরাবরই পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎশক্তির সঙ্গে যুক্ত না হয়ে বঞ্চিত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দিকে বেশি গুরুত্ব দেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। আসলে দুই নেতার মধ্যে পার্থক্য ছিল রাজনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ ও দর্শনের। সোহরাওয়ার্দি ছিলেন বুর্জোয়া রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির লোক। আর ভাসানী নির্যাতিত-বঞ্চিত মানুষের জন্যে যে সংগ্রামী রাজনীতি, সেই রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির লোক। ফলে সংগত কারণেই বিচ্ছেদ তাঁদের অনিবার্য হয়ে পড়ে।

দলের অভ্যন্তরের এই নীতিগত দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য ভাসানী টাঙ্গাইলের কাগমারিতে আওয়ামী লীগের বিশেষ এক কাউন্সিল সভা আহ্বান করেন। কিন্তু এতে কোনো মীমাংসা হয়নি। বরং বিভেদ আরো বেড়েছে। কাউন্সিল অধিবেশেনের বক্তৃতায় দুজনের আদর্শগত বিরোধ আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বক্তৃতায় ভাসানী সরকারের গৃহীত সাম্রাজ্যবাদ-ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আবেগপ্রবণ হয়ে কথা বলেন। তিনি এও বলেন যে, পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও অপরাপর ন্যায্য দাবি আমলে নিয়ে এর সমাধান না করলে পূর্ব বাংলার জনগণ ভবিষ্যতে পশ্চিম পাকিস্তানকে ‘ওয়ালাইকুম আস্‌সালাম’ জানাবে। বিপরীতক্রমে সোহরাওয়ার্দি তাঁর পররাষ্ট্রনীতির পক্ষে মত

Dhaka University Institutional Repository

তুলে ধরেন এবং পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন শতকরা ৯৮ ভাগ অর্জিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি এও বলেন যে, পূর্ব বাংলার স্বয়ত্তশাসনের দাবি রাজনৈতিক 'ভাওতাবাজি'। (দৈনিক আজাদ, ৮.২.৫৭) ফলে, কোনো প্রকার সিদ্ধান্ত ছাড়াই কাগমারির কাউন্সিল সভা শেষ হয়। 'তারপর থেকে সোহরাওয়ার্দি আরো পাশ্চাত্যঘেঁষা হয়ে উঠলেন। তিনি ওমানে সামরিক হামলাকে সমর্থন করলেন। এবং প্রেসিডেন্ট নাসেরের মধ্যপ্রাচ্য নীতির বিরোধী হয়ে উঠলেন।' (সাঈদ-উর ২০০১ : ৫১) শুধু তাই নয়, ভাসানীর পদত্যাগপত্র দেওয়া ও তা কার্যকর হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে; যখন তিনি ন্যায্যত আওয়ামী লীগের সভাপতি, তখন ভাসানীকে না জানিয়েই আওয়ামী লীগের বড় বড় সিদ্ধান্ত– ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত করা, পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন– গ্রহণ করা হয় বলে সংবাদ মাধ্যমে ভাসানী অভিযোগ করেন। এমতাবস্থায় তিনি আওয়ামি লিগে তাঁর আর প্রয়োজন নেই বলে মনে করে আওয়ামি লিগে না ফেরার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। যদিও তিনি যাতে দল ছেড়ে না যান এজন্য আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি শেখ মুজিবুর রহমান নিজে উদ্যোগী হয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেছেন। (আবদুল হক ১৯৯৬ : ৪৩-৪৪) 'কমিউনিস্ট পার্টির আন্ডার গ্রাউন্ড নেতৃত্ব পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দ্বিধাবিভক্তি রোধ করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই।' (অলি ২০১২ : ২৩৪-২৩৫)

১৯৫৭ সালের ২৫ ও ২৬শে জুলাই ঢাকায় 'ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টি' গঠিত হয়। পার্টি গঠন উপলক্ষে উক্ত দুদিনব্যাপী কর্মিসম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত কর্মিসম্মেলনে পশ্চিম পাকিস্তানের শখানেক প্রতিনিধিসহ প্রায় ৮০০ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। (আবদুল হক ১৯৯৬ : ৪৪) উক্ত কর্মিসম্মেলন থেকেই মাওলানা ভাসানী নবগঠিত দলের সভাপতি মনোনীত হন। দলটি গঠিত হয় অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যাশনাল পার্টি, পূর্ব পাকিস্তানের গণতন্ত্রী দল ও মাওলানা ভাসানীর সমর্থক প্রাক্তন আওয়ামি লিগপন্থীদের সমন্বয়ে। দল গঠনকালীন এ দলের সমর্থক অন্তত ৩০ জন আইন পরিষদের সদস্য ছিল এবং জাতীয় পরিষদে এর সমর্থক ছিল ৪ জন।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংহতি ও স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নে জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তান সরকার কমিউনিস্ট পার্টি বিষয়ে স্পর্শকাতরতা প্রদর্শন করে এসেছে। একারণে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট আদর্শীরা বরাবরই তিন উপায়ে তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়েছে; এক. আন্ডার গ্রাউন্ডে থেকে, দুই. প্রকাশ্য রাজনৈতিক দলের ভেতরে তার সদস্য হিসেবে এবং তিন. বিভিন্ন নামে ছাত্র সংগঠন খুলে । ১৯৫৭ সালের আগে পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় কমিউনিস্ট কর্মীরা বাহ্যত বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও আওয়ামী লীগের সদস্য থাকলেও তাদের মূল যোগাযোগ ও আদর্শ ছিল আন্ডার গ্রাউন্ড কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত। সেই বাস্তবতায় ১৯৫৭ সালে আসে এক নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে কমিউনিস্টদের একটা বড় অংশ সরাসরি যোগ দেয় মাওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত নতুন দল ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টিতে।[১৩] ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির আগেই দলটির একটি শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামো দাঁড়িয়ে যায়। পার্বত্য চট্টগাম ছাড়া পূর্ব বাংলার আর সবকটি জেলাতেই ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টির সংগঠন গড়ে ওঠে।

অল্প সময়ের মধ্যে দলটি সাংগঠনিক সফলতার পরিচয় দিলেও একথা অনস্বীকার্য যে, আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে এসে নতুন দল গঠন করায় পূর্ব বাংলার সম্মিলিত জাতীয়তাবাদী চেতনা দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে পড়ে। একারণে কেউ কেউ আওয়ামী লীগের এই ভাঙন বা অন্যকথায় ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টির গঠননের সিদ্ধান্তকে 'সর্বনাশা পদক্ষেপ' বলে অভিহিত করেছেন। (অলি ২০১২ : ২৩৪) শুধু তাই নয়, পূর্ব বাংলায় নিজেদের মধ্যে বিভক্তি, দোষারোপ আর প্রতিহিংসার রাজনীতিও এই ঘটনার মধ্য দিয়ে বিস্তার লাভ করে। এর ফলে আইয়ুবি স্বৈর শাসনের পথ কিছুটা হলেও নিষ্কণ্টক ও দীর্ঘায়িত হয়। কারণ বিভক্ত রাজনৈতিক শক্তি আর অবিভক্ত রাজনৈতিক শক্তির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামকে দানাদার করে তোলার শক্তি-সামর্থ্য সমান থাকে না।

গ. সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত : পাকিস্তান পর্ব

বিশ শতকের ষাটের দশকে পূর্ব বাংলার সংস্কৃতিতে চোখে পড়ার মতো এক স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদী জাগরণ লক্ষ করা যায়। কিন্তু ষাটের দশকের সংস্কৃতির এই স্বাতন্ত্র্য, এই জাগরণ হঠাৎ ষাটের দশকেই ঘটেনি। এর দূর প্রাথমিক ভিত্তি তৈরি হয়েছে বিভাগপূর্ব কাল থেকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবিলাসী অথবা সাংস্কৃতিক জাগরণ প্রত্যাশী প্রচেষ্টার মাধ্যমে। 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ,' 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি,' 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ' ইত্যাদি সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয় যা, আগেই আলোচিত হয়েছে। এসব সংগঠনের ভূমিকা যেমন সাংস্কৃতিক ছিল তেমনি ছিল রাজনৈতিক। এসব সংগঠনের কোনো কোনোটির ভূমিকা, আদর্শ-উদ্দেশ্য বিভাগপরবর্তী পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ঘাত-প্রতিঘাতের পরিপ্রক্ষিতে ষাটের দশকে এসে হয়ত প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। কোনো কোনো প্রচেষ্টা হয়ত উপযোগিতাও হারিয়েছে জাতীয়তাবাদী নব রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জাগরণের কাছে। কোনো কোনোটি তার মূল উদ্দেশ্য হাসিলের পর হারিয়েও গিয়েছে। আবার কোনো ধারা হয়ত আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যা-ই হোক না কেন, এসব সাংস্কৃতিক উদ্যোগ-আয়োজন-চর্চা-প্রচেষ্টা বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলা, এমনকি ষাটের দশকের পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রাথমিক প্রচেষ্টা এবং সফলতার দৃষ্টান্ত হিসেবে ক্রিয়াশীল থেকেছে। বিভাগপূর্ববর্তী পূর্ব বাংলার এসব সফল-অর্ধসফল, ব্যর্থ-অর্ধব্যর্থ সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম বিভাগপরবর্তী পূর্ব বাংলার প্রেরণা ও শিক্ষা হিসেবে প্রেরণা জুগিয়েছে।

পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস

একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে এবং অব্যবহিত পরে 'মুসলিম' এবং 'ইসলাম' শব্দযুগল রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উভয় অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করেছে। তবে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীভেদে এর ব্যাখ্যা-বাস্তবতা বিভিন্ন ছিল।

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বছরই অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর গঠিত হয় তমদ্দুন মজলিস। এই সাংস্কৃতিক সংগঠনটিও ইসলামি আদর্শকে কেন্দ্রে রেখে এক ধরনের আধুনিক জীবনচেতনার কথা বলে আত্মপ্রকাশ করেছিল। আধুনিকতা এবং বস্তুচেতনাকে যতটুকু ইসলামি জীবনাদর্শের সঙ্গে শুষে নেয়া যায়, ততটুকুর প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই সংগঠন তার কর্মকাণ্ড শুরু করে। কারণ, এই প্রতিষ্ঠান তার গঠনতন্ত্রে 'কুসংস্কার, গতানুগতিকতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা'কে দূর করে 'সুস্থ ও সুন্দর সংস্কৃতি গড়ে তোলার

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। যুক্তিবাদ, ধর্মভিত্তিক সাম্যবাদ আর মানবীয় মূল্যবোধের ভিত্তির ওপর তারা গণজীবন এবং শিল্পসাহিত্য গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তবে গণজীবনের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে 'নিখুঁত চরিত্র গঠন' করার বাসনা তাদের পূর্ণাঙ্গ আধুনিক জীবনচেতাকে কিছুটা হলেও আবিলতার আচ্ছাদন অন্তত আদর্শগতভাবে টেনে দিয়েছিল; এতে সন্দেহ নেই। আধুনিকতা আর ধর্মীয় আদর্শবাদিতার দোটানার মধ্য দিয়েও তমদ্দুন মজলিস দীর্ঘদিন– অন্তত ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত– অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে চিন্তা, শিল্প-সাহিত্য এবং প্রকারান্তরে রাজনীতিতে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে গিয়েছে।

তমদ্দুন মজলিসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক আবুল কাসেম (১৯২০-১৯৯২)। তিনি এই সংগঠনের প্রধান কর্মকর্তাও ছিলেন। এছাড়া এক সময়ের 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর অন্যতম সভ্য কাজী মোতাহার হোসেনও সংগঠনটির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। ছিলেন আবুল মনসুর আহমদও। 'দেশের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঠিক প্রতিফলন ঘটানোর ইচ্ছা নিয়ে তমদ্দুন মজলিস কাজ শুরু করে।' (রেজোয়ান ২০০৬ : ৪০)

তমদ্দুন মজলিস সংগঠনটির প্রকাশনা তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত সংগঠনটির মুখপত্র সাপ্তাহিক 'সৈনিক' নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এছাড়া সাপ্তাহিক সাহিত্যানুষ্ঠান ও বিচিত্র বিষয়ে তর্কসভার আয়োজন করা ছিল সংগঠনটির নিয়মিত অনুষ্ঠানের অংশ। তমদ্দুন মজলিসের সদস্যদের রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ছিল ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় পাঁচশত।

প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনকে সংগঠিত করা প্রতিষ্ঠানটির একটি বিশেষ কীর্তি। বাংলাকে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা করার দাবি এবং যৌক্তিকতা বিষয়ে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত তৎপরতার পর সাংগঠনিকভাবে তমদ্দুন মজলিসই বোধ করি প্রথম সোচ্চার ভূমিকা পালন করে। গবেষকের ভাষায়, 'তারা বাংলা ভাষাকে পূর্ব বাংলার সরকারী ভাষা ঘোষণার দাবী প্রথম উত্থাপন করেন এবং বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী তোলেন।' (রেজোয়ান ২০০৬ : ৪০) প্রতিষ্ঠার পনের দিনের মধ্যে ১৯৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে যুক্তি দিয়ে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা– না উর্দু' শিরোনামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করে। এতে অধ্যাপক আবুল কাসেমের প্রস্তাবনা বাদে কাজী মোতাহার হোসেন ও আবুল মনসুর আহমদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ছিল। তাঁদের প্রবন্ধ দুটির শিরোনাম ছিল যথাক্রমে 'রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা' এবং 'বাংলাভাষাই হইবে আমাদের রাষ্ট্র-ভাষা'। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে তমদ্দুন মজলিসের সম্পাদক আবুল কাসেম ভাষার প্রশ্ন আলোচনা ও বিবেচনার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে একটি সাহিত্যসভার আয়োজন করেন। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন পূর্ব বাংলা সরকারের মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার। আলোচকদের মধ্যে ছিলেন জসীমউদ্‌দীন, কাজী মোতাহার হোসেন, প্রাদেশিক মন্ত্রী সৈয়দ মহম্মদ আফজল এবং আবুল কাসেম প্রমুখ। বক্তাদের সবাই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে এর জন্য যথাযথ আন্দোলন গঠনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। (বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ৩০/১) এছাড়া "তমদ্দুন মজলিসের উদ্‌যোগে ১৯৫২ সালের ১৭-২০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত 'ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন' সেকালে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল।" (সাঈদ-উর ২০০১ : ২৭) ভাষা

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনের পর থেকে সংগঠনটির কর্মতৎপরতা ক্রমে স্তিমিত হয়ে পড়তে শুরু করলেও ১৯৫৭ পর্যন্ত এর মুখপত্র 'সৈনিক'-এর নিয়মিত প্রকাশনা এবং গ্রন্থ প্রকাশ অব্যাহত ছিল।

আদতে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তমদ্দুন মজলিসের সবচেয়ে উজ্জ্বল সময়। সংগঠনটির দ্বিতীয় ভাগে অর্থাৎ ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৭১ কাল পরিসরে ক্রমে সংগঠনটি নির্জীব হয়ে যেতে থাকে। গবেষক বলেন, 'এই দ্বিতীয় ভাগে তমদ্দুন মজলিস মোটামুটিভাবে রক্ষণশীলতাকে আশ্রয় করে দু'চারটা বৈঠক-সভা করা ছাড়া তেমন কোন বড় কাজে অংশ নিতে পারেনি এবং তার তৎপরতা হ্রাস পেতে পেতে তখন প্রায় নীরবতার পর্যায়ে চলে এসেছিল।' (রেজোয়ান ২০০৬ : ৪৯) এই সংগঠনটির ক্রমে 'প্রায় নীরবতার পর্যায়ে' চলে যাওয়ার কারণ হিসেবে অনেকে বলেন, এই সংগঠনের অনেকে ১৯৫৪ সালে সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর পর থেকেই সংগঠনটির সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ভাটা পড়ে। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে, ভাষা আন্দোলনের পর থেকে পূর্ব বাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তা এবং এই চিন্তা-চেতনাশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক তৎপরতা বেড়ে যাওয়ায় ক্রমে পাকিস্তানি ও ইসলামি জাতীয়তাবাদী চেতনাধারার সাহিত্য-সাংস্কৃতিক তৎপরতা কমতে থাকে। তমদ্দুন মজলিশের ক্রমে নীরব হয়ে যাওয়ার মূল এখানেই খুঁজতে হবে।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় যে-জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ও প্রকাশ ঘটেছিল, সেক্ষেত্রে তমদ্দুন মজলিস সংগঠনটি অন্যতম অনুঘটকের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে।

সংস্কৃতি সংসদ

সাংস্কৃতিক সচেতনতা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে ছিল প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক। এই সচেতনতা ক্রমে স্বাতন্ত্র্যের বোধ জন্ম দিয়েছে প্রকাশ্যভাবে। রাজনৈতিক বঞ্চনা আর অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের চেতনা ক্রমে স্পষ্ট হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক এই সচেতনতাই ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছে প্রান্তের দিকে।

সাংস্কৃতিক সচেতনতা থেকে ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক সংগঠন 'সংস্কৃতি সংসদ'। প্রথমে সংগঠনটির নাম 'সংস্কৃতি সংসদ' থাকলেও পরে এর নাম হয় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ'। 'কার্যত সংস্কৃতি সংসদ প্রায় প্রথম থেকেই ছিল নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক সংগঠন। সংস্কৃতি সংসদের আদর্শও ছিল সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও রুশ-বিপ্লব প্রভাবিত।' (রেজোয়ান ২০০৬ : ৭১) এই সংগঠনের সঙ্গে বিভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ওবায়দুল হক সরকার, আনোয়ারুল আজীম, এ জেড এম ওবায়দুল্লাহ খান (সেন্টু), হাসান হাফিজুর রহমান, জহির রায়হান, মুনীর চৌধুরী, এনামুল হক, আলাউদ্দিন আল আজাদ, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, খান সারওয়ার মুরশিদ, রফিকুল ইসলাম, কাজী জাফর আহমদ প্রমুখ। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এই সংগঠন উল্লেখযোগ্যভাবে সক্রিয় ছিল। ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংগঠনটি ছাত্র ইউনিয়নের সহযোগী সংগঠন হিসেবেই কাজ করেছে। কিন্তু ১৯৬৫ সালে পূর্ব

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন বিভক্ত হয়ে গেলে সংস্কৃতি সংসদও বিভক্ত হয়ে যায়। আদতে, এর পর থেকেই এই সংগঠনের কর্মকাণ্ড ক্রমে স্তিমিত হয়ে যেতে থাকে।

প্রথমে নাট্যাভিনয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও সংগঠনটির চৈতন্যে ছিল রাজনৈতিক সজ্ঞানতা। তাদের অভিনীত নাটকের মধ্যকার মূল বিষয় ছিল অসাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি আর গণমুখী মানবতাবাদ। এই বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যাবে সংগঠনটির প্রথম মঞ্চস্থ নাটকটি থেকে। তাদের প্রথম মঞ্চস্থ নাটক ছিল বিজন ভট্টাচার্যের Revbe›'x। বলা বাহুল্য, দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে লেখা গণচেতনাস্পর্শী এই একই নাটক ওই সময়ে কলকাতার কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক সংগঠন গণনাট্য সংঘও মঞ্চস্থ করেছিল। নাটক দিয়ে শুরু করলেও পরবর্তী ধাপে সংগঠনটির চর্চার বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় দেশাত্মবোধক গান ও গণসঙ্গীত। সংগঠনটি বিশ্বাস করত যে, সামন্তবাদের পরিসমাপ্তি জন্ম দিয়েছে ধনতন্ত্রের। আর ধনতন্ত্রকে নস্যাৎ করে ক্রমে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে সমাজতন্ত্রের হাওয়া। অর্থব্যবস্থার রূপান্তর যে-নতুন রূপান্তরিত সংস্কৃতিকে সম্ভবিত করে তুলছে, সেই নতুন গণসংস্কৃতির সাধনাই ছিল 'সংস্কৃতি সংসদ'-এর আরাধ্য। সংগঠনটির ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে গবেষক বলেছেন–

> সংগঠনটি প্রদেশভিত্তিক না-হলেও সদস্যরা পরবর্তীকালে প্রদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেকালে প্রদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় সংস্কৃতি সংসদের পরোক্ষ প্রভাব পড়েছিল সর্বত্র। (সাঈদ-উর ২০০১ : ২৮)

আরেক গবেষক সংগঠনটির ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'সংস্কৃতি সংসদ যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক সংগঠন ছিল, তা সত্ত্বেও গোটা পূর্ব বাংলার সংস্কারমুক্ত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে পাকিস্তান আমলে সংস্কৃতি সংসদ পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে।' (রেজোয়ান ২০০৬ : ৮২) প্রকৃত প্রস্তাবে, সংস্কৃতি সংসদ সংগঠনটির সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি আর রাজনৈতিক সচেতনতা পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের বাঙালি মধ্যবিত্তের চেতনাকে আবিলতামুক্ত করতে এবং নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে যে-ভূমিকা পালন করেছে, তা অলক্ষে, পূর্ব বাংলার জাতীয় চৈতন্যে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে জাগাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ১৯৩৯ সালে ঢাকায় 'প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সঙ্গে মূলত সাম্যবাদী চেতনায় আস্থাশীলদের সংশ্লিষ্টতা ছিল। কিন্তু সরকারি নির্যাতন ও নানাবিধ কারণে দেশবিভাগের পরে এই সংগঠনের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সাম্যবাদী চেতনার সংস্কৃতিসেবীদের তেমন কোনো সংগঠন ছিল না। অন্যদিকে চল্লিশের দশকের শেষ থেকে পঞ্চাশের দশকের শুরুতে পূর্ব বাংলায় পশ্চিম বাংলার সাহিত্যের প্রভাবে দুই ধরনের চেতনার শিল্পী-সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে; সমাজবাদী এবং আধুনিকতাবাদী। এই দুই শ্রেণির শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণির অধিকাংশই চেতনায় শুরুতে অন্তত রাজনীতি বিশ্লিষ্ট বিশুদ্ধ শিল্পবাদী, বুর্জোয়া উদারনীতিবাদী ছিলেন। এই পূর্বোক্ত দুই চেতনার শিল্পী-সাহিত্যিকদের সম্মিলিত হওয়ার বিশেষ একক কোনো সংগঠন ছিল না। এদের সম্মিলিত হওয়ার সংগঠনই ছিল মূলত পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫২ সালের শেষ দিকে গঠিত হয় পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ। কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১) ছিলেন সংগঠনটির সভাপতি। আর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন ফয়েজ আহমদ (১৯২৮-২০১২)। বিভিন্ন মেয়াদে আতোয়ার রহমান (১৯২৭-২০০২) এবং হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩৬-১৯৮৩)-ও ছিলেন এর সম্পাদক। এছাড়া আবদুল গণি হাজারী (১৯২৫-১৯৭৬), বোরহাউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (জ. ১৯৩৬) এবং আনিসুজ্জামান (জ. ১৯৩৭) প্রমুখ সংগঠনটির বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সংগঠনের সক্রিয় সভ্য ছিলেন জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-১৯৭৬), বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯), অজিতকুমার গুহ (১৯১৪-১৯৬৯), কামরুল হাসান (১৯২২-১৯৮৯), মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১), মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (জ. ১৯২৭), ফজলে লোহানী (১৯২৯-১৯৮৫), আনিস চৌধুরী (১৯২৯-১৯৯০), বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (জ. ১৯৩৬), সাইয়িদ আতীকুল্লাহ (১৯৩৩-১৯৯৮), আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী (জ. ১৯৩১), আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৯৩৪-২০০১), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬) প্রমুখ শিল্পী-সাহিত্যিক।

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের কর্মকাণ্ড মূলত বিশুদ্ধ শিল্পসাহিত্যিক আলোচনা-সমালোচনা-পাঠ ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। নিয়মিত সভা ছিল মূলত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদির আলোচনা-সমালোচনা নিয়ে। আর বিশেষ সভায় বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, ম্যাক্সিম গোর্কি প্রমুখ সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচনা সভাও করত সংগঠনটি। শুধু তাই নয়, সংগঠনটি ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ (১৮৬২-১৯৭২), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৯-১৯৭০), মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮)-কেও তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এনেছে স্মৃতিচারণার জন্য।

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ শিল্পী-সাহিত্যিকই পরবর্তী বাংলাদেশের সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন।[১৪]

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের ঘোষিত কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-আদর্শ ছিল না। তবে এঁরা ছিলেন রাজনীতির অভিঘাত তাড়িত। তার প্রমাণ ১৯৫৩ সালে একুশের প্রথম সংকলনটি সংসদের উদ্‌যোগে হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

১৯৫৪ সালে সর্বদলীয় সাহিত্যসম্মেলনের আয়োজন করাকে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের অন্যতম সাফল্য হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু এই সংগঠনটির ভূমিকা কেবল একটি সাহিত্যসম্মেলন আয়োজনের সার্থকতা দিয়ে বিচার করলে ভুল হবে। কারণ এই সংগঠন এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পী-সাহিত্যিকরা চেতনার দিক দিয়ে ছিলেন মুক্তচিন্তার অধিকারী, উদার মানবতাবাদী, কেউ কেউ সাম্যবাদী। এই চেতনা তখন অর্থাৎ পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝিতে পাকিস্তানি চেতনার পরিপন্থী হিসেবে বিবেচিত হতো। একারণে হাসান হাফিজুর রহমান এই সংগঠন সম্পর্কে বলেছেন, 'প্রতিক্রিয়ার কাছে এদেশের সাহিত্য যে আত্মসমর্পণ করেনি বা পরাজিত হয়নি, পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের ভূমিকাই তার জন্য সর্বতো কৃতিত্বের দাবীদার, এ এক ঐতিহাসিক সত্য।' (উদ্ধৃত, রেজোয়ান ২০০৬ : ৮৬) সংগঠনটির রাজনৈতিক তাৎপর্য বিবেচনা করেই তৎকালীন সরকার এটিকে ভলো চোখে দেখত না। পাকিস্তান সরকার এবং কট্টর পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী শিল্পী-সাহিত্যিকরা পাকিস্তান সাহিত্য সংসদকে কম্যুনিস্টদের সংগঠন বলে মনে

Dhaka University Institutional Repository

করত। একারণে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনার শিল্পী-সাহিত্যিকদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে সওগাত অফিসে– এখানেই পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সভা হতো সব সময়– পুলিশ হানা দেয়।[১৫]

সুতরাং পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ শুধু সাংস্কৃতিক একটি সংগঠন নয়, এটি সংস্কৃতি বিষয়ক রাজনীতির ধারক এক প্রতিষ্ঠানের নাম। এটি মাত্র ছয় বছর স্থায়ী থাকলেও পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি ও উপান্তে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার ধারণে ও প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। একারণে আমারা দেখব এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত শিল্পী-সাহিত্যিকরাই ষাটের দশকে গিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিশেষ ধারক ও শিল্পী হয়ে উঠেছেন।

ভাষা বিষয়ক বিতর্ক : ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক পর্যায়

ভাষা পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামকে দানাদার করে তোলার অন্যতম উপাদান। পাকিস্তান রাষ্ট্রে শুরু থেকেই পূর্ব বাংলা 'অপর' হয়ে যায়। এই 'অপর'কে পশ্চিম পাকিস্তান-নির্ভর শাসকগোষ্ঠী ঐক্যের বৈচিত্র্য হিসেবে কখনো নেয়নি। তারা সব সময় দুটি কাজ করতে চেয়েছে। একটি, পূর্ব বাংলাকে 'অপর' করে রেখেই তাকে নানা শোষণ-শাসনের আওতায় রাখা। দুই, পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের ইচ্ছার রঙে রঙিন করে নাই-করে ফেলা। এই নাই-করে ফেলার বাসনাকে তারা সব সময় নাম দিয়েছে পাকিস্তানি ঐক্য। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর তরফ থেকে এই ঐক্যকে বলা হতো পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদ প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের ঐক্যের অনুভূতিই বটে। কিন্তু এই ধরনের জাতীয়তাবাদী ঐক্য জবরদস্তি করে হয় না। জনগোষ্ঠীকে নিজে থেকেই ঐক্যের তাগিদ বোধ করতে হয়, বিসর্জনের প্রণোদনা অনুভব করতে হয়। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রে পূর্ব বাংলার জনগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ঐক্য এবং বিসর্জনের প্রণোদনা অনুভব করেনি। ভাষার ক্ষেত্রে আরো বেশি করে অনুভব করেনি। এক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠী যত ভাষার ঐক্যের জন্যে বাংলা ভাষাকে পাশ কাটাতে চেয়েছে, ততই পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের বিপরীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

পূর্ব বাংলার শিক্ষার মাধ্যম এবং সরকারি কাজের মাধ্যম বাংলা ভাষা হবে না– এই ধরনের কথার কথাকেও পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণ পর্যন্ত কেউ-ই কখনো সহজভাবে নেয়নি। একারণে লক্ষ করি, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেই বাংলাকে পাশ কাটিয়ে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার যুক্তির বিরুদ্ধে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সোচ্চার হয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে অর্থাৎ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেই, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জিয়াউদ্দিন আহমদ ভারতে যেমন হিন্দি পাকিস্তানে তেমনি উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত দেন। জিয়াউদ্দিন আহমদের উক্ত অভিমত নিয়ে কেউ কোনো প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বিষয়টি শিক্ষিত সমাজ ও সাধারণ জনগণকে জানানোর তাগিদ থেকে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' শীর্ষক এক প্রবন্ধ ˆ'wbK AvRv' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এতে তিনি যুক্তি দেখান যে, 'পাকিস্তানে ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাই শ্রেষ্ঠ'। তিনি বলেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যদি কোনো ভাষাকে করতেই হয় তবে বাংলাকে

Dhaka University Institutional Repository

করা উচিৎ; উর্দুর দাবি বাংলার পরে। তাঁর ভাষায়, 'যদি বাংলা ভাষার অতিরিক্ত কোন দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করতে হয়, তবে উর্দ্দু ভাষার দাবী বিবেচনা করা কর্তব্য।' (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৯৪ : ২১০/১) এরপর তিনি জিয়াউদ্দিনের বক্তব্যের বিরোধিতা করে যেকথা বলেন তা আরো তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন–

> ডাঃ যিয়াউদ্দীন আহমদ পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহনরূপে প্রাদেশিক ভাষার পরিবর্ত্তে উর্দ্দু ভাষার সপক্ষে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি একজন শিক্ষাবিদ্‌রূপে উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। ইহা কেবল বৈজ্ঞানিক শিক্ষানীতি বিরোধীই নয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতিবিগর্হিতও বটে। (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৯৪ : ২১১/১)

এখানে তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হচ্ছে ' প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার'। এই প্রবন্ধের মাস পাঁচেক পরে ১৩৫৪ সালের ১৭ই পৌষ ZKexi পত্রিকায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'পূর্ব্ব পাকিস্তানের শিক্ষার ভাষা সমস্যা' নামে এক প্রবন্ধ লেখেন বাংলার পক্ষে। সেখানে তিনি বলেন–

> হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক বাঙ্গালীর জন্য প্রাথমিক শিক্ষণীয় ভাষা অবশ্যই বাঙ্গালা হইবে। ইহা জ্যামিতির স্বীকৃত বিষয়ের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ। উন্মাদ ব্যতীত কেহই ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে পারে না। এই বাঙ্গালাই হইবে পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা।' (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৯৪ : ২১১/১)

এরপর প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সুস্পষ্ট অবস্থান নেয় তমদ্দুন মজলিস নামক সংগঠনটি। যদিও তমুদ্দন মজলিসের আগে 'গণ আজাদী লিগ' ও 'গণতান্ত্রিক যুব লিগ' নামে দুটি সদ্যগঠিত রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করা হয়। এদের এই দাবি তমদ্দুন মজলিসের মতো এত সংগঠিত পরিকল্পিত ছিল না। তমদ্দুন মজলিস ১৯৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা-না উর্দু' নামে পুস্তিকাও প্রকাশ করে। পুস্তিকার 'প্রস্তাব' অংশে আবুল কাসেম দাবি করেন, লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তানের প্রত্যেক ইউনিটকে স্বার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার অধিকার দেয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী প্রত্যেক ইউনিটকে তাদের নিজ নিজ প্রাদেশিক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণ করার স্বাধীনতা দিতে হবে। কাজী মোতাহার হোসেন উক্ত পুস্তিকায় 'রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা' নামক প্রবন্ধে ভাষার বাধা সৃষ্টি করে শাসকগোষ্ঠী যাতে পূর্ব বাংলার মানসিক বিকাশে বাধা তৈরি করতে না পারে এবিষয়ে নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণকে সজাগ করেন। একই পুস্তিকায় আবুল মনসুর আহমদ তাঁর 'বাংলা ভাষাই আমাদের রাষ্ট্রভাষা' প্রবন্ধে বলেন–

> উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিলে পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ রাতারাতি 'অশিক্ষিত' ও সরকারি চাকুরীর 'অযোগ্য' বনিয়া যাইবেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফারসীর জায়গায় ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে রাতারাতি 'অশিক্ষিত' ও সরকারি কাজের 'অযোগ্য' করিয়াছিল'।

আরো অনেকে বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্তের মধ্যে ইংরেজ উপনিবেশ এবং তার ভাষা ইংরেজির প্রচলনের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। ফরিদ আহমদ তাঁর *Before the twenty-first* এবং *The concept of Pakistan* (1966) গ্রন্থে বলেছেন–

> দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সাধারণ মানুষের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার আগ্রহ কারো মধ্যে দেখা গেলো না। উপরন্তু দেশের অবস্থা দেখে মনে হলো যেন সাদা প্রভুদের স্থলে শুরু হলো দেশীয় প্রভুদের এক নিশ্চিন্ত রাজত্ব। এই নোতুন প্রভুদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই পুঞ্জীভূত হতে থাকলো এবং তার

Dhaka University Institutional Repository

> ফলে সরকারি আমলারা ক্রমশ জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকলেন। এই সমস্ত সরকারি আমলারা উর্দুতে এবং ইংরেজিতে কথা বলতেন এবং তাঁদের প্রায় সকলের মাতৃভাষা ছিলো উর্দু। কাজেই অতি সত্বর সাধারণ মানুষেরা এই সব কর্মচারীদেরকে বিদেশী বলে চিহ্নিত করলো এবং তাদের ভাষা উর্দুও পরিগণিত হলো একটি বিদেশী ভাষা রূপে।' (বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ৩০/১)

তখন পর্যন্ত উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার কোনো ঘোষণা সরকারি পর্যায় থেকে আসেনি। কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ের বিভিন্ন লেখালেখি ও বক্তব্য এমন সম্ভাবনাকে আভাসিত করলে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় ব্যক্তিগত ও ক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে।

পূর্ব বাংলার সচেতন মহলের মধ্যে প্রথম কিছুটা সুস্পষ্ট সন্দেহ তৈরি হয় ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনকে ঘিরে। করাচির শিক্ষাসম্মেলন শেষে ৫ই ডিসেম্বর পূর্ব বাংলা সরকারের মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার ও আবদুল হামিদ ঢাকা বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের এক সাক্ষাৎকার দেন। পরের দিন g‌ibs ‌ibDR পত্রিকায় বলা হয় যে, শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। একই সাথে ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭-এ ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লিগের ওয়ার্কিং কমিটির সর্বশেষ বৈঠক বসে। ওয়ার্কিং কমিটির ওই বৈঠকে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা নিয়েও আলোচনা হয়। বিষয়টি জানতে পেরে বৈঠক চলাকালে বহুসংখ্যক ছাত্র ও কিছু শিক্ষক প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সরকারি বাসভবন 'বর্ধমান হাউসে' উপস্থিত হন। তারা বাংলাকে দ্রুত রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। (বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ৩০/১) সেখানে মাওলানা আকরম খান তাদের আশ্বাস দিলে তারা ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। প্রকৃতপক্ষে পূর্বোক্ত g‌ibs ‌ibDR পত্রিকার খবরটি সত্য নয় দাবি করে হাবিবুল্লাহ বাহার পরে পত্রিকায় বিবৃতি দেন। এই বিবৃতির পরপরই পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ থেকে প্রকৃত অবস্থা নিয়ে একটি বিবৃতি দেয়া হয়। এই তিন সংবাদ ও বিবৃতির মধ্যে কোনোটির সঙ্গে কোনোটির মিল ছিল না। এই অমিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের এবং সচেতন শিক্ষকদের উদ্বিগ্ন করে তোলে। পরিস্থিতি ক্রমে ধূমায়িত হতে থাকে। এর মধ্যে ১২ই ডিসেম্বর পলাশি ব্যারাক ও আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সরকারি কর্মচারী ও ছাত্ররা বহিরাগত দুর্বৃত্তদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। ধারণা করা হয় তারা ছিল অবাঙালি উর্দুভাষী। রাষ্ট্রভাষা উর্দুর পক্ষে তারা শ্লোগান দিয়েছিল। খবরটি শহরময় ছড়িয়ে পড়ে দাবনলের মতো। ছাত্র ও সরকারি কর্মচারীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ সমবেত হয়ে একটি মিছিল করে সেক্রেটারিয়েটে জোরপূর্বক ঢুকে পড়ে। তাদের মিছিলের দাবি ছিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। এরপর রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে ক্রমে পরিস্থিতি উত্তপ্ত ও ঘোলাটে হতে থাকে। ক্রমে এই উত্তাপের সঙ্গে সরকারের বিভিন্ন মহলের বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গির সংঘর্ষ বাড়তে থাকে। এরমধ্যে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা দেয়, তাদের অধীনের সব স্কুল-কলেজে বাংলা ভাষায় শিক্ষাদান করা হবে। এছাড়া ১৯শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার নাগরিকবৃন্দের নামে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদান, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সিলেটের বিশিষ্ট মহিলাদের খাজা নাজিমুদ্দীনের কাছে বাংলার পক্ষে স্মারকলিপি প্রদান, রাষ্ট্রভাষা উর্দুর পক্ষেও নানা পত্রপত্রিকা ও ব্যক্তির যুক্তিতর্ক পরিস্থিতিকে ক্রমে আরো ঘোলাটে করে তোলে। এর মধ্যে ১৯৪৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণ-পরিষদের

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধিবেশন আহূত হয়। উক্ত অধিবেশনে যোগদানের জন্য ঢাকা ত্যাগ করার পূর্বে ১৯৪৭-এর অক্টোবরে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে গঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি প্রতিনিধি দল আবুল কাশেমের নেতৃত্বে দেখা করেন পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি নূরুল আমীন, হাবিবুল্লাহ বাহার প্রমুখের সঙ্গে। সাক্ষাৎ করে তারা পাকিস্তানের মুদ্রা, ডাক টিকিট, মানি অর্ডার ইত্যাদিতে বাংলা ভাষা বাদ দেয়ার নিন্দা জানান এবং বিষয়টি নূরুল আমীন প্রমুখ সংশোধনের আশ্বাস দেন।

ভাষাবিতর্ক : রাষ্ট্রীয় পর্যায়

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে প্রথম রাষ্ট্রীয় সংশ্লিষ্টতা এবং জটিলতা তৈরি হয় পাকিস্তানের গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশনকে কেন্দ্র করে। এটি ছিল নতুন রাষ্ট্রের প্রথম সংসদ অধিবেশন। সঙ্গত কারণে প্রথম দিনের আলোচনায় স্থান পায় পাকিস্তান গণ-পরিষদের কার্যনির্বাহ সংক্রান্ত আইনের খসড়ার ওপর আলোচনা। গণ-পরিষদ কীভাবে চলবে সে-সংক্রান্ত খসড়া আইনে বলা হয়, গণ-পরিষদে দুটি ভাষা ব্যবহার করা যাবে, উর্দু ও ইংরেজি। এর মানে দাঁড়ায়, পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রীয় কাজে এদুটি ভাষাকেই গ্রহণ করার পক্ষপাতী। এই খসড়া আইনের ওপর একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। অধিবেশনের তৃতীয় দিনে অর্থাৎ ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮-এ গণ-পরিষদে ব্যবহারের জন্য স্বীকৃত ভাষার প্রশ্নে উত্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর আলোচনা হয়। ধীরেন্দ্রনাথের পক্ষ থেকে সংশোধনী প্রস্তাবটি ছিল, উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষাকেও গণ-পরিষদে ব্যবহারের যোগ্য ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের এই প্রস্তাবের ওপর আলোচনার সময় গণ-পরিষদে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। এই বিতর্কে স্বয়ং পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানও অংশগ্রহণ করেন। তিনি তীব্র ভাষায় এই প্রস্তাবের নিন্দা জানান। তিনি বলেন–

> এখানে এ প্রশ্নটা তোলাই ভুল হয়েছে। এটা আমাদের জন্যে একটি জীবনমরণ সমস্যা। আমি অত্যন্ত তীব্রভাবে এই সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধিতা করি এবং আশা করি যে এ ধরনের একটি সংশোধনী প্রস্তাবকে পরিষদ অগ্রাহ্য করবেন। (বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ৫৩/১)

তিনি শুধু এর নিন্দা করেননি, এই প্রস্তাবকে তিনি প্রকারান্তরে সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট বলে ইঙ্গিত করেন। তিনি এই প্রস্তাবকে 'একটি সাধারণ ভাষার দ্বারা ঐক্যসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করার' পাঁয়তারা হিসেবে উল্লেখ করেন। ওইদিন সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর আরো যারা আলোচনায় অংশ নেন, তারাও সবাই লিয়াকত আলী খান প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হয়েছেন। তারা এই বলে মত দেন যে, 'উর্দু মুসলিম সংস্কৃতির ভাষা'। পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন আরো এককাঠি এগিয়ে বলেন– 'পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসীরই এই মনোভাব যে একমাত্র উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।' (বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ৫৪/১)

সেদিনের সেই সংশোধনী প্রস্তাবের পক্ষে মুসলিম কোনো সদস্য কথা বলেননি। মুসলমান সদস্যরা সকলেই ছিলেন সরকারি মুসলিম লিগ দলভুক্ত। সে কারণে বাঙালি-অবাঙালি সব সদস্যই সংশোধনী প্রস্তাবটির নিন্দা এবং বিরোধিতা করেছেন। ধীরেন্দ্রনাথের উত্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাবটি শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে সেই প্রস্তাবের আলোচনায়। কারণ গণ-পরিষদের ব্যবহারের স্বীকৃতি মানে

Dhaka University Institutional Repository

তো রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতি আদায়ের সেদিনের আলোচনায় বাংলাকে সমর্থন করে যাঁরা বক্তৃতা করেছিলেন তাঁদের সবাই ছিলেন হিন্দু এবং কংগ্রেস দলভুক্ত। (বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ৫৩/১) গণ-পরিষদে কংগ্রেস দলের সেক্রেটারি রাজকুমার চক্রবর্তী সেদিন বাংলার সমর্থনে কথা বলেছিলেন। তিনি কোনো বিভাজন তত্ত্বে যাননি। সাম্প্রদায়িকতার বিতর্কের পথও মাড়াননি। তিনি যুক্তি দেখিয়েছিলেন শ্রেণি, গণতন্ত্র এবং আধিপত্যবাদের যুক্তি। তিনি মোক্ষম জায়গাটি শনাক্ত করে বলেছিলেন–

> উর্দু পাকিস্তানের কোন প্রদেশেরই কথ্য ভাষা নয়। তা হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের উপরতলার কিছুসংখ্যক মানুষের ভাষা। পূর্ব বাঙলা এমনিতেই কেন্দ্রীয় রাজধানী করাচী থেকে অনেক দূরে অবস্থিত, তার উপর এখন তাদের ঘাড়ে একটা ভাষাও আবার চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। একে গণতন্ত্র বলে না। আসলে এ হলো অন্যান্যদের উপর উচ্চশ্রেণীর আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা। বাংলাকে আমরা দুই অংশের সাধারণ ভাষা করার জন্য চাপ দিচ্ছি না। আমরা শুধু চাই পরিষদের সরকারি ভাষা হিসাবে বাংলার স্বীকৃতি। ইংরেজীকে যদি সে মর্যাদা দেওয়া হয় তাহলে বাংলা ভাষাও সে মর্যাদার অধিকারী। (উদ্ধৃত, বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ৫৪/১)

কিন্তু এসব কথায় সেদিন কোনো ফল হয়নি। বাংলাকে গণ-পরিষদের অন্যতম ভাষা করার প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। এখবর ঢাকায় প্রকাশিত হলে ছাত্র, রাজনীতিক ও শিক্ষিত মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই প্রতিক্রিয়া ক্রমে আন্দোলনে রূপ নিলে ক্রমে এর নাম হয়ে ওঠে ভাষা আন্দোলন। খাজা নাজিমুদ্দীনের অসত্য ভাষণ, আর গণ-পরিষদে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিদের বাংলার বিপক্ষে অবস্থান নেয়ার ঘটনা, প্রতিক্রিয়াকে তীব্রতর করে তুলেছিল। প্রতিক্রিয়ার অংশ হিসেবে ঢাকার ছাত্র সম্প্রদায় ২৬শে ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট পালন করে। ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কামরুদ্দীন আহমদ, রণেশ দাশগুপ্ত, অজিত গুহ, আবুল কাসেম, সরদার ফজলুল করিম, শওকত আলী, মহম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, শামসুল হক, শহীদুল্লা কায়সার, তাজউদ্দিন আহমদ প্রমুখ। উক্ত সভায় ভাষা আন্দোলনকে আরো বেগবান ও সুষ্ঠু করার জন্য 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' নামে একটি সর্বদলীয় পরিষদ গঠিত হয়। উক্ত পরিষদে গণআজাদী লিগ, গণতান্ত্রিক যুব লিগ, তমদ্দুন মজলিস, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক হল ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লিগের প্রত্যেকটি থেকে দুইজন করে প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি পরবর্তীতে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ধর্মঘট পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়।

১১ই মার্চ যথারীতি ধর্মঘটকে বানচাল করার জন্য পূর্ব বাংলা সরকার ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়। সংগ্রাম কমিটিও ঢাকার বিভিন্ন পয়েন্টে ব্যাপক ভিত্তিক পিকেটিং-কর্মী জমায়েত করে। সেদিন ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের সঙ্গে হরতালকারীদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। ছাত্র নির্যাতন প্রবল রূপ ধারণ করে। এতে ধর্মঘটকারীদের মধ্যে আহত হয় ২০০, গুরুতরভাবে আহত হয় ১৮, পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয় ৯০০ এবং জেলবন্দি হয় ৬৯ জন।

ভাষা বিতর্ক : রাজনৈতিক পর্যায়

প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষাকে নিয়ে প্রথমে দাবিটি ছিল গণ-পরিষদে ব্যবহারের দাবি। ক্রমে এটি রাষ্ট্রভাষার অব্যর্থ দাবিতে পরিণত হয়। এই দাবি ক্রমে সাংস্কৃতিক ও ব্যক্তিগত বুদ্ধিজীবিতার পর্যায় অতিক্রম করে

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক পর্যায়ে চলে যায়। প্রকৃতপ্রস্তাবে, ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চের কর্মসূচিটি ছিল একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি। এই কর্মসূচির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যারা জড়িত ছিলেন তারা কমবেশি সবাই ছিলেন পার্লামেন্টারি মুসলিম লিগের উপদলের সদস্য। এই উপদলীয় রাজনৈতিক বিভাজনের উদ্ভব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেই হয়েছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেই খাজা নাজিমুদ্দীন, শহিদ সোহরাওয়ার্দি আর আবুল হাশিম অনুসারী অন্তত তিনটি উপদল ক্রিয়াশীল ছিল। 'দেশভাগের পর আবুল হাশিম বর্ধমানে থেকে যাওয়ায় তাঁর সমর্থক ছাত্রদের একটি প্রভাবশালী অংশ সোহরাওয়ার্দী সমর্থক পূর্ব বাংলা মুসলিম লিগ পার্লামেন্টারি উপদলের সাথে যুক্ত হয় এবং অন্য একটি অংশ বামপন্থী রাজনীতির সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথম দলের মধ্যে শেখ মুজিবর [মুজিবুর] রহমান, শওকত আলী, নূরুদ্দীন আহমদ, সালেহ আহমদ, মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় দলের মধ্যে ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ, মহম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ প্রভৃতি। ছাত্রদের যে-উপদলটি নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করতো তার মধ্যে শাহ আজিজুর রহমান, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ ছিলেন নেতৃস্থানীয়।' (বদরুদ্দীন উমর ১৯৯৫ : ৮৮-৮৯/১) প্রকৃতপক্ষে, ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় নাজিমুদ্দীন সমর্থক অংশ ছাড়া বাকিরা সবাই একত্র হয়ে ভাষা আন্দোলনের সংগ্রাম করেছে। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চের আন্দোলন থেকেই প্রকৃতপক্ষে ভাষা আন্দোলন উপর্যুক্ত রাজনৈতিক কর্মী-সংগঠন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়েছে।[১৬]

১১ই মার্চের ছাত্র নির্যাতনের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে ঢাকার নাজিমুদ্দীন সমর্থিত পার্লামেন্টারি মুসলিম লিগের ছাত্র সংগঠন ছাড়া সকল সংগঠন। এ সময় চলতে থাকে নানা প্রতিবাদ-বিক্ষোভ এবং প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের ওপর চাপ প্রয়োগ। সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ খাজা নাজিমুদ্দীনকে দিয়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেন এবং ছাত্র নির্যাতনের বিচার সংবলিত একটি আট দফা চুক্তিও স্বাক্ষর করিয়ে নেন। ইতোমধ্যে ঘোষিত হয় ১৯শে মার্চ মুহম্মদ আলী জিন্নাহর পূর্ব বাংলা সফরের সংবাদ।

স্মর্তব্য যে, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত পূর্ব বাংলার রাজনীতিক, ছাত্র সমাজ বা জনগণের মধ্যে পাকিস্তানের অখণ্ডতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ছিল না। তাঁদের এই আন্দোলন ছিল শুধু বাংলার রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি আদায়ের আন্দোলন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটি ছিল গণতান্ত্রিকতার আর ন্যায্যতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কারণ পাকিস্তানের দুই তৃতীয়াংশের ভাষাকে উপেক্ষা করা মানে গণতন্ত্রকে অস্বীকার করা, ন্যায্যতার দাবিকে অস্বীকার করা। এর সঙ্গে পূর্ব বাংলার স্বকীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার মনোভঙ্গিও কম ক্রিয়াশীল ছিল না। তবে, যা-ই থাকুক না কেন, পাকিস্তানের অখণ্ডতা তখনো প্রশ্নবিদ্ধ হয়নি। কারণ রাষ্ট্রভাষার দাবিতে করা এতদিনের অব্যাহত ছাত্র নির্যাতন, গ্রেফতার ইত্যাদির মধ্যেও ১৮ই মার্চ ১৯৪৮-এর রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির বৈঠকে ১৯শে মার্চ তারিখে আগত 'জিন্নাহকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করার উদ্দেশ্যে একটি ছাত্র সম্বর্ধনা কমিটি গঠনেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।' (বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ৮৬/১) এ থেকে আরো একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, জিন্নাহর ওপর থেকে তখনো পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ আস্থা হারায়নি। হয়ত তাদের মধ্যে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে এক ধরনের প্রত্যাশাও কাজ করে থাকবে।

জিন্নাহ ঢাকায় আসলেন ১৯শে মার্চ ১৯৪৮। ২১শে মার্চ তাঁকে রেসকোর্স ময়দানে ব্যাপক গণ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেদিন প্রায় একঘণ্টা বক্তৃতা করেন তিনি। কিন্তু তাঁর রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত বক্তব্য, বিশেষত

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রামকারীদের হতাশ করে। তাঁর বক্তব্যের মূলকথা ছিল 'উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে অন্য কোনা ভাষা নয়। যুক্তি হিসেবে তিনি পাকিস্তানের অখণ্ডতার কথা বলেন বারবার; মুসলমানিত্বের কথা বলেন বারবার। অন্য কোনো ভাষাকে যারা রাষ্ট্রভাষা করতে চায়, তিনি তাদের 'রাষ্ট্রের শত্রু' আখ্যা দেন। তিনি তাঁদের 'কমিউনিস্ট' এবং 'বিদেশীদের সাহায্যপ্রাপ্ত এজেন্ট' বলেও ইঙ্গিত করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি এবং আন্দোলনকে 'ভারতের সাথে পূর্ব বাংলাকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা' বলেও মন্তব্য করেন। মুসলিম লিগের বাইরের যেকোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে 'ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ' বর্ণনা করে তিনি মুসলিম লিগকে উপস্থিত জনতা এবং পাকিস্তানের মুসলমানদের 'একটি পবিত্র আমানত' হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায়, পূর্ব বাংলা প্রদেশের সরকারি ভাষা সম্পর্কে বলেন 'এটি এই প্রদেশের অধিবাসী এবং জনপ্রতিনিধিরাই ঠিক করবেন।' 'মুসলিম লিগ ও উর্দুর পক্ষে মতামত ব্যক্ত করার ফলে ছাত্র সমাজ, এমনকি জনসাধারণের একাংশ জিন্নাহর বিরুদ্ধে কিছুটা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ... রেসকোর্সের বক্তৃতার পর ছাত্রদের মধ্যে জিন্নাহর জনপ্রিয়তা অনেকাংশে ক্ষুণ্ন হয় এবং তার ফলে বাংলার প্রতি সমর্থনও বৃদ্ধি পায়।' (বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ৯৬/১) কারণ ছাত্ররা জিন্নাহর কাছে সেদিন নিরপেক্ষতা এবং নাজিমুদ্দীন সরকার কর্তৃক তাদের ওপর নির্যাতনের নিন্দা আশা করেছিল। সে আশা সেদিন তাদের পূরণ তো হয়ইনি, এমনকি ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনেও তিনি একই মনোভাব ব্যক্ত করে আরো হতাশ এবং ক্ষুব্ধ করেন। সমাবর্তনের অনুষ্ঠানে জিন্নাহ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা পুনর্ব্যক্ত করলে কিছু ছাত্র চিৎকার করেন এবং এর প্রতিবাদ করেন। 'এই প্রতিবাদে জিন্নাহ বোধ করি অবাক এবং আহত হয়ে কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ থেকে' আবার বক্তব্য শুরু করেছিলেন।

একই সফরে ২৪শে মার্চ সন্ধ্যায় জিন্নাহ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ দেন।[১৭] সেখানেও জিন্নাহ একই অনমনীয় মনোভাব ব্যক্ত করলে সেখানে এক রকমের বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। এমনকি জিন্নাহ 'রীতিমতো ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং ... সংগ্রাম পরিষদের, ... সদস্যদের উচ্চকণ্ঠে বকাবকি করতে থাকেন।' (বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ৯৯/১) সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি জিন্নাহর কাছে দেয়ার মধ্য দিয়ে সেই সাক্ষাৎ ও আলোচনা এক প্রকার নিষ্ফলতার মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

এরপর ভাষা আন্দোলনের গতি কিছুটা থমকে যায়। কারণ হিসেবে বদরুদ্দীন উমর বলেছেন–

> তাঁর (জিন্নাহ) এই আচরণ সত্ত্বেও পূর্ব বাঙলায় ভাষা আন্দোলন ১৯৪৮ সালে আবার নতুনভাবে শুরু করা সম্ভব হয়নি। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন-বিরোধী নানা উক্তি এবং পূর্ব বাঙলার জনসাধারণের বিভিন্ন দাবি-দাওয়াকে প্রাদেশিকতা আখ্যা দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আনুগত্যের আহ্বান সত্ত্বেও জিন্নাহর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা এবং তাঁর প্রতি সাধারণ মানুষের অপরিসীম শ্রদ্ধাই এই পর্যায়ে নতুন আন্দোলন গঠনের পক্ষে ছিলো মস্ত বাধাস্বরূপ। (বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ১০৮-১০৯/১)

জিন্নাহর ঢাকা সফরের পর ভাষা আন্দোলনের উত্তাপ কমে যায়। এমনকি জিন্নাহর ঢাকা সফরের পর ১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিল পূর্ব বাংলার ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে নাজিমুদ্দীন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে করা আট দফা চুক্তিকে অস্বীকার করেন। এজন্য তিনি মার্চ মাসে ঢাকায় জিন্নাহর উর্দুর পক্ষে করা বক্তৃতা এবং মনোভাবের দোহাই দেন। অর্থাৎ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় গণপরিষদে

Dhaka University Institutional Repository

পাঠানোসহ আটদফা চুক্তি তিনি এক প্রকার অস্বীকার করে ঠারে-ঠোরে উর্দুর পক্ষে অবস্থান নেন। এরপরও ভাষা আন্দোলন আর তেমন জমে ওঠেনি, বরং ঝিমিয়ে যায়। কারণ হিসেবে জিন্নাহর প্রতি তখনো বিরাজ মান 'সম্মোহন', ভাষা আন্দোলন কর্ম-পরিষদের নেতৃত্বের মতদ্বৈধতা, পালামেন্টারি নেতৃবৃন্দের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভাষা আন্দোলনের ব্যবহারকে কেন্দ্র করে মুসলিম লিগের সোহরাওয়ার্দি সমর্থক উপদলের মধ্যে সৃষ্ট ভাঙন ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। (বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ১০৮, ১০৯, ১৩৩/১ আহমদ রফিক ২০০৬ : ২৬) ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত ভাষা আন্দোলন সত্যিকার অর্থেই ঝিমিয়ে যায়।

১৯৫১ সাল থেকে রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক আন্দোলন-তৎপরতা আবার বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর কারণ নানাবিধ। ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি পুনর্গঠিত হয়। এবার আবদুল মতিন (১৯২৬-২০১৪)-কে এর আহ্বায়ক করা হয়। তাঁর এবং কমিটির সচেতনতা ও সক্রিয়তায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি বিষয়ক সচেতনতা ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় পূর্বের ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত সংগঠন যুব লিগের দেশময় শাখা গঠন ও তৎপরতা। এছাড়া ১৯৫০ সালে শাসনতন্ত্র মূলনীতি নির্ধারক কমিটি তাদের মূলনীতি প্রস্তাব প্রকাশ করে। এতে উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করা হয়। উক্ত প্রস্তাবে শুধু রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গ নয়, অন্যান্য প্রস্তাবও ছিল মূলত পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক অধিকার বিরোধী। এর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় জনপর্যায়েও আন্দোলন, প্রতিবাদ, বিক্ষোভ হয়। এটিও ১৯৫১ সালে ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ। ১৯৫১ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বেশ সক্রিয় হলেও ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারির আগ পর্যন্ত বড় কোনো আন্দোলন সংঘটিত হয়নি। তবে ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের পর প্রতিবছর ১১ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস পালিত হয়েছে।[১৮]

তবে, ১৯৫১ সালের নতুন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কমিটির সক্রিয়তা ছিল চোখে পড়ার মতো। ১১ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস উদ্‌যাপন থেকে শুরু করে ১৯৫২ সালের গোড়া পর্যন্ত এই কমিটি যথেষ্ট সক্রিয়তার পরিচয় দিয়েছিল। ১১ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকা শহরের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। এছাড়া কমিটির এসময়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে রয়েছে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি সংবলিত স্মারকলিপি কেন্দ্রীয় সংবিধান সভার সদস্য, প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এবং পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন সংবাদ পত্রের কাছে পাঠানো। এছাড়া ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৮ তারিখে এই কমিটি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করে যে, 'পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রে যদি দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রভাষার প্রচলন নাও থাকতো তবুও আমরা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করবার আন্দোলন করতাম।' এর আগে ছাত্রনেতারা এত দৃঢ়তার সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে এরকম ঘোষণা দিয়েছে বলে মনে হয় না। এই শক্তি আর দৃঢ়তার উৎস বোধ করি ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত জাতীয় জীবনে ঘটে যাওয়া নানা আন্দোলন-সংগ্রাম-বিক্ষোভ-প্রতিবাদ। মধ্যবর্তী সময়ের এসব আন্দোলন-সংগ্রামের সাফল্য-ব্যর্থতার ভেতর দিয়ে এ-পর্যায়ে এসে ভাষা আন্দোলন একটি শক্ত আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছে।

তবে, ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারির পর। এই দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ঢাকার পল্টন ময়দানের এক জনসভায় উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার

ঘোষণা দেন। এক্ষেত্রে তিনি ১৯৪৮ সালে জিন্নাহর ঘোষণা ও আকাঙ্ক্ষার দোহাই দেন। শুধু তাই নয়, আরবি অক্ষরে বাংলা প্রচলনের সরকারি প্রচেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষার কথাও তিনি বলেন।

এই ঘোষণার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ প্রতীক ধর্মঘটসহ মিছিল করে। এই প্রথম কোনো মিছিল থেকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় কোনো প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে আওয়াজ ওঠে 'নাজিমুদ্দীন গদী ছাড়ো।' ২৭শে জানুয়ারির ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় ৩১শে জানুয়ারি আওয়ামি মুসলিম লিগের ছাত্রফ্রন্ট ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লিগ একটি সর্বদলীয় সভা আহ্বান করে।[১৯] (বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ১৫৪/৩) ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৩১শে জানুয়ারির উক্ত সভায় পূর্ব পাকিস্তান যুব লিগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লিগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামি মুসলিম লিগ, তমদ্দুন মজলিস, নিখিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লিগ, ইসলামি ভ্রাতৃসংঘ, পূর্ব পাকিস্তান মোহাজের সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দসহ ঢাকার কিছু নেতৃস্থানীয় নাগরিক ও বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় বিভিন্ন সংগঠনের প্রায় চল্লিশ জন প্রতিনিধি নিয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। এই দিন সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির সভায় ২১শে ফেব্রুয়ারি 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' পালনের লক্ষ্যে ওই দিন পূর্ব বাংলা প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (এম আর আখতার ২০১২ : ৬৫)

উক্ত কমিটির তৎপরতায় ৪ঠা ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘট ও মিছিল হয়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারির মিছিল ভাষা আন্দোলনের প্রথম মিছিল যেখানে 'শহরের বাসিন্দারা বিপুল উৎসাহের সঙ্গে মিছিলে নানাভাবে অংশগ্রহণ করেন।' শুধু তাই নয় এই মিছিল ছিল প্রায় 'দেড় দুই মাইল লম্বা'। 'ঢাকা শহরে এতবড় শোভাযাত্রা পূর্বে আর কখনো হয়নি।' (বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ১৫৯, ১৬৮/৩) প্রকৃতপক্ষে, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি শুধু ঢাকায় নয় ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, মানিকগঞ্জ, দিনাজপুর, চাঁদপুর, ফেনীসহ আরো নানা জায়গায় ধর্মঘট পালিত হয়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারির ধর্মঘট ও মিছিল দেখে কমিউনিস্ট পার্টি একটি দীর্ঘ সার্কুলার প্রচার করে। এতে তারা ভাষা আন্দোলনকে শহরের ছাত্র আর মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে কৃষক-মজুরসহ সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার তাগিদের কথা বলেন।

২০শে ফেব্রুয়ারি আওয়ামি মুসলিম লিগের অফিসে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের এক সভা হয়। ইতোমধ্যে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে সমগ্র ঢাকা শহরে ২০শে ফেব্রুয়ারি থেকে পরবর্তী ত্রিশ দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির ২০ তারিখের সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে-বিপক্ষে নানা মত-মতান্তর হয়। অবশেষে সিদ্ধান্ত হয় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার। কারণ হিসেবে অনেকেই বলেন, ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামের পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কার কথা। ২১শে ফেব্রুয়ারিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক ছাত্র-সংগঠন ও বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ভোর থেকে সমাগত হতে থাকে। উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ক্রমাগত ক্ষোভ উত্তাল হয়ে উঠলে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ছাত্রছাত্রীরা একত্রভাবে চেয়েছিল ঐ দিন প্রাদেশিক পরিষদের চলমান সভায় তাদের প্রতিবাদের ভাষাকে জানান দিতে। এজন্য তারা বর্ধমান হাউসের দিকে যেতে চাইলে পুলিশের বাধার সম্মুখীন হয়। সকাল থেকে চলতে থাকে পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। এক পর্যায়ে বেলা

Dhaka University Institutional Repository

৩টা সাড়ে তিনটার দিকে পুলিশ গুলি চালালে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে আন্দোলনরতদের অনেকের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শুধু ঢাকায় ধর্মঘট বিক্ষোভ-আন্দোলন হয়েছিল তা নয়। পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় সেদিন আন্দোলন হয়েছিল। ঢাকাসহ এসব জেলার আন্দোলনে শুধু শহরের মধ্যবিত্ত ও ছাত্ররাই অংশগ্রহণ করেনি, সাধারণ শ্রমজীবী মানুষও এতে অংশগ্রহণ করে। এমনকি অনেক গ্রামে-গঞ্জেও এই আন্দোলন পালিত হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া, দাউদকান্দি, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারিপুরের শিবচর, রাজশাহী, মাইজদি, রংপুর, সোনাইমুড়ি, খিলপাড়া, খুলনা, পাবনা, চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল, সন্দীপ, ঈশ্বরগঞ্জ, বালিমুড়ি প্রভৃতি শহর, গঞ্জ ও গ্রামে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ মিছিল ও সভা সমাবেশ হয়েছিল বলে ২১শে ফেব্রুয়ারির পরের দিন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছিল। ২১শে ফেব্রুয়ারির পর ভাষা আন্দোলনের ঢেউ ও ২১ তারিখের প্রতিক্রিয়া দ্রুত সারাদেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৩ই মার্চ ১৯৫২ সালে bl‡ejvj পত্রিকায় লিখেছে–

> পূর্ব বাঙলায় আজ যে গণ আন্দোলন চলছে তা শুধু শহরের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নাই। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরেও ছড়িয়ে পড়েছে। ছাত্রকর্মী ও যুবকদের তৎপরতায় আন্দোলন আজ সাফল্যের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।
>
> গোপালগঞ্জ অঞ্চলে আন্দোলনের বিশেষ সাড়া দেখা গিয়াছে। ঢাকায় বীভৎস ও মর্মন্তুদ ঘটনায় ছাত্র ও জনসাধারণ খুবই মর্মাহত ও বিক্ষুব্ধ হয়েছে, গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলি বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারি হইতে এক সপ্তাহকাল পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে। তারা কালো ফিতে ও ব্যাজ ধারণ করে গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় বেরিয়ে পড়ে এবং প্রতিবাদ সভা করে। জনসাধারণ গ্রামাঞ্চলে ছাত্রদের এ আন্দোলনকে দরদপূর্ণ সহযোগিতা করে। দূর দূরান্তের গ্রামের লোকেরা বাজারে সমবেত হয়ে সভা করে সরকারের এ ঘৃণ্য কাজের তীব্র প্রতিবাদ জানায়, শহীদ ছাত্রদের রুহের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করা হয়, এবং জালীম সরকারের আশু অবসানের জন্য কঠোর দাবী জানায়। জনসাধারণ আজ সব অন্যায়, অবিচার আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ... এমনি আর কখনো গ্রামাঞ্চলে সাড়া দেখা যায়নি। (উদ্ধৃত, বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ২৮৩/৩)

ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীর সীমা অতিক্রম করে ভাষা আন্দোলন ক্রমে তার সীমা বাড়িয়ে অধিগ্রহণ করে নিচ্ছিল পূর্ব বাংলার সব সাধারণ মানুষকে। যারা ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২-এর কাছাকাছি সময়ে এই আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদী চেতনাবলয়ের আওতার মধ্যে আসেনি, তারাও পরবর্তীতে ভাষা আন্দোলনের চেতনার রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক ব্যবহারে ক্রমাগত ভাষা আন্দোলনকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী চেতনার আওতার মধ্যে চলে আসে। এটি লক্ষ করেই পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্যে কোনো কোনো গবেষক 'বিকল্প সরকারের ঝলক' আবিষ্কার করেছিলেন। (রণেশ ২০১৫ : ৩৬) এ কারণেই বোধ করি ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের দফার সংখ্যা করা হয় একুশটি। আর এই একুশকে কেন্দ্র করে জনতা জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই ১৯৫৪ সালে সংঘটিত করে এক ভোট-বিপ্লব। এই ভোট-বিপ্লব কেবল ভোট-বিপ্লব ছিল না, এটি ছিল ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২-কে কেন্দ্র করে জেগে ওঠা এক জাতীয়তাবাদী চেতনারই বহিঃপ্রকাশ। একারণে লেখক বলেছেন, 'প্রথমে যা ছিলো একটি ক্ষুদ্র আন্দোলন– আহত উঠতি মধ্যবিত্তের সংঘবদ্ধ প্রয়াসে তা দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনে পরিণত হতে সময় লেগেছে মাত্র দুই বছর। ১৯৫৪ সালের রাজনৈতিক যুক্তফ্রন্ট প্রধানত ঐ ক্ষুব্ধ মধ্যবিত্তের

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিরোধ।'[২০] (আবু হেনা ২০০১ : ৩৯৯/১) আর রাজনীতিবিদের ভাষ্য হচ্ছে, 'একুশের রক্তরাঙা পথ বেয়েই বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং স্বাধিকার চেতনা ধীরে ধীরে এক দুর্বার গতি লাভ করে।' (শেখ মুজিবুর ১৯৯৫ : ৩০২)

ভাষা আন্দোলন ও এর পূর্ব-পর

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন নিঃসন্দেহে এক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। এই আন্দোলন কেবল রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন নয়। এই আন্দোলনে পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে প্রায় সমগ্র পূর্ব বাংলার সব শ্রেণি-পেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত জাগরণকে কেবল ভাষা দিয়ে উপলব্ধি করা যাবে না। আবার একে হঠাৎ কোনো জাগরণ হিসেবেও দেখা যাবে না। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর থেকেই নব গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে পূর্ব বাংলা নানা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকারে পরিণত হতে থাকে। ভাষা আন্দোলন সেসব বৈষম্য ও বঞ্চনার থেকে তার রসদ সংগ্রহ করেছিল নিশ্চয়। সরকারি দল ও সরকারের নানা কর্মকাণ্ডে পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে বঞ্চনার বোধ যত বেড়েছে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের গণমূর্তি তত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। একারণে আমরা লক্ষ করি, ১৯৪৮ সাল থেকে যে ভাষা আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু, তা ১৯৪৮ সালের মধ্যেই প্রায় স্তিমিত হয়ে যায়। কারণ তখনো পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে পাকিস্তান রাষ্ট্রপ্রাপ্তির আনন্দ, ভবিষ্যৎ স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা ক্রিয়াশীল ছিল। বঞ্চনার বোধ তখনো দানা বাধেনি। তখন ভাষা আন্দোলন মূলতই ভাষাকেন্দ্রিক আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অপরাপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বাস্তবতার সঙ্গে এর সম্পর্ক তত্ত্বগতভাবে থাকলেও জনগণতান্ত্রিকভাবে ছিল না। একারণে এ-আন্দোলন শুধু ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু প্রথম পর্যায়ের এই আন্দোলনের পর ঘটে গেছে টাঙ্গাইল উপনির্বাচনের প্রহসন; যেখানে শামসুল হক নির্বাচিত হয়েও প্রতিনিধিত্ব করতে পারেননি; সিলেটের নানাকার বিদ্রোহ, ময়মনসিংহ-সিলেটের হাজং আন্দোলন, রাজশাহীর সাঁওতালদের আন্দোলন, নাচোল বিদ্রোহসহ নানা বিচ্ছিন্ন আন্দোলন। এসব আন্দোলনের সময় সরকার কর্তৃক পরিচালিত নির্যাতন, হত্যা পূর্ব বাংলার মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে। শুধু তাই নয় ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে জেলবন্দিদের ওপর চালানো হয় অকথ্য নির্যাতন। ঢাকা, খুলনা ও রাজশাহীতে জেলের মধ্যে গুলি করে হত্যা করা হয় অনেককে। ১৯৫০ সালে অন্যায়ভাবে চেষ্টা করা হয় একটি বৈষম্যপূর্ণ, অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার। এছাড়া ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সময়পর্বে অর্থাৎ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে দেখা দেয় নানা শিক্ষা সংকট এবং তজ্জনিত শিক্ষা আন্দোলন। ব্রিটিশ আমলের শিক্ষাব্যবস্থায় ভারতবর্ষের খুব অল্প সংখ্যক মানুষই শিক্ষা লাভে সমর্থ হতো। তখন অশিক্ষিতের হার ছিল প্রায় ৯০ শতাংশ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এমনকি ব্রিটিশ আমলের শিক্ষামানও ক্রমে নিম্নগামী হতে থাকে। শুধু তাই নয় 'স্কুল কলেজ বন্ধ হতে থাকে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকরা ছাঁটাই হতে থাকেন। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সংখ্যা ও যোগ্যতার মান কমে আসে। এই পরিস্থিতিতে সারা দেশব্যাপী ছাত্র ও শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ব্যাপক ও গভীর বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকে এবং ছাত্র ও শিক্ষক

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনের মধ্যে তার অভিব্যক্তি ঘটে।' (বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ৫৭/৩) ১৯৫০ সাল থেকে পূর্ব বাংলায় শুরু হয় বিচিত্র শিক্ষা আন্দোলন। নিখিল পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলন (১৯৫০), পূর্ব বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ অধ্যাপক সম্মেলন (১৯৫১), প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ধর্মঘট (১৯৫১), মেডিকেল ছাত্র ধর্মঘট (১৯৫১) ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার বঞ্চনার বাস্তবতার সঙ্গে ক্রমে সাধারণ মানুষ একাত্ম হতে থাকে। এসব ঘটনা পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষকে ক্রমে রাজনৈতিক, সচেতন এবং প্রতিবাদী করে তুলেছে। উল্লেখ্য যে, শিক্ষা আন্দোলনের প্রত্যেকটি ঘটনার সঙ্গে মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষাদানের দাবি বারবার উত্থিত হয়েছে।

এভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ইত্যাদি ইস্যুকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলা ক্রমে তাতিয়ে ওঠে। সেই তাতানো বাস্তবতার মধ্যেই ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির গণ আন্দোলন তথা জাতীয়তাবাদী জাগরণ সম্ভব হয়েছে। আর ২১শে ফেব্রুয়ারির ঘটনা উত্তরকালে পূর্ব বাংলার জনগণের স্বাধিকার আন্দোলনের, আত্মোৎসর্গের চেতনার প্রতীকে পরিণত হয়ে ১৯৫২ ও ১৯৭১-এর মধ্যবর্তী আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে নতুন মাত্রা দান করেছে।

পূর্ব বাংলার জনগণের যাবতীয় চেতনা ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে জাগ্রত জাতীয় স্বকীয়তার দ্বারাই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এই জাতীয় স্বকীয়তার রাজনৈতিক ডাকনামই তো জাতীয়তাবাদ।

বাংলা ভাষার লিপি ও অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের চেষ্টা

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই রাষ্ট্র পরিচালনার সঙ্গে জড়িত উর্দ্ধতন মহল প্রথমেই গুরুত্ব দেন জাতীয় ঐক্যের ওপর। এই ঐক্য কিভাবে সমুন্নত করা যায় তার জন্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। এরই অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, পাকিস্তানে এমন এক হরফ চালু করা দরকার যার মাধ্যমে সিন্ধি, উর্দু, পশতু, বাংলা প্রভৃতি ভাষাকে একটি রূপগত ঐক্যের মধ্যে নিয়ে আসা যায়। নানা দিক বিবেচনা করে আরবি হরফ প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আরবি হরফ প্রবর্তনের কারণ দ্বিমাত্রিক। প্রথমত, আরবি ভাষার সঙ্গে ইসলামি সংস্কৃতির রয়েছে গভীর যোগ। দ্বিতীয়ত, বাংলা ছাড়া পাকিস্তানের অন্যান্য ভাষাগুলোর হরফ আরবির কাছাকাছি। তাছাড়া যুক্তি দেয়া হয় যে, আরবি আয়ত্ত করা এবং টাইপ করা সহজ। আরবি হরফ প্রবর্তনের মূল প্রবক্তা ছিলেন তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান (১৯০৫-১৯৬৬)।

ফজলুর রহমানের এই চিন্তাকে সমর্থন করেন অনেকে। তাঁদের মধ্যে প্রাদেশিক শিক্ষা দফতরের সেক্রেটারি ফজলে আহমদ করিম ফজলী, মৌলানা জুলফিকার আলি, মৌলানা আবদুর রহমান বেখুদ এবং এমনকি হাবিবুল্লাহ বাহারও ছিলেন। ফজলুর রহমান পাকিস্তানের সব ভাষা লেখার জন্য আরবি হরফ প্রবর্তনের কথা ১৯৪৮ সালে করাচিতে নিখিল পাকিস্তান শিক্ষক সম্মেলনে এবং ১৯৪৯ সালে পেশোয়ারে পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সভায় প্রকাশ করেন। এপর ১৯৫০ সালে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় ২০টি কেন্দ্রে আরবি হরফে বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার কাজ শুরু করে

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর। এজন্য আরবি হরফে বাংলা বইও ছাপানো ও বিতরণ করা হয়। পরবর্তীতে শিশুদের এই শিক্ষণ ব্যবস্থার আওতায় আনার ঘোষণাও দেয়া হয়।

পাকিস্তান সরকারের এহেন উদ্দেশ্য ও সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়া হয় স্বভাবতই পূর্ব বাংলায়। কারণ পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের ভাষা ও সাহিত্য বাংলার মতো এতো সমৃদ্ধ ছিল না। শুধু তাই নয়, বাংলা সমগ্র পৃথিবীর ঐশ্বর্যপূর্ণ ভাষাগুলোর মধ্যে প্রথম দিককার একটি ভাষা। স্বভাবতই বাংলাভাষীরা সরকারি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। ১৯৪৯ সালেই আরবি হরফ প্রবর্তনের খবর প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ কলেজ, ইডেন কলেজে ছাত্রছাত্রীরা সভা, আলোচনা ও স্মারকলিপির মাধ্যমে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড ও বর্ণমালা বিবেচনার জন্য গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে তীব্রভাষায় লিখিত একটি স্মারকলিপি পেশ করে। তাতে বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রবর্তনের এই সিদ্ধান্তকে তারা বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর 'হামলা' হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সরকারি এই সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে। শুধু ঢাকা নয়, পূর্ব বাংলা প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরবি হরফ প্রবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। শুধু ছাত্র-ছাত্রীরা নয়, পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের তীব্র সমর্থক পূর্ব বাংলার সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরাও এর প্রতিবাদ জানান। এমনকি 'শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটি'র সভাপতি এবং 'ভাষা কমিটি'র সভাপতি মাওলানা আকরম খানও এর বিরোধিতা করেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, গোলাম মোস্তফা, সৈয়দ আলী আহসান, ডক্টর এনামুল হক প্রমুখ এই প্রচেষ্টার বিপক্ষে অবস্থান নেন, কেউ প্রত্যক্ষভাবে কেউ-বা পরোক্ষভাবে। সাংগঠনিকভাবে সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নিন্দা জানায় তমদ্দুন মজলিস। (বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ২০৯-২২২/১) শেষ পর্যন্ত সরকার আরবি হরফ প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে। শুধু সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে নয় সরকার কর্তৃক নিয়োজিত 'কমিটি ভাষা সংস্কার ইত্যাদি প্রশ্নে বহু প্রতিক্রিয়াশীল সুপারিশ পেশ এবং অনাবশ্যক প্রশ্নের অবতারণা সত্ত্বেও তাঁরা আরবি হরফ প্রচলন ইত্যাদির বিরুদ্ধে দৃঢ়মত পোষণ করেন।' (বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ২২৭/১) আরবি হরফ প্রবর্তনের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয়। এর ফলে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার বাস্তবতা তৈরি হয়। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হয়।

কিন্তু আবার নতুন সমস্যা তৈরি হয় আইয়ুব খান শাসন ক্ষমতা গ্রহণের পর। তিনিও মুহম্মদ আলি জিন্নাহ এবং আরবি হরফ প্রবর্তনের অপরাপর প্রচেষ্টাকারীদের মতো 'জাতীয় ঐক্য ও সংহতি' এবং 'পাকিস্তানি জাতীয়তা'র প্রশ্নে ভাষা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। যেহেতু আগেই বাংলায় আরবি হরফ প্রবর্তন করে এই 'জাতীয় ঐক্য' প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে এবং উর্দুকে এককভাবে রাষ্ট্রভাষা করে 'পাকিস্তানি জাতীয়তা' সৃষ্টির পথ রুদ্ধ গিয়েছে, সেহেতু আইয়ুব খান অন্যতর চেষ্টা করলেন। তিনি রোমান হরফে পাকিস্তানের সব ভাষা লেখার পদ্ধতি প্রবর্তনের ওপর জোর দেন।[২১] এক জাতিরাষ্ট্রের গঠনকে ত্বরান্বিত করার জন্য তিনি যে 'Common eliment'-এর কথা বলেছেন, তা হচ্ছে রোমান হরফ।

আইয়ুব খানের এই ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য ১৯৫৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশনকে দায়িত্ব দেয়া হয়। শিক্ষা কমিশন জাতীয় শিক্ষা সংস্কার বিষয়ে জনমত যাচাইয়ের জন্য বেশকিছু প্রশ্নসহ তা বিতরণের ব্যবস্থা করে। বিভিন্ন প্রশ্নের মধ্যে একটি ছিল– 'আপনি কি পাকিস্তানে রোমান হরফ প্রবর্তন চান?' রোমান হরফ প্রবর্তিত হলে এর সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কেও বেশ কয়েকটি প্রশ্ন যুক্ত করা হয়। বিষয়টি প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি কয়েকটি পত্র-পত্রিকার– বিশেষত ˆ'wbK B‡ËdvK ও gvwmK †gvnv¤§'x– সম্পাদকীয়তে একাধিক দিন রোমান হরফ প্রবর্তনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে লেখা হয়। ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের ছাত্র-সংসদ ও কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদের উদ্যোগে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সরকারি এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগও এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। 'অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯) ও এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২) ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা ভাষায় রোমান লিপি প্রবর্তন প্রস্তাবের অকার্যকারিতা প্রমাণ করে মাসিক mgKvj (চৈত্র ১৩৬৫) পত্রিকায় দুটি প্রবন্ধ লেখেন।' (মোরশেদ ২০১৪ : ১৪১) তবু ১৯৫৬ সালের ২৬শে আগস্ট শিক্ষা কমিশন রোমান হরফ প্রবর্তনের সম্ভাবনা সংবলিত রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করে। ফলে, উভয় পাকিস্তানে এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আলোচনা-সমালোচনা-প্রতিবাদ শুরু হয়। ১৯৬০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বিরোধিতা নতুন মাত্রা পায়। ১৯৬২-এর ছাত্র আন্দোলনের প্রতিবাদ-বিক্ষোভের অন্যতম বিষয় ছিল এই রোমান হরফ। শেষ পর্যন্ত সরকার এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান সরকারের রোমান হরফ প্রবর্তনের প্রধান উদ্দেশ্য 'জাতীয় সংহতি' সৃষ্টি হলেও, কলকাতার সংস্কৃতি থেকে, হরফ থেকে পূর্ব বাংলাকে আলাদা করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

জাতীয় সংহতি তৈরির জন্য রোমান হরফ প্রবর্তনের বাইরে একই সময় (১৯৬২) বাংলা একাডেমির তৎকালীন পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান ভিন্ন এক প্রস্তাব দেন। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় পাকিস্তানের লেখক-সাহিত্যিকদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে তিনি অনুবাদ, উভয় পাকিস্তানের স্কুলে বাংলা ও উর্দু ভাষাশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের অভিধান তৈরির প্রস্তাব করেন। পূর্ব বাংলার বাংলা ভাষাকে মুসলিম জনগোষ্ঠীর আরো কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং পশ্চিম বাংলার জীবন ও সংস্কৃতি থেকে ভিন্নতা দান করার লক্ষ্যে ভাষা সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি বাংলা ভাষার আভ্যন্তরীণ কাঠামো পরিবর্তনের কিছু সুপারিশ করে–

১. পূর্ব বাঙলায় প্রচলিত সরল শব্দবিন্যাস ও সহজ বাক্যরীতির ব্যবহার দ্বারা ভাষায় সংস্কৃত প্রভাব যথাসম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে;

২. মুসলিম লেখকদের প্রকাশভঙ্গী ও ভাবসমূহ ইসলামী আদর্শের সাথে strictly conform করা উচিত, এবং

৩. পূর্ব বাংলায় সাধারণভাবে ব্যবহৃত শব্দ, Idiom, Phrase, বিশেষত পুঁথি ও বহুল প্রচলিত সাহিত্যে যেগুলি ব্যবহৃত হয় সেগুলি ভাষাতে আরও স্বাধীনভাবে প্রবর্তন করতে হবে। (উদ্ধৃত, বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ২২৫/১)

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৯ সালের ২৩শে জুনে গঠিত ভাষা কমিটি থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে গঠিত সাব-কমিটির বিভিন্ন সুপারিশ আরবি বা রোমান হরফ প্রবর্তনের বিপক্ষে থাকায় তা ১৯৫৮ সালের পূর্বে কখনো প্রকাশ করা হয়নি। কিন্তু ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন কায়েম হওয়ার পর ভাষা কমিটি ও বিভিন্ন সাব-কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। কারণ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর– বিশেষত ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়ার পর– হরফ পরিবর্তনের বাস্তবতা পূর্ব বাংলায় আর প্রায় ছিল না বললেই চলে। একারণে ভাষা সংক্রান্ত পাকিস্তানি জাতীয়তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অন্যান্য সুপারিশ-সংস্কার বাস্তবায়নের দিকে সরকার মনোযোগী হয়। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সালেই প্রকাশ করা হয় ভাষা কমিটির রিপোর্ট। বলা বাহুল্য, এই রিপোর্ট বাংলা ভাষার ব্যবহারে এবং সংস্কারে তেমন উল্লেখযোগ্য নতুন কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। কারণ, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই পূর্ব বাংলায় সাহিত্যিক বাংলা ভাষার দুটি ধারা প্রচলিত ছিল। এর একটি বাংলা ভাষার কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলার মধ্যে উদার অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনার মিশেলে একটি স্বতন্ত্র ভাষা কাঠামোর চর্চা করছিল, যেটি পঞ্চাশের দশকের নতুন প্রজন্মের কবিকুলের হাতে স্পষ্টতা লাভ করেছিল। অন্য ধারাটি পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের অংশ হিসেবে মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ব বাংলার জন্য স্বতন্ত্র ভাষা কাঠামো নির্মাণের এবং ব্যবহারের প্রয়াস পেয়েছিল। তবু একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ভাষা কমিটির এই রিপোর্ট বাংলা ভাষার উভয় ধারাকে কিছুটা হলেও নতুন মাত্রার বেগ সঞ্চার করেছিল। কারণ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর এমনিতেই পূর্ব বাংলার কবি-সাহিত্যিকরা তাঁদের অনুসৃত উদার গণতান্ত্রিক ভাষা কাঠামোকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে শিল্প-সাহিত্য চর্চা করেছে। তার উপরে আবার ১৯৫৮ সালের ভাষা সংস্কার বিষয়ক সুপারিশকে তাদের কাছে অসাম্প্রদায়িক উদার গণতান্ত্রিক বাংলা ভাষারীতির বিরুদ্ধে নতুন ষড়যন্ত্র মনে হয়েছে। ফলে তারা আরো শক্তভাবে তাদের অনুসৃত ভাষা কাঠামোকে জাতীয়তাবাদী চেতনার অংশ হিসেবে আঁকড়ে ধরেছে। বিপরীতক্রমে ভাষা কমিটির উক্ত রিপোর্ট পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদে আস্থাশীল শিল্পী-সাহিত্যিকদেরও নুতন প্রাণাবেগের যোগান দিয়েছে।

বিভিন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলন-অনুষ্ঠান-সাহিত্যপত্র

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্ব পূর্ব বাংলার রাজনীতির মতো সংস্কৃতিতেও এক নতুন তৎপরতার সূচনা করে। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক তৎপরতাকে আরো বেগবান করেছে। তবে বরাবরই এইসব সাংস্কৃতিক তৎপরতা দুটি ধারায় বিভক্ত ছিল। একটি ধারা পূর্ব বাংলার স্বতন্ত্র নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চাকে কেন্দ্রে রেখে চালিত হয়েছে এবং অন্য ধারাটি পাকিস্তানের উভয় অংশের সমন্বিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছে। উভয় ধারাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সম্মেলনের মাধ্যমে নিজেদের সমুন্নত ও সমন্বিত করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এই উভয় ধারা আপাতদৃষ্টিতে অরাজনৈতিক এবং বেসরকারিভাবে চর্চিত হলেও স্পষ্টত ছিল রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট। দুটি ভিন্ন জাতীয়তাবাদ ও আদর্শবাদকে কেন্দ্র করে এদুটি ধারা অব্যাহত থেকেছে। একটি পূর্ব বাংলাকেন্দ্রিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও অন্যটি পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা তাড়িত ছিল। উভয় ধারাই স্বাতন্ত্র্যকামী। তবে একটির স্বাতন্ত্র্য চেতনা পূর্ব বাংলার ভূগোল এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্য দ্বারা চিহ্নিত

Dhaka University Institutional Repository

হলেও অন্তত ষাটের দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের বাসনা দ্বারা চিহ্নিত নয়। স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের বাসনা দ্বারা পূর্ব বাংলাকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক তৎপরতা চিহ্নিত হয়েছে ষাটের দশকের অন্তত দ্বিতীয়ার্ধে। কারণ স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বাসনা পূর্ব বাংলায় তৈরি হয়েছে ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে। এ কারণে ষাটের প্রথমার্ধের পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যনির্ভর নানা চর্চা বাঙালি জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক প্রকাশ হিসেবেই গণ্য। অন্যদিকে এর বিপরীত ধারা অভিন্ন পাকিস্তান রাষ্ট্রের নতুন ইতিহাস-ঐতিহ্য নির্মাণ ও বর্তমান-ভবিষ্যতের সংহতির বাসনা দ্বারা চিহ্নিত। তবে এই দুই ধারার সাংস্কৃতিক চর্চা উত্তরকালের ইতিহাসে যতটা স্পষ্ট দ্বিধারিক বলে চিত্রিত, সমকালে ততটা স্পষ্ট দ্বিধারিক ও মীমাংসিত ছিল না। রাজনৈতিক, রাষ্ট্রিক, ঐতিহ্যিক, ভাষিক, কৃষ্টিক নানা বাস্তবতায় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের মধ্যে মিশ্রতা, দ্বৈততাও লক্ষ করা যায়। এ কারণে আমরা দেখব, একই ব্যক্তি একই সময়ে সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলন ও অনুষ্ঠানাদির উভয় ধারাতেই অংশগ্রহণ করছেন, উভয় ধারাতেই নিজেকে খোঁজার প্রয়াস পাচ্ছেন। তবে মোটা দাগে দুটি স্বতন্ত্র ধারায় চলেছে সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলন-অনুষ্ঠানাদি।

১. পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সম্মেলন ; ঢাকা

১৯৪৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর এবং ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারি ঢাকার কার্জন হলে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনটির প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন পূর্ব বাংলার তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার (১৯০৬-১৯৬৬)। সম্মেলনের উদ্দেশ্যে গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন হাবিবুল্লাহ বাহার এবং সম্পাদক ছিলেন অজিতকুমার গুহ (১৯১৪-১৯৬৯) ও সৈয়দ আলী আশরাফ (১৯২৪-১৯৯৮)।

এটি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলায় প্রথম সাহিত্য সম্মেলন। এই সাহিত্য সম্মেলনটি দুটি অর্থে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। একটি এর সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের কারণে এবং অন্যটি সম্মেলনে প্রকাশিত চেতনার কারণে। সম্মেলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তালিকা থেকে এর উদ্দেশ্য-আদর্শ সম্পর্কে এক ধরনের অস্পষ্টতা তৈরি হয়। যেমন, সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। এছাড়া কাব্য, শিশু সাহিত্য, পুঁথি সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি, শিক্ষা, ইতিহাস বিষয়ক অনুষ্ঠান অংশের সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬), বেগম শামসুন্নাহার (১৯০৮-১৯৬৪), ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী, অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮) ও অধ্যক্ষ শরফুদ্দীন। এছাড়া ১লা জানুয়ারি ১৯৪৯-এ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে ছিলেন হাবিবুল্লাহ বাহার, সৈয়দ আলী আহসান, নাজির আহমদ, আবদুল আহাদ, আব্বাসউদ্দীন আহমদ, লায়লা আরজুমন্দ বানু, ফররুখ আহমদ, ফতেহ লোহানী, মুজীবর রহমান খাঁ, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ। কমিটির এই সদস্যদের প্রত্যেকেই উত্তরকালে বাংলাদেশের খ্যাতিমান সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। আবার উত্তরকালে এঁদের চেতনা ও বিশ্বাসেরও একটি রূপরেখা ইতিহাসে লিখিত হয়েছে। এই ইতিহাস লক্ষ করলে দেখা যাবে, উক্ত কমিটির সভ্যরা অনেকেই ভাষা আন্দোলন-পরবর্তী সময়ের ইতিহাসে এমনকি বর্তমান ইতিহাসেই পরস্পর বিরোধী বলে চিহ্নিত। এই সাংস্কৃতিক কমিটির অনেক সদস্য পাকিস্তানবাদী

Dhaka University Institutional Repository

সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি’ (১৯৪০) ও ‘পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ’ (১৯৪২)-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। বিশেষত, হাবিবুল্লাহ বাহার, সৈয়দ আলী আহসান ও ফররুখ আহমদ। এঁদের সম্পর্কে এবং উপর্যুক্ত দুটি সাংস্কৃতিক সংগঠন সম্পর্কে বলতে গিয়ে হুমায়ুন আজাদ বলেছেন–

> তারা সবাই মুসলিম লিগের রাজনীতিক দর্শন বিনাপ্রশ্নে গ্রহণ করেছিলেন; এবং উগ্রভাবে তাতে বিশ্বাসী ছিলেন। পাকিস্তানবাদী সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্যে পাকিস্তানবাদ প্রচারের জন্যে তাঁরা দুটি সংঘও গড়ে তুলেছিলেন;- একটি কলকাতায়, অপরটি ঢাকায়। এ-সংঘ দুটি আলোচনা-অনুষ্ঠান ও সাহিত্যসম্মেলন আয়োজন ক'রে মুসলমান সমাজে বিশেষ এক ধরনের সংস্কৃতি ও সাহিত্য-চেতনা গ'ড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। (হুমায়ুন ২০০০ : ১)

ফলে সহজেই প্রশ্ন উঠতে পারে ১৯৪৮ সালের ওই সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলনে বিপরীত চেতনার সংস্কৃতিবান মানুষদের সম্মিলন ঘটল কিভাবে। এর সহজ উত্তর বোধ করি এই যে, এসব কবি সাহিত্যিকের মধ্যে বাংলা আর বাঙালিত্ব নিয়ে বিরোধ কখনোই ছিল না। বিরোধ ছিল জাতীয়তাবাদী রাজনীতি আর সংস্কৃতির ধরন-ধারণ নিয়ে।[২২] তাছাড়া তখন বাঙালি জাতীয়তাবাদ আর পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের বিষয়টি উত্তরকালের মতো এত তেলে-জলে ছিল না।[২৩] একটু স্পষ্ট করে বললে বলা যায়, সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে পূর্ব বাংলাকেন্দ্রিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার তখনও স্ফুরণ ঘটেনি। এই চেতনাটি ক্রমে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের আধিপত্যে ও পীড়নে জন্মলাভ করেছে। তবে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কিছুদিন আগে জিয়াউদ্দীনের প্রস্তাবিত উর্দুর বিপরীতে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরাকে কেন্দ্র করে বাঙালিত্ব ও বাঙালি বলে একটি আলাদা বিষয়ের অবতারণা হয়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ১৯৪৮ সালে জিন্নাহর বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার ঘোষণা। কিন্তু তখনো ভাষাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া বিতর্ক সুস্পষ্ট জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্ম দিতে পারেনি। একারণেই ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক সম্মেলনে পরস্পর বিপরীত চেতনার মানুষেরা একই মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই একই কারণে ফতেহ লোহানী আর সৈয়দ আলী আহসানে বা আবদুল আহাদ আর ফররুখ আহমদে সেদিন কোনো বিরোধ বাঁধেনি।

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠান শুরু হয় কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে। এতে বিপুল জনসমাগম ঘটে। অনুষ্ঠানে গোলাম মোস্তফা, হাবিবুল্লাহ বাহার যথারীতি পূর্ব বাংলার মুসলমান সাহিত্যিকদের নতুন ‘স্বাধীনতার আবহাওয়ায়’ ‘নতুন যুগের নতুন সাহিত্য’ রচনার তাগিদ দিয়ে আবেগী বক্তৃতা করেন, যে-বক্তৃতা এবং সাহিত্যের আকাঙ্ক্ষা পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনা দ্বারা পরিপুষ্ট ছিল। (রেজোয়ান ২০০৬ : ১৭২)

অন্যদিকে মূল সভাপতির ভাষণে ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌ পূর্ব বাংলার সাহিত্যচর্চার মাধ্যম যে বাংলাই হওয়া উচিত সে-প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। বাংলায় অন্য কোনো হরফ প্রবর্তনের সম্ভাবনাকে তিনি নাকচ করে দেন তাঁর বক্তৃতায়। আর পূর্ব বাংলার জনগণের স্বাতন্ত্র্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন–

Dhaka University Institutional Repository

> আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙ্গালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো টি নেই। (উদ্ধৃত, বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ১৪৯/১)[২৪]

শহীদুল্লাহ্‌র এই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে পরে বক্তব্য দেন পূর্ব বাংলা স্বাস্থ্য দপ্তরের সেক্রেটারি ফজলে আহমদ করিম ফজলী। তিনি শুধু শহীদুল্লাহর বক্তব্য নয়, পুরো অনুষ্ঠানে পঠিত প্রবন্ধগুলোর মূল স্পিরিট নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন– 'আজ এখানে যে প্রবন্ধগুলি পড়া হলো সেগুলি শোনার পর আমি ভাবছি আমি কি ঢাকাতে আছি না কলকাতায়?' সম্মেলনে বাংলা আর বাঙালিত্ব মুখ্য হয়ে ওঠায় তিনি এরূপ মন্তব্য করে সরাসরি শহীদুল্লাহর বক্তব্যের সমালোচনা করেন। এ নিয়ে সম্মেলন স্থল উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ফজলে আহমদকে মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার নিবৃত্ত হতে বললেও তিনি কর্ণপাত না করে বক্তব্য অব্যাহত রাখলে উপস্থিত ছাত্ররা ফজলে আহমদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এ সময় সৈয়দ আলী আহসান তাঁকে ছাত্রদের হাতে 'মার খাওয়ার সম্ভাবনা'র কথা বলে সম্মেলন ত্যাগ করতে বললে তিনি সম্মেলন স্থল ত্যাগ করেন। সম্মেলনে বাংলা ও বাঙালিত্ব প্রাধান্য পাওয়ায় পরদিন ১লা জানুয়ারি ˆ'wbK AvRv' পত্রিকায় তীব্র সমালোচনা করা হয়।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারিতে একটি কার্যকরী সংসদ গঠনের প্রস্তাব আনা হলেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক কার্যকরী সংসদ থেকে বাদ পড়েছেন মর্মে কেউ কেউ প্রতিবাদ করলে তা প্রত্যাহার করা হয়। সম্মেলনের এই দ্বিতীয় দিনে ব্যবস্থাপক সভায় বাংলাকে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা করার যে-প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিলো তাকে কার্যকর করার জন্য একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়।

'পাকিস্তানিত্ব ও বাঙালিত্ব'-এর দ্বন্দ্ব সম্মেলনটিতে স্পষ্ট হয়ে উঠলেও সম্মেলনে উপস্থিত পূর্ব বাংলার সকল সাহিত্যিকের প্রকাশ্য ও মৌন সমর্থনে বাংলা, বাঙালিত্ব আর পূর্ব বাংলার স্বাতন্ত্র্যই মুখ্য হয়ে উঠেছে। এখানে পাকিস্তান ও এর সংহতির কথা উঠলেও তা মুখ্য হয়ে ওঠেনি। দুটি স্বরই জারি থাকলেও অন্তর্গত স্বর ছিল কিন্তু একটি ; আর তা হল বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য। এদিক থেকে এই সম্মেলনটিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উচ্চকিত প্রকাশ না হলেও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার অন্তর্গত অনুচ্চ স্পন্দন সহজেই অনুমেয়।

২. পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন ; চট্টগ্রাম

বিভিন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতি সংগঠন এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক সম্মেলন পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান আমলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ গঠনে ও বিকাশে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে-জাতীয়তাবাদী চেতনা দ্রুত সম্প্রসারিত ও চাক্ষুষ হয়ে ওঠে, তার নীরব ক্ষেত্রটি অনেক সময় তৈরি করে এই সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন-সম্মেলন। আবার অনেক সময় জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম উপজাত চেতনা দ্বারা সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন-সম্মেলনও জাতীয়তাবাদী চেতনাকে শুষে নিয়ে তার বিস্তার ঘটায় জনমনে। তবে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পূর্বে পূর্ব বাংলায় বিভিন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতি সংগঠন ও সম্মেলন সম্পর্কে প্রথমোক্ত সূত্রই বেশি

ক্রিয়াশীল। কারণ ১৯৫২-এর পূর্বে বড় কোনো জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন ঘটেনি বললেই চলে। যা ঘটেছে তা পুরো পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠীকে একসূত্রে গেঁথে আমূল ঝাঁকুনি দিতে পারেনি। তাছাড়া ১৯৫২-এর পূর্বে পূর্ব বাংলার জনগণের চেতনা ও স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের মোহ কাটেনি। এই মোহগ্রস্ততার মধ্যেই বিভিন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতি সংগঠন ও সম্মেলন পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে বাংলা ও বাঙালিত্বের স্বাতন্ত্র্যের চেতনা উন্মেষের নীরব ভূমিকা পালন করে গিয়েছে। বিশেষত ঢাকার বাইরের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন ও সম্মেলনগুলো এক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

চট্টগ্রামকেন্দ্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতি সংগঠন 'সংস্কৃতি পরিষদ' ও 'প্রান্তিক'-এর উদ্যোগে আয়োজিত 'পূর্ব' পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন' একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন, যেটি চট্টগ্রামে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা পরিগঠনে ১৯৫১ সালের ১৬ই মার্চ এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৫১ সালের ১৬ই মার্চ চট্টগ্রামে যে-সাহিত্য সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় তাতে ঢাকা থেকে অনেক লেখক সাহিত্যিকের অংশগ্রহণের কথা ছিল। কিন্তু gwbs wbDR ও ˆ`wbK AvRv` পত্রিকায় সম্মেলনটিকে কমিউটিস্টদের সম্মেলন বলে প্রচার করায় ঢাকা থেকে অনেক লেখক-সাহিত্যিক চট্টগ্রামের ওই সম্মেলনে যোগ দেননি। সম্মেলনের প্রধান অতিথি ছিলেন সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯) এবং মূল সভাপতি ছিলেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩)। সম্মেলনটি চলেছিল দুইদিন ব্যাপী।

সম্মেলনটির বিশেষত্ব লক্ষ করা যায় এর পরিবেশনা, উপস্থিতি এবং ঘোষণা থেকে। কীর্তন, রবীন্দ্রসঙ্গীত, কবিগান প্রভৃতির পরিবেশনা সম্মেলনটিকে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত করেছিল। সম্মেলনটিতে অগণিত লোকের সমাগম ঘটেছিল। এমনকি সম্মেলনের 'পাশের রাস্তায়ও তিল ধারণের জায়গা ছিল না।' শিল্পী-সাহিত্যিকদের বাইরে সাধারণ মানুষের বিপুল উপস্থিতিই ছিল সম্মেলনটির একটা বড় প্রভাব এবং শক্তির দিক। সম্মেলনে বক্তারা পূর্ব বাংলার সাহিত্যের উত্তরাধিকারের পথরেখা নির্দেশে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কথা স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করেন। এছাড়া সম্মেলনের আয়োজকরা তাদের ইশতেহারে সাহিত্যকে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবেও উল্লেখ করেন।

৩. পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন ; কুমিল্লা

এই সাংস্কৃতিক সম্মেলনটি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর পূর্ব বাংলায় অনুষ্ঠিত প্রথম সাংস্কৃতিক সম্মেলন। এটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সালের আগস্ট মাসের ২২, ২৩ ও ২৪ তারিখে, তিনদিন ব্যাপী। এটি পূর্ব বাংলার প্রথম সাংস্কৃতিক সম্মেলন, যেখানে সাহিত্য-সংস্কৃতি সংগঠনের বাইরেও বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনও অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করেছে। এর উৎস বোধ করি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। কারণ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন অরাজনৈতিক মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিকতার সঙ্গে সংযুক্ত করে। এরপর সেই রাজনৈতিকতার গণ্ডি দিনদিন কেবলই বড় থেকে বড়তর হয়ে ... দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে। পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলনে ফরওয়ার্ড ব্লক, যুব লিগ, কমিউনিস্ট পার্টি ও রেভুলিউশনারি সোস্যালিস্ট পার্টির ন্যায় প্রগতিশীল সরকারবিরোধী রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কুমিল্লা শাখাসমূহ এতে সহযোগিতা করে। তাছাড়া প্রদেশের বিভিন্ন জেলার প্রতিষ্ঠানও এতে প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিল। সম্মেলনটির চরিত্র সম্পর্কে অনেকে মনে করেছেন, 'ভাষা-আন্দোলনলব্ধ অসাম্প্রদায়িক বাঙালি চেতনার

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ প্রকাশ যে এতে ঘটতে যাচ্ছে, তাতে সন্দেহ ছিল না।’ (আনিসুজ্জামান ২০১৫ : ২০০) আদতে হয়েছিলও তাই। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নজরুলসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত, লোকগীতি ও গণসঙ্গীত পরিবেশিত হয়, মঞ্চস্থ হয় বিজন ভট্টাচার্যের নাটক Revbe›‘x এবং ‘যুদ্ধ বনাম শান্তি’ পালা গান।

সম্মেলনের উদ্দেশ্য-আদর্শ তুলে ধরে প্রকাশিত ‘আহ্বান’ নামক পুস্তিকা এবং সম্মেলনের বক্তাদের বিভিন্ন বক্তব্য সম্মেলনটির জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষাকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিল। পুস্তিকায় জাতীয় সংস্কৃতিকে ‘মোহমুক্তচিত্তে’ পর্যালোচনার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়। সম্মেলনে আহ্বান জানানো হয় জাতি-ধর্ম-শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে সবাইকে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ‘ভদ্রসংস্কৃতি’ এবং ‘অভদ্রসংস্কৃতি’-র বিলোপ সাধন করে এক সমন্বিত সংস্কৃতি গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সম্মেলনে ভাষা আন্দোলনকে দমন করার পাকিস্তানি নীতির তীব্র বিরোধিতা করা হয়। এসবই যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের দ্বিজমন্ত্রে দীক্ষিত চেতনার রঙ্গে রাঙানো ছিল তা বলাই বাহুল্য।

৪. ইসলামি সাংস্কৃতিক সম্মেলন ; ঢাকা

পূর্বেই বলা হয়েছে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক চর্চা ও সংগঠন-সম্মেলন প্রধান দুটি ধারায় চলেছে। এর একটি বাঙালি জাতীয়তাবাদমুখ্য এবং অন্যটি পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদমুখ্য। উভয় ধারার সঙ্গেই জড়িত ছিলেন পূর্ব বাংলার শিল্পী-সাহিত্যিক। দুই ধারার শিল্পী-সাহিত্যিকরাই তাদের আদর্শানুগ চর্চা ও সাংগঠনিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। এরই অংশ হিসেবে ১৯৫২ সালের ১৭-২০ অক্টোবর ঢাকায় তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় ‘ইসলামি সাংস্কৃতিক সম্মেলন’। সম্মেলনটিতে অংশগ্রহণকারী সাহিত্যিক শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩) মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪), সৈদয় আলী আহসান (১৯২২-২০০২), হাসান জামান (১৯২৮-৮১) প্রমুখ সবাই ‘ইসলামি তমদ্দুন’ ও ‘ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা’র ওপর গুরুত্ব দেন। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ওপরও তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করে পাকিস্তানের সংহতি প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেন। তাঁরা বাংলা সাহিত্যকে পশ্চিম বাংলার সাহিত্য, ইউরোপীয় আধুনিকতাবাদী সাহিত্য ও সোভিয়েত সাহিত্যের প্রভাবমুক্ত করে স্বতন্ত্র স্বাদ-গন্ধে ভরে তোলার আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনীয়তা কথা ব্যক্ত করেন। তবে তাঁরা মুসলিম লিগ তথা পাকিস্তান সরকারের অনাচার, ব্যর্থতা সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞান ছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ এই সম্মেলনেই ‘একটি প্রস্তাবে ইসলামের নাম ভাঙিয়ে শাসন করার জন্য সরকারের নিন্দা করা হয়।’ (সাঈদ-উর ২০০১ : ৩৮) এবং একই সঙ্গে সম্মেলনে বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। অর্থাৎ পাকিস্তান সরকারের ইসলামি আদর্শ এবং এঁদের ‘ইসলামি আদর্শ’, ‘ইসলামি তমদ্দুন’ ও ‘ইসলামি রাষ্ট্র’ ধারণার মধ্যে একটি গুণগত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য সহজেই অনুমেয়।

চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত ‘ইসলামি সাংস্কৃতিক সম্মেলন’টি পাঁচভাগে বিভক্ত ছিল– সমাজবিজ্ঞান, ইসলামি আন্দোলন, লোকসংস্কৃতি, সাহিত্য-অধিবেশন ও বিচিত্রানুষ্ঠান। পুরো সম্মেলনের কেন্দ্রে ‘ইসলাম’ এবং ‘মুসলিম তমদ্দুন’-এর আদর্শ জারি থাকলেও এই ‘ইসলাম’ এবং ‘মুসলিম তমদ্দুন’-এর ধারণা মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

লিগের 'আদর্শ' থেকে যে-ভিন্ন, তা লক্ষ রাখা জরুরি। [দ্রষ্টব্য- এই অধ্যায়ের সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত শিরোনামের 'পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ' উপশিরোনাম]

৫. পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সম্মেলন ; ঢাকা

১৯৫৪ সালের ২৩-২৬ এপ্রিল পর্যন্ত ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সম্মেলন' পূর্ব বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কারণ অন্তর্গতভাবে এটি নিছক সাহিত্য-সম্মেলন ছিল না। এর প্রেরণা এবং প্রভাব ছিল রাজনৈতিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত।[২৫] এর আগে পূর্ব বাংলায় এত শিল্পী-সাহিত্যিকদের অংশগ্রহণে এত বড় সাহিত্য-সম্মেলন আর হয়নি। এই সম্মেলনের সঙ্গে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৩ সালে বাংলা ভাষাবিরোধী নাজিমুদ্দীনের প্রধান মন্ত্রিত্ব হারানোর স্বস্তি, ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় ও মন্ত্রিসভা গঠন ইত্যাদির গভীর যোগ ছিল। ১৯৫৪ সালে জাগরিত পূর্ব বাংলাকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী চেতনাই এই সম্মেলনের সমূহ প্রেরণা হিসেবে গভীরভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। এমনকি ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ উদ্বোধনী ভাষণে ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন যে, 'যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন সাহিত্য-সম্মেলন-অনুষ্ঠানের অনুকূল হয়েছে।' (আনিসুজ্জামান ২০১৫ : ২৩৮)

সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সম্মেলনের আগেই একটি ঘোষণাপত্র রচনা করা হয়। এই ঘোষণাপত্রে অসংখ্য শিল্পী-সাহিত্যিক নামসহ স্বাক্ষর করেন। এই ঘোষণাপত্র ও স্বাক্ষরকারীদের নামের তালিকা থেকে অনেকে পূর্ব বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নতুন জোয়ারের আবাহন শুনতে পেয়েছিলেন–

> এই ঘোষণাপত্র এবং বিশিষ্ট লেখক, চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতশিল্পী ও সাংবাদিক প্রভৃতির নামসহ স্বাক্ষকারীর এত দীর্ঘ তালিকা পূর্ব বাংলায় তো বটেই, পশ্চিম বাংলায়ও বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'অগ্রণী' পত্রিকায় ঘোষণাপত্র ও স্বাক্ষরদাতাদের নামের সম্পূর্ণ তালিকা পুনর্মুদ্রিত হয়। এখানে যে সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা নতুন ভাবের জোয়ার এসেছে, ঘোষণাপত্র তারই ইঙ্গিতবাহী বলে গণ্য হয়। (আনিসুজ্জামান ২০১৫ : ২৩৬)

এই সাহিত্য-সম্মেলনের স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন এর বিরোধিতা করে 'তমদ্দুন মজলিশ', ^‘wbK AvRv‘ এবং ব্যক্তিগতভাবে আরো অনেকে। তারা এই আয়োজনকে 'পাকিস্তানের আদর্শ বিরোধী এবং দুই বাংলার একীকরণের উদ্‌যোগ হিসেবে আখ্যা দিলেন।' এ থেকে বোঝা যায়, এই সম্মেলন এবং সম্মেলনের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাশ্লিষ্ট। যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে তা ছিলেন না, তাঁরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে পূর্ব বাংলার নানামাত্রিক স্বাতন্ত্র্যকে কবুল করতেন।

কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধি দল যোগদান করেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যোগদান করেন নরেন্দ্র দেব, রাধারানী দেবী, মনোজ বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। পূর্ব বাংলার সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা বিভিন্ন পর্বে বক্তৃতা করেছিলেন বা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অথবা কোনোভাবে সম্পর্কিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে মাওলানা ভাসানী, কাজী মোতাহার হোসেন, মাহবুব-উল-আলম, মোহাম্মদ বরকতুল্লহ, সুফিয়া কামাল, জসীমউদ্‌দীন, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা, শওকত ওসমান, মুহম্মদ আবদুল হাই, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, নূরুল মোমেন, কাজী দীন মুহম্মদ, আবদুল্লাহ আল মুতী,

Dhaka University Institutional Repository

আলাউদ্দিন আল আজাদ, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, সিকান্‌দার আবু জাফর, সরদার জয়েনউদ্দীন, হাবীবুর রহমান, আতোয়ার রহমান, শামসুর রাহমান, সৈয়দ নুরুদ্দীন, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, আতাউর রহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, ফয়েজ আহমদ, রফিকুল ইসলাম, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, জহির রায়হান, কলিম শরাফি, রমেশ শীল, আবদুল আলিম, আবদুল লতিফ, আহমদ শরীফ, কবীর চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী, অজিত গুহ, আবুল মনসুর আহমদ, আতাউর রহমান খান, জয়নুল আবেদিনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন সংগীত, নাটক, কবিগান, প্রবন্ধপাঠ ইত্যাদিতে মুখর তিনদিনের পূর্বনির্ধারিত সম্মেলন অংশগ্রহণকারী ও শ্রোতাদের অনুরোধে আরো একদিন বাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। 'সাহিত্য-সম্মেলন খুব সফল হয়েছিল, এর অসাম্প্রদায়িক ও গণমুখী চরিত্র সকলের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।' (আনিসুজ্জামান ২০১৫ : ২৪০) সম্মেলনের ব্যতিক্রমী আয়োজন ছিল বর্ধমান হাউসে মূলত রাষ্ট্রভাষা ও গণ আন্দোলনের ওপর আলোকচিত্রের একটি প্রদর্শনী। এতে আমানুল হক ও রফিকুল ইসলামের তোলা চিত্র প্রদর্শিত হয়, যার শিরোনাম ছিল 'আমার বাংলা'। (রফিকুল ১৯৭৪ : ৪০৭) সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ যে-কথা বলেন, তা ছিল এই সম্মেলনের মূল সুর–

> ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট বহুদিনের গোলামীর পর যখন আযাদীর সুপ্রভাত হল, তখন প্রাণে আশা জেগেছিল যে এখন স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে বাংলা সাহিত্য তার সমৃদ্ধির পথ খুঁজে পাবে। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় যে সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশন হয়েছিল, তাতে বড় আশাতেই বুক বেঁধে আমি অভিভাষণ দিয়েছিলুম। কিন্তু তারপর যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তাতে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলুম, স্বাধীনতার নূতন নেশা আমাদের মতিচ্ছন্ন করে দিয়েছে। আরবী হরফে বাংলা লেখা, বাংলা ভাষায় অপ্রচলিত আরবী ফার্সী শব্দের অবাধ আমদানি, প্রচলিত বাংলা ভাষাকে গঙ্গাতীরের ভাষা বলে তার পরিবর্তে পদ্মাতীরের ভাষা প্রচলনের খেয়াল প্রভৃতি বাতুলতা একদল সাহিত্যিককে পেয়ে বসল। তাঁরা এই সব মাতলামিতে মেতে গেলেন, যে প্রকৃত সাহিত্য সেবা যাতে দেশের ও দশের মঙ্গল হতে পারে, তার পথে আবর্জনা স্তূপ দিয়ে সাহিত্যের উন্নতির পথ কেবল রুদ্ধ করেই খুশিতে ভূষিত হলেন না বরং খাঁটি সাহিত্যসেবীদিগকে নানা প্রকারে বিড়ম্বিত ও বিপদগ্রস্ত করতে আদাজল খেয়ে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। তাতে কতক উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী উস্‌কানি দিতে কসুর করলেন না। ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং অন্যান্য পশ্চিম বঙ্গের কবি ও সাহিত্যিকগণের কাব্য ও গ্রন্থ আলোচনা, এমন কি বাঙ্গালী নামটি পর্যন্ত যেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে কেউ কেউ মনে করতে লাগলেন।' (উদ্ধৃত, রফিকুল ১৯৭৪ : ৪০৭-৪০৮)

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র এই ভাষণ এবং এর মধ্যকার চেতনা ও প্রতিবাদী সুরের স্পষ্টতা পূর্ব বাংলার সাহিত্যিক সমাজে পূর্বে দেখা যায়নি। মূলত 'পাকিস্তান সাহিত্য-সম্মেলন' পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরের পূর্ব বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির অসংগঠিত, অবরুদ্ধ, অবিকশিত সাহিত্য-সংস্কৃতি ভাবনাকে সংগঠিত, মুক্ত এবং বিকশিত করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। ১৯৫২ সালের পরের পূর্ব বাংলার সাহিত্যের পালাবদল এবং পরবর্তী অভিমুখ এই সম্মেলনে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। সাহিত্যে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনায় আস্থাশীল একাধিক সাহিত্যিক এ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। আবার অনেকে আদর্শগত কারণে যোগ দেননি। মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ এবং আবুল মনসুর আহমদ এঁরা দুজন দুটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। আবুল কালাম শামসুদ্দীন মনন সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করতে রাজি হলেও শেষ পর্যন্ত বিরুদ্ধপক্ষের

Dhaka University Institutional Repository

চাপে সম্মেলনে আসেননি। সৈয়দ আলী আহসানকে প্রস্তাব দেয়া হলেও তিনি সম্মেলনে প্রবন্ধ পড়তে রাজি হননি। আর ফররুখ আহমদ নীতিগত কারণে সম্মেলনের বিরোধী ছিলেন। (আনিসুজ্জামান ২০১৫ : ২৩৬-২৪০)

৬. সাংস্কৃতিক সম্মেলন; কাগমারী

১৯৫৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল-সভা আহ্বান করা হয়। কাউন্সিল-সভার পর ৮, ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন। এই সাংস্কৃতিক সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি ছিলেন স্বয়ং মাওলানা ভাসানী। আর আহ্বায়ক ছিলেন আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-১৯৮৮)।

সাংস্কৃতিক সম্মেলনটি ছিল প্রকৃত অর্থেই পূর্ব বাংলার প্রথম আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন। এতে ভারত, মিশর, কানাডা, আমেরিকা, যুক্তরাজ্য ও পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পী-সাহিত্যিকগণ প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯)। এই প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে এসেছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), নরেন্দ্র দেব (১৮৮৮-১৯৭১), রাধারানী দেবী (১৯০৩-১৯৮৯), প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫-১৯৮৩) প্রমুখ। যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধি ছিলেন ব্রিটিশ কাউন্সিলের ঢাকার আঞ্চলিক প্রতিনিধি ড. কসন। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সাংস্কৃতিক সম্মেলনে এসেছিলেন ড. মাহমুদ হোসেন, আবদুল কাদের এবং নৃত্যশিল্পী মাদাম। দূতাবাসের মাধ্যমে পৃথিবীর আরো নানা দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকদের দাওয়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যেসব দেশের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করতে পারেননি, তাঁরা সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বাণী পাঠিয়েছিলেন। এছাড়া সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের মানুষকে সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এমনকি সম্মেলনে যাওয়ার জন্য কম ভাড়ায় বাসের ব্যবস্থাও করা হয়। উদ্যোক্তারা সবার খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থাও করেছিলেন। এসব বিষয় থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, সাংস্কৃতিক সম্মেলনটির আকাক্ষা শুধু সংস্কৃতি চর্চার সাধারণ আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছিল না। এর সঙ্গে রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাও একাকাকার হয়ে গিয়েছিল। আদতে, ১৯৫২ সালের পরে পূর্ব বাংলার কোনো সাংস্কৃতিক আয়োজনই শুধু সাংস্কৃতিক ছিল না, সবই ছিল রাজনীতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। কাগমারীর সাংস্কৃতিক সম্মেলনের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

সম্মেলনের প্রবেশপথে নির্মাণ করা হয় অসংখ্য তোরণ। এসব তোরণের নামকরণ হয়েছিল জিন্নাহ, গান্ধী, নেহেরু, সুভাষ, চিত্তরঞ্জন, স্যার সৈয়দ আহমদ, মাওলানা মোহাম্মদ আলি, তিতুমীর, শরীয়তুল্লাহ, রুমি, হালি, ইকবাল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জর্জ ওয়াশিংটন, লিঙ্কন, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুং, শেক্সপিয়র, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বায়রন, শেলি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের নামে। সম্মেলন উদ্বোধন করেন তৎকালীন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান। সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন। পূর্ব বাংলা থেকে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা, মুহম্মদ এনামুল হক, এম. এন. হুদা, আখলাকুর রহমান, নূরুল ইসলামসহ পূর্ব বাংলার অনেক কৃতী ব্যক্তিত্ব এতে যোগ দিয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

কাজী মোতাহার হোসেনের সভাপতিত্বে সাংস্কৃতিক সম্মেলন শুরু হয় ৮ই ফেব্রুয়ারি। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন মাওলানা ভাসানী। তিনি তাঁর ভাষণে পাকিস্তানের সঙ্গে বিশ্বের অন্য রাষ্ট্রগুলোর সমঝোতার ভাব তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এটিকে তিনি এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য বলেও ঘোষণা করেন। তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে পাকিস্তানে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে অবক্ষয় চলছে। তিনি এই অবক্ষয় থেকে উত্তরণের জন্যে সবাইকে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সাহিত্যালোচনায় অংশ নিয়ে বৈশ্বিক ঐক্য গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীতানুষ্ঠান, বাউলগান, যাত্রাগান, জারিগান, লাটি খেলা, তরবারি ও রামদা খেলা।

সাংস্কৃতিক সম্মেলনের শুরুর দিন থেকে শেষ হওয়ার বেশ কদিন পর পর্যন্ত মুসলিম লিগের মুখপত্র ও পাকিস্তানবাদী বিভিন্ন পত্রিকায়-বিশেষত w' Wb, w' gwbs wbDR, ^'wbK AvRv', ^mwbK সম্মেলন বিষয়ে বিরূপ আলোচনা-সমালোচনা ছাপে। এমনকি ^'wbK B‡ËdvK পত্রিকাও এর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে। পাকিস্তানবাদী পত্রিকাগুলো এই সম্মেলনকে 'পাকিস্তানের দেশাত্মবোধ, জাতীয়তা ও সংহতি'র বিরোধী বলে আখ্যা দেয়। এছাড়া সম্মেলনে উল্লেখিত সংস্কৃতিকে এসব পত্রিকা 'পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতি' বলে এর কঠোর সমালোচনা করে।

৭. সিপাহী বিপ্লবের শতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

সচেতন যেকোন সম্প্রদায় বা জাতি তার প্রয়োজন মতো অতীত ইতিহাসের পুনরুজ্জীবন ঘটায়। পুরোনো ইতিহাসকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে তার ভবিতব্যের পথচলা স্পষ্ট করতে চায়। ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই কাজটি করে পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস, পাক-বাংলা সাহিত্য মাহফিল, পাকিস্তান সাহিত্য মজলিস, এসলামি সংস্কৃতি প্রভৃতি কয়েকটি পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদভিত্তিক সাংস্কৃতিক সংগঠন। এসব সংগঠন মিলে ২৯, ৩০ ও ৩১ মার্চ এই তিনদিনব্যাপী আয়োজন করে সিপাহী বিপ্লবের শতবার্ষিক অনুষ্ঠান। তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হওয়া এ-অনুষ্ঠানে সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ইতিহাস বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। এছাড়া ছিল কাজী নজরুল ইসলাম ও ফররুখ আহমদের গান এবং আসকার ইবনে শাইখ (১৯২৫-২০০৯)-এর নাটক 1857-এর মঞ্চায়ন। কবিসম্মিলনীও হয়েছিল সিপাহী বিপ্লবের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের জন্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানের মূল সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোহাম্মদ ইব্রাহিম (১৮৯০-১৯৬৬) যা বলেছিলেন, তা-ই মূলত এ শতবার্ষিক অনুষ্ঠানের মূল প্রতিপাদ্য–

> যে আদর্শ, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধসমূহের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধাবশতঃ বীর মুজাহিদগণ অকাতরে রক্তদান করেছেন তার প্রতি আজো যদি আমরা উদাসীন থাকি তবে আমাদের নবলব্ধ রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ ব্যর্থ প্রমাণিত হবে। (উদ্ধৃত, সাঈদ-উর রহমান ২০০১ : ৫৫)

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদকে সুসংহত করার উদ্দেশ্যে আয়োজিত এই শতবার্ষিক আয়োজন পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদীদের নতুনভাবে উজ্জীবিত করেছিল– এমন ধারণা অমূলক নয়।

৮. রওনক সাহিত্য সংস্থার বৈঠক

১৯৫৮ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে রওনক সাহিত্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। গঠন পর্বে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪) ও মতিনউদ্দীন আহমদ (১৯০০-১৯৮০)। এটি ছিল মূলত একটি ঘরোয়া সাহিত্য সংস্থা। এই সংস্থার উদ্যোগে প্রতিমাসে একটি বৈঠক হতো। বৈঠক সাধারণত অনুষ্ঠিত হতো এই সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত সদস্যদের বাসায়। সেখানে একটি প্রবন্ধ পঠিত হতো এবং সেই প্রবন্ধের ওপর আলোচনা হতো।

রওনক সাহিত্য সংস্থার প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় কবি গোলাম মোস্তফার বাসায়। ওই বৈঠকে গোলাম মোস্তফা নিজে 'পাক-বাংলাভাষা' শিরোনামের একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে আবদুর রশিদ ওয়াসেকপুরী (১৯২৬-?), খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন (১৯০১-১৯৮০) প্রমুখের লেখা 'পাক-বাংলা ভাষার অভিধান', 'পাক-বাংলা সাহিত্যে উপমা' এবং বিদেশি সাহিত্যের বই আমদানি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রতিটি প্রবন্ধ এবং তার আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু ও উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব বাংলার ভাষা ও সাহিত্যকে অপরাপর ভাষা ও সাহিত্য থেকে– বিশেষত পশ্চিম বাংলা থেকে– স্বাতন্ত্র্য দান করা। পাকিস্তান ও মুসলমানের সাংস্কৃতিক, ভাষিক ও সাহিত্যিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানি চেতনার সঙ্গে সাজুয্যপূর্ণ বাস্তবতা তৈরির জন্য যা যা করা প্রয়োজন তার সবই করার পক্ষপাতী ছিলেন রওনক সাহিত্য সংস্থার সভ্যরা। তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন বৈঠকের প্রবন্ধ ও আলোচনায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাকিস্তানি মেজাজ তৈরির জন্য সংস্কৃত শব্দ ও রাঢ়বাংলার সংস্কৃতির বিপরীতে আরবি-ফারসি শব্দ ও পাক-বাংলার মুসলমানি সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটানোর প্রস্তাবনা করেন। সংস্কৃত শব্দ ও রাঢ়বাংলার হিন্দু সংস্কৃতিকে রোধ করার জন্য পশ্চিম বাংলার সাহিত্য বিষয়ক বইপত্র আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলা হয় সাহিত্য সংস্থার বিভিন্ন বৈঠকে। পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের পরিপোষক সাহিত্য সংস্থাটির বৈঠক অবশ্য বেশিদিন চলেনি। ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরের পরে সংস্থাটির আর তেমন কোনো বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এর বিশেষ কোনো প্রভাব ছিল না বললেই চলে। কারণ সংস্থাটির আলোচনা-বৈঠকের কোনো গণসম্পৃক্তি ছিল না। এর 'আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল সমমনাদের মধ্যেই।' (সাঈদ-উর ২০০১ : ৫৬)

৯. সওগাত-মোহাম্মদী-মাহে নও-সমকাল

পাকিস্তান আন্দোলনের সময় বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা যেমন কিছু সাংস্কৃতিক সংগঠন ও এসবের নানা সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি এসময় কিছু সাময়িকপত্রও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর মতো পত্রিকাগুলোও পাকিস্তান আন্দোলনের সাংস্কৃতিক প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। এই ধরনের পত্রিকার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় mIMvZ (১৯১৮) এবং †gvnv¤§` xর নাম। এই দুটি পত্রিকার সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যথাক্রমে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন

Dhaka University Institutional Repository

(১৮৮৯-১৯৯৪) এবং মওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮)। এই পত্রিকা দুটির মধ্যে অন্তত দ্বিতীয়টি সরাসরি পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে পত্রিকাটি পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদকে সমুন্নত রাখার আদর্শে এতটাই নিবেদিত ছিল যে, পূর্ব বাংলার মানুষের ন্যায্য অধিকার আর আন্দোলন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে পত্রিকাটির ভূমিকা ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। (ইসরাইল ২০০৪ : ১১০)। তবে আকরম খাঁর মুসলিম লিগ ত্যাগ (১৯৫৪) বা সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের (১৯৬৪) পর থেকে পত্রিকাটি তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থান থেকে কিছুটা সরে আসে। উল্লেখ্য, পত্রিকাটি ১৩৫৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। তবে মোহাম্মদী পত্রিকার প্রতিক্রিয়াশীলতার জায়গা এবং পাকিস্তানবাদী চেতনার জায়গাটি সার্থকভাবে চর্চা করেছে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা gv‡n bI (১৯৪৯)। অন্যদিকে সওগাত পত্রিকাটি এর প্রতিষ্ঠার সময় থেকে প্রগতিশীলতার চর্চা করে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে আধুনিক মনন নির্মাণে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে। তবে কখনো কখনো পত্রিকাটি পূর্ব বাংলার মানুষের স্বাধিকারের প্রশ্নে, ন্যায্য দাবির প্রশ্নে দ্বিধান্বিত ছিল। 'যেমন, রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বাংলাই যে একমাত্র ভাষা হবে, না হওয়া উচিত একথা তাঁরা বলতে কুণ্ঠিত ছিলেন, বরং উর্দুর প্রাধান্য স্বীকার করতেই প্রস্তুত ছিলেন।' (ইসরাইল ২০০৪ : ২৯২) তবে একথা সত্য যে, ঢাকার অধিকাংশ প্রগতিশীল সাহিত্যিক m|MvZ পত্রিকা এবং এর সম্পাদকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই পত্রিকা এবং এর সম্পাদককে কেন্দ্র করেই পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল সাহিত্য ও চিন্তাচর্চা অগ্রসর হয়েছে। পাকিস্তান আমলে m|MvZ-এর চিন্তা-চেতনার ধারাকে যে-পত্রিকাটি ধারণ আর চর্চা করেছে তার নাম mgKvj (১৯৫৭)। পত্রিকাটি গোড়া থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ধারণ করেছে। এর সম্পাদক সিকান্দার আবু জাফরের সাম্যবাদী চেতনা আর স্বাধীনচেতা মানসিকতা পত্রিকাটিকে বাঙালির প্রাণের পত্রিকায় পরিণত করেছিল। গবেষকের ভাষায়–

> পাকিস্তানের আগে বাঙালি মুসলমান স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় উত্তেজিত ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেই দেখা গেল স্বাতন্ত্র্যই মুক্তি নয়। দুর্বল বাঙালি ন্যাশনালিটি প্রবল পাঞ্জাবি ন্যাশনালিটির বন্ধনে বাঁধা পড়েছে। স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জায়গায় নতুনভাবে দেখা দিল আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। সমকাল এ প্রশ্নে নিজে একাধিকবার বিপদ বরণ করেও সাহসিক এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। এ প্রশ্নের সমাধানে বাঙালি জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব। এ-উদ্ভবে সমকালও তার কৃতিত্ব-চিহ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছে, এ শিরোপা সমকালকে দিতে হবে। (ইসরাইল ২০০৪ : ৩৩০)

বিশেষত ষাটের দশকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামে এই পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের কবিতায় জাতীয়তাবাদী চিন্তার স্ফুরণ ও রূপায়ণ

এক. প্রাক্-ভাষা আন্দোলন পর্ব

১৯৪০ থেকে ভাষা আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের কবিতার এক বিশেষ সময়। এসময় পাকিস্তান আন্দোলন এবং প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের কবিতা বিষয় এবং প্রকরণের দিক থেকে এক বিশেষ লক্ষণপ্রাপ্ত হয়। এই বিশেষ রূপপ্রাপ্তির কারণটি নিহিত আছে পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদে আলোচিত দেশের আর্থ-

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে। উক্ত কালখণ্ডের আর্থ-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ করলে দেখা যায় যে, সময়টা ছিল ভারতের মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জাতীয়তাবাদী বাসনা দ্বারা প্রকম্পিত। এই কম্পন সমকালীন শিল্প-সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো কবিতায়ও লেগেছিল বৈ কি। বরং বলা যায়, আঙ্গিকের স্বল্পাবয়ব ও তাৎক্ষণিক আবেগ ধরে রাখার সক্ষমতা হেতু কবিতায় এই কম্পন একটু বেশি এবং স্পষ্টভাবেই পড়েছিল। এসময়ের বাঙালি মুসলমান কবিদের একটা বড় অংশ কেবল কবি-ই ছিলেন না, তাঁরা অনেকে নানাভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে জড়িত ছিলেন। যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না, তাঁরা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কিন্তু সময়টা ছিল রাজনৈতিকতা দ্বারা এতটাই গ্রাসিত যে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ছিল রাজনীতিরই নামান্তর। নতুন রাষ্ট্রের বাসনা অর্থাৎ নতুন সম্ভাবনাময় জীবনের বাসনা অরাজনৈতিক ব্যক্তিকেও রাজনৈতিক করে তুলেছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল নয়, এমন মানুষ অন্তত পূর্ব বাংলায় বোধ করি খুঁজে পাওয়া ভার ছিল। ফলে, পূর্ব বাংলার কাব্য-কবিতা পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ দ্বারা পরিপুষ্ট হবে এটাই স্বাভাবিক। আদতে ১৯৪০-এর পাকিস্তান আন্দোলন থেকে শুরু করে ভাষা আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত কালপর্বে পূর্ব বাংলার কবিতার মূলধারাই ছিল পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী কবিতার ধারা। (আহমদ রফিক ১৯৯৩ : ৩৪) এই কালসীমায় বাংলাদেশের সময়-সচেতন এমন কবি খুঁজে পাওয়া ভার হবে যিনি পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে কবিতা লেখেননি। যিনি প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী কবিতা রচনা করেননি, তাঁর কবিতাও নানা হতাশার মধ্যেও নতুন রাষ্ট্রের স্বপ্ন আর আশাবাদে উদ্বেল হয়েছে। পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের উত্থানের বা পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবির মূল কারণ অর্থনৈতিক, রাজনেতিক বা সাংস্কৃতিক যা-ই হোক না কেন, এর অন্যতম নিয়ামক যে ধর্ম ছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই। একারণে এসময়ের একটা বড় অংশ কবিতা এই বাস্তবতার চিহ্নকে ধারণ করেই বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাসে বিশেষ হয়ে আছে। আবার একই সময়ে আরেক ধারার কবিতা রচিত হয়েছে যেগুলিতে জাতীয়তাবাদী চেতনা ছায়া ফেললেও ধর্মের ছায়াপাত ঘটেনি।

প্রাক্-ভাষা আন্দোলন পর্বের পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী কবি ও কাব্য

১৯৪০ সালের পাকিস্তান দাবির পর থেকে ক্রমাগত ভারতের রাজনীতি স্পষ্টত দ্বিধাবিভক্ত হতে থাকে। মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিকে কেন্দ্র করে ক্রমাগত দানা বাঁধতে থাকে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ। এই জাতীয়তাবাদের প্রাবাল্য ও একমুখিতা সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বলেছেন—

> তখন পাকিস্তান আন্দোলনের সময়। এ আন্দোলনকে মুসলিম সমাজের এককে শ্রেণী এককে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতো শ্রেণী স্বার্থের দিক থেকে। এই শ্রেণীস্বার্থ পরে যেমন সুস্পষ্টরূপ পেয়েছিল, তখন তেমন পায়নি। তখন ছাত্র এবং অছাত্র যুব সম্প্রদায় প্রায় সমগ্রভাবেই পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করতো, স্বপ্ন এবং সংকল্প নিয়ে। (আবদুল হক ১৯৮৮ : ২৪)

এই পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ পূর্ব বাংলার কবিতাকে প্রায় এককভাবে শাসন করেছে। 'কবি-গল্পকার-প্রাবন্ধিক-ঔপন্যাসিকেরা ভয়াবহভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন পাকিস্তানি জ্বর ও ঘোর দিয়ে।' (হুমায়ুন ২০০৫ : ৮০) গবেষক অমলেন্দু দে বলেছেন, 'পাকিস্তান প্রস্তাব রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের যেমন একটি

Dhaka University Institutional Repository

স্বতন্ত্র পথে পরিচালিত করে, তেমনি সাহিত্য ক্ষেত্রেও হীনমন্যতাবোধ দূর করে ও হিন্দু লেখকদের প্রভাবমুক্ত করে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যের পথে চলতে অনুপ্রাণিত করে।' (অমলেন্দু ২০১১ : ১৮১) চল্লিশের দশকের কবি বলে খ্যাত বাংলাদেশের প্রায় সব গৌণ-মুখ্য কবি তাঁদের কবিতায় পাকিস্তান আন্দোলন, নতুন রাষ্ট্রের বাসনা, নতুন জীবনের স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা, পরাধীনতার অবসান, বঞ্চনার রাত্রিশেষ ইত্যাদিকে উপজীব্য করে কবিতা রচনা করেছেন। 'বিভাগোত্তর বাংলাদেশে (পূর্ববঙ্গে) প্রধানত রাজনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক কারণে সাহিত্যে দ্বিভাজিত আদর্শের উপস্থিতি সত্ত্বেও পাকিস্তানবাদী রক্ষণশীল চেতনার প্রভাব ছিল তাৎক্ষণিকভাবে প্রবল'। (আহমদ রফিক ২০০৬ : ৭) প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত 'বিষয়গত বিচারে ইসলাম ও পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদই ... কবিতায় মুখ্য স্থান দখল করেছিল। ইসলামী বিষয় অবলম্বনে কবিতা রচনার রেওয়াজ শুরু হয়েছে বহু পূর্বে– লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার পর এতে রাজনৈতিক দিকটি প্রবল হয়, আর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তা চূড়ান্তরূপ লাভ করে।' (সাঈদ-উর ২০০১ : ৪০)

প্রাক্-ভাষা আন্দোলন পর্বে বাঙালি মুসলমানের কবিতা শুধু নয়, যাবতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড রাজনৈতিক ভাবানুভূতি জাতীয়তাবাদী চেতনার দ্বারা বিশেষিত। এই পর্বে বাংলাদেশের কবিদের তেমন উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। অধিকাংশ কবিতা মূলত gwmK †gvnv¤§`x, m I MvZ ইত্যাদি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের আগে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন (১৯০১-১৯৮১)-এর †mvbvi cvwK¯Ívb (১৯৪৭), আমিনুল ইসলাম চৌধুরী (১৯১৩-১৯৫৮)-এর RI qve (১৯৪৯), মতিউল ইসলাম (১৯১৪-১৯৮৪)-এর Kv‡q‡` AvRg †Zvgvi Rb¨ (১৯৪৮), আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫)-এর iwÎ‡kl (১৯৪৭), রওশন ইয়াজদানী (১৯১৭-১৯৬৭)-এর eRevYx (১৯৪৭), ivnMxi (১৯৪৯), wPbwewe (১৯৫১), iwOjveÜ (১৯৫১), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪)-এর mvZ mvM‡ii gwS (১৯৪৪), সূফী জুলফিকার হায়দার (১৮৯৯-১৯৮৭)-এর fvOv Z‡jvqvi (১৯৪৫), এম, এ, রশিদ ছিদ্দিকীর cwwK¯Ívb weRq KweZv (১৯৪৭), ছদরুদ্দিন (জ. ১৯১০)-এর GK dwj Pv` (১৯৫০), msMvg (১৯৫১), cqMvg (১৩৫৮) দেওয়ান আবদুল হামিদ-এর cwK¯Ívb Kve¨gÄix (১৯৪৯), cqMvg (১৯৫১), মীজানুর রহমানের cwK¯Ívbx Mvb (১৯৪৮), wR›`v gmjgvb (১৯৪৯), নূর আহমদ শাহ্-এর Kv‡q‡` AvRg (১৯৪৯); মোহাম্মদ হোসেন-এর ¸jkv‡b cwK¯Ívbx (১৯৫০) মোছলেম আহমেদ-এর kivevb Zûiv (১৯৪৮), মুফাখ্খারুল ইসলাম (জ. ১৯২১)-এর †n cvK †dŠR (১৯৪৮) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ। এসব কাব্যগ্রন্থের 'অধিকাংশ কবিতাই রচিত হয়েছিলো সাতচল্লিশের আগে।' (হুমায়ুন আজাদ ২০০৫ : ৮৩) আবার কিছু কবিতা রচিত হয়েছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে কিন্তু কাব্য আকারে প্রকাশিত হয়েছে কিছুটা পরে। ১৯৪০-১৯৫২ সময় পর্বের পূর্ব বাংলার প্রায় সব কবির কবিতাকেই স্পর্শ করেছে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনার জ্বর। শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯), সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৭-১৯৭৫), মযহারুল ইসলাম (১৯২৮-২০০৯), আবদুল গণি হাজারী (১৯২৬-১৯৭৬), আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৬-২০০2) জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (১৯২৮-২০১৪) সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২) প্রমুখ কবির সবাই ১৯৪৭ সালের পূর্বে এবং অব্যবহিত পরে বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁদের পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী

Dhaka University Institutional Repository

চেতনার প্রকাশ ঘটিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। এসব কবিদের অনেকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁদের পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকে স্বপ্নভঙ্গজনিত কারণে সরে আসেন। তবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বের ও পরের কবিতায় মূলত পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনা-ই প্রকাশিত হয়। তখনো বাঙালি জাতীয়তাবাদ কবিতার মানচিত্রে স্পষ্ট কোনো আসন লাভ করেনি। ১৯৪০ থেকে ১৯৫২ সময় পর্বের 'অধিকাংশ কবিই রচনা করেছেন পাকিস্তান ও জাতির পিতা ও শায়েরে পাকিস্তান অর্থাৎ, ইকবালের স্তোত্র, আর ঈদের মহিমা কীর্তন করেছেন তাঁরা বছর বছর।' (হুমায়ুন ২০০৫ : ৮৩) এসময়ে রচিত শুধু মৌলিক রচনা নয়, আজিজুল হাকিমের †ivevBqvr-B-Igi ˆLqvg (১৯৪৮), গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪)-এর wkKIqvn I RvIqve-B-wkKIqvn (১৯৫১) প্রভৃতি অনুবাদ গ্রন্থের উৎসে ক্রিয়াশীল ছিল পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনা।

উপরোল্লেখিত কবিরা ছাড়াও বাঙালি মুসলমান পূর্বসূরি কবিরাও উল্লিখিত সময় পর্বে এসে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনার দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হন এবং রচনা করেন অসংখ্য কবিতা। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন গোলাম মোস্তফা। এ সময় পর্বে তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে ZvivbvB-B-cwK¯Ívb (১৯৪৮) ও ejewj¯Ívb (১৯৪৯)। এছাড়া পূর্বসূরি কবিদের মধ্যে এসময় পর্বে প্রকাশিত হয় শাহাদাৎ হোসেন-এর i/c"Q›'v (১৯৫০)।

এসব কবির সবাই যে শুধু পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদকেন্দ্রিক কবিতা রচনা করেছেন, তা নয়। এঁদের অনেকেরই মূল কবিস্বভাব ভিন্নধারার হলেও তাঁদের কবিতায় নানা সময়ে উঁকি দিয়েছে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী আবেগ। একারণে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরের কবিতা সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন, 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই যে ভাবধারাকে কাব্যক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী সচল এবং প্রবল দেখতে পেলাম তা হচ্ছে– ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসকে স্মরণ করে সৃষ্ট একটি আনন্দময় রোমান্টিক ভাবধারা।' (মুহম্মদ আবদুল ও সৈয়দ আলী ২০১৫ : ৩৮০)

কবিতায় পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনার স্বরূপ

প্রাক্-ভাষা আন্দোলন পর্বের কবিতার প্রধান সুর স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা, মুসলিম ঐতিহ্যের স্মরণ, নতুনভাবে জেগে ওঠা, মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য এবং মুসলিম ঐক্য। এসব অনুষঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রাক্-পাকিস্তান পর্বে কবিরা পাকিস্তান দাবির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন এবং কবিতাকে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ পরিগঠনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন–

> মোঙ্গল-চীন-আরব যে তোর ইরান-আজম-শাম
> তামাম জাহানে শাহী-তখতের তোরি তরে আঞ্জাম।
> কারে ডর তবে– বেয়ে চল তরী দুর্জ্জয় গতিবেগ
> সম্মুখে-পিছে পাহারায় আছে, 'আলীর' দু–ধারি তেগ।
> আসুক ঝঞ্ঝা বজ্র-তড়িতে মেঘের দৈত্য দল
> হানুক করকা প্রলয়-সন্ধে– তুই চির অবিচল–

হিমাচল-সম উন্নত শির কে তোরে টলারে বল।

লা-ইলাহা তোর বুকের বর্ম্ম– তৌহিদে বাঁধ বল। (শাহাদাৎ ১৯৫০ : ৩৪)

অথবা

ভৈরবে ভেরী গরজে গভীর তুর্জে তুরীয় তান

কুল-মুখ্‌লুকে জাগে রোমাঞ্চ– জিন্দা পাকিস্তান।

সিন্ধি-বেলুচী-বাঙালী-পাঠান

হুর-পাঞ্জাবী জাগে মর্দ্দান

তুঙ্গ তুফানে আর্‌বী দরিয়া নির্ঘোষে অবিরাম

জিন্দা পাকিস্তান। (শাহাদাৎ ১৯৫০ : ১৯)

দ্বিতীয় উদ্ধৃতাংশের জাতীয়তাবাদী চেতনার মধ্যে যে-ভূগোল অঙ্কিত হয়েছে তা সমগ্র পাকিস্তানকে একীভূত করেছে। 'সিন্ধী-বেলুচী-বাঙালী-পাঠান-পাঞ্জাবী' জাতিগোষ্ঠী তাদের ভাষিক, নৃতাত্ত্বিক, নিজস্ব সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ছাড়াই মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে কবিকল্পনায় এবং তীব্র আবেগে একাকার হয়ে গিয়েছে। কবির তীব্র পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী আবেগে সব ভেদচিহ্ন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তান চেতনাই এখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। শুধু পাকিস্তানের মধ্যকার সব মুসলিম নয় i|c"Q›'_ কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় সারা পৃথিবীর মুসলমানদের কবি একই জাতি হিসেবে কল্পনা করে বৃহত্তর ইসলামি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ধারণ করেছেন। একারণে এই কাব্যের 'পরিচিতি' অংশে সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন–

> আদর্শের দিক দিয়ে কবি কিন্তু বৃহত্তর ইস্‌লামী জাতীয়তাবাদী। যে-স্বপ্ন থেকে খেলাফৎ আন্দোলনের উদ্ভব, সেই বিশ্ব-মুসলিম ভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন আজও কবির কাছে পরম সত্য, তাই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রথমেই ভাব্‌ছেন বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের দ্বিধাহীন উল্লাসের কথা। (i|c"Q›'_ কাব্যগ্রন্থের 'পরিচিতি' দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা–১১)

বৃহত্তর ইসলামি জাতীয়তাবাদের কথা বললেও কবির মূল কিন্তু প্রোথিত পাকিস্তানে। অর্থাৎ পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ থেকে ক্রমে ধাবিত হয়েছেন বৈশ্বিক ইসলামি জাতীয়তাবাদে।

মুসলিম পরিচয়ভিত্তিক, ইসলামি চেতনাভিত্তিক পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনার উৎসারণ লক্ষ করা যায় জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর নিম্নোক্ত কবিতাংশেও–

তুমি কি শুন্‌ছ আসে আহ্বান ইসলামেরই!

নয়া-জামানার শুন্‌ছ আজান?

তবে ওঠো আজ হে মুসলমান,

তবে গড়ে তোল নয়া মঞ্জিল-পাকিস্তান। (পাকিস্তান/মাসিক মোহাম্মদী, বৈশাখ, ১৩৫৩)

কবিতায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে। 'ইসলাম' এবং 'মুসলমান' শব্দদুটিই কবিতাংশের জাতীয়তাবাদী চেতনার ভিত্তিচিহ্ন হয়ে উঠেছে একথা বলাই বাহুল্য।

কোনো কোনো কবিতায় পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে জাগরূক রাখার জন্য অতীতের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে মুসলমানদের বঞ্চনার চিত্রের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ অভিন্ন বঞ্চনার অনুভূতি

Dhaka University Institutional Repository

একটি জনগোষ্ঠীকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে আরো সন্নিকটবর্তী হতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। সুফিয়া কামালের 'আজাদীর ফরমান' কবিতায় এদিকটি ফুটে উঠেছে–

ভুলে ছিল ভাই ভাইয়ের বেদনা লাঞ্ছনা অপমান,

ভুলেছিল জাতি জাতির যাতনা বঞ্চনা হতমান

আনত করিয়া শির–

পাতিয়া দুহাত নিত উচ্ছিষ্ট পরভোজী গোষ্ঠীর।

লজ্জায় কালো হত না আনন, ছিল নাকো বোধজ্ঞান

ছিল না আলোক অন্ধকারের গাঢ় যবনিকা খান। (মাসিক মোহাম্মদী, ভাদ্র, ১৩৫৪)

উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে জাতির দিশা হিসেবে মুসলিম নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটলে ভারতের মুসলিম জাতি জেগে ওঠে। এবং লাভ করে নতুন রাষ্ট্র, যেন নতুন পরিচয়। সুফিয়া কামালের ভাষায়–

সিপাহ সালার দাঁড়ায়েছে আগে, চলিয়াছে সেনাদল

মুক্তির নেশা বিভোল করেছে, জাগে প্রাণ চঞ্চল।...

সেই 'নারা' সেই 'তকবীর' ধ্বনি ভাঙিয়াছে জিন্দান

মুসলিম জাতি লাভ করিয়াছে তাই আজাদীর ফরমান। (প্রাগুক্ত)

কবিতাটি ১৯৪৭ সালেই রচিত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই রচিত। কবিতাটির মধ্যে আবেগের চেয়ে সিপাহ সালার জিন্নাহর নেতৃত্বে পাকিস্তান রাষ্ট্র তথা পাকিস্তানি জাতি হয়ে ওঠার কারণ ও প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, কবিতাটি পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ এবং বিকাশের ইতিহাস ও প্রক্রিয়াকেই ধারণ করে আছে।

যেকোনো জনগোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদী চেতনা ওই জনগোষ্ঠীর অতীত দুর্ভোগ আর আত্মত্যাগকে স্মরণে এনে তার বর্তমানের গতি ও শক্তি সঞ্চয় করে। জাতীয়তাবাদী চেতনার এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় অসংখ্য কবিতায়– পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেই। 'রাজনৈতিক কারণে সৃষ্ট দাঙ্গায় ইসলামের অনুসারী পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মীরা বেসামাল হয়নি, বরং সামনে অগ্রসর হয়েছে আপন লক্ষ্যাভিমুখে– এই কথা উল্লেখ করেছেন কবি এ, এন, এম, বজলুর রশীদ।' (নিতাই দাস ১৯৯৩ : ২২৭) শুধু বজলুর রশীদ নয়, এ সময়ের আরো অনেক কবি এই চেতনা থেকে কবিতা রচনা করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বেগবান করার প্রয়াস পেয়েছেন। 'কাফেলা চলিয়া যায়' কবিতায় বজলুর রশীদ বলেছেন–

আল্লাহর রাহে চলে মুসাফির নাহি কোন সঞ্চয়

কণ্ঠে তাহার 'লা শরিক' বাণী নাহি ভয় নাহি ভয়

জখমী দিলের খুন ঝরে পড়ে তপ্ত বালুর গায়–

তবু কাফেলা চলিয়া যায়।। (মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ, ১৩৫৩)

ইসলামি যুগের দিগ্বিজয়ের সময় 'তপ্ত বালুর গায়' খুন ঝরানোর কথা বলে কবি দাঙ্গায় খুন ঝরানোর নিকট-অতীতের প্রসঙ্গ স্মরণ করেছেন। এই স্মরণের মধ্য দিয়ে কবি বর্তমানে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

ইঙ্গিত দিয়েছেন। ১৯৪৫ সালে একই চেতনার কবিতা লিখেছিলেন আশরাফ সিদ্দিকীও। তাঁর 'হে বীর সেনানী' কবিতায় দাঙ্গার স্মৃতির স্মরণ নেই, কিন্তু আত্মত্যাগের ইসলামি দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে–

> আমামা দিলনা-দামামা বাজালো-রক্ত ঝরালো তবু
>
> প্রাণ দিল হায় এজিদের হাতে মান দিল নাকো কভু। (মাসিক মোহাম্মদী, মাঘ, ১৩৫২)

একইভাবে রক্তদানের মাধ্যমে আত্মত্যাগের কথাই বলেছিলেন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী তাঁর পাকিস্তান কবিতায় 'শুধু চাই আজ ওগো কারিগর রক্তদান।' (পাকিস্তান, মাসিক মোহাম্মদী, বৈশাখ, ১৯৫৩)

যা নেই কিন্তু কাঙ্ক্ষিত, তার প্রতিষ্ঠা ঘটানোর অদম্য বাসনাই জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ঘুমাতে দেয় না। এই নির্ঘুমতার মধ্যেই সে তার কবিদের দিয়ে লিখিয়ে নেয় নতুন কবিতা, নতুন ইতিহাস। এই নতুন ইতিহাস, সমাজ, কাব্য-কবিতার আয়োজন এবং প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রচুর জাগরণমূলক ও উদ্দীপনা-সঞ্চারী কবিতা রচিত হয়েছে–

> সিন্ধুপারের পাখি যে এনেছে ফাল্গুন দিনের বাণী
>
> হে কবি, এবার নয়া সুরে লেখো নতুন কবিতাখানি।
>
> নোতুন চলার ছন্দে এবার কারাভান দল তব–
>
> নোতুন করিয়া 'গুলেমারজান' ফুটাক না নব নব।
>
> জাতির নয়নে নোতুন আলোর নোতুন প্রদীপ ধরো
>
> হে বীর সেনানী নোতুন করিয়া নয়া ইতিহাস গড়ো। (আশরাফ সিদ্দিকী, হে বীর সেনানী, মাসিক মোহাম্মদী, মাঘ ১৩৫২)

জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ চেতনা ক্রমে তার সীমানা বিস্তৃত করতে উন্মুখ থাকে। কতিপয় থেকে সমগ্রের দিকে ধাবিত হয়ে সবাইকে এক করার মধ্য দিয়ে এই চেতনা পূর্ণতার অভিযাত্রী হয়ে ওঠে। এজন্য শিল্পসাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। শিল্পীর মনোদর্পণে দেখা দেয়া চেতনা, শিল্পের মাধ্যমে অনেকের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। শিল্পী নিরন্তর যে-চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ এবং অস্থির হয়ে ওঠেন, সেই চেতনা তিনি শিল্পিত করে কখনো কখনো উৎসাহমূলক, উদ্দীপনামূলক বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি তাঁর চেতনার সঙ্গে অনেককে গেঁথে ফেলে মালাকরের ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তান আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অসংখ্য কবি এই কাজটি করেছেন। কবিতায় এক ধরনের আহ্বানের মধ্য দিয়ে কবি তাঁর ধৃত জাতীয়তাবাদী চেতনায় অনেককে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এতে ওই চেতনাধারীরা যেমন আরো বেগবান হয়েছে তেমনি এধরনের কবিতার নতুন বিস্তারও ঘটেছে। যেমন, সৈয়দ আলী আহসানের নিম্নোক্ত কবিতা–

> তোমরা শায়েরী এনেছ নূতন গান,
>
> তোমাদের পথে বুলবুলি আজ শিস দিয়ে হয়রান
>
> নিরুদ্দেশের দুর্গম পথে তোমরা ঘোড়সওয়ার
>
> দীপ্ত দিবসের ঝলসিত হাতে উলঙ্গ-তলোয়ার। (আলী আলী ২০০৯ : ২৪৯)

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয়তাবাদী চেতনা অতীতচারিতার মধ্য দিয়ে বর্তমানকে উজ্জ্বল করে তুলতে চায়। অতীতের কোন কোন উপাদানকে সে গ্রহণ করবে, পুঁজি করবে তা বর্তমানের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অভিমুখের স্বরূপ দ্বারা নির্ধারিত হয়। পাকিস্তান আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক ভিত্তির পাশাপাশি, এর রাজনৈতিক চেতনাগত অন্যতম ভিত্তি ছিল ধর্ম। ফলে সঙ্গত কারণেই এর রাজনৈতিক বাস্তবতায় পূর্ব বাংলার কবিরা তাঁদের জাতীয়তাবাদী চেতনা চাঙ্গা ও জাগরূক রাখার উপাদান হিসেবে গ্রহণ ও ব্যবহার করেছে ইসলাম ধর্মের অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্যকে। এ কারণে দেখা যায় চল্লিশের দশকে সক্রিয় প্রায় সব কবিই– আবুল হোসেন ও আহসান হাবীব এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম– তাঁদের কবিতায় জাতীয়তাবাদী চেতনার রূপায়ণ করতে গিয়ে ইসলামের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে কবিতা রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে বোধ করি সবচেয়ে বেশি কাব্যসিদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন ফররুখ আহমদ। 'তিনি প্রাথমিক যুগের ইসলামের উদ্দীপনা, সচলতা, আগ্রহ এবং অনেক দূরে চিত্তকে প্রসারিত করার আকাঙ্ক্ষা তাঁর কবিতায় উপস্থিত করেছেন।' (সৈয়দ আলী ১৯৬৯ : ২৬) যেমন–

> কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
> শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
> ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,
> পাহাড় বুলন্দ ঢেউ বয়ে আসে নোনা দরিয়ার ডাক;
> নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দাবাদ। (ফররুখ ২০১২ : ৩৭)

মূলত ফররুখ আহমদই চল্লিশের দশকের একমাত্র কবি যাঁর কবিতায় পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ নিবিড় ও শৈল্পিক রূপে তীব্র আবেগ আর অতীত ঐতিহ্যের মিশেলে রূপায়িত হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর mvZ mvM‡ii gwS (১৯৪৪) অনন্য। রূপক, প্রতীক, আরবি-ফারসি শব্দ, মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক প্রতিবেশ ইত্যাদির প্রযোজনায়, 'mvZ mvM‡ii gwS-র মধ্যে অত্যন্ত সুন্দর একটা রোমান্টিক ভাবাবহ নির্মিত হয়েছে।' একই জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকে ফররুখ আহমদ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে পাকিস্তান আন্দোলনকে আরো বেশি বেগবান করতে রচনা করেছিলেন AvRv` K‡iv cwK¯Ívb (১৯৪৬) কাব্যগ্রন্থটি। একাব্যের কবিতাগুলো হচ্ছে 'ফৌজের গান', 'আজাদ করো পাকিস্তান', 'ওড়াও ঝান্ডা', 'কায়েকে আজম জিন্দাবাদ', 'নতুন মোহাররম', 'পথ', 'পাকিস্তানের কবি', 'রাত্রির অগাধ বনে', 'কারিগর', 'জালিম' ও 'জুলুম'। এসব কবিতার বিষয় সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন–

> মুসলিমলীগ কর্তৃক গৃহীত পাকিস্তান প্রস্তাবে মুসলমানদের জন্য যে আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল, কবি তাতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে এই কবিতাগুলো লেখেন। ... পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা থাকবে না, অত্যাচার জুলুম থাকবে না, অর্থাৎ একটা আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান গড়ে উঠবে বলে কবি বিশ্বাস করতেন। বর্তমান শোষক-শাসকরা হটে গিয়ে স্বাধীন পাকিস্তানে নিরন্ন মানুষের প্রাধান্য হবে বলে কবি যে আশাবাদ পোষণ করতেন, তারই প্রতিফলন ঘটেছে এই কাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। (নিতাই ২০০৭ : ১৪৪-১৪৫)

ফররুখ আহমদের কবিতায় পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনা ধারণ করাকে অনেকে বলেছেন চল্লিশের সমাজবাদী ধারায় 'সময়স্বভাবে' উচ্চকিত কবিতার সগোত্র। চল্লিশের বাংলা কবিতার মতোই 'ফররুখের প্রথমদিকের কবিতাতেও সমাজতন্ত্রের পাখা ঝাপটানি শোনা যাবে। নির্যাতিত মানুষের অপরাজেয় মনোভাব

Dhaka University Institutional Repository

ও শোষকের পীড়নের বিরুদ্ধে ফররুখও উচ্চারণ করেছেন তাঁর কবিতায়, কিন্তু ক্রমশ এই নির্যাতিতেরই একটি অংশের– বাঙালি মুসলমানের ভাবনা-বেদনা তাঁকে আমূল দখল করে।' (আবদুল মান্নান ২০১৫ : ৪৮৮/২) বলা বাহুল্য 'বাঙালি-মুসলমানের ভাবনাবেদনা' ফররুখ আহমদের পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কবিতা রচনার মূল ভিত্তি। এ সময়ে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠার কারণ ও ভবিষ্যৎ আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে ফররুখ আহমদের চেতনা কেমন ছিল সে সম্পর্কে আবদুল হক তাঁর 'ফররুখ আহমদ' নামক লেখায় বলেছেন–

> ধনতন্ত্র পাকিস্তানের মৌলিক লক্ষ্যের বিরোধী, এবং এ ব্যাপারে রাজনৈতিক কর্মীদের মতো লেখকদেরও কর্তব্য আছে, এ বিষয়ে ফররুখ আহমদ এবং আমি একমত ছিলাম। ভারতীয় সমাজে যে সামাজিক এবং মানবিক বৈষম্য আছে তা পাকিস্তানে সম্ভব হবে না, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে পাকিস্তান অধিকতর অগ্রসর রাষ্ট্র হবে, হওয়া উচিত, এই ছিল আমাদের [আবদুল হক ও ফররুখ আহমদ] ধারণা। আরো অনেকের মতো গোটা পাকিস্তান আন্দোলনই আমাদের চোখে একটা রোমান্টিকতায় মণ্ডিত ছিল। (আবদুল হক ১৯৮৮ : ২৪-২৫)

যদিও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার পরে 'পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর অনুসৃত পথের ভ্রান্তি সম্পর্কে তিনি অবশ্য নিশ্চুপ ভূমিকা নেননি। হায়তদারাজ খান ছদ্মনামে তিনি অনেক ব্যঙ্গ কবিতা লিখে পাকিস্তানি শাসকদের সমালোচনা করেছিলেন। (নিতাই ২০০৭ : ১৪১) পাকিস্তানি শাসকচক্রের নানা অনাচারে আশাহত ফররুখ ষাটের দশকে এসে ক্লান্ত এবং রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তবু পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনা আর যুগপৎভাবে বাঙালি মুসলমানের উন্নয়নভাবনা তিনি ত্যাগ করেননি। এই প্যাশন থেকেই তিনি পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে পাঞ্জাবিদের মূর্খতাজনিত বাড়াবাড়ি এবং ভারতের ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করেছেন। এবং এও তিনি মনে করতেন যে, এ শয়তানির খেসারত দুপক্ষকেই সুদে-আসলে দিতে হবে। (নিতাই ২০০৭ : ১৪১, আখতার ১৯৮৮ : ৫৮) তবে তাঁর mvZ mvM‡ii gwS যে-প্রেরণা থেকে সৃষ্ট, তা এই উপমহাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রাম এবং তৎসঞ্জাত উদ্দীপনার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এতে কোনো সন্দেহ নেই। (রফিকুল ১৯৮৮ : ৫২৫) এদিক লক্ষ রেখেই অনেকে তাঁকে 'একান্তভাবেই পাকিস্তান আন্দোলনের সৃষ্টি' বলেছেন। (আবদুল হক ১৯৮৮ : ৩১) আর তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ন হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদে আস্থাশীল থাকা সম্পর্কে আবদুল হক বলেন–

> ফররুখ আহ্‌মদ ছিলেন প্রতিভাবান, বস্তুত তাঁর প্রজন্মের কবিদের মধ্যে তিনিই ছিলেন যথার্থ প্রতিভাবান, কিন্তু তাঁর নিজের সমাজের নবজাগরণকে, তার দৃপ্ত অগ্রযাত্রাকে তিনি উপলব্ধি করে উঠতে পারেন নি।' (আবদুল হক ১৯৮৮ : ৩৩)

১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ কালপর্বে সক্রিয় বাঙালি মুসলমান কবিদের কবিতার আরেকটি ধারা ছিল। এই ধারা মূলত মার্কসবাদী, সমাজবাদী, সমকাল সংলগ্ন ধারা বলে খ্যাত। এই ধারার কবিদের কবিতায় পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চেতনা প্রত্যক্ষ কোনো প্রভাব বিস্তার করেনি। তবে কারো কারো মনোদর্পণে চলমান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, নতুন রাষ্ট্রের আশাবাদ ইত্যাদি নানামাত্রিক বিভঙ্গ ছায়া ফেলেছে। এসব ঘটনা তাঁদের মনের নির্জন কুঠুরিতে কেলাসিত হয়ে কবিতায় তৈরি করেছে নানা ইমেজ, চিত্রকল্প, টুকরো মনোজাগতিক উদ্ভাস। আহসান হাবীব এই ধারার

Dhaka University Institutional Repository

কবিদের মধ্যে অগ্রগণ্য। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত তাঁর iwÎ‡kl (১৯৪৭) কাব্যগ্রন্থটিতে ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ সময়পর্ব এবং এর নানা ঘটনাপ্রবাহ টুকরো টুকরো ইমেজ-চিত্রকল্পে এবং ভাষা ও প্রতীকের অন্তর্গত প্রবণতায় রূপায়িত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য সময়পর্বেই আহসান হাবীবের iwÎ‡kl কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা রচিত হয়েছে। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ সময়পর্বটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক, উভয় দিক থেকেই এক অস্থির সময়। উত্তেজনা, অবক্ষয় আর শ্লোগানই সময়পর্বটিকে বিশেষিত করেছে। একারণে লক্ষণীয় যে, উক্ত সময়পর্বের সমগ্র বাংলা সাহিত্যের কবিতাই অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় উচ্চকণ্ঠ। এই সরগোল এবং উচ্চকণ্ঠতা নিভৃত, নির্জন ও মৃদুকণ্ঠ-কবি আহসান হাবীবও পুরোপুরি এড়াতে পারেননি। এর প্রমাণ তাঁর iwÎ‡kl কাব্যগ্রন্থের 'আজকের কবিতা', 'হে বাঁশরী অসি হও', 'স্বাক্ষর'সহ বিভিন্ন কবিতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে উঁকি-ঝুকি দিয়েছে শ্লোগানধর্মী উত্তেজনা।

পাকিস্তান আন্দোলনের সময়ে রচিত কবিতার লক্ষণকে হাসান হাফিজুর রহমান দুইভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত, 'জাতীয়তাবোধমূলক লক্ষণসমূহ', দ্বিতীয়ত, 'সাধারণভাবে কাব্যে বিবর্তন সঙ্গত লক্ষণসমূহ।' (হাসান হাফিজুর ১৯৭৩ : ১৮০) আহসান হাবীব দ্বিতীয়োক্ত লক্ষণের কবি। তাঁর কবিতায় প্রথমোক্ত ধারার কবিতার মতো 'রাষ্ট্র গঠনের সাংগঠনিক ও কল্পনাশ্রয়ী আবেগচঞ্চলতা' প্রত্যক্ষভাবে নেই। কিন্তু দেশকালের বাস্তবতা এক বিশেষ ব্যক্তিত্বপূর্ণ ভাষা-প্রতীক চিত্রকল্পে চিত্রিত হয়েছে। দেশকালের বাস্তবতা বলতে ১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত মূলত পাকিস্তান আন্দোলনকেই বোঝানো হচ্ছে। ফলে পাকিস্তান আন্দোলন, বাঙালি মুসলমানের নতুন রাষ্ট্র ও স্বপ্নাকাঙ্ক্ষার বাস্তবতা অন্যকথায় জাতীয়তাবাদী চেতনা আহসান হাবীবের ওই সময়কালে রচিত iwÎ‡kl কাব্যে আভাসিত হয়েছে। যেহেতু আহসান হাবীব সমকালের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ডামাডোলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না, এবং এসব ব্যাপারে এমনকি 'আলোচনাতেও উৎসাহিত হতেন না, সেহেতু তাঁর প্রকাশও প্রত্যক্ষ নয়।' (সৈয়দ আলী ১৯৮৩ : ১৬৮) তবে বাঙালি মুসলমানের বহুকালের বঞ্চনাবোধতাড়িত নতুনরাষ্ট্রের স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রাম তাঁর সংবেদনশীল কবি মনকে সংগুপ্ত স্নিগ্ধ মৃদুভাবে একাত্ম করেছিল। এর প্রথম আভাস ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত কাব্যের iwÎ‡kl নামকরণের মধ্যেই খুব অস্পষ্ট নয়। এছাড়া সমগ্র কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় 'মুক্তপ্রাণ কঠিন সংগ্রাম', 'পুরনো ধুলোরা উড়ে যাবে',' 'নিরাপত্তার পাল', 'নদীর জলে ঝলকে উঠবে মুক্তি', 'নতুন আগুন',' 'বাঁচিবার পণ',' 'ঝরোকায় নতুন আলোক', 'আরেক সূর্যের পানে বিস্তৃত', 'স্বপ্ন রঙিন', 'নতুনের ছাঁচ', 'আমার আত্মার তলে অগ্নিশিখা সাতান্ন সনের', 'নতুন দিনের নতুন সূর্য', 'নতুন বারতা', ইত্যাদি শব্দ, চরণ, প্রতীক আর ইমেজের ব্যবহার পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙালি মুসলমানের সংগ্রাম আর আশাবাদের প্রতি কবির অন্তর্গত সমর্থনকে সহজেই আভাসিত করে তুলেছে। নিম্নোক্ত কবিতায় প্রকৃতি আর সূর্যের ইমেজে আহসান হাবীবের কবিস্বভাবের অনুগামী নতুন রাষ্ট্রের প্রতীকী বাসনার আবিষ্কার অসম্ভব নয়। 'নতুন সূর্যের' উদ্ভাসনের ইমেজ কবি এভাবে এঁকেছেন–

> এদিকে আবার জাগবে নতুন সূর্য।
>
> খানিকটা স্থির হয়ে সে থাকবে
>
> তারপর সে চমকাবে
>
> কাঁপবে

Dhaka University Institutional Repository

কেঁপে কেঁপে উঠে আসবে উপরে
ঝরাবে তার সোনা
ছড়াবে এই এখানে
এই রেড্‌ রোডের মরচে ধরা ঘাসে।
সকাল বেলার হাওয়ায় লাগবে জোর
পুরনো ধুলোরা এবার উড়বে। (আহসান ১৯৯৫ : ৫৩/১)

অথবা,

আগামী দিনের যারা–
এই মৃত স্তূপের উপর
তারা যদি ঘর বাঁধে;
ভাঙা-চোরা দিনের ফাঁটলে
তারা যদি ভালোবেসে নতুন সূর্যের মত জ্বলে,
তাদের কি দেব না হৃদয়?
সূর্য থেকে এ পৃথিবী
আরেক সূর্যের পানে বিস্তৃত কি নয়? (আহসান ১৯৯৫ : ৪৫/১)

অথবা,

নির্লজ্জ হৃদয়ে তবু ছায়া ফেলে বাসনার সোনা,
নতুন বাসার আশা তবু চিত্তে করে আনোগোনা। (আহসান ১৯৯৫ : ৪৩/১)

উদ্ধৃতিগুলোতে নিঃসন্দেহে আহসান হাবীবের কবিস্বভাবের মৌল প্রবণতা ফুটে উঠেছে। তাঁর কবিস্বভাবের মধ্যে বেশ চোখে পড়ার মতো নৈরাশ্য-হতাশা থাকে এবং একই সঙ্গে থাকে আশাবাদ-স্বপ্ন। উদ্ধৃতাংশের আশাবাদ-স্বপ্নকে একারণে সহজেই তাঁর কবিস্বভাবের অংশ বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু এই আশাবাদ-স্বপ্নাকাঙ্ক্ষার বাস্তবভিত্তি বোধ করি বাঙালি মুসলমানের দীর্ঘ বঞ্চনাবোধান্তে নতুন রাষ্ট্রের সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সংযুক্ত।[২৬] কারণ, কবির মনোলোকেই তরঙ্গিত হয় তাঁর স্বজাতির সংগ্রাম, স্বপ্ন, জাগরণ, উজ্জীবন, শিহরণ, নৈরাশ্য এবং বঞ্চনা।

প্রাক্‌-ভাষা আন্দোলন পর্বের বুর্জোয়া কাব্যধারা

বাংলাদেশের কবিতার চল্লিশের দশকে দুটি ধারা ছিল আগেই বলা হয়েছে। একটি ধারা প্রত্যক্ষ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামে কম্পিত। অন্য ধারাটি ঠিক প্রত্যক্ষভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনার রঙে রঙিন নয়। শেষোক্ত ধারার কবিরা তাঁদের জীবনচেতনা আর কাব্য-ঐতিহ্যের অনুসরণের দিক থেকে বাংলা কবিতার মূলধারার সঙ্গে যুক্ত আর লিপ্ত থাকায় ধর্ম ও ধর্মনিষ্ঠ রাজনৈতিকতায় নিজেদের সমর্পিত করতে পারেননি। এই ধারার গুরুত্বপূর্ণ কবি মূলত আবুল হোসেন, আহসান হাবীব, সিকান্দার আবু জাফর আর আলাউদ্দিন আল আজাদ। আবদুল গণি হাজারী এই তালিকায় থাকলেও প্রাক্‌-ভাষা আন্দোলন পর্বে তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

একটা অংশ কবিতা ঘনিষ্ঠভাবেই পাকিস্তানি রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের সঙ্গে শ্লিষ্ট ছিল। তিনি পরে পুরোপুরিভাবে রূপান্তরিত হয়েছেন চেতনায় ও কাব্যাদর্শে। এসব কবির মধ্যে আলাউদ্দিন আল আজাদের প্রাক্-ভাষা আন্দোলন পর্বের কবিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আহমদ রফিক AvjvDwÏb Avj AvRv' KweZv mgM-1 গ্রন্থের 'মুখবন্ধ'-এ বলেছেন—

> পাকিস্তানী সংস্কৃতির দামামা বিভাগোত্তর বছর কয় ধরে সজোরে বাজানো হলেও পূর্বোক্ত চল্লিশের আধুনিকতাবাদী কবিগণ যেমন স্তব্ধ হয়ে থাকেননি তেমনি কিংবা তাদের চেয়েও অধিকতর তৎপরতায় তৎকালীন তরুণ কবিদের সাহসী কলম ধরে আধুনিকতা, জীবনচেতনা বা সমাজচেতনার পক্ষে পঙ্ক্তি রচনা করতে দেখা গেছে। এদের মধ্যে জীবনঘনিষ্ঠ রোমান্টিকতায় নিষিক্ত এবং সমাজচেতনায় জড়িত কবিতা রচনায় বিশেষভাবে উল্লেখ্য আলউদ্দিন আল আজাদ। তাঁর তখনকার কবিতায় মানবিক চেতনা ও গণতান্ত্রিক চেতনার সমন্বিত প্রকাশ যেমন সত্য তেমনি সত্য ব্যক্তিক ও সমাজচেতনার প্রতিফলন।
>
> উল্লিখিত বিশেষ ধারায় প্রাক-বাহান্ন পর্বে যে কয়জন তরুণ কবিতা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে সময় বিচারে আলাউদ্দিন আল আজাদ অগ্রগণ্য। ... কবির ভাষ্যমতে তাঁর মানচিত্র বইটিতে (যদিও প্রকাশিত ১৩৬৮) সংকলিত অধিকাংশ কবিতাই প্রাক-বাহান্ন পর্বে এবং পঞ্চাশের দশকে (১৯৫১) রচিত। প্রাক-বাহান্ন পর্বে এ ধরনের কবিতা লেখা ছিল সাহসিকতার পরিচায়ক। (আহমদ রফিক ২০০৬ : ৭)

স্মর্তব্য যে, এই ধারার কবি এবং কবিতা প্রাক্-ভাষা আন্দোলন পর্বে কম ছিল। পরবর্তী প্রজন্মের কবিদের হাতেই এই ধারাটি পরিপুষ্ট হয়েছে। এই পরবর্তী প্রজন্মের কবিদের হাতেই বাংলাদেশের কবিতা তার নিজস্ব সুর ও স্বর আবিষ্কার করেছে এবং একই সঙ্গে নতুন জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ধারণ করে অনন্যতা লাভ করেছে। এই ধারার নতুন প্রজন্মের কবিদের বেশ কয়েকজনের আগমনী বার্তা ধ্বনিত হয় আশরাফ সিদ্দিকী ও আবদুর রশীদ খান সম্পাদিত bZb KweZv (১৩৫৬) সংকলনের মাধ্যমে। তাঁরা এই অভিসন্দর্ভের কাঠামো পরিকল্পনায় ভাষা আন্দোলন পর্বের নতুন প্রজন্মের কবি হিসেবেই আলোচিত হয়েছেন।

দুই. ভাষা আন্দোলন পর্ব

১৯৪০ থেকে ভাষা আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের কবিতাকে বিষয় এবং আঙ্গিকের দিক থেকে শাসন করেছে মূলত পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনা। পাকিস্তান আন্দোলন এবং প্রতিষ্ঠার তৃপ্তিই এই পর্বের কবিতার নিয়ন্তা। আমরা দেখেছি, পরবর্তীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ অনেক কবি, যাঁরা চল্লিশের দশকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁরাসহ পূর্বের রাবীন্দ্রিক রোমান্টিক ধারার বাঙালি মুসলমান প্রায় সব কবিই ১৯৪০-১৯৫২ কালপর্বে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাব্য-কবিতা চর্চা করেছেন। এর মূলে ছিল বাঙালি মুসলমানের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক মুক্তির বিশেষ তাগিদ। নতুন রাষ্ট্রের বাসনা এবং নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা তাঁদের সত্তাকে প্রাণিত করেছিল ওই সময়ের নতুন কবিতা রচনায়। আবার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরে আত্মতৃপ্তি ও প্রাপ্তিকে সমুন্নত রাখার আত্মগরিমাজাত জাতীয়তাবাদী আবেগের ধারাই ছিল তখনকার কবিতার মূলধারা।

কিন্তু ১৯৫২-১৯৬০ কালপর্বটি অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনের পরের সময়পর্বটি বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই পর্বটিকে বলা যায় বাংলাদেশের কবিতার নবজন্ম। পূর্বের রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণে আমরা দেখেছি যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পেছনে বাঙালি মুসলমানের যে স্বপ্ন-সাধ ক্রিয়াশীল ছিল তা পাকিস্তান রাষ্ট্রের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে মিলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। নবগঠিত রাষ্ট্রে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, ন্যায্য অধিকার ইত্যাদির অনুপস্থিতি পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমানদের প্রথমে ভাবিত করলেও বেশ কিছুকাল হতাশ করেনি। কিন্তু ক্রমে তারা হতাশ হয়েছে এবং পরিণামে ক্ষুব্ধ হয়েছে। পূর্ব বাংলার মানুষের চেতনার এই ক্রম দারুণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাদের কাব্য-কবিতায়। তাছাড়া বাংলাদেশের কবিতা এই কালপর্বেই রাজনীতির মতোই আবিষ্কার ও আত্মস্থ করেছে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার স্বকীয় সুর ও স্বর। এই পর্বেই বাংলাদেশের কবিতাকে মোকাবিলা করতে হয়েছে পাকিস্তানবাদী কবিতার ধারাকে। দ্বন্দ্ব-মোকাবিলা, আত্মানুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গ্রহণ-বর্জন, পলায়ন-সম্মুখসমর ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এই পর্বেই বাংলাদেশের কবিতা নিজেকে আবিষ্কার করেছে; অঙ্গীকৃত করেছে তার দেশ ও দশকে; জাতীয় আকাঙ্ক্ষা ও চরিত্রকে। বন্ধুর এই পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশের কবিতা নানাভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনায় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী কবিতাধারার পূর্বানুসৃতি

১৯৪০ থেকে ১৯৫২ কালপর্বের পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী কবিতার ধারা আমাদের কথিত ভাষা আন্দোলন পর্বেও অব্যাহত থেকেছে। পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী ধারায় যাঁরা পূর্বে কবিতা রচনা করেছেন তাঁরা এই পর্বে এসে সেই ধারাকে সচল রেখেছেন নতুন উদ্যমে। আবার নতুন কেউ কেউ যুক্ত হয়েছেন এই ধারায়। তবে এই ধারায় নতুন শক্তিশালী কবির আবির্ভাব ঘটেনি বললেই চলে। বরং পূর্বের কবিরাই এই ধারাকে কখনো পুনরাবৃত্তি কখনো নতুনমাত্রা যোগ করার মধ্য দিয়ে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। এই পর্বে এসে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদকে আশ্রয় করে রচিত কাব্যের মধ্যে জহিরউদ্দীন মোয়াজ্জম হোসেন চৌধুরীর-এর w‘b AvMZ H gmwjg Ze KB (১৯৫২), সূফী জুলফিকার হায়দারের AwRKvi KweZv (১৯৫৫), ¯c hvi Avbj †h Moj hviv (১৯৫৯), আজহারুল ইসলামের (জ. ১৯১১) Qvqvc_ (১৯৬৬), রওশন ইয়াজদানীর K‡qKwU KweZv (১৯৬০), LvZvgb bexCb (১৯৬০), cwK¯Ív‡bi R½bvgv (১৯৬৫), ফররুখ আহমদের wmivRg gbxiv (১৯৫২), †bŠ‡dj I nv‡Zg (১৯৬১), gn‡Zi KweZv (১৯৬০);[২৭] তালিম হোসেন (১৯১৮-১৯৯৯)-এর w‘kvix (১৯৫৬), kvnxb (১৯৬২) উল্লেখযোগ্য। এছাড়া এই পর্বে gwmK †gvnv¤§‘x, mIMvZ, bIevnvi, gv‡n bI, mvßwnK ˆmwbK ইত্যাদি পত্রিকায় পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনার বেশ কিছু কবির কবিতা বিভিন্ন সংখ্যায় ছাপা হয়। এই সময়পর্বে প্রকাশিত হয় এই কাব্যধারার দুটি উল্লেখযোগ্য কবিতার সংগ্রহ Kve¨ex_ (১৯৫৪) এবং ceevsjvi KweZv (১৯৫৪)। একই সময়ে পূর্ব বাংলায় লক্ষ করা যায় কিছু অনুবাদ। যেমন, সৈয়দ আলী আহসানসহ বেশ কয়েকজন কবিকৃত BKev‡ji KweZv (১৯৫২) শিরোনামে একটি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় সৈয়দ আলী আহসানের সম্পাদনায়। এসময়ের অধিকাংশ কবিতায় মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রতীক ও আরবি-ফারসি শব্দের সংযোজনে অর্জিত নতুন রাষ্ট্রের ঐক্য সমুন্নত রাখার প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

এ ধারার কবিরা দেশবিভাগের পূর্বেকার পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি ও পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের আদর্শকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছেন তাঁদের কবিতায়। এই আদর্শভিত্তিক কিছু নতুন পত্রিকা–

Dhaka University Institutional Repository

যেমন gv‡n bI, w‘jiæev– ও সাংস্কৃতিক সংগঠনও পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব পত্রিকা ও সাংস্কৃতিক সংগঠন তাদের তৎপরতার মাধ্যমে পাকিস্তানের 'তাহজীব ও তমদ্দুন' সমুন্নত রাখা এবং পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার চিরকালীন পার্থক্য স্বীকার করে পূর্ব পাকিস্তানের স্বতন্ত্র সাহিত্যধারা নির্মাণ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে। এসব পত্রিকা ও সংগঠনকে কেন্দ্র করেই মূলত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী কাব্য-কবিতার প্রকাশ-পরিবর্ধন হয়েছে। এসব পত্রিকা ও সংগঠন যেমন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক হয়েও মূলত চেতনার দিক থেকে ছিল রাজনৈতিক, তেমনি এতে প্রকাশিত কবিতাও ছিল রাজনৈতিক।

ভাষা আন্দোলন পর্বের পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী ধারার কবিতা যতটা না সাহিত্য বা সংস্কৃতির অংশ তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক। সাহিত্যে এই রাজনৈতিক আদর্শ জারি রাখার ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী ধারার অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক ছিলেন গোলাম মোস্তফা। ১৯৬০ সালে গোলাম মোস্তফা তাঁর এক প্রবন্ধে পাকিস্তান রাষ্ট্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'পাকিস্তানের এখন সংগঠনী যুগ'। রাষ্ট্রের যথার্থ রূপ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সাহিত্যিকদেরও কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর বিভিন্ন গদ্যরচনায়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের 'সংগঠন যুগে' তিনি কবিদের প্রতি 'জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি দরদ' দেখিয়ে তা নিয়ে কবিতা রচনা করতে বলেছেন। মুসলিম কবিদের রচিত 'কাসাসুল আম্বিয়া,' 'জঙ্গনামা', 'শাহনামা', 'ছয়ফুলমুল্‌ক্‌', 'চাহার দরবেশ' ইত্যাদির মধ্যে ঐতিহ্যের প্রতিফলন দেখিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের লেখকদের সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কাব্য-কবিতা রচনার আহ্বান জানিয়েছেন। (গোলাম ১৯৬২ : ২৩১-২৩২) তিনি মনে করতেন, 'সাহিত্যে যদি কেউ স্থায়ী আসন পেতে চায়, তবে অনাবিষ্কৃত যে রত্নখনি আমাদের আপন দেশে, আপন ইতিহাসে ও আপন তাহ্‌জিব-তমদ্দুনে রয়েছে, তাঁর সন্ধান করতেই হবে। সবিশেষ হলেই তবে আমাদের সাহিত্যের মূল্য বাড়বে।' (প্রাগুক্ত : ২৩২) বলা বাহুল্য গোলাম মোস্তফার এই দৃষ্টিভঙ্গিই পোষণ করতেন পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী কবিরা। তবে তাঁদের কবিতার বিষয়বস্তু, ভাষাকাঠামো এবং চেতনা যে গোলাম মোস্তফা কথিত 'আমাদের আপন দেশে' মনোযোগ দিতে পেরেছে, সেকথা বলা মুশকিল হয়ে যাবে। এঁদের সাহিত্যের প্রধান প্রবণতা, উদ্দেশ্য ও আশাবাদ সম্পর্কে গোলাম মোস্তফা নিচের উদ্ধৃতাংশে যা বলেছেন, তা-ই ছিল ভাষা আন্দোলন পর্বের পাকিস্তানবাদী সাহিত্যের মূল চেষ্টা–

> আমরা এখন পাকিস্তান পেয়েছি। স্বতন্ত্র জাতিত্ব এবং স্বতন্ত্র তাহ্‌জিব তমদ্দুনের দাবীই এর ভিত্তিমূল। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যে ভয় পাবার কিছু নেই। ধর্মে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে মুসলমানেরা স্বতন্ত্র হয়েছে বলেই জগতে কল্যাণের পথ খুলে গেছে। বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র পথ নিলেও অনেক নতুনত্ব ও বৈশিষ্ট্য আসবে। ইসলাম অচলায়তন সৃষ্টির বিরোধী। তার মধ্যে আছে সৃষ্টির উল্লাস, মুক্তির আনন্দ, অসীমের ইংগিত ও অনির্বচনীয়ের ছাপ। এইখানে আমাদের কাব্য-সাহিত্যে ইসলামের প্রয়োজন রয়েছে। ইসলামের স্পর্শ পেলে প্রেম, 'তাজমহলে' রূপান্তরিত হয়। (গোলাম ১৯৬২ : ১৯১-১৯২)

গোলাম মোস্তফা কথিত এই চিন্তা-চেতনা পাকিস্তানবাদী কাব্যধারার কবিদের আদর্শের মধ্যেই থেকে গিয়েছিল। এই ধারার কবিরা এই আদর্শের তেমন কোনো বাস্তবায়ন তাঁদের কবিতায় ঘটাতে পারেননি।

পাকিস্তানবাদী সাহিত্য সাম্প্রদায়িক সাহিত্য কিনা সেদিক সম্পর্কেও আদর্শ জারি রেখেছিলেন পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনার কবিকুল। চট্টগ্রামের সাহিত্য সম্মেলনে কাব্যশাখার সভাপতির অভিভাষণ দিতে গিয়ে ১৯৫৯ সালে গোলাম মোস্তফা তাজমহলের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন–

Dhaka University Institutional Repository

> জয়পুর, যোধপুর, তুরস্ক, ইরান– সব যায়গা থেকে সে উপকরণ সংগ্রহ করে বটে; কিন্তু সমস্ত মিলিয়ে যে মর্মরস্বপ্ন সৃষ্টি হয়, তার অন্তরে থাকে মমতাজ, বাইরে থাকে শাহ্জাহান। মানব-মনের যা-কিছু অনুভূতি, তা যখন সত্য সুন্দর ও কল্যাণলোকে পৌঁছে যায়, তখন তার গায়ে আর কোন সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ থাকে না– তার আবেদন তখন বিশ্বজনীন হয়। আমাদের শিল্পসাহিত্যও একই নীতিতে রচিত হবে। (গোলাম ১৯৬২ : ১৯২)

কিন্তু বলা বাহুল্য, পাকিস্তান পর্বের পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী ধারার কবিরা তাঁদের কবিতাকে ইসলাম আর সাম্প্রদায়িকতার বাইরে খুব বেশি দূর নিয়ে যেতে পারেননি।

পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী কবিতা ও লোকজীবন

পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি, পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ, পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ ইত্যাদি পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনার সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো বরাবরই পূর্ব বাংলার জন্য একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যধারা সৃষ্টির কথা বলে এসেছে। বলা বাহুল্য, এই স্বাতন্ত্র্য পশ্চিম বাংলার সাপেক্ষে, পশ্চিম পাকিস্তানের সাপেক্ষে নয়। বরং পাকিস্তানের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার কথাই বলা হয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে যেহেতু পূর্ব বাংলার ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যগত কোনো মিল নেই এজন্য ইসলামি আদর্শ দ্বারা পাকিস্তানের সঙ্গে ঐক্য অটুট রাখার কথা বলতেন এই ধারার জাতীয়তাবাদী কবি ও তাত্ত্বিকরা। এই ধারার কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক-তাত্ত্বিকরা স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদির মুসলিমানুগ উপস্থাপনার মাধ্যমে। একই সঙ্গে উপর্যুক্ত সাংস্কৃতিক সংগঠন ও পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনাধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সাহিত্যসম্মেলন থেকে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কবি-সাহিত্যিকরা কবিতায় পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদকে সমুন্নত করতে গ্রামীণ জীবন আর লোক-সাহিত্যের উপাদান ব্যবহারের ওপর জোর দেন। কারণ যেকোনো জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং এই চেতনাকে আশ্রয় করে রচিত কবিতা ওই জনগোষ্ঠীর লোকজীবন ও লোকসাহিত্যকে আত্মীকৃত করে পরিপুষ্ট হয়।

পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনাধারার কবিতার মধ্যে এই প্রবণতাটি দুর্লক্ষ নয়। তবে এক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমানের লোকসাহিত্য বলতে অধিকাংশ সময় বোঝানো হয়েছে মধ্যযুগে বাঙালি মুসলমান কবিদের দ্বারা রচিত পুঁথিসাহিত্যকে। যেমন- ‘জঙ্গনামা’ ‘গাজীকালু ও চম্পাবতীর কেচ্ছা’, ‘গোলে বকাওলী’, ‘লায়লী-মজনু’, ‘শিরী-ফরহাদ’, ‘হাতেমতাই’, ‘ছয়ফুলমূলক’, ‘চাহার দরবেশ’ ইত্যাদি। লোকসাহিত্য হিসেবে পরিগণিত এসব কাহিনি পুঁথিসাহিত্যের মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এই হিসেবে এগুলো লোকসাহিত্যের মর্যাদার অধিকারী। বাঙালি মুসলমানের লোকজীবনে ব্যাপকভাবে প্রচলিত এসব কাহিনিভিত্তিক কিছু রচনার প্রয়াস পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদীধারার কবিতার মধ্যে লক্ষ করা যায়। যেমন– সৈয়দ আলী আহসানের Pvnvi ‘i‡ek I Ab¨vb¨ KwebZv বা ফররুখ আহমদের nv‡Zg Zvðqx, †bŠ‡dj I nv‡Zg ইত্যাদি। কিন্তু এই ধারার চর্চা পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী কবিকুল খুব বেশি করেছেন বলে মনে হয় না। আবার পূর্বোল্লেখিত যেসব কবিরা করেছেন তাঁদের অবলম্বিত পুঁথিসাহিত্যের লোককাহিনি বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঠিক ওই মাত্রায় প্রচলিত, জ্ঞাত ও ব্যবহৃত নয়, যে-মাত্রায় প্রচলিত, গ্রাহ্য ও ব্যবহৃত হলে তাকে লোকসাহিত্যের উপাদান বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে ‘চাহার দরবেশ’ ও ‘গাজী কালু চম্পাবতী’র কাহিনির তুলনা করলে। ‘গাজীকালু চম্পাবতী’ বাঙালি মুসলমানের লোকজীবনের যত গভীরে প্রোথিত ‘চাহার দরবেশ’ ততোটা নয়।[২৮] (বোরহানউদ্দিন ১৯৬৯ : ৪৪) ফলে আকাঙ্ক্ষার দিক থেকে উচ্চাভিলাসী হওয়া সত্ত্বেও লোকসাহিত্যের উপাদান ব্যবহারে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী কাব্যধারা পূর্ব বাংলার লোকজীবনের প্রতিনিধিত্ব করেনি। লোকের জীবন আর লোক-মানুষের সাহিত্যরুচির দিকে লক্ষ করে সাহিত্য রচনার আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজনীয়তা ও ব্যর্থতা সবই ধরা পড়েছে গোলাম মোস্তফার কথায়–

> সাহিত্যের আর্শিতেই জাতির অন্তর্মূর্তি প্রতিফলিত হয়। আমাদের সাহিত্যেও তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবিম্বিত হবে আমাদের কৃষক-জীবনের ছবি। শতকরা ৯০ জনকে বাদ দিয়ে কোন সাহিত্য রচিত হতে পারেনা; হলেও তা হবে বুর্জোয়া সাহিত্য বা কুলীন সাহিত্য। আমরা যে ভাষায় লিখি, তাতে আছে সেই আভিজাত্যের গন্ধ। এভাষা মাঠের মাটিতে নামতে জানেনা, শুধু জানে আকাশে উড়তে। সাহিত্যের এই ব্রাহ্মণ্য রূপ এখন আমাদের যথাসাধ্য বর্জন করতে হবে; নামতে হবে আমাদের ধরার ধূলায়, শুনতে হবে মাটির বুকের কান্না-হাসি, গাইতে হবে মাটির মানুষের গান। এদের জীবনেও রহস্য আছে, রোমাঞ্চ আছে, প্রেম আছে, বিরহ আছে। কাব্য ও সাহিত্যের প্রচুর উপকরণ আছে। ... দুঃখের বিষয়, আমাদের কবিসাহিত্যিকেরা এদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন; এদের জীবনের চমৎকারিত্ব ও মাধুর্য তাই এরা ধরতে পারেন না। (গোলাম ১৯৬২ : ১৪৯)

উদ্ধৃতাংশে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী কাব্যধারার লোক জীবনকে, গণজীবনকে সাহিত্যের অঙ্গীভূত করার চেতনা ধরা পড়েছে। একইসঙ্গে এক্ষেত্রে ‘আমাদের কবিসাহিত্যিক’দের ব্যর্থতার কথাও বলা হয়েছে। গোলাম মোস্তফা উদ্ধৃতাংশে এবং মূল প্রবন্ধে (মাঠের কবি) তির্যকভাবে এই ব্যর্থতাকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালের আধুনিক কবিদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সমগ্র পাকিস্তানবাদী সাহিত্যধারার দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, এবিষয়ে অর্থাৎ পূর্ব বাংলার লোকজীবনকে, গ্রামীণ জীবনকে, তার ভাষা ও সাহিত্যিক উপকরণকে কাব্যে তুলে আনার ক্ষেত্রে তাদের ব্যর্থতা চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছিল। বিষয়টি মূলত তাঁদের মধ্যে তত্ত্ব হিসেবেই হাজির ছিল। একারণেই বোধ করি পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী কবিতাধারার অন্যতম কবি ফররুখ আহমদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন, “ফররুখ আহমদ ‘ইসলাম’কে যেরূপ আকুলভাবে হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন সমান আকুলতায় তিনি তার স্বদেশভূমির ঐতিহ্যকে...কবিতায় উপস্থিত করতে পারেননি।” (আল মাহমুদ ১৯৯৫ : ৩৭)

গ্রামীণ ও লোকজীবনের রূপায়ণের প্রশ্নে সমগ্র পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী কাব্যধারায় একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন রওশন ইয়াজদানি। এই ব্যতিক্রম ছিল তাঁর কাব্যের বিষয়, ভাষা, আঙ্গিক সবক্ষেত্রেই। ivnMxi (১৯৪৯), LvZvgb bexCb (১৯৬০) এবং cwwK¯Í v‡bi R½bvgv (১৯৬৫) তাঁর প্রত্যক্ষ পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনা-প্রকল্পের আওতায় রচিত কাব্যগ্রন্থ। এখানে পাকিস্তানবাদী ধারার অন্যান্য কবির মতোই পাকিস্তানের প্রশস্তি, জিন্নাহর গুণকীর্তন, পাকিস্তানকে অটুট রাখার প্রত্যয়, পাক-ভারত যুদ্ধে পাকিস্তানের জনগণ ও সৈন্যদের উজ্জীবিতকরণ ইত্যাদি সবই আছে। কিন্তু এসব কাব্যের ভাষা, আঙ্গিক, কাহিনি-উৎস, বর্ণনভঙ্গি, শব্দচয়ন, বিষয়নির্বাচনের সঙ্গে পূর্ব বাংলার লোকজীবনের ঘটেছে এক নিবিড় যোগ। iwOjv eÜ কাব্যে তিনি যখন ‘পাকিস্তানের চাষী’ কবিতা অথবা ‘কায়েদে আজমের জারি’ লেখেন; কিংবা ivnMxi কাব্যে ইসলামের অভ্যুদয় থেকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণনা করেন; এমনকি

Dhaka University Institutional Repository

যখন তিনি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনীভিত্তিক কাব্য LvZvgb bexCb লেখেন তখন তিনি সেখানেও পূর্ব বাংলার লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের একান্ত প্রবণতাকে জারি রাখেন–

লইলো জনম সোনার ছাওয়াল ভরলো মায়ের কোল
খুশিতে তাঁর বিশ্বজাহান অমনি দিলো দোল;
ঘুমে ছিলো ঘুমুতি জগৎ– ডাইক্যা বলে, জাগ,
নাচে তামাম তাক-ধিনা-ধিন– খুশিতে বাগ বাগ,
ঊষা নাচে বিহান নাচে– পুষ্প নাচে ডালে
মনের খোশে দইরা নাচে ঢেউয়ের তালে তালে। (রওশন ১৯৬০ : ১৭)

উদ্ধৃতাংশের বর্ণনাভঙ্গি পুঁথির মতো, ভাষা খাঁটি পূর্ব বাংলার, বাকভঙ্গি পূর্ব বাংলার অথচ বিষয়টি দেশ-কালের ওই বিশেষ পরিপ্রক্ষিতে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনারই পরিপূরক। পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি, পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ, এবং অপরাপর পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনার আদর্শভিত্তিক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও এদের সাহিত্য সম্মেলনে বাংলা কবিতায় লোকজ উপাদান ব্যবহার ও পশ্চিম বাংলার সাহিত্য থেকে আলাদা করার যেকথা বলা হতো তা বোধ করি ওই ধারার কবিদের ভেতর যথার্থভাবে রওশন ইয়াজদানীর মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে। একারণে তাঁর কবিতা পাকিস্তানবাদী হয়েও দারুণভাবে লোকজ এবং পূর্ববঙ্গীয়। নিচের মন্তব্য একারণেই যথার্থ বলেই মনে হয়–

> পাকিস্তানপন্থী অন্যান্য কবির মতো তিনি কবিতায় অনেক আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তবে তার মাত্রা বাংলা শব্দ কিংবা ময়মনসিংহের আঞ্চলিক বুলির ভাণ্ডার অতিক্রম করে যেতে পারেনি। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেশজ শব্দই তিনি বেশি ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন। তিনি পাকিস্তানবাদী কবিদের মূলধারা অর্থাৎ পাকিস্তানী রেনেসাঁর আসল সুরটি ধরতে পেরেছিলেন। (নিতাই ২০০৭ : ১৪০)

কাব্যস্বভাবের এই বিশেষ ধরনসহ রওশন ইয়াজদানী পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনাধারার কবিকুলের সঙ্গে ঠিক হুবহু যেন মেলেন না। ইয়াজদানীর কবিতা যেন পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের এক ভিন্ন সংস্করণ, যেখানে পূর্ব বাংলা বিশেষ রূপপ্রাপ্ত হয়েছে; বিশেষ আবেগ ও অগ্রাধিকারে ধরা পড়েছে। একারণে ইয়াজদানী যখন হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনী বর্ণনা করেন তখন 'মনে হবে হযরত মোহাম্মদ বুঝি বাংলাদেশেরই একজন মানুষ।' (নিতাই ২০০৭ : ১৩৪) ইয়াজদানীর কবিতায় পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ, ইসলামি ঐতিহ্য এবং পূর্ব বাংলার লোকজ ঐতিহ্য– এই তিনের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল।

কবিতায় পাকস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনার আদর্শ নির্মাণ-প্রচেষ্টা

পাকিস্তান নামক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবির অন্যতম ভিত্তি ছিল জাতিগত ভিন্নতা। মুসলমানদের নিজেদের ভিন্ন জাতি হিসেবে দাবির মূলে আরো অনেক কিছুর সঙ্গে ক্রিয়াশীল ছিল ধর্ম। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার দাবির মুখে ভারতের মুসলমানরা দাবি করেছিল তাদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর সংস্কৃতির মধ্যে অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন রূপ-প্রকৃতি থাকে। সেই হিসেবে পাকিস্তান দাবির প্রাক্কালে ধর্মের স্বাতন্ত্র্যের পাশাপাশি ভারতের মুসলমানদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের

কথাও বলা হয়েছিল। পাকিস্তান দাবির ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের যে-চিহ্নায়ন ঘটেছিল তাও ছিল মূলত ধর্মজাত। মোটকথা, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পেছনে মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের বাস্তবতা একটা বড় নিয়ামক ছিল। এ কারণে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনাধারার সাহিত্যকর্মের মুখ্য নিয়ামক ছিল ধর্ম, ধর্মানুভূতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ। একথা ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৬০ কালপর্বের এই ধারার প্রায় সব কবিদের সম্পর্কে বলা যায়। তবে, এই ধারার প্রাক্-ভাষা আন্দোলন পর্বের কাব্য-কবিতার সঙ্গে পাকিস্তান পর্বের কাব্য-কবিতার একটি পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। প্রাক্-ভাষা আন্দোলন পর্বের কবিতার মধ্যে উদ্দীপনা, জাগরণ, উৎসাহ, আস্ফালন, তীব্র রোমান্টিক স্বপ্নকাতরতা, বিধ্বংসী মনোভাব, পাকিস্তান ও পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত নেতৃত্বের প্রশস্তি প্রাধান্য পেয়েছে। আর পাকিস্তান পর্বের কবিতায় জাতীয়তাবাদী জাগরণের যে-উদ্দীপনা তা বেশ খানকিটা শমিত হয়ে গিয়েছে। এপর্বে কবিরা যেন মনোযোগ দিয়েছেন জাতীয়তাবাদী চেতনার পরিকল্পিত পরিগঠনে। ফলে, ইসলামি আদর্শবাদই এ-পর্বের কবিতার প্রধান সুর হয়ে উঠেছে। ধর্মীয় আদর্শবাদের পাশাপাশি পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনাধারার কবিরা এই পর্বে এসে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে বাঙালি মুসলমানের কাব্য-ঐতিহ্যের উৎস ও রূপরেখা নির্মাণে মনোযোগী হয়েছেন।

গোলাম মোস্তফার ewb Av'g (১৯৫৮), সূফী জুলফিকার হায়দারের dv‡Znv-B-†'vqvR 'ng (১৯৫১), ছদরুদ্দীনের cqMvg (১৩৫৮) ও msMvg (১৯৫১), রওশন ইয়াজদানীর LvZgb bexCb (১৯৬০), ফররুখ আহমদের wmivRg gbxiv (১৯৫২), gn‡Zi KweZv (১৯৬০) কাব্যগ্রন্থের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উপর্যুক্ত ধরনটি সহজেই চোখে পড়ে। যেমন ewb Av'g কাব্যে গোলাম মোস্তফা আদমের সংগ্রাম, শ্রেষ্ঠত্ব আর প্রতিষ্ঠাকে আদর্শায়িত করতে চেয়েছেন। পাকিস্তানের মুসলমানদের সংগ্রাম শ্রেষ্ঠত্ব আর পরিণামে কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠার রূপকাভাস কাব্যটির মধ্যে দূর কল্পনা নয়। একই ধরনের চেতনা লক্ষ করা যায় পূর্বোল্লেখিত কবিদের কাব্যে। এসব কাব্যে হয় হযরত মুহাম্মদ (স.) নতুবা ইসলামের আদর্শ ব্যক্তিত্ব নতুবা মুসলিম সাহিত্যিককে আদর্শায়িত করা হয়েছে। dv‡Znv-B-†'vqvR 'ng ও LvZvgb bexCb কাব্যে আছে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আদর্শ জীবনের রূপায়ণ। ফররুখ আহমদের wmivRg gbxiv কাব্যে আছে আবুবকর সিদ্দিক, উমর, ওসমান গনি, আলী হায়দার, গাওসুল আজম, খাজা নকশবন্দ, সুলতানুল হিন্দ, মুজাদ্দিদ আলফেসানী প্রমুখ ইসলামের ও মুসলিমদের আদর্শ প্রেরণার ধারক-ব্যক্তিত্বদের স্মরণ ও তাৎপর্যের বয়ান। আবার একই কবির gn‡Zi KwеZv কাব্যে ফেরদৌসী, জামী, রুমী, সাদী, হাফিজ, শাহ গরীবুল্লাহ প্রভৃতি কবি-প্রশস্তিমূলক সনেটের মাধ্যমে তিনি 'পাক-বাংলা' সাহিত্যের উৎস কী হওয়া উচিত তা নির্দেশ করেছেন। এছাড়া বাংলা ভাষার প্রতি, চলতি ভাষার পুঁথি, গাথা ও গান, দীউয়ানা মদিনা, শাহ গরীবুল্লার অসমাপ্ত পুঁথি প্রসঙ্গে, পুঁথির আসর, পুঁথি-পড়া : মুহার্রাম মাসে /১২/, শহীদে করবালা, তাজকেরাতুল আউলিয়া, কাসাসুল আম্বিয়া, শাহনামা, আলিফ লায়লা, চাহার দরবেশ, হাতেম তা'য়ী প্রভৃতির মাধ্যমে ঐতিহ্যের প্রবাহটি নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন। (সাঈদ-উর ২০০১ : ১৬৮) সূফী জুলফিকার হায়দার এর dv‡Znv-B-†'vqvR 'ng কাব্যটি প্রকাশ করেছিল ইসলামিক একাডেমী। গ্রন্থের শুরুতে প্রতিষ্ঠানটি গ্রন্থটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছে– 'পাকিস্তানোত্তর যুগে

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের আদর্শের নবজন্মের মহত্তর প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে একাব্য নিঃসন্দেহে একটি যুগোপযোগী এবং অমূল্য গ্রন্থ।' (উদ্ধৃত, সাঈদ-উর ২০০১ : ১৪৬)

ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৬০ কালপর্বে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনাধারার কবিরা ইসলামের মহামানবদের জীবন ও তাঁদের সিফাত বর্ণনার মাধ্যমে, কখনো পুঁথি সাহিত্যের উৎস থেকে কাহিনি নিয়ে নবরূপ দান করার মাধ্যমে, কখনো অনুসরণীয় মুসলিম কবি-সাহিত্যিকের প্রশস্তিকীর্তনের মাধ্যমে আবার কখনো বা জীবনের বিশুদ্ধ রূপকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে পরিগঠিত ও আদর্শায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। বলা বাহুল্য, এসব সাহিত্যকর্ম আদর্শের দ্বারা এত বেশি প্রাণিত এবং মোহান্ধ ছিল যে, সমকালীন দেশকালের বাস্তবতাকে তাঁরা প্রায় অবলীলায় উপেক্ষা করে গিয়েছেন। পাকিস্তানবাদী চেতনার অনেক কবি তাঁদের কবিতায় অর্থনৈতিক সাম্য, ন্যায়বিচার , ইনসাফ, আদিল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার কথা বললেও তা ছিল আদর্শের বুলি মাত্র। বাস্তবে পাকিস্তান রাষ্ট্রে পূর্ব বাংলার মানুষ কিভাবে জাতিগত বৈরিতা, অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক অন্যায্যতার শিকার হয়েছে, তার কোনো সমালোচনামূলক অবস্থান এসব কবিদের মূলধারার কবিতায় ছিল না বললেই চলে। পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনাধারার কবিতা মূলত পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ও চেতনারই সাহিত্যিক রূপ। আমরা পূর্বের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাধারা আলোচনায় দেখেছি যে, পূর্ব বাংলা পূর্বাপর পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় নানা অবহেলা ও অন্যায্যতার শিকার হয়েছে। এই ধারার কবিতায় পূর্ব বাংলার মানুষ, প্রকৃতি, নিজস্ব সংস্কৃতি, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-বঞ্চনা-সংগ্রাম-নৈরাশ্য তেমন একটা স্থান পায়নি। এই ধারার কবিতায় মানুষের চেয়ে আদর্শ বড় হয়ে উঠেছে। একমাত্র এসময়ে রচিত কিছু ব্যঙ্গ কবিতায় পাকিস্তান রাষ্ট্র পরিচালনার কিছু দিকের সমালোচনা করতে দেখা যায়।

পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনাধারার কবিরা জাতীয়তাবাদী চেতনার মধ্যে মুসলিম এবং ইসলামকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। ফলে তাঁদের কাব্য-কবিতার জাতীয়তাবাদী চেতনা অনেক ক্ষেত্রে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভূগোলের সীমারেখা অতিক্রম করে বিশ্ব ইসলামি জাতীয়তাবাদ বা বিশ্ব মুসলিম জাতীয়তাবাদের দিকে ধাবিত হয়েছে। এ কারণে এই ধারার কবিতা এবং এর চেতনা স্থানীয়তাকে উপেক্ষা করে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার অভিমুখী হয়েছে। যেমন–

কোথা মক্কা-মোয়াজ্জেমা মদিনা কোথায়
প্রাণকেন্দ্র এ মহা সাম্যের
কোথা আমি ভারতের প্রান্ত তটে ক্ষুদ্র ঈদ্‌গাহে।
সিন্ধু-মরু-গিরি-দরী-কান্তার-তটিনী
রচিয়াছে ব্যবধান দুর্জ্জয় বিপুল
তবু শুনি বায়ুস্তরে তরঙ্গ-দোলায়
ভেসে আসে সে উদাত্ত মন্দ্রিত নির্ঘোষ–
সাম্যের দিশারী আমি– আমি মুসলমান

Dhaka University Institutional Repository

দেশ-কাল-পাত্র মোর সর্ব্ব একাকার

বহুত্বে একক আমি

আত্মার আত্মীয় মোর দুনিয়া-জাহান (শাহাদাৎ ১৯৫০ : ২৯-৩০)

এ ধারার কাব্য-কবিতার রচয়িতারা প্রায় সবাই বিনা বাক্যব্যয়ে, প্রায় প্রশ্নহীনভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দিয়েছেন।[২৯] এমনকি আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের নামে প্রচলিত মৌলিক গণতন্ত্রও পেয়েছে তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন। তাঁরা মনে করতেন–

> আইউব-প্রবর্তিত নবশাসনতন্ত্র রাজনীতির ইতিহাসে এক বিপ্লবধর্মী নূতন অধ্যায় খুলে দিয়েছে। এই বিপ্লব থেকে জগতের ইতিহাসে বিপ্লব আসতে পারে। এই নূতন আদর্শকে সার্থক রূপদান করবার জন্যে পাকিস্তানের লেখক গোষ্ঠীর এগিয়ে আসা উচিত। (গোলাম ১৯৬২ : ২৪০)

বাস্তবপক্ষে হয়েছিলও তাই। অনেক কবিসাহিত্যিক আইয়ুব খানের ক্ষমতা-দখলকে পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদ এবং রাষ্ট্রীয়ভিত্তি আরো মজবুত হওয়ার পথে একধাপ এগিয়ে যাওয়া বলে মনে করতেন। একারণে আইয়ুব খান, কায়েদে আজম, লিয়াকত আলী খানের প্রশস্তিকীর্তন করেও এই ধারায় অনেক কাব্য-কবিতা রচিত হয়েছে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত। যেমন, সূফী জুলফিকার হায়দারের ¯c hvi Avb‡jv †h Mo‡jv hvi (১৯৫৯) কাব্যে 'ইকবাল তুমি লহ অর্ঘ্যদান', 'কায়েদে আজম', 'শহীদ লিয়াকত স্মরণে', 'শের-ই-সেরহদ' এবং 'আইয়ুব খান' নামক পাঁচটি কবিতা রয়েছে। এসব কবিতায় কবি পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের স্মরণ করার পাশাপাশি তাঁদের অবদান তুলে ধরেছেন। এর মধ্য দিয়ে কবিরা পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে আরো মজবুতভাবে গঠন করার প্রয়াস পেয়েছেন।

পূর্ব বাংলায় মধ্যবিত্তের বিকাশ ও নতুন কবিতা

পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙালি মুসলমান তার অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ নিয়ে শামিল হয়েছিল। পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙালি মুসলমানের অন্তর্জাগতিক লিপ্ততা আমরা লক্ষ করেছি ১৯৪০ থেকে ১৯৫২ কালপর্বের পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী কবিতা রচনার প্রায় একমুখী প্রয়াসের মধ্যে। আর বহির্জাগতিক লিপ্ততার স্বাক্ষর রয়েছে উক্ত কালপর্বে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রায় একমুখী অভিন্ন তৎপরতার মধ্যে।

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পূর্ব বাংলার মুসলমানদের ওপর এর একটি প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে। ঢাকা প্রাদেশিক রাজধানী হওয়ায় এর দ্রুত বহুমাত্রিক সম্প্রসারণ হতে থাকে। এর আগেও বঙ্গভঙ্গের ফলে ঢাকা রাজধানী হওয়ার সুবাদে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা এই প্রথম স্থায়ী উন্নয়ন, বিকাশ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। পূর্ব বাংলার মোটামুটিভাবে সচ্ছল কৃষককুলের ছেলেমেয়েদের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের আওতার মধ্যে রাজধানী এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে পড়াশুনার সুযোগ চলে আসে। অন্তত কলকাতার তুলনায় ঢাকায় আসা এবং পড়াশুনা বা অন্যান্য কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ তাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। অধিকন্তু ঢাকায় শুধু নয়, পূর্ব বাংলার বিভিন্ন শহরে আগমন ঘটে কলকাতায় বিকাশোন্মুখ, অর্ধবিকশিত এবং বিকশিত নানা পর্যায়ের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির। এছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বৈষম্যমূলক হারে হলেও পূর্ব বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্পায়ন, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রের উন্নতি ঘটতে থাকে ব্রিটিশ আমলের

Dhaka University Institutional Repository

চেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি। পূর্ব বাংলা থেকে সংখ্যায় কম হলেও কিছু সংখ্যক হিন্দু জমিদার জোতদার মহাজন চলে যায় ভারতে। ফলে তাদের স্থান দখল করে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা। ভূমি-সংস্কারের ফলে মাথাপিছু সর্বোচ্চ জমির পরিমাণ একশ বিঘার জায়গায় তিনশ পঁচাত্তর বিঘা করায় এখানে সচ্ছল আধা সামন্ত শ্রেণির প্রতিষ্ঠায়নও ঘটে। সব মিলিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক বাস্তবতায় বেশ একটা পরিবর্তনের আলোড়ন অনুভূত হয়। এই যাবতীয় পরিবর্তনের সঙ্গে পূর্ব বাংলার মানুষ স্বাভাবিকভাবেই জড়িত হয়ে পড়ে। এই ধরনের পরিবর্তনের আওতায় পূর্ব বাংলা ব্রিটিশ শাসনামলে কখনো আসেনি। ফলে, সংগত কারণেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে যে-নতুন পরিস্থিতি তৈরি করে, এই নতুন পরিস্থিতি এর জনগণের বিভিন্ন স্তরে একটা পরিবর্তনকে সম্ভবিত করে তোলে। এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, পূর্ব বাংলায় মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশের একটা পথ তৈরি হয়।

১৯৪৭ সালের পর যত দিন গিয়েছে, পূর্ব বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশের গতি তত দ্রুত হয়েছে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির চেতনাগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাঈদ-উর রহমান বলেছেন–

> শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জীবন চর্চায় এরা পাশ্চাত্য উদারনীতির আবহাওয়ায় পুষ্টি লাভ করেছে। বুর্জোয়া শ্রেণির সহযোগিতায় জন্মলাভ করায় বুর্জোয়া উদারনীতি ও মানবতাবাদে এরা আস্থাবান। উদারতন্ত্রের মূল লক্ষণগুলো– ধর্মনিরপেক্ষতা তথা ইহলৌকিকতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মানবিক সমতা, আইনের শাসন চিন্তা-মত প্রকাশের ও জীবনাচরণের স্বাধীনতা এদের মনে ছাপ ফেলেছে কিন্তু শ্রেণীবিকাশের ঐতিহাসিক কারণে এগুলোকে আত্মস্থ করা এদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। (সাঈদ-উর ২০০১ : ২০০)

কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিই পূর্ব বাংলার রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে নেতৃত্ব দিয়েছে। এই শ্রেণির বিকাশ ও প্রকাশের ইতিহাস আর পূর্ব বাংলার রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ-প্রকাশ ও মেজাজের ইতিহাস প্রায় সমান্তরাল। ভাষা আন্দোলন পরবর্তী বাংলাদেশের কবিতার মূল ধারা এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির দ্বারাই নির্মিত ও পরিপুষ্ট হয়েছে।

পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি, পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে-মূল উদ্দেশ্য ছিল সেই উদ্দেশ্য দিন গড়ানোর সাথে সাথে পদে পদে বাধাগ্রস্ত হতে শুরু করে। ক্রমাগত পূর্ব বাংলার মানুষ আবিষ্কার করে যে, তারা আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক দিক থেকে নতুন করে অপরায়ণের শিকার হয়েছে। এই অপরায়ণ ও বঞ্চনার বোধ এখানকার মধ্যবিত্ত শ্রেণি-উদ্ভূত রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে যেমন পূর্ব বাংলাকেন্দ্রিক এক নতুন বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্ম দিয়েছে, তেমনি এখানকার কবি-সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক কর্মীদেরও ক্রমে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের বাইরে বাঙালি জাতীয়তাবাদে ধাতস্থ করেছে। যত দিন গড়িয়েছে বাংলাদেশের কাব্য-কবিতা ততই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উচ্চকিত হয়েছে। এমনকি আমরা লক্ষ করব, বাঙালি মুসলমান কবিদের যে-অংশ এক সময় পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে কাব্য-কবিতা রচনা করেছেন, সেই চল্লিশের দশকের প্রজন্মের অনেকের মধ্যে রূপান্তর ঘটেছে। পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকে তাঁরা সরে এসে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাব্য-কবিতা রচনা করেছেন। আবার পঞ্চাশের দশকে যে-নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব ঘটেছে বাংলাদেশের কবিতায়, তাদের প্রায় সবাই হয় বুর্জোয়া মানবতাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আধুনিক মননজাত কাব্য-কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন, নতুবা সাম্যবাদে দীক্ষিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

যাঁরা শুরুতে রাজনীতি-বিশ্লিষ্ট তাঁরা ক্রমে দেশকালের উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে স্বজাতির আশা-নিরাশায় মিশে কবিতায় বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ধারণ করেছেন। পাকিস্তান-পরবর্তী বাংলাদেশের কবিতার একটি লক্ষণীয় গতিবিধি এই যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নতুন প্রজন্মের তেমন কোনো কবি পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদকে অন্তত কবিতায় ধারণ করেননি। এই ধারায় পুরাতনদেরই অনুবর্তন ঘটেছে মাত্র।

বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাধারার কবিতার উন্মেষ

বাংলাদেশের কবিতায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণ প্রকৃতপক্ষে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পূর্বে তেমন লক্ষ করা যায় না। কারণ ১৯৫২-এর পূর্ব পর্যন্ত মূলত, বাঙালি মুসলমানের মধ্যে পাকিস্তান নামক নয়া রাষ্ট্র অর্জন এবং তাকে ঘিরে স্বপ্নাবিষ্ট থাকার বাস্তবতা কাটেনি। যদিও পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি, পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার মানুষ তাদের ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে সংগ্রামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়েছে। ১৯৪৮ সাল থেকে যে বাংলা ভাষা আন্দোলন শুরু হয় তা থেকে-থেকে ১৯৫২-তে এসে এমন এক রূপ লাভ করে যে, এর সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে পূর্ব বাংলার সচেতন-অর্ধসচেতন প্রায় সবাই যুক্ত হয়ে যায়। এছাড়া ১৯৪৯ সালের উপ-নির্বাচন, ১৯৫০ সালের শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন, ইতোমধ্যে পাকিস্তানের দুই অংশে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনীতিতে গণতন্ত্রহীনতা ইত্যাদি গিয়ে আঁছড়ে পড়েছে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের ওপর। এরই প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব বাংলার সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটা বড় অংশ সংশয়ী হয়ে উঠতে লাগল যে, পূর্ব বাংলা ভূখণ্ড, এর মানুষ ও তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার দায়িত্ব পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পালন করতে পারবে কি না।[৩০] এই সংশয়ের শুরু ১৯৫২ সাল থেকে। ফলে এখানকার রাজনীতির মতোই কাব্য-কবিতায় পূর্ব বাংলার ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে নতুন চেতনার বোধ, অহংকারের বোধ লক্ষিত হতে থাকে। একেই আমরা শনাক্ত করতে চাই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা হিসেবে। সাহিত্যে এই জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রথম স্ফুরণ আমরা লক্ষ করি ১৯৫৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত GK‡k †deæqvix সংকলনকে কেন্দ্র করে।

ভাষা আন্দোলন-পরবর্তী কবি ও তাঁদের মূল প্রবণতা

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশের কবিতার ভূগোল-কাঁপানো এক ঝাঁক কবির আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা প্রায় সবাই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত পূর্ব বাংলার নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে উঠে এসেছেন। এই নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে উঠে আসা কবিদের অধিকাংশই চেতনায় বুর্জোয়া মানবতাবাদী। এঁদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এঁরা প্রায় সবাই ঢাকাকেন্দ্রিক। এঁদের পূর্বজ কবিদের মতো এঁরা কলকাতার আলো-বাতাসে বেড়ে ওঠেননি। এঁদের উন্মেষ, বিকাশ, প্রকাশ, বৃদ্ধি, পরিপুষ্টি সবই হয়েছে পূর্ব বাংলার আলো-বাতাসে। কলকাতার সাহিত্যিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে সংগ্রাম করে এঁদের প্রতিষ্ঠা আসেনি। একারণে ওই সংগ্রামের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা খোঁজা পূর্বজদের চেতনার দ্বান্দ্বিকতা এঁদের মধ্যে দেখা যায় না। কলকাতা এবং এর কাব্যেতিহাস তাই পূর্বজদের মতো এঁদের কাছে বাইনারি নয়। বরং এই শ্রেণির কবিকুলের একটা বড় অংশ প্রাথমিক পর্যায়ে খুব অল্প সময়ের জন্যে হলেও তাঁদের আধুনিক মননের ও কাব্যরুচির মিল খুঁজে পেয়েছে কলকাতাকেন্দ্রিক ত্রিশের আধুনিকতাবাদী কবিদের মনন ও কাব্যরুচির

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে। একারণে এই নতুন প্রজন্মের কবিদের কেউ কেউ তাঁদের কাব্য-উপাদান, প্রকরণ ইত্যাদির জন্য তাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাব্যজীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে হাত পেতেছেন ত্রিশের কবিদের কাছে। কিন্তু যেহেতু নতুন প্রজন্মের এসব কবিদের বৃদ্ধি আর পরিপুষ্টি পূর্ব বাংলার এক বিশেষ আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতার মধ্যে, তাই তাঁদের কবিতা অল্পকিছুকালের মধ্যেই চেতনায়, প্রকরণে, ভাষায়, ভাবে, উপমা-উৎপেক্ষা-চিত্রকল্পে হয়ে উঠতে চেয়েছে আলাদা ; পূর্ব বঙ্গীয়। এই আলাদা চারিত্র্য দাঁড়ানোর পেছনে পাকিস্তানি রাজনীতি এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। পূর্ব বাংলার পঞ্চাশের দশকের এমন কবি খুঁজে পাওয়া ভার হবে যিনি রাজনীতি সচেতন নন। প্রথম দিকে যিনি রাজনীতি সচেতন নন বরং রাজনীতি-বিচ্ছিন্ন, ক্রমে তিনিই অনিবার্যভাবে রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেছেন; উচ্চকণ্ঠ হয়েছেন। আর এভাবে বাংলাদেশের আধুনিক কবিতা কলকাতার কবিতা থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে। পূর্ব বাংলার পাকিস্তানবিরোধী জাতীয়তাবাদী রাজনীতি বাংলাদেশের কবিতার এই স্বাতন্ত্র্য অর্জনে এক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী পূর্ব বাংলার কবি-প্রজন্মের প্রথম পর্যায়ের কবিতায় রাজনীতি গৌণ। আধুনিক জীবনের নৈরাশ্য, হতাশা, বেদনা, সংকট, জটিলতাই সেখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। ১৯৫২ থেকে ১৯৬০ কালপর্বের কবিতার এটি মূল প্রবণতা। কিন্তু ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও পাকিস্তানি শাসকচক্রের নানা হঠকারী অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড, ১৯৫৮-এর অবরুদ্ধ সামরিক শাসন, অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনা, অসম্প্রদায়িক পূর্ব বাংলা ভূখণ্ডে পশ্চাৎপদ জীবনাদর্শপুষ্ট সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থান ইত্যাদি নবীন কবিদের চেতনার অন্তস্তলে বিভিন্ন সময়ে ঘা দিয়েছে। সংবেদনশীল মানুষ হিসেবে পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠীর মতো কবিদেরও প্রভাবিত করেছে এসব ঘটনা। ফলে তাঁদের কবিতায় পাকিস্তানের বন্ধন আলগা হয়ে গিয়েছে। বিপরীতে দানাদার হয়েছে পূর্ব বাংলার স্বাতন্ত্র্য, যাকে আমরা বলি জাতীয়তাবোধ; বাঙালি জাতীয়তাবোধ। এই জাতীয়তাবাদী চেতনা স্পষ্ট হয়েছে তাঁদের কবিতায় যখন তাঁরা বাংলা ভাষা, বাংলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, পূর্ব বাংলার প্রকৃতি ইত্যাদিকে বিশেষ দরদে বাঙ্ময় করে তুলেছেন। ভাষা আন্দোলনের পরে এই প্রবণতা লক্ষ করা যায় চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের প্রায় সব আধুনিক বুর্জোয়া মানবতাবাদী কবিদের মধ্যে। এছাড়া চল্লিশের দশকের সেইসব কবিদের মধ্যেও এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়, যাঁরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, আদর্শিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আস্থা হারিয়ে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। এঁদের এই রূপান্তরে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল মূলত ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন।[৩১] একারণেই বলা হয় 'একুশে ফেব্রুয়ারি সাহিত্য-সংস্কৃতিক্ষেত্রে বাঁক ফেরার প্রেরণা।' (আহমদ রফিক ২০০৬ : ৭) অন্য এক সমালোচক যথার্থই বলেছেন–

> পঞ্চম দশকের কবিদের যদি পাকিস্তান আন্দোলনের কবি বলা হয় তবে ষষ্ঠ দশকের কবিদের বলতে হয় ভাষা আন্দোলনের কবি। বস্তুতঃ এ কালের তরুণ কবিরা পূর্ববর্তীদের মত নবীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের মধ্যে নিঃশেষিত ন'ন বরং নবীন রাষ্ট্রের আধুনিক নাগরিকরূপে তাঁরা সর্বপ্রকার দায়িত্ব সচেতন ও সহজাত দেশপ্রেমিক। (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৬৯ : ৪০)

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা আন্দোলনের কবি-প্রজন্মের মধ্যে মধ্যে রয়েছেন আতাউর রহমান (১৯২৫-১৯৯৯), শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬), আনিস চৌধুরী (১৯২৯-১৯৯০), ফজলে লোহানী (১৯২৯-১৯৮৫), হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯), আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৯৩৪-২০০১), বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (জ. ১৯৩৬), আল মাহমুদ (জ. ১৯৩৬) প্রমুখ কবি। লক্ষণীয় যে, আল মাহমুদ ছাড়া ওপরের সব কবির কবিতাই হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত GK‡k †deªæqvix (১৯৫৩) সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।[৩২] ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের পূর্বে যাঁরা কিছুটা হলেও সময়ের উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়েছিলেন তাঁদেরই একাংশ ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের পরে রূপান্তরিত হলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায়। এই ধারার অর্থাৎ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার তীব্র আবেগে উদ্বেলিত পাকিস্তানি জাতীয়াবাদী ধারা থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারায় রূপান্তরিত কবিদের মধ্যে রয়েছেন সুফিয়া কামাল, সিকান্দার আবু জাফর, মজহারুল ইসলাম, হাবীবুর রহমান, আবদুল গণি হাজারী, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী প্রমুখ। প্রথমোক্ত কবিরা মূলত বুর্জোয়া মানবতাবাদী। পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অভিঘাতে তাঁদের চেতনায় প্রায় নির্বিকল্পভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ দানাদার হয়েছে। এদিক থেকে বলা যায়, এঁরা জন্মেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী। কারণ বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের প্রাক্কালে অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৪৯-এর টাঙ্গাইল উপনির্বাচন, ১৯৫০-এর শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন এবং ১৯৫২ সালের রক্তাক্ত ভাষা আন্দোলনের মতো বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার গর্বোন্মুখ বাস্তবতার মধ্যে প্রথমোক্ত কবিকুলের চেতনা বিকশিত হয়েছে। অন্যদিকে দ্বিতীয়োক্ত রূপান্তরিত জাতীয়তাবাদী ধারার কবিরা যখন বেড়ে উঠেছেন, তখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম আর তীব্র স্বপ্ন-কল্পনায় আচ্ছন্ন তাঁদের চারপাশ। এঁদের শুরু এবং রূপান্তর দুটিই সংগত ও স্বাভাবিক। বরং এঁদের রূপান্তর আরো বেশি অর্থবহ। কারণ এই রূপান্তরের মধ্যে রয়েছে নিজের সঙ্গে এবং বাস্তবতার সঙ্গে বোঝাপড়ার এক দ্বন্দ্বদীর্ণ ব্যক্তিগত ইতিহাস। এই দুই শ্রেণির বাইরে মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকবেন চল্লিশের দশকের কবি– যাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ A‡bK AvKvk (১৯৫৯) প্রকাশিত হয়েছে পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে– সৈয়দ আলী আহসান। তিনি নিজের কাব্যচর্চার আদর্শের প্রশ্নে রূপান্তরিত হয়েছেন।[৩৩] সৃজনশীল কবিতা রচনাকে তিনি সচেতনভাবে রাজনীতি থেকে আলাদা করে ফেলেছেন। কবিতায় তিনি প্রকৃতি, নৈঃশব্দ্য ও সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য উপভোগকেই মুখ্য করে তুলেছেন। রাজনৈতিক সত্তাকে তিনি কবিতা থেকে তুলে নিয়ে গদ্যের মধ্যে সীমায়িত করেছেন। তাঁর কবিতায় সজ্ঞান বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ নেই। কিন্তু পূর্ব বাংলা বিষয়ক কিছু কবিতায় এবং অন্যান্য কাব্য-কবিতায় পূর্ব বাংলার নিজস্ব প্রকৃতির প্রতি কবির যে-ঐকান্তিক লীলালিপ্ত মনটি ধরা পড়েছে তাকে সহজেই অখণ্ড পাকিস্তান থেকে সহজেই আলাদা করে চেনা যায়। এসব ধারা-উপধারার বাইরে মার্কসবাদী চেতনার কোনো কোনো কবি ছিলেন।[৩৪] তাঁরা তাঁদের কবিতায় সাধারণ মানুষের সার্বিক জাগরণ ও মুক্তির কথা বলেছেন। সংগত কারণেই পূর্ব বাংলার সমকালীন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের অভিঘাতে তাঁদের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণ ঘটেছে।

Dhaka University Institutional Repository

আগেই বলা হয়েছে প্রাক্-ভাষা আন্দোলন পর্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার রূপায়ণ তেমন লক্ষ করা যায় না। কারণ এ সময়ের মধ্যে পাকিস্তানি শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে কিছু কিছু ছোট ছোট প্রতিবাদ বিক্ষোভ, আন্দোলন-সংগ্রাম হলেও এ গুলোর কোনো জাতীয় রূপ ছিল না। পাকিস্তান বিষয়ে মোহভঙ্গ বাঙালি মুসলমানের খুব একটা হয়েছিল বলেও মনে হয় না; তবে সন্দেহ, দ্বিধাদ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছিল। এই সময়ের আর্থ-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক যে-ঘটনা প্রবাহ আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি, তাতে এ সময়কে বলা যায়, পূর্ব বাংলায় নতুন বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা স্ফুরণের সময়। আর এ সময়টি বাংলাদেশে কবিতার পুনর্জাত হবার, পুনর্গঠিত হবার প্রস্তুতিকাল। ১৯৪৯ সালে 'নতুন কবিতা'র যে-সংকলন প্রকাশিত হল, তাতে বাংলাদেশের আধুনিক কবিতার কতিপয় সন্তের পূর্বাভাস মিলল। আর ১৯৫২-এর পরে তাঁরা আধুনিক জীবন চেতনার সার্থক রূপায়ণের পাশাপাশি ষাটের দশকে এসে স্বদেশ ও স্বকালের সংকট ও সম্ভাবনাকে ধারণ করে প্রকৃত-পূর্ণাঙ্গ কবি-সন্ত হয়ে উঠলেন।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক বিতর্ক পাকিস্তান সৃষ্টির আগে থেকেই শুরু। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যত দিন গড়াতে লাগল ততই বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা আর কোণঠাসা করার প্রবণতা পূর্ব বাংলার মানুষ লক্ষ করতে লাগল। পূর্ব বাংলার মানুষ বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবিকে শুধু রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি হিসেবে দেখেনি। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবিকে তারা গণতন্ত্রের স্বীকৃতি হিসেবে মনে করেছে। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে বাদ দেয়া মানে বাঙালির স্বাতন্ত্র্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে অস্বীকার করা হিসেবে মনে করেছে। এজন্য বাংলাকে প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ব বাংলার জনগণ আত্মাহুতি দিয়েছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার জনগণের প্রথম জাতীয় জাগরণমূলক আন্দোলন। এই আন্দোলন এবং আত্মাহুতি পূর্ব বাংলার বাঙালি জাতিকে প্রথম পাকিস্তানি জাতিসত্তার পরিচয়ের বাইরে গিয়ে, ইসলামি জাতীয়তার পরিচয়ের বাইরে গিয়ে, এক স্বতন্ত্র বাঙালি জাতীয়তার চেতনাকে স্পষ্ট করেছে। এর মধ্য দিয়েই পূর্ব বাংলার মানুষ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নিজেদের আলাদা অনুভব করতে শুরু করেছে। 'একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনে সুপ্ত ছিল গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, ইহলৌকিক ও স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষাসমূহ। এই আন্দোলনের সফলতার মাধ্যমে ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাজনৈতিক দর্শনের অর্থহীনতা প্রকাশিত হয়ে নতুন রাষ্ট্রের সম্ভাবনা জাগ্রত হয়।' (সাঈদ-উর ২০০১ : ২৮০) এ কারণে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির পর একুশ পূর্ব বাংলার বাঙালির কাছে হয়ে উঠেছে একটি চেতনা, প্রেরণা। একুশ হয়ে ওঠে আধিপত্যবাদ, বেইনসাফ আর অন্যায্যতাকে রুখে দেওয়ার, বাঙালির একত্র হওয়ার প্রতীক। একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের কবিতায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রথম বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। ১৯৫৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত GK‡k †deæqvix সংকলটিকে বলা যায় কবিতায় ভাষাকেন্দ্রিক, একুশে ফেব্রুয়ারিকেন্দ্রিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রথম প্রকাশ। এই সংকলনের কবিতায় কবিরা শহিদদের প্রতি তীব্র আবেগের প্রকাশ ঘটানোর পাশাপাশি একুশে ফেব্রুয়ারিকে ভবিষ্যৎ প্রেরণার উৎসে পরিণত করেছেন–

> যাদের হারালাম তাঁরা আমাদেরকে বিস্তৃত করে দিয়ে গেল
> দেশের এপ্রান্ত থেকে ও প্রান্তে, কণা কণা করে ছড়িয়ে দিয়ে গেল
> দেশের প্রাণে দীপ্তির ভেতর মৃত্যুর অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল বরকত, সালাম, রফিউদ্দিন, জব্বার

কি আশ্চর্য, কি বিষণ্ন নাম! একসার জ্বলন্ত নাম। (হাসান হাফিজুর ১৯৫৩ : ৪৭/১)

কবিতায় কবি নির্দিষ্টকে দিয়ে অনির্দিষ্টকে বেঁধেছেন। কয়েকটি নামকে সারাদেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন। কবির চেতনায় 'দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত' এক সূতায় গাঁথা পড়েছে। বলা বাহুল্য, জাতীয়তাবাদী চেতনার কাজই বিচ্ছিন্নকে সমাগত করা।

একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২-এর পর ভাষা আন্দোলনে শহিদদের স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মাণ করার চেষ্টা করা হয় শহিদ মিনার। উদ্দেশ্য ছিল শহিদ মিনারকে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ অপশাসন-বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামের উৎস হিসেবে দাঁড় করানো। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকচক্র চায়নি পূর্ব বাংলার বাঙালিরা কোনো একক চেতনায় উজ্জীবিত হোক। এজন্য বারবার গুড়িয়ে দিয়েছে শহিদদের উদ্দেশ্যে গড়া স্মৃতির মিনার। স্মৃতির মূর্তিমান বাহ্যিক মিনার ভেঙেছে বটে কিন্তু কবিতায় কবি সেই বাহ্যিক মিনারের অনুপস্থিতিকে চিরকালের জন্য স্থায়ী করে রাখলেন। চেতনাটা কবি ছড়িয়ে দিলেন সারা পূর্ব বাংলাব্যাপী। কবিকল্পনায় পূর্ব বাংলার প্রতিটি পরিবার হয়ে উঠল এককেটি শহিদ মিনার–

স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু আমরা এখনো

চার কোটি পরিবার

খাড়া রয়েছি তো। যে-ভিৎ কখনো কোন রাজন্য

পারেনি ভাঙতে...। (আলাউদ্দিন ১৯৫৩ : ৩৩/১)

কবির চেতনায় ভাষা আন্দোলন হয়ে উঠেছে 'চার কোটি' বাঙালি পরিবারের একত্র হওয়ার অনুঘটক। 'বিচূর্ণ শহীদ মিনার যেন অমরত্ব অর্জন করেছে এই কবিতায়, কিন্তু শহীদ মিনার অমরত্বের বদলে প্রতিরোধই ধরে রাখে সংগ্রামীদের জন্য।' (আহমদ রফিক ১৯৯৩ : ৩৭)

একুশের চেতনার রঙে শুধু বাঙালির হৃদয় রঞ্জিত হয়নি, বাংলার প্রকৃতি আর মানুষের মধ্যেও একুশের শহিদদের স্মৃতিকে লক্ষ করে লেখা হল অসংখ্য কবিতা–

সমুদ্রের গান শোনো–
সে গানে তাদের হাসি
কি আশ্চর্য ফুল হয়ে ঝরে।

তোমরা যে কথা বলো সেই স্বরে
তাদের প্রতিজ্ঞা মিশে আছে।
তোমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসে
তোমাদের পদক্ষেপের প্রত্যেক বিশ্বাসে
তোমাদের স্নেহে প্রেমে আষাঢ়-আশ্বিনে
ভাই-বোন মায়েদের স্মরণীয় দিনে
অবিচ্ছিন্ন তাদের হৃদয়।

Dhaka University Institutional Repository

তারা তো তোমার কথা

তারা তো আমার কথা

তোমাদের আমাদের সকলের হাসি

চেয়েছিল। এদেশে প্রবাসী

নয়– তারা হতে চেয়েছিল

এ দেশেরই ঘাসের শিশির। (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৯৮ : ৪৬)

একুশ এত গভীরভাবে বাংলার কবিদের নাড়া দিল যে, চুন ওঠা দেয়াল দেখে এক কবির মনে হলো, সেই দেয়ালে ‘বরকতের চোখে বুঝি ভবিষ্যৎ বুঁজে আছে।’ (বোরহানউদ্দিন ১৯৫৩ : ২৫) ষাটের দশকে গিয়ে আমরা দেখব, একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে কবিতায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ আরো ব্যাপকভাবে আকরিত হয়েছে। একুশ সেখানে শোক ও অনুভবময়তার স্তর অতিক্রম করে রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

একুশ-পরবর্তী বাংলাদেশের কবিতায় জাতীয়তাবাদ

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির পর থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত রচিত বাংলাদেশের কবিতা একুশের ভাষা আন্দোলন দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছে। প্রভাবের এই দিকটি সবসময় খালিচোখে দেখার মতো প্রত্যক্ষ নয়। প্রভাবটি ছিল একান্তই অদৃশ্য চেতনাগত। কবিতার মর্মে প্রোথিত হয়েছিল একুশের চেতনা। এই চেতনা বিশ্লেষিত হতে পারে দুই দিক থেকে। প্রথমত, কবিতার ভাষায় এবং দ্বিতীয়ত স্বদেশের দিকে কবিদের দৃষ্টিপাতে। দুটি বিষয়ই বাংলাদেশের কবিতার নতুন অর্জন। এই নতুন অর্জনের তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য স্মরণ রাখা দরকার bZb KweZv (১৯৪৯) সংকলনকে কেন্দ্র করে আবির্ভূত কবি-প্রজন্মের কাব্যাদর্শটি। এই প্রজন্মের আধুনিক কবিকুল কাব্যাদর্শে অধিকাংশই ছিলেন ত্রিশের দশকের কবিদের অনুসারী। শুরুতে ত্রিশের কবিতার স্বদেশের সংকট আর মাটিমানুষ ব্যতিরিক্ত পাশ্চাত্য আত্মসর্বস্ব নৈরাশ্যবাদী চেতনার রূপায়ণই বাংলাদেশের নতুন কবিদের আরাধ্য ছিল। কিন্তু ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি আধুনিকতাবাদী চেতনার মধ্যে স্বদেশ আর স্বজাতির পক্ষে ভাগ বসিয়েছে। উদ্বায়ী আধুনিকতার ঘোরতর উন্মাতালতার মধ্যেও কবিরা একুশের চাপ-তাপ-প্রভাবকে উপেক্ষা করতে পারেননি। এ কারণে এসব কবির আধুনিকতাবাদী জীবন চেতনার চিহ্ন রূপায়ণের পাশাপাশি পূর্ব বাংলাকেন্দ্রিক এক ধরনের জাতীয়তাবাদী চেতনারও রূপায়ণ ঘটিয়েছেন।

ভাষার দিক লক্ষ করলে দেখা যাবে, ১৯৫২ থেকে ১৯৬০ সময়পর্বে– যাকে আমরা বলেছি ভাষা আন্দোলন পর্ব– পুরনো বাংলাদেশের কবিতা ভাষারীতিকে এই নবীন কবিকুল প্রায় পরিপূর্ণভাবে ত্যাগ করেছেন। পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী ধারার কবিতায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র ভাষা নির্মাণের যে-প্রচেষ্টা বাংলাদেশের কবিতায় ১৯৪০ সাল থেকে জারি ছিল, তা এই পর্বে আধুনিক কবিরা গ্রহণ করেননি। তাঁরা বাংলা কবিতার মূল ধারার কাব্যভাষায় কবিতার রচনায় প্রয়াসী হলেন। কাব্যভাষার এই নবতর রূপ একুশে ফেব্রুয়ারির জাতীয়তাবাদী চেতনাজাত–

> একুশের আগে বাঙালি মুসলমানের ভাষা ছিলো অপরিস্রুত, অনেকটা পুথিসাহিত্যের ভাষা; ওই ভাষার অবিরল আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ জানিয়ে দিতো যে রচয়িতারা মুসলমান, পাকিস্তানি। বায়ান্নোর পরে পরিস্রুত হয়ে উঠতে

Dhaka University Institutional Repository

> থাকে বাঙলা ভাষা, বিদায় নিতে থাকে আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ, এবং ষাটের দশকে বাঙলা ভাষা প্রায় বিশুদ্ধ বাংলায় পরিণত হয়। ... ভাষা আন্দোলন ভাষাকেই স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত করেছে বেশি। (হুমায়ুন ২০১২ : ২৭৮-২৭৯)

তবে আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ তথা মুসলমানি পরিচয়জ্ঞাপক কাব্যভাষার বাইরে বাংলা কবিতার আবহমান ভাষায় কাব্যরচনা বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলনের পরেই শুরু হয়েছে তা নয়। এই ধারাটি পাকিস্তান আন্দোলনের পূর্বে, প্রাক্কালে এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেও পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমান কবিদের মধ্যে অব্যাহত ছিল। যেমন, আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫), আবুল হোসেন (১৯২২-২০১৪), সানাউল হক (১৯২৪-১৯৯৩), আবদুল গণি হাজারী (১৯২১-১৯৭৬), সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫) প্রমুখ কবি– যাঁদের অনেকের কাব্যগ্রন্থ পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে প্রকাশিত হলেও কবিতা রচনায় যাঁরা চল্লিশের দশক বা ভাষা আন্দোলনের আগে থেকেই সক্রিয়– বরাবরই মুসলিম পরিচয়-চিহ্নজ্ঞাপক কাব্যভাষার বাইরে আবহমান বাংলা কবিতার ভাষায় কবিতা রচনা করেছেন। এপ্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন–

> বাঙালি মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যবাদী কাব্যচর্চার সমান্তরালে চল্লিশের নবোদ্ভূত কবিবৃন্দ আধুনিক জীবনচেতনার মর্মমূলস্পর্শী কাব্যধারার জন্ম দিলেন– যা বাংলা কবিতার মূল ধারার সঙ্গে সংলগ্ন এবং ত্রিশের পাশ্চাত্য-পন্থার সঙ্গে চল্লিশের প্রগতিবাদী নবধারার অঙ্গীকার এঁদের মধ্যে একটা সমন্বয়ী বিষয় ও আঙ্গিকচেতনার জন্ম দিয়েছিল। (রফিকউল্লাহ ২০১৬ : ৭০)

তবে একুশের ভাষা আন্দোলনের পর তাঁদের একই কাব্যভাষায় কবিতার ভাষাকে আর সাধারণ কোনো ভাষা বলা যায় না। কারণ তাঁদের ভাষায় আর বিষয়ে স্বদেশ আর স্বজাতির বিশেষ পরিচয়জ্ঞাপক এমন কিছু বৈশিষ্ট্য সেঁটে গিয়েছে যে, তা আর আগের মতো থাকেনি। পঞ্চাশের দশকের নবীন কবিদের কাব্যভাষা এবং চল্লিশের দশকের কবিদের ধর্মীয়-পরিচয়-নিরপেক্ষ-কাব্যভাষা অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, স্বায়ত্তশাসনাকাঙ্ক্ষী জাতীয়তাবাদী চেতনার পরিচায়ক হয়ে উঠেছে। একটি উদাহরণ দেখা যেতে পারে–

> বুলেট শুধু
> রক্ত ঝরাতে
> পারে
> প্রাণ অথবা
> এমন কিছুই
> নয়।
> তুমি কি ভেবেছ
> পেয়েছি ভয়?
> যখন তোমার
> গুলিটি আমার
> বুকে লাগল?
> মোটেই নয় (আলাউদ্দিন ২০০৬ : ৬৪-৬৫/১)

কবিতার এই ভাষা চল্লিশের দশকের সমাজবাদী ও সমাজতান্ত্রিক কাব্যধারা দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হলেও হতে পারে। কিন্তু এর ভাষার মধ্যেকার স্পষ্টতা আর অব্যর্থতার মূলে যে একুশে ফেব্রুয়ারির প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই ভাষা চেতনা আর শব্দের দিক থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার স্মারক হয়ে উঠেছে।

শুধু ভাষা নয়, বাহান্ন-উত্তর কবিতায় জাতীয়তাবাদী চেতনা আরো স্পষ্ট হয়েছে যখন কবিদের কবিতায় পূর্ব বাংলা, এর মানুষ ও প্রকৃতি বিশেষভাবে সম্ভাষিত ও রূপবান হয়ে উঠেছে।[৩৫] লক্ষ করা যাক হাসান হাফিজুর রহমানের এই ঘরানার একটি কবিতা–

> দর্পিত দর্পণ যেন স্বদেশ আমার
> নদীনালা গাছপালা প্রশান্ত খামার
> বৈশাখের ঘূর্ণিবায়ু, আষাঢ়ের ঢল
> মুগ্ধ পটে ফুটে ওঠে বিস্মিত উজ্জ্বল
>
> কাদামাখা চাষা-ভুষো মেহনতি হাত
> অর্পিত দেশের ভার রাখে পলিত্বকে
> নির্বিশেষ স্তন দাও ক্ষুধার পাবকে
> অক্লান্ত উৎস তুমি প্রাণের প্রপাত
>
> তোমার মর্তের ওই অমর্ত রোশ্‌নাই
> মর্তের অবোধ ভোজে দুহাতে ছড়াই
> দুহাতে আঁজলা ভরি তোমাকেই পাই
> জঠরের অন্ধ যেন ঋণ শুধে যাই। (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ১৭-১৮/১)

আবার যেমন, সানাউল হকের b‘x I gvb‡li KweZv (১৯৫৬) কাব্যের এক কবিতায় কবির তীব্র আবেগে অঙ্কিত হয়েছে পূর্ব বাংলার কৃষক আর প্রকৃতি-

> এ-সবুজ কাদের যৌবন–
> এ-হলুদে রাঙানো মন রোদেঝড়ে তবুও কাদের
> জানি জানি আমি;
> আমি চিনি শিল্পী কারা রঙিন মাঠের।
> আমি চিনি, আরো ভালো লাগে তাই কাঁচাসোনা-ঢালাই এ-ক্ষেত,
> আমি জানি, তাই এ মাঠের রঙে রাঙায়েছি মন :
> চোখে শান্তি, মনে আশা,
> তারাভরা মাঠের নিখিল,
> এখানে আমার তাঁবু স্বপ্নের নোঙর–
> এখানেই খুঁজি আমি হলুদ সবুজ লাল মণিমুক্তাধন। (সানাউল ১৯৯৮ : ৭/১)

Dhaka University Institutional Repository

এই কবিতা সরাসরি রাজনৈতিক চেতনা হিসেবে জাতীয়তাবাদের কথা বলে না। অথবা সরাসরি দেশপ্রেমের কথা বলে না। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহ যে, এই কবিতার শেকড় বাহান্ন-পরবর্তী পূর্ব বাংলায় বিকশিত জাতীয়তাবাদী চেতনার গভীরে প্রোথিত।

বাংলাদেশের কবিতার এই পর্বে অর্থাৎ ১৯৫২ থেকে ১৯৬০ পর্বে– যাকে আমরা বলছি ভাষা আন্দোলন পর্ব– পূর্ব বাংলা মাঝে-মধ্যেই স্বতন্ত্র-শব্দবন্ধে কবিতার মধ্যে উচ্চারিত হয়েছে। এই উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অপর অংশ, পশ্চিম পাকিস্তান, এমনকি সমগ্র পৃথিবী থেকে আলাদা হয়ে উঠেছে। 'আমরা আলাদা'– জাতীয়তাবাদী চেতনার এই বোধ এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল থেকেছে। যেমন, সৈয়দ আলী আহসানের নিম্নোক্ত কবিতায়–

বৃষ্টি বৃষ্টি এখানে সেখানে
পৃথিবীর সর্বত্র
শিকাগো শহরে নিউইয়র্কে প্যারিসে
কোথাও আলো ছুঁয়ে, কোথাও
জানালার কাচে,
কোথাও মসৃণ ঐশ্বর্যের গাড়ি, বর্ষাতি
ছাতা–
আমার পৃথিবীর বৃষ্টি– মাটির গন্ধ,
ধান ক্ষেত ভেসে যাওয়া,
আমগাছের ডাল ভেঙে পড়া
হঠাৎ গরুর ডাক, ভিজে-যাওয়া
পাখির ডানা ঝাপটানো
আবার পুকুরে, নদীতে
ডোবায় লাবণ্যের সাড়া
আমার পূর্ব-বাংলা অনেক রাত্রে
গাছের পাতায় বৃষ্টির শব্দের মতো। (সৈয়দ আলী ২০০৯ : ৬২)

অন্যদিকে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতায়, পূর্ব বাংলা রূপময় হয়ে উঠেছে প্রত্যাবর্তনের প্রশান্তিতে–

প্রাচীন স্বপ্নের সেই পথ ছেড়ে ফিরেছি এখানে; এই
বাংলার উদার মাটি শস্যের বিপুল সমারোহে,
মেঘের বিস্তৃত ছায়া, বৃষ্টির নূপুরে নৃত্য– ব্যাকুল নদীতে,
বিচিত্র ঋতুর রঙ্গে কি অপার ঐশ্বর্যের হাসি
উজ্জ্বল বিভার রত্নে গরবিনী প্রশান্ত শ্যামলা;
অপরূপ মাঙ্গলিকী ঘিরে আছে রাত্রিদিন
অবিশ্রাম স্নেহের বর্ষণে। (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৯৮ : ৬)

Dhaka University Institutional Repository

তবে, একথা অনস্বীকার্য যে, ১৯৫২ থেকে ১৯৬০ কালপর্বে এই ধারার প্রত্যক্ষ জাতীয়তাবাদী কবিতা পরিমাণগত দিক থেকে বেশ কম। কারণ, এই পর্বে বাংলাদেশের কবিতায় নতুন প্রজন্মের যেসব কবির আবির্ভাব ঘটেছে তাঁরা আত্মপ্রমুখ। ব্যক্তির নৈরাশ্য, হতাশা, কামনা-বাসনা, যৌনতা-শুদ্ধতার ধারণাই এই ধারার কবিতাকে মুখ্যত শাসন করেছে। দেশ এবং তার বাস্তবতা এসব কবির আধুনিকতার মোহনিদ্রা খুব বেশি ভাঙতে পেরেছে– এমন অকাট্য সাক্ষ্য এঁদের কবিতা দেয় না। তবে ব্যক্তির যে-বহুবিচিত্র মুক্ত প্রকাশ এবং ভাষারীতির যে-উদার রূপ গ্রহণ– এর সঙ্গে ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ যোগ অবশ্যই রয়েছে। কারণ এত বড় জাতীয় অর্জনই এসব কবিকে মুক্ত আত্মপ্রকাশের, উদারনৈতিক চেতনাপ্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছে। চৈতন্যের গভীর প্রদেশে এই ঘটনা এক সুদূরপ্রসারী ছাপ ফেলেছিল। কারণ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ– এই দুটিই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার জনগণের সবচেয়ে বড় অর্জন। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভের পর থেকে পূর্ব বাংলার রাজনীতি অন্তত ১৯৬১ পর্যন্ত সংকটের, বিসর্জনের ও অবরুদ্ধতার দ্বারা আক্রান্ত থেকেছে– এই অধ্যায়ের রাজনৈতিক ঘটনাধারা পর্যালোচনা অংশে একথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। বাহান্ন এবং চুয়ান্নর অর্জন পূর্ব বাংলার নতুন প্রজন্মের এবং পুরাতন প্রজন্মের কবিদের যতটুকু স্বদেশ ও স্বজাতিমুখী করেছে, তাঁরা ততটুকুই তাঁদের কবিতায় রূপায়িত করেছেন। কবিদের একচেটিয়া, অখণ্ড মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি এ সময়ের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতা। কিন্তু ষাটের দশকে গিয়ে পূর্ব বাংলার রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বাস্তবতা পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের গৃহীত নানা পদক্ষেপে এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে। ষাটের দশকে এসে পঞ্চাশের দশকের উদ্ভিন্নমান অথচ সাময়িক চাপা থাকা জাতীয়তাবাদী চেতনা ক্রমে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। এ কারণে ষাটের দশকে এসে বাংলাদেশের কবিতায় পরিস্ফুট হতে শুরু করেছে জাতীয়তাবাদী চেতনার বহুমাত্রিক, গভীর ও স্বচ্ছ রূপ। এই পর্বে এসে নতুন ও পুরাতন অধিকাংশ কবিই সচেতনভাবে কবিতায় জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ধারণ করেছেন। পঞ্চাশের দশক নতুন জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ আর ষাটের দশক এর বিকাশ প্রকাশ; পঞ্চাশ অভিজ্ঞতার আর ষাট প্রকাশের।

টীকা

১. এ বিষয়ে গবেষক বলেছেন, 'মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা শিক্ষিত হয়েও চাকুরী না পাবার ফলে বাধ্য হয়ে শিক্ষকতা পেশা

গ্রহণ করেছিল– এমন ভাবে যদি উক্ত তথ্যকে ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে সম্ভবত খুব একটি ভুল হবে না।' (আতিউর ও লেনিন ২০০০ : ৩৭)

২. এসময়ে মুসলমানদের মধ্যে ছাত্রসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়তে থাকে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে যে, ১৮৮২-৮৩

থেকে ১৯১২-১৩ এই কাল পরিসরে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পায় শতকরা ৫৫ ভাগ। একই সময়ে অমুসলিম ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পায় মাত্র শতকরা ২.৯ ভাগ। একারণে ১৮৮২-৮৩ সালে যেখানে মুসলিম ছাত্রের অনুপাত ছিল ২৭.৬ ভাগ সেখানে ১৯১২-১৩ সালে সেই অনুপাত বেড়ে দাঁড়ায় ৪০.৫ ভাগে। (আকবর ২০১৫ : ১২১)

৩. আবুল হাশিম তাঁর এক রাজনৈতিক আত্মজীবনীতে বলেছেন–

Dhaka University Institutional Repository

জিন্নাহ দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রচার করছিলেন এবং এ তত্ত্বকে তিনি তাঁর রাজনৈতিক ধুয়ো হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। আমি জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলাম না এবং বাংলায় আমি সেটা প্রচারও করিনি। আমি প্রচার করেছিলাম বহুজাতিতত্ত্ব। আমি মনে করি ভারতবর্ষ কোনো একটি দেশ নয়। এ হলো একটি উপমহাদশে। ভারতবর্ষ বিভিন্ন দেশ ও জাতির সমন্বয়ে গঠিত।' (আবুল হাশিম ২০১২ : ৩০)

৪. মুসলিম লিগের অভিজাত নেতৃত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে গবেষক বলেছেন–

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলে বাংলার মুসলমানরা তাঁদের স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে চিন্তিত হন। তবে তাঁদের নেতৃত্বে ছিল অভিজাত শ্রেণি। তাঁদের মনমানসিকতা ছিল বর্ণহিন্দুদের মতোই। এই শ্রেণির মানুষেরা মনে করতেন, তাঁরা আরব, মোগল, পাঠান, তুর্কি বা অন্য কোনো বহিরাগত ব্যক্তির বংশধর। তাঁদের সন্তানদের তাঁরা আরবি, ফারসি ও উর্দু শেখাতেন এবং নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন– পাছে তাঁদের 'ধর্মান্তরিত মুসলমান' বা অনার্য বলে কেউ মনে করে। তাঁরা শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান– এদের বংশধর হিসেবে নিজেদের 'শরিফ' বলে প্রচার করতেন এবং চাষী, জেলে, জোলা প্রভৃতি শ্রেণির লোকদের 'আতরাফ' বা নিচু জাতের মানুষ মনে করতেন। (মহিউদ্দিন ২০১৭ : ১৫)

৫. ইসলামি ও মুসলমানি ভাবধারার সন্নিবেশের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিকে নতুন মাত্রা দেয়ার ব্যাপারে পুরোপুরি

একমত না হলেও এ সময়ের অধিকাংশ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীও মনে করতেন যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে পূর্ব বাংলার সাহিত্য এক নতুন মাত্রা পাবে। এবং এই মাত্রার সঙ্গে যে মুসলিম সংস্কৃতি বা পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির একটা ভিন্ন স্বর যুক্ত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নাই। দেশ বিভাগের এক মাস আগে প্রকাশিত আবদুল হকের এক লেখায় এমন ইঙ্গিত এবং আশাবাদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে–

পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীরা আজ স্বাধীন হতে যাচ্ছে। স্বাধীন হওয়ার ফলে তাদের শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতা দূর হবে, সাহিত্য-ক্ষেত্রে তারা দ্রুত অগ্রসর হবে এবং যেহেতু ঐ অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগুরু এই কারণে বাংলা সাহিত্য মুসলিম সংস্কৃতিরও বাহন হয়ে উঠবে। অতএব মুসলিম সংস্কৃতির ভাষাগত এলাকা পূর্বাপেক্ষা বিস্তৃত হবে। (আবদুল হক ২০১৪ : ২৩)

৬. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কমিউনিস্টদের ওপর মুসলিম লিগ সরকারের দমন-নির্যাতনমূলক কর্মকাণ্ডের কথা ইতিহাস পাঠকমাত্রই কম-বেশি

জানেন। ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস লিখতে গিয়ে এক কমিউনিস্ট-কর্মী ও নেতা শুধু ১৯৪৮ সালের কয়েকটা ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনা থেকে নির্যাতনের প্রত্যক্ষ আঁচ পাওয়া যেতে পারে। লেখক নিজেই বলেছেন, 'একটি দৃষ্টান্ত দিলেই এই বে-পরোয়া কাজের ধরন বুঝা যাইবে'। দেখা যাক সেই দৃষ্টান্ত–

পার্টির নামে যখন কোন সভা করা সম্ভব হয় না তখন ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি করোনেশন পার্কে আমাদের মেয়ে কমরেডদের দ্বারা একটি সভা আহ্বান করা হয়। এই সভার উপরে লীগের কর্মীরা ও পুলিশ একত্রিতভাবে হামলা করে এবং দায়িত্বশীল একজন মেয়ে কমরেড এই একটি সভা হইতেই গ্রেপ্তার হন। ফলে আমাদের মহিলা ফ্রন্টটি নষ্ট হইয়া যায়। কোন রকম সতর্কতা ছাড়া ইস্তাহার বিলি ও স্কোয়াড করিতে গিয়া অনেক ছাত্র এবং রেলশ্রমিক ১৯৪৮ সালের মধ্যেই গ্রেপ্তার হইয়া যান, ফলে রেলশ্রমিক ইউনিয়নের ও ছাত্র ফেডারেশনে আমাদের কাজ ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সূতাকল অঞ্চলে গোয়েন্দা কর্মচারীকে মারধর করা এবং অসময়োচিত কয়েকটি শোভাযাত্রা বাহির করিবার জন্য বহু শ্রমিক কমরেড গ্রেপ্তার হন, বহু কমরেডকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয় এবং গুণ্ডা ও পুলিশের আক্রমণে কেহ কেহ চাকুরী ছাড়িয়া চলিয়া যায়। মিল অঞ্চলে আমাদের কমরেডদের উপরে অত্যন্ত নির্মম অত্যাচার হয়। ই.পি.আর. ও আনসাররা দলবদ্ধভাবে মিলে ঢুকিয়া কর্মরত অবস্থায় আমাদের কমরেডদের কাজের জায়গা হইতে বাহির করিয়া আনিয়া সাধারণ শ্রমিকদের সামনে নির্মমভাবে মারপিট করিত, তাহাদের জিনিসপত্র পোড়াইয়া দিত আর কাহাকে কাহাকেও গ্রেপ্তার করিয়া নিয়া যাইত এবং যাঁহাদের পার্টির লোক বলিয়া মনে করিত তাঁহাদের কাজ হইতে বরখাস্ত করিত। ইহার ফলে শ্রমিকদের ভিতরে ভয়ানক ভীতির সঞ্চার হয় এবং তাঁহারা আমাদের কমরেডদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে চেষ্টা করেন। এই অবস্থা কেবলমাত্র মিলগুলিতেই

Dhaka University Institutional Repository

হয় নাই গ্রাম অঞ্চলেও আমাদের বিশেষ প্রভাবাধীন বিভিন্ন জায়গায় আমাদের কমরেডদের উপর নির্মম অত্যাচার হয়। (জ্ঞান ২০১৬ : ১২১)

৭. দেশ বিভাগের পরে মুসলিম লিগের বড় বড় প্রায় সব নেতাই পাকিস্তানে চলে আসেন। কিন্তু সোহরাওয়ার্দি আসেননি। কারণ,

দেশ বিভাগের প্রাক্কালে যে উন্মত্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল তার রেশ পরেও রয়ে গিয়েছিল। শান্তিরক্ষার মানবিক তাগিদ থেকে সোহরাওয়ার্দি কলকাতায় থেকে যান। ১৯৪৮ সালে তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির জন্যে এক শান্তি মিশন নিয়ে ঢাকায় আসেন। কিন্তু পূর্ব বাংলার নাজিমুদ্দীন সরকার তাঁর সঙ্গে বিরূপ আচরণ করেন। এমন কি সোহরাওয়ার্দিকে নিরাপত্তা আইনের দশ ধারায় আটক করা হয়। শুধু আটক নয়, তাঁকে পূর্ববঙ্গ থেকে বহিষ্কার করা হয়, তাঁর পূর্ব বাংলায় প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় এবং এমনকি গণপরিষদের সদস্যপদ বাতিলও করা হয়। এহেন পরিস্থিতিতে ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে সোহরাওয়ার্দি করাচি গিয়ে আইন ব্যবসা শুরু করেন। পরবর্তীতেও সোহরাওয়ার্দিকে নানাভাবে কোণঠাসা করে রাখা হতো। এমনকি পূর্ব বাংলায় যারা সোহরাওয়ার্দিপন্থী রাজনীতিক বলে পরিচিত ছিলেন তাদের মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়া মুশকিল হয়ে যেত। (আবু জাফর ২০১৬ : ২২২) সমকালের এক সাহিত্যিক-রাজনীতিক তাঁর আত্মজীবনীতে ১৯৫২ সালের দিকে পূর্ব বাংলায় সোহরাওয়ার্দির অবস্থান সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'পূর্ব বাংলার মুসলিম মহলে সোহরাওয়ার্দী সাহেব ছিলেন জুজু বিশেষ। পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে সোহরাওয়ার্দী এবং মাওলানা ভাসানীর পুনর্বাসন যে-কোনো উপায়ে ঠেকিয়ে রাখাটাই ছিল তৎকালীন মুসলিম লীগারদের একমাত্র রাজনীতি।' (আবু জাফর ২০১৬ : ২২২)

৮. সুপারিশের যে-সমালোচনাগুলো পত্রপত্রিকা ও বিভিন্ন সংগঠন করে তার ভাষা, মেজাজ এবং দৃষ্টিভঙ্গিগুলো এরকম–

(ক) কয়েক লক্ষ অধিবাসীর প্রদেশ বেলুচিস্তানের যতজন প্রতিনিধি উচ্চ পরিষদে থাকবে চার কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি-সংখ্যা সমান হতে পারে না। যদি সমান সংখ্যক প্রতিনিধির প্রস্তাব গৃহীত হয় তবে পূর্ব বাংলার স্বার্থমূলক কোনো প্রস্তাব কখনোই গৃহীত হবে না। উচ্চ পরিষদের পরিকল্পনা গৃহীত হলে পূর্ব বাংলা একটি কোলোনিতে পরিণত হবে এবং এর অধিবাসীরা নিজ দেশে পরবাসী হতে থাকবেন।

(খ) এই প্রস্তাব পাস হলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রী মিলে নিরুদ্বেগে যথেচ্ছাচারী শাসন কায়েম করতে পারবেন। পাকিস্তান আন্দোলনের সময়কার আজাদীর স্বপ্ন ও গণতান্ত্রিক আদর্শ এতে নেই; আছে ফ্যাসিস্ট শাসন কায়েমের ব্যবস্থা।

(গ) জরুরি অবস্থার কথা বলে বিনা বিচারে নাগরিককে আটকের বিধান মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন। এটি বাস্তবায়িত হলে নাগরিকের স্বাধীন সত্তার ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত করার শামিল হবে।

(ঘ) প্রদেশের শাসনকর্তা ও মন্ত্রীদের নিয়োগ-বরখাস্তের ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে থাকলে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার অপহৃত হবে। এ সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে বিপুল ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রপতি সময় বুঝে কতিপয় প্রধানকে হাত করে পাকিস্তানকে রাজতন্ত্রের জোয়ালে জুড়ে দিতে পারেন। এর ফলে জমিদারি, জায়গিরদারি, শোষণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে জনসাধারণ প্রতিবাদ করতে পারবে না।

(ঙ) বাষট্টিভাগ জনসংখ্যার দাবিকে স্বেচ্ছাচারী ও বেপরোয়াভাবে লঙ্ঘন করে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা চলবে না। সুপারিশে পৃথিবীর ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে ৭ম স্থান অধিকারকারী সমৃদ্ধিশালী ও বলিষ্ঠ বাংলা ভাষাকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

৯. ১৯৫০ সালের শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বদরুদ্দীন উমর বলেন–

১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাস থেকেই বস্তত পক্ষে পূর্ব বাঙলার জনগণের ওপর মুসলিম লীগ শাসনের শোষণ নির্যাতন শুরু হয় এবং উত্তরোত্তর তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু ১৯৫০ সালের এই আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত সেই শোষণ ও

Dhaka University Institutional Repository

নির্যাতনকে মূলত কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত হিসেবে না দেখার ফলে জনগণের বিক্ষোভ অনেক বেশি প্রাদেশিক সরকার ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে স্থাপিত হয়। ... ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গণপরিষদের মূলনীতি নির্ধারক কমিটির সুপারিশ প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। ... এর পর থেকে শুধু শাসনতান্ত্রিক অধিকারের সংগ্রামই নয়, সর্বপ্রকার গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকারকেই জনগণ মূল শত্রু হিসেবে বিবেচনা করে পূর্ব বাঙলায় পাকিস্তানি শাসন শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে ক্রমাগতভাবে নিজেদের গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে সংগঠিত করেন। (বদরুদ্দীন ১৯৯৬ : ২৯৪-৯৯৫/২)

১০. একুশ দফাকে জনগণ কীভাবে গ্রহণ করেছিল তা নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যেতে পারে–

যুক্তফ্রন্টের একুশ দফার সব দফা নিয়ে গায়ের কৃষক জনতার মাথাব্যথা ছিলো না। তারা পাটের ন্যায্য দাম পাবে, খাজনা ট্যাক্স কমে যাবে, সার্টিফিকেট যোগে খাজনা আদায়ের জুলুম থাকবে না, এখানে সেখানে ঘুষ দিতে হবে না, লবণের দাম শস্তা হবে, শস্তায় কাপড় কেনা যাবে, ছেলে-মেয়েদের বিনা খরচে লেখাপড়া শেখাতে পারবে, লেখাপড়া শেখানোর জন্য ছেলেদের শহরে পাঠালে সেখানে গুলি খেয়ে মরতে হবে না– নৌকা মার্কা বাক্সে ভোট দেয়ার পক্ষে এ-সবই ছিলো তাদের বিবেচনা। শিক্ষিত প্রগতি চেতন মানুষদের দৃষ্টিতে অবশ্যি একুশ দফার আরো গভীরতর তাৎপর্য ধরা পড়েছিলো। যদিও একুশ দফায় অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগঠনের প্রত্যয় ব্যক্ত হওয়ার বদলে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রনীতির কথাই বলা হয়েছে, তবু তাঁরা এতে গণতন্ত্রের চর্চা, বাংলাভাষার অধিকার আর পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসন অর্জনের সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁরা এও বুঝে নিয়েছিলেন যে, বাংলাভাষার অধিকার আর পূর্ববঙ্গে স্বায়ত্তশাসন মানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা। (যতীন ২০১৩ : ১৯৯)

১১. সেখানে তিনি বলেছিলেন যে–

It is important that the people of the two Bengals [East wing of pakistan and west Bengal of India) Should realige the fundamental fact that in order to live happlily they must render mutual assistance to each other ... politicians had partitioned territories but the common people should ensure that everybody lived peacefully. Language proved itself to be the most important unifying factor in history of the people of two Bengal ... I do not believe in any political division of the country. ... I am in fact not familiar with the two new worlds- Pakistan and Hindustan. (Quoted, Jyoti Sen 1974 : 56)

১২. সংবিধানটির মূল্যায়ন করতে গিয়ে আবুল মনসুর আহমদ বলেছেন–

এই শাসনতন্ত্রের বলে কেন্দ্রে সর্বশক্তি কেন্দ্রীভূত হইল এবং পূর্ব-বাংলা প্রবঞ্চিত হইল। এটাই যদি শেষ কথা হইত, তবে ব্যাপারটা তেমন জটিল হইত না। আসল কথা এই যে এই শাসনতন্ত্র সমস্যার সমাধান করে নাই, আরও সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে। যতই ইসলামী বিশেষণ দেওয়া হউক, যে শাসনতন্ত্র দুই পাকিস্তানের ভৌগোলিক পৃথক সত্তা ও আর্থিক বিভিন্নতার স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইবে, তা পাকিস্তানের সত্যিকার বাস্তবানুগ শাসনতন্ত্র হইতে পারে না। সে শাসনতন্ত্র স্থায়ী হইতে পারে না। রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক অবিচার ও অসাম্যকে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রলেপ দিয়া চাপা দিবার চেষ্টা করিলে তাতে ইসলামেরই অপমান করা হয়'। (আবুল মনসুর ২০০১ : ২৩৮/৩)

১৩. এ সম্পর্কে গবেষক বলেছেন–

পূর্ব পাকিস্তানের অসাম্প্রদায়িক ও বাম মনোভাবাপন্ন যুবকদের সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান যুব লিগের নেতৃবৃন্দ নতুন এই দল গঠনের ব্যাপারে উৎসাহী ভূমিকা নেন। তবে আওয়ামী লিগের এই ভাঙন চূড়ান্ত করা ও নতুন দল গঠনের প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে দলের ভেতরের কমিউনিস্ট ও বামপন্থিরা। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের অনেকে এ সময় দলীয় সিদ্ধান্তক্রমেই আওয়ামী লীগ ও যুব লীগের ভেতরে কাজ করতেন। তাঁরা অতঃপর অধিকতর অসাম্প্রদায়িক ও বামপন্থি সংগঠন হিসেবে ন্যাপের সঙ্গে যুক্ত হন। (মোরশেদ ২০১৪ : ২০৩-২০৪)

Dhaka University Institutional Repository

১৪. পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সাহিত্য-সভার ধরন, আয়োজন এবং পরবর্তী বাংলাদেশে সাহিত্যে এর অবদান সম্পর্কে বলতে

গিয়ে এই সংগঠনের এক সময়ের সভ্য বলেছেন–

> সেই সন্ধ্যাটি! পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের পাক্ষিক সাহিত্যসভার সেই একটি সন্ধ্যা। সভা হতো পাটুয়াটুলীতে নাসিরউদ্দীন সাহেবের 'সওগাত' প্রেসে, তাঁর আপিস ঘরের পাশের ঘরে– ঘর তো নয় গুদাম! খোলা একটা বড় ঘর, রিমকে রিম শাদা কাগজ আর ছাপা ফর্মার পাহাড়, এক পাশে টেবিল-চেয়ার, ওখানে বসতেন হাসান হাফিজুর রহমান, তিনি দেখতেন নাসিরউদ্দীন-কন্যা নূরজাহান বেগমের সাপ্তাহিক 'বেগম' পত্রিকা। পাক্ষিক সভার জন্যে ওই টেবিল-চেয়ার এক পাশে সরিয়ে মেঝেতে পাতা হতো পাতলা শতরঞ্জি, আমরা বাবু হয়ে ওতেই বসতাম, আর চেয়ারটি আলো করে টেবিলে কনুইয়ের ভার রেখে ধ্যানস্থ হয়ে বসতেন কাজী মোতাহার হোসেন– সাহিত্য সংসদের সভাপতি, সভারও পৌরহিত্য প্রায় নিয়মিত তাঁরই। মনে পড়ে, ঘরে জায়গা দেওয়া যেত না, এত ভিড় হতো লেখকের, চল্লিশ-পঞ্চাশ জন তো বটেই– পঞ্চাশের দশকের সেই শুরুর বছরগুলোতে প্রত্যেকেই তুমুল হাতে লিখছেন, ছাপা হচ্ছে, সাড়া পড়ে যাচ্ছে, এঁদের কতজনাই না এখন আর নেই, অনেকেই লেখা ছেড়ে দিয়েছেন কিছুদিন পরেই, হারিয়ে গেছেন ছাপা অক্ষরের পাতা থেকে, কিন্তু আছেন তাঁরা, একটা ভিতই তাঁরা গড়ে দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর ওঁদের ওই ভিতটির ওপরেই কালে কালে দাঁড়িয়ে উঠেছে আজকের সাহিত্যসৌধ, ভিতটি মাটির তলায় চলে গেলেও ওঁরাই তো! ভুলব কী করে! (সৈয়দ শামসুল ২০১৪ : ২০৩)

১৫. এ সম্পর্কে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন বলেছেন–

> ১৯৫৪ সালের মাঝামাঝি সময়। পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ তখন শক্তিশালী সাহিত্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আর সওগাত ছিল উক্ত সাহিত্য সংসদের মুখপত্র। কিন্তু উর্দুপন্থী প্রগতি-বিরোধীরা এই তরুণ লেখক গোষ্ঠীর উত্থান এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাদের অগ্রযাত্রা সহ্য করতে পারলেন না। তরুণ দলের গোঁড়ামীমুক্ত জীবনবাদী কবিসাহিত্যিকরা উর্দুর দ্বারা বাংলা ভাষাকে বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র উন্মোচন করে দিলেন। তাঁদের মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত লেখনী উর্দুপন্থীদের কায়েমী স্বার্থের দুর্গে আঘাত হানলো। (উদ্ধৃত, রেজোয়ান ২০০৬ : ৯৪)

১৬. বদরুদ্দীন উমর এ সম্পর্কে বলেন–

> তমদ্দুন মজলিস আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে, বিশেষত যখন তা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো, তখন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু মার্চের প্রথম দিক থেকে আন্দোলন রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করার সাথে সাথে তমদ্দুন মজলিসের গুরুত্ব ও তাদের নেতৃত্বের প্রভাব উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে আসে। এই পরবর্তী পর্যায়ে গণতান্ত্রিক যুব লিগভুক্ত কর্মীবৃন্দ, মুসলিম ছাত্র লিগ এবং সাধারণ ছাত্র সমাজই আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। (বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ১০৯/১)

১৭. জিন্নাহর সঙ্গে সেই সাক্ষাৎকারের সময় সংগ্রাম পরিষদের সেব সদস্য উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন, শামসুল হক, কমরুদ্দীন

আহমদ, আবুল কাসেম, তাজউদ্দিন আহমদ, লিলি খান, মহম্মদ তোয়াহা, আজিজ আহমদ, অলি আহাদ, নঈমুদ্দীন আহমদ, শামসুল আলম এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম। (বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ৯৯/১)

১৮. ১৯৪৮-এর পর থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত জোরদার কোনো আন্দোলন না হওয়ার কারণ সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমর

বলেছেন–

> ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের পর প্রতিবছর ১১ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৪৮ এর পর ১৯৫১ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোন নতুন উদ্যোগ দেখা যায়নি। অন্যদিকে সরকার পক্ষ থেকে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে নানা চক্রান্ত জারি থাকলেও রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্নে সরাসরি বাংলা ভাষা

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী কোন বক্তব্য কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক এই সময়ের মধ্যে ঘোষিত হয়নি। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বেশ সতর্কতার সাথেই যতদিন সম্ভব নিশ্চুপ থাকার কৌশলই গ্রহণ করেছিলেন। (বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ৯৬/৩)

১৯. এম আর আখতার মুকুল অবশ্য তাঁর একুশের দলিল (২০১২) গ্রন্থে এই সভার তারিখ উল্লেখ করেছেন ৩০শে জানুয়ারি। কিন্তু বদরুদ্দীন উমর তাঁর পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (১৯৯৫) গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে মর্নিং নিউজ ও দৈনিক আজাদ পত্রিকার বরাত দিয়ে উক্ত সভার তারিখ ৩১শে জানুয়ারিই উল্লেখ করেছেন। আহমদ রফিকও তাঁর ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস (২০১৫) গ্রন্থে ৩১শে জানুয়ারিই উল্লেখ করেছেন।

২০. ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার জনমানসের মূল ধরে এত তীব্রভাবে ঝাঁকি দিয়েছিল যে, ভাষা আন্দোলনের পর পূর্ব বাংলার

রাজনীতির অভিমুখ সত্যি আমূল বদলে যায়। এই ঘটনায় পূর্ব বাংলায় মুসলিম লিগের গ্রহণযোগ্যতা গণমানুষের মধ্যে প্রায় শূন্যের কোঠায় গিয়ে ঠেকে। এটি স্পষ্ট বোঝা যায় ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে। এ সম্পর্কে গবেষক বলেছেন–

> ভাষা আন্দোলন ঢাকাসহ মফস্বলের রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ সৃষ্টি করে। মাতৃভাষার বিরোধিতা করায় মুসলিম লীগ গণবিচ্ছিন্ন দলে পরিণত হয়। এর তাৎক্ষণিক প্রভাব হিসেবে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ভাষা-আন্দোলনের সমর্থক যুক্তফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়যুক্ত হয়। ৩০৯ টি আসনের মধ্যে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মাত্র ১০টি আসন লাভ করে। মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন আইন পরিষদের নির্বাচনে তাঁর এলাকায় সম্পূর্ণ অপরিচিত তরুণ ছাত্রনেতা খালেক নেওয়াজ খানের কাছে পরাজিত হন। তাঁর মন্ত্রিপরিষদের অন্যান্য সদস্যের পরিণতি তাঁর মতোই হয়। কারো কারো জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। পঞ্চগড় আসনে স্পিকার গামির উদ্দীন প্রধান যুক্তফ্রন্টের মির্জা গোলাম হাফিজের কাছে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে পরাজিত হন। একইভাবে মন্ত্রী ওয়াহিদুজ্জামান পরাজিত হন শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে। ঝানু মুসলিম লীগ নেতা মোনায়েম খান, ফরিদপুরের ইউসুফ আলী মোহন মিয়া, চট্টগ্রামে ফজলুল কাদের চৌধুরী, জয়পুরহাটে আব্বাস আলী খান, খুলনায় সবুর খানের একই পরিণতি হয়। (আবু মোঃ ২০১১ : ৪২)

২১. রোমান হরফ প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। এ সম্পর্কে তিনি বলেন–

> It is quite clear to me that with two national languages we cnanot become a one-nation state; we shall continue to remain a multi-nation state. I am just stating a fact of life which has to be recogniged. For it is the case that one language cannot be imposed on the whole country; neither Bengali non Urdu can become the language of the whole Pakistan. It is eaually true that if the people – both in East and West Pakistan want to develop choesion they must have a medium to communicate with each other. And the medium must be a national medium. To envolve such a medium we have to identify common eliments in Bengali and Urdu and allow them to grow together through a common script. (Mohammad Ayub 2008 : 102)

২২. একারণেই পাকিস্তানবাদী সাহিত্যের অন্যতম সক্রিয় তাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক হওয়া সত্ত্বেও ফররুখ আহমদ ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হতে দ্বিধা করেননি। গুলি চালনার সংবাদে 'ফররুখ আহমদের নেতৃত্বে ঢাকা বেতারের সকল স্টাফ আর্টিস্ট অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন'। (আনিসুজ্জামান ২০১৫ : ১৭৭) শুধু বেরিয়ে আসেননি 'পুলিশ কর্তৃক গুলি চালনার অল্প কিছুক্ষণের পরেই ঢাকা বেতারের শিল্পী ও কর্মচারীরা নাজিমুদ্দীন রোডে অবস্থিত রেডিও কেন্দ্রের উল্টো দিকে আবন মিঞার রেস্টুরেন্টে সমবেত হন এবং গুলির প্রতিবাদে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফররুখ আহমদ, সিকান্দার আবু জাফর, সায়ীদ সিদ্দিকী, আবদুল আহাদ (১৯২০-১৯৯৪), আবদুল লতিফ (১৯২৭-২০০৫) প্রভৃতি লেখক ও শিল্পীরা এই ধর্মঘট সংগঠিত করার কাজে খুব সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এর ফলে রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রের ঐ দিনের তৃতীয় অধিবেশনের সমস্ত প্রোগ্রাম বাতিল হয়ে যায় ...।' (বদরুদ্দীন ১৯৯৫ : ২১১/৩) অনুরূপভাবে, পাকিস্তান সরকারের ঘনিষ্টজন হিসেবে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও সৈয়দ আলী

Dhaka University Institutional Repository

আহসানও ১৯৬২ সালে বাংলা ভাষায় রোমান হরফ প্রবর্তনের আইয়ুবী প্রচেষ্টার বাইরে গিয়ে পাকিস্তানের উভয় অংশে দুটি রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও উর্দু পাঠ বাধ্যতামূলক করার মধ্যবর্তী প্রস্তাব দেন। (মোরশেদ ২০১৪ : ৪২)

পূর্ব বাংলার স্বাতন্ত্র্য আর বাঙালিত্বের অহংকার বিষয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার কোনো লেখক-সাহিত্যিক-শিল্পীর মধ্যে কোন দ্বিধা ছিল না। একারণে ১৯৪৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর এবং ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে' সাহিত্যের আদর্শের প্রশ্নে ভিন্ন চেতনার শিল্পী-সাহিত্যিকদের সম্মিলন ঘটেছিল সম্মেলনটির কমিটিতে। বাংলা ভাষাই এঁদের মধ্যে একটি ঐক্যের সেতুবন্ধ রচনা করে দিয়েছিল। তা না হলে হাবিবুল্লাহ বাহার, জসীমউদ্‌দীন, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সৈয়দ আলী আহসান, ফররুখ আহমদ, ফতেহ লোহানী ও কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ একই প্লাটফর্মে কীভাবে ঐক্যবদ্ধ হন! কোনো কোনো গবেষক মনে করেন, উপর্যুক্ত কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের অনেকের মধ্যে প্রগতি আর প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল। (প্রথমা ১৯৯৬ : ৬৬) তবে একটি কথা স্মরণে রাখা দরকার যে, সাহিত্যের আদর্শের প্রশ্নে চেতনার দ্বিস্রোতের বিষয়টি বোধ করি আরো পরে দেখো দিয়েছে। চল্লিশের দশকে তখনো এটি স্পষ্ট হয়নি। ওই সম্মেলনে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র দেয়া অভিভাষণের দুটি চরণ দেখলেই বিষটি সহজে বোঝা যেতে পারে। তিনি সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'স্বাধীন পূর্ব বাংলার স্বাধীন নাগরিকরূপে আজ আমাদের প্রয়োজন হয়েছে সর্ব শাখায় সুসমৃদ্ধ এক সাহিত্য। এই সাহিত্যে আমারা আজাদ পাক-নাগরিক গঠনের উপযুক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের অনুশীলন চাই।' (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ১৯৯৪ : ৫৫৩/১)

২৩. যখন এই সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলনটি হচ্ছে অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বয়স মাত্র এক বছর। এই তো এর মাত্র দুই বছর আগেও বাঙালি মুসলমান পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের জ্বরে তীব্রভাবে কেঁপেছে। ১৯৪৫-১৯৪৬ সালের দিকের এক কিশোরের দেখা থেকে সেই জ্বরের কিছুটা আঁচ করা যেতে পারে–

> হিন্দু-মুসলমানের এই স্বাতন্ত্র্যবোধ যে মুসলিম লীগের রাজনীতির আবহাওয়ায় অনেকখানি পুষ্ট হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। আমার জ্ঞান হতে দেখি, বাড়ির সকলে পাকিস্তান চান, মুসলিম লীগকে সমর্থন করেন এবং জিন্নাহ্‌কে নেতা মানেন। আশপাশেও এই ভাবটাই প্রবল ছিল। ... এই আবহাওয়ায় আমিও পাকিস্তানের খুদে সমর্থক হয়ে উঠেছিলাম। স্কুলে টিফিনের জন্যে যে-পয়সা পেতাম, হঠাৎ করে একটা সিগারেটের টিনে তা জমাতে আরম্ভ করলাম। উদ্দেশ্য : জিন্নাহ্‌ ফান্ডে দান করা। (আনিসুজ্জামান ২০১৫ : ৭৫)

আনিসুজ্জামানের এই আত্মজৈবনিক স্মৃতিচারণ থেকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেকার পাকিস্তানি আবেগের তাৎপর্য সহজেই অনুমেয়। এই আবেগ ১৯৪৮-এ মুছে গিয়েছিল বলে মনে হয় না।

২৪. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ৩১শে ডিসেম্বর সম্মেলনের প্রথম দিনে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে অনেক কথার সঙ্গে উদ্ধৃত কথাগুলো বলেছিলেন বলে বদরুদ্দীন উমর তাঁর ce evOjvi fvlv Av‡›`vjb I ZrKvjxb ivRbxwZ (১৯৯৫) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৪৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। আমরা যে-অংশটি বদরুদ্দীনের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছি সেই অংশের তথ্যনির্দেশে বদরুদ্দীন উমর উল্লেখ করেছেন ১লা জানুয়ারি ১৯৪৯ সালের ˆ`wbK AvRv`-এর কথা। কিন্তু ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র এই ভাষণটি 'অভিভাষণ' শিরোনামে গ্রন্থিত হয়েছে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত knx`jøvn iPbvejx (১৯৯৪)-র প্রথম খণ্ডে। যেটি সম্পাদনা করেছেন আনিসুজ্জামান। আনিসুজ্জামান সম্পাদিত উক্ত গ্রন্থের ওই অভিভাষণে বদরুদ্দীন উমরের গ্রন্থে উদ্ধৃত শহীদুল্লাহ্‌র ভাষণের অন্যান্য অংশ থাকলেও বদরুদ্দীন উমর থেকে আমরা যে অংশ উদ্ধৃত করেছি সেই অংশটুকু পাওয়া যায়নি। তাই বদরুদ্দীন উমরের গ্রন্থে উদ্ধৃত– 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙ্গালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুটি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো টি নেই।'– এই অংশটুকু আনিসুজ্জামানের সম্পাদনায় বাদ পড়েছে অথবা ˆ`wbK AvRv`-এ অতিরিক্ত সংযোজিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২৫. সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালির আন্দোলন-সংগ্রাম তথা রাজনৈতিক সংগ্রামের ঘনিষ্ঠ যোগ বরাবরই ছিল। বাংলাদেশের

স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রেও কথাটি আরো সত্য। একারণে ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমিতে এক সাহিত্য-সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'বিশ্বের স্বাধীনতা-লব্ধ জাতিগুলির মধ্যে আমরা এদিক থেকে গর্ব করতে পারি যে, আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম হাতে হাত ধরে অগ্রসর হয়েছে।' (শেখ মুজিবুর ১৯৯৫ : ৩০২)

২৬. যদিও কেউ কেউ আহসান হাবীবের iv॥‡kl কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোর বিষয়চেতনার কথা বলতে গিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথাই উল্লেখ করেছেন। যেমন আল মাহমুদ বলেছেন, দেশবিভাগের পূর্বে আহসান হাবীব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় বাংলাদশেকে উপস্থিত করেছেন iv॥‡kl কাব্যের 'রেড রোডে রাত্রি শেষ' এবং অপরাপর কিছু কবিতায়। (আল মাহমুদ ১৯৯৫ : ৩৭)

২৭. ফররুখ আহমদের gn‡Zi KweZv কাব্যগ্রন্থের সব কবিতা অবশ্য ইসলামি ভাবধারা বা পাকিস্তানবাদী ভাবধারার কবিতা নয়। এর অনেক কবিতা আছে যেগুলোতে পূর্ব বাংলার মাঠ-ঘাট-জনপদ-প্রকৃতি-ঐতিহ্য রূপময় হয়ে উঠেছে। যেমন, 'কোকিল', 'ফাল্গুনে', 'বৈশাখী', 'ঝড়', 'বৃষ্টি', 'ময়নামতির মাঠে', 'মোতিঝিল', 'ধানের কবিতা', 'সিলেট স্টেশনে একটি প্রভাত' ইত্যাদি কবিতায় যেন পূর্ববাংলা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। এসব কবিতা দেখে কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন, 'ফররুখ আহমদ ক্রমশ সমুদ্র থেকে বন্দরে ফিরে আসছিলেন। সেই বন্দর তাঁর নিজস্ব জন্মভূমির নিসর্গ পথ-প্রান্তর।' (আবু হেনা ১৯৮৮ : ৫০৪)

২৮. ১৯৬৮ সালে বাংলা একাডেমি আয়োজিত এক সাহিত্য-সপ্তাহে সৈয়দ আলী আহসান 'পূর্ব বাংলার বিশ বছরের কবিতা' শিরোনামে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ওই প্রবন্ধ পাঠ শেষে প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর। তিনি আলোচনা করতে গিয়ে সৈয়দ আলী আহসানের Pvnvi ' i‡ek এবং এই কাব্যের শুরুতে লেখা আলী আহসানের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, এটি যতটা না লোকসাহিত্য তার চেয়ে বেশি সৈয়দ আলী আহসানের ক্রেডো। বক্তব্যটি ছিল এরকম–

'চাহার দরবেশ' প্রসঙ্গে কিছু বলা জরুরী। 'চাহার দরবেশ' প্রথম বেরিয়েছিল আজাদের কোন এক ঈদসংখ্যায়, সৈয়দ আলী আহসানের ভূমিকা শুদ্ধ। ঐ ভূমিকা সেই সময়কার সৈয়দ আলী আহসানের ক্রেডো। লোকজ অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি থেকে তাঁর অবস্থান দূরে, ঐ অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি তিনি ব্যবহার করতে চেয়েছেন, যাকে তিনি ভেবেছেন লোকজ সংস্কৃতির পুনর্নির্মাণ, কিন্তু অভিজ্ঞতার একমাত্রিক ব্যবহারের দরুন কাহিনীর বিন্যাসে বহু স্তর সংলগ্ন হয়নি, কৌতূহলের প্রমাণ মেলেনি, সেজন্য হয়তো 'চাহার দরবেশে' তাঁর শব্দ ব্যবহারে লোকজ অভিজ্ঞতার শক্তি তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতা অনুপস্থিত। উনিশ শতকের মধ্যপাদ থেকে বাংলা কবিতায় যে ভাষা গড়ে উঠেছে তাকে তিনি ব্যবহার করেছেন, তাঁর ভাষায় তাই বাঁশীর মতো বেজেছে গতানুগতিকতা, উপমায় ও রূপকে ধ্বনিত বাংলা কবিতার চেনা সুর। (বোরহানউদ্দিন ১৯৬৯ : ৪৪)

২৯. তবে পাকিস্তান পর্বে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী ধারার কিছু কবি ব্যঙ্গ কবিতা রচনার মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের নানা অসঙ্গতিকে আঘাত করার প্রয়াস পেয়েছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনার কবিদের মূলধারার কাব্য-কবিতায় তাঁদের জাতীয়তাবাদী চেতনা সমুন্নত থাকলেও ব্যঙ্গ কবিতায় লক্ষ করা যায় পাকিস্তান সরকার, সরকারের নানা অযৌক্তিক কর্মকাণ্ড, সরকারের মন্ত্রী, তাদের দুর্নীতি ইত্যাদি কবিদের ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ হয়েছে। অবশ্য একে এসব কবির সামাজিক দায়িত্ব পালন বলেও অনেকে মনে করেন। (নিতাই ২০০৭ : ১৬৪) এমন ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেছেন ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী প্রমুখ পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী কবিরা। যেমন, তালিম হোসেনের b‡ni RvnvR (১৯৮৪) কাব্যের 'কর্মখালি' কবিতায় কবি ব্যঙ্গের তীব্র কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন পাকিস্তানি স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতা, আমলা আর মন্ত্রীদের। কারণ, পাকিস্তানের শাসকদের কার্যকলাপে তাঁর আশাভঙ্গ হয়েছিল। তিনি লক্ষ করেছিলেন যে, 'সাধারণ মানুষের দেশ না হয়ে পাকিস্তান হয়েছে স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতা, আমলা আর মন্ত্রীদের বিলাস ভূমি।' (নিতাই ২০০৭ : ১৬৪) আবার হায়াৎদারাজ খান নামে ফররুখ আহমদ পাকিস্তানি শাসকচক্রের 'আদর্শহীনতা, দুর্নীতি আর চারিত্রিক দুর্বলতার' বিরুদ্ধে লিখেছিলেন 'তৈল'

Dhaka University Institutional Repository

নামক ব্যঙ্গ কবিতা। আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী তাঁর †h‡nZ (১৯৫৪) ব্যঙ্গকাব্যের 'আজাদীর গান' এবং 'আমরা আপনাদের খাদেম' কবিতায় পাকিস্তানি শাসকচক্রের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করেছেন–

বিড়াল দেখিলে ভয়েতে পালাই বাঘকে করি না ভয়
মুখে করি শত পরিকল্পনা কাজের বেলায় নয়।
কওমী ঝাণ্ডা উড়াই আমরা শারাব খানার পরে
'ট্রেড ইসলাম' মদ পান করি কভু উল্লাস ভরে। (আবদুর রশীদ ১৯৫৪ : ২৫)

অথবা

ছিন্নবস্ত্র কোমরেতে জড়া
রেশমী নিশান আসমানে উড়া
যেহেতু আমরা স্বাধীন আজিকে, সেহেতু সবাই মউজ কর
বেকার আছিস? কুত্তার লেজ সোজা কর ভাই জীবন ভর। (প্রাগুক্ত : ৩৫)

পাকিস্তানি শাসকদের এধরনের সমালোচনা করে আরো বেশ কিছু ব্যঙ্গ কবিতা সংকলিত হয়েছিল †avjvB Kve¨ (১৯৬৩) নামক এক ব্যঙ্গ কবিতার সংকলনে।

৩০. ঠিক একইভাবে অবিভক্ত ভারতে কংগ্রেস সম্পর্কে ভারতের মুসলমান নেতৃত্ব এবং এর জনগণ সংশয়ী হয়ে উঠেছিল এই

বলে যে, কংগ্রেস ভারতের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে না। এই সংশয়ের বোধ থেকে ভারতের মুসলমানরা মুসলিম লিগের নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছিল।

৩১. ভাষা আন্দোলন পঞ্চাশের দশকে কাব্য-কবিতায় তৎপর নতুন-পুরাতন অধিকাংশকেই বদলে দিয়েছিল। তরুণ

কবিদের ওপর ভাষা আন্দোলনের প্রভাবের এক দারুণ বর্ণনা দিয়েছেন সৈয়দ শামসুল হক। ১৯৫৩ সালের হাসান হাফিজুর রহমানের GK‡k †deªæqvix সংকলনের জন্যে লেখা আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কবিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন–

> সেদিন খাওয়াদাওয়া শেষে জুত করে সিগারেট ধরিয়ে ওবায়দুল্লাহ পকেট থেকে তাঁর সদ্য লেখা কবিতাটা বের করে পড়ে শোনালেন। সেই কবিতা– 'কুমড়ো ফুলে ফুলে নুয়ে পড়েছে লতাটা'– শুনে আমি খুব অবাক হলাম, ওবায়দুল্লাহ এত দিন পর্যন্ত তাঁর সব কবিতাই ছড়ার আঙ্গিকে লিখেছেন, এতেই তাঁর প্রসিদ্ধি, কিন্তু এ কবিতা যে নিপাট গদ্যে লেখা। এই কি তাঁর সেই অভ্যেস থেকে সরণ, যার পরিণামে আমরা বহু বছর পরে দেখে উঠব তাঁরই কলমে এমন অবিস্মরণীয় কবিতা– 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি', কিংবা 'বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্যে প্রার্থনা'! (সৈয়দ শামসুল ২০১৪ : ১৩৬)

সৈয়দ হক আরো বলেছেন–

> এর মধ্যে ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলেন আনিসুজ্জামান, তিনি তাঁর শার্টের পকেট থেকে যে গল্পটি হাসানের হাতে তুলে দিলেন– শিরোনাম, 'দৃষ্টি'– মুক্তোর মতো অক্ষর, কিন্তু মাপে আর তাঁর আগের গল্পের মতো তেমনটি ছোট নয়, বেশ বড়ই, একেবারে তাঁর অভ্যেসের বাইরেই– পেছনের দিকে তাকিয়ে এখন আমার মনে হয়, ভাষা আন্দোলনের ওপর কবিতা বা গল্প লিখতে গিয়ে ওবায়দুল্লাহ কি আনিস যে তাঁদের চিরাচরিত পথ থেকে সরে এসেছিলেন, এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় এবং গভীরে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু কি ওদেরই ওই নতুনতর কলম হাতে নেওয়া?– আমার কথাটা বলি, হাসানের ওই সংকলন আমাকেও একটি নতুন কলম হাতে তুলে দেয়! (সৈয়দ শামসুল ২০১৪ : ১৩৭-১৩৮)

৩২. ১৯৫৩ সালে বোধ করি আল মাহমুদ ঢাকায় আসেননি। তিনি জন্মস্থান ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঢাকায় এসেছেন আরো পরে। তাছাড়া আবিদ আজাদের কাছে এক সাক্ষাৎকারে আল মাহমুদ বলেছেন, 'আমি পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি

Dhaka University Institutional Repository

সময়ে লিখতে শুরু করি।' (আল মাহমুদ ২০০৩ : ৭)। এই হিসেবে আল মাহমুদের কবিতা হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত GK‡k †dewqvix সংকলনে থাকার কথা নয়।

৩৩. সৈয়দ আলী আহসানের এই রূপান্তর সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন–

> ভাষা আন্দোলন পরবর্তীকালে সৈয়দ আলী আহসান তাঁর কবিজনোচিত অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে, দেশ ও বহমান কাল থেকে বিচ্ছিন্ন করে ধর্মকে হৃদয়ে স্থাপন করা সম্ভব হলেও ফররুখ আহমদের অনুসরণে ধর্মকে একজন কবির সমগ্র শিল্পসত্তায় সঞ্চারিত করা সহজ কাজ নয়। আর ফররুখের অসমৃদ্ধির দৃষ্টান্ত যেহেতু তার চোখের সামনেই ছিল সে কারণে 'চাহার দরবেশ' কাব্য রচনার পর তিনি আর সে দিক অগ্রসর হলেন না। তিনি তাঁর কবিতার জন্য অকস্মাৎ এমন দু'টি বিষয়কে বেছে নিলেন যা বিশ্বের যে কোনো দেশের সাহিত্য-আন্দোলনকারী নবীন পথচারীদের প্রবল প্রশ্নের সম্মুখীন হয় না। অর্থাৎ নরনারীর যে সম্বন্ধকে আমরা প্রেম বলি, তিনি এই প্রেম এবং নৈসর্গিক সৌন্দর্যমণ্ডিত অবস্থায় দেশকে স্থাপন করে, প্রেম এবং দেশপ্রেম তাঁর কবিতার উপজীব্য করে তুললেন। (আল মাহমুদ ১৯৯৫ : ৩৭)

সৈয়দ আলী আহসানের এই প্রত্যাবর্তনকে অনেক সমালোচক বলেছেন, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায় দেখা দেয় 'দেশরূপের ইশারা', 'দেশচেতনার অন্তরঙ্গ অনুভব'। (মাসুদুজ্জামান ১৯৯৩ : ২৬৯)

৩৪. সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩) বা সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭) যে অর্থে মার্কসবাদী কবি সেই অর্থে বাংলাদেশের কবিতার পঞ্চাশের দশকে মার্কসবাদী কবি কেউ ছিলেন না। বুর্জোয়া মানবতাবাদী হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো কবির মধ্যে শ্রেণিচেতনার বীজ ছিল এবং কবিতায় তার প্রকাশও ঘটেছে। কিন্তু তাই বলে তাঁরা মার্কসবাদী কবি নন। এসব কবির ওপর চল্লিশের বাংলা কবিতার সমাজবাদী ধারা প্রভাব ফেলে থাকতে পারে। এই প্রভাব যেসব কবিকে কিছুকাল উচ্চকিত করে রেখেছিল তাঁদের মধ্যে আলাউদ্দিন আল আজাদ, হাসান হাফিজুর রহমান, দিলওয়ার (১৯৩৭-২০১৩) প্রমুখ অগ্রগণ্য।

৩৫. পঞ্চাশে মাতৃভাষা-মাতৃভূমি কেন্দ্রিক যে চেতনার বিকাশ শুরু হয় সে পথ ধরে একুশোত্তর বছর কয়েকের মধ্যেই 'পূর্ববাংলা' আর নিছক একটি ভূখণ্ড-পরিচয়ে সীমাবদ্ধ থাকেনি। সে তখন কবিদের চোখে এক রূপময়ী মহিমময়ীর প্রতীক যার বন্দনায় পাকিস্তানবাদী কবি সৈয়দ আলী আহসানকেও পরে এক সময় আবেগাশ্রিত হয়ে এগিয়ে আসতে হয়েছিল।

> একই আবেগে আহসান হাবীব যখন 'মাকে আর প্রেয়সীকে এবং এই দেশকে বিচিত্র রঙের তুলি' দিয়ে এঁকে তোলেন তখন সে দেশকে ঘিরে 'মায়ের মুখের কথা প্রেয়সীর মুখের কবিতা' (১৯৬২) প্রকাশ পায়। প্রায়ই একই সময়ে হাসান হাফিজুর রহমানের উপলব্ধিতে 'দর্পিত দর্পণ স্বদেশ যেন মর্তের অমর্ত রোশনাই' (১৯৬৩) হয়ে ওঠে। আর আবু জাফর ওবায়দুল্লা'র চোখে 'মা যেন সোঁদাগন্ধ মাটি ফলবতী' যে মা তার অতি স্বচ্ছন্দ 'কোলে সহোদর ঘাসফুল সাজায়।' অবশ্য সানাউল হকের গম্ভীর বাক্যবন্ধে 'পূর্ববাংলা যেন মৌন সমর্পিতার শান্ত শ্রী প্রতীক্ষা, উদাসীনা ধরিত্রী তিতিক্ষা।' অন্যদিকে সিকান্দার আবু জাফর 'মায়ের বাড়ির দরজা অষ্টপ্রহর খোলা' রেখে দেন যাতে 'পথ চিনতে কারো কষ্ট না হয়।' (আহমদ রফিক ২০১৪ : ১১৪)

সহায়কপঞ্জি

অজয় রায় (২০১৭), evsjv‡`‡k evgcš'x Av‡›`vjb : 1947-1971, দ্বিতীয় সংস্করণ, সাহিত্যিকা, ঢাকা।

অমলেন্দু দে (২০১১), evOvjx eyw×Rxex I wew"QbZvev`, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

অলি আহাদ (২০১২), RvZxq ivRbxwZ : 1945 †_‡K 75, ৫ম সংস্করণ, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ঢাকা।

অশ্রুকুমার সিকদার (২০১৪), †Pv‡Li `wU Zviv : `B evsjvi KweZv, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা।

আকবর আলী খান (২০১৫), evsjv‡`‡ki mËvi A‡š^lv : GKwU c"Qb RwZi MwZ-cKwZi AbmÜvb (অনু. আমিনুল ইসলাম ভুইয়া), প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আখতার ফারুক (১৯৮৮), diiæL Avng` : e¨w³ I Kwe (সম্পা. শাহাবুদ্দীন আহ্মদ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ (২০০০), fvlv Av‡›`vj‡bi Av_-mvgvwRK cUfwg (সম্পা. আতিউর রহমান), একত্রে ৫ খণ্ড, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

আনিসুজ্জামান (২০১৫), Kvj wbiewa, তৃতীয় মুদ্রণ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী (১৯৫৪), †h‡nZ, নয়া দুনিয়া প্রকাশনী, ঢাকা।

আবদুল মান্নান সৈয়দ (২০১৫), Ave`j gvbvb ˆmq` iPbvewj, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আবদুল হক (১৯৮৮), diiæL Avng` : e¨w³ I Kwe (সম্পা. শাহাবুদ্দীন আহ্মদ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

(১৯৯৬), †jL‡Ki †ivRbvgPvq Pvi `k‡Ki ivRbxwZ-cwiµgv, †cÿvcU : evsjv‡`k (1953-Ô93), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

(২০১৪), fvlv Av‡›`vj‡bi Aw`ce, চতুর্থ প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা।

আবু জাফর শামসুদ্দীন (২০১৬), AvZ¥¯§wZ, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

আবু মোঃ দেলোয়ার (২০১১) 'ঢাকার বাইরে ভাষা-আন্দোলন', fvlv Av‡›`vj‡bi cÂvk eQi (সম্পা. আহমদ রফিক ও বিশ্বজিৎ ঘোষ), দ্বিতীয় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল (২০০১), Ave †nbv †gv¯Ídv Kvgvj iPbvejx, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আবুল মনসুর আহমদ (১৯৯৯), †k‡i evsjv nB‡Z e½eÜ, পঞ্চম মুদ্রণ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

(২০০১), Avej gbmi Avng` iPbvejx, ৩য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০১৪), AvZ¥K_v, তৃতীয় মুদ্রণ, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা।

আবুল হাশিম (২০১২), Avgvi Rxeb I wefvMce evsjv‡`‡ki ivRbxwZ, প্রথম অ্যাডর্ন প্রকাশ, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা।

আল মাহমুদ (১৯৯৫), GK‡ki wbewPZ ceÜ : 1963-1976 (সম্পা. মোবারক হোসেন), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০০৩), mvÿvrKvi : Avj gvng` (সম্পা. সাজ্জাদ বিপ্লব), ঐতিহ্য, ঢাকা।

আলাউদ্দিন আল আজাদ (২০০৬), KweZvmgM 1, গতিধারা, ঢাকা।

আহমদ রফিক (১৯৯৩), fvlv Av‡›`vj‡bi ¯§wZ I wKQ wRÁvmv, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০১৪), evsjv‡`‡ki KweZv : `kKfvOv wePvi, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

(২০১৫), fvlv Av‡›`vj‡bi BwZnvm, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা।

(২০০৬), 'মুখবন্ধ', AvjvDwÏb Avj AvRv` : KweZvmgM-1, গতিধারা, ঢাকা।

আহসান হাবীব (১৯৯৫), Avnmvb nvexe iPbvejx, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

ইসরাইল খান (২০০৪), evsjv mvgwqKcÎ : cwiK¯Ívbce, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

এম আর আখতার মুকুল (২০১২), GK‡ki `wjj, তৃতীয় মুদ্রণ, অনন্যা, ঢাকা।

কামরুদ্দীন আহমদ (১৩৭৬), ce evsjvi mgvR I ivRbxwZ, স্টুডেন্টস পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

(২০০৪), evsjvi ga¨we‡Ëi AvZ¥weKvk, অখণ্ড সংস্করণ, ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন, ঢাকা।

কুদরত-ই-হুদা (২০১৩), kIKZ Imgvb I m‡Z¨b †m‡bi Dcb¨vm : Awf½K wePvi, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আদর্শ, ঢাকা।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও সরদার ফজলুল করিম (২০১২), Pwjø‡ki ‘k‡Ki XvKv, তৃতীয় মুদ্রণ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

গোলাম মুরশিদ (২০১৭), gwµ³hy× I Zvici : GKwU wb‘jxq BwZnvm, একাদশ মুদ্রণ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

গোলাম মোস্তফা (১৯৬২), Avgvi wPšÍvaviv, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

জ্ঞান চক্রবর্তী (২০১৬), XvKv †Rjvi KwgDwb÷ Av‡›`vj‡bi AZxZ hM, নতুন সংস্করণ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা।

জয়া চ্যাটার্জী (২০০৩), evOjv fvM nj, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

নিতাই দাস (১৯৯৩), cwK¯Ívb Av‡›`vjb I evsjv KweZv, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০০৭), evsjv mvwn‡Z¨ cwK¯Ívb Av‡›`vj‡bi cfve : 1940-1971, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

নেহাল করিম (২০১১), RvZxqZvev` : D‡b¥l I weKvk, কৃষ্ণচূড়া প্রকাশনী, ঢাকা।

ফররুখ আহমদ (২০১২), KweZvmgM, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অনন্যা, ঢাকা।

বদরুদ্দীন উমর (১৯৯৫), ce evOjvi fvlv Av‡›`vjb I ZrKvjxb ivRbxwZ, প্রথমম খণ্ড, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা।

(১৯৯৫), ce evOjvi fvlv Av‡›`vjb I ZrKvjxb ivRbxwZ, ৩য় খণ্ড, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা।

(১৯৯৬), ce evOjvi fvlv Av‡›`vjb I ZrKvjxb ivRbxwZ, ২য় খণ্ড, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (১৯৫৩), GK‡k †dewqvix (সম্পা. হাসান হাফিজুর রহমান), পুঁথিপত্র প্রকাশনী, ঢাকা।

(১৯৬৯) Avgv‡`i mvwnZ¨ (সম্পা. সরদার ফজলুল করিম), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মওদুদ আহমদ (২০১৫), evsjv‡`k : ¯vqËkvmb †_‡K ¯vaxbZv (অনু. জগলুল আলম), পঞ্চম মুদ্রণ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

(২০১৭), AvIqvgx jxM : DÌvbce 1948-1970, দ্বিতীয় মুদ্রণ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

মাসুদুজ্জামান (১৯৯৩), evsjv‡`k I cwðg evsjvi KweZv : ZjbvgjK aviv, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য (২০১০), evsjv‡`‡ki BwZnvm, নওরোজ কিতাবিস্তান, পঞ্চম সংস্করণ, ঢাকা।

মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান (২০১৫), evsjv mvwn‡Z¨i BwZeË (আধুনিক যুগ), দ্বাদশ মুদ্রণ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

মুহম্মদ মজিরউদ্দীন (১৯৯৩), cm½ : RvZxqZvev` I ms¯¥wZ (সম্পা. আমিনুর রহমান সুলতান), নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৯৯৪), knx`jøvn iPbvejx, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মোরশেদ শফিউল হাসান (২০১৪), ¯vaxbZvi cUfwg : 1960 ‘kK, অনুপম প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ঢাকা।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৬৯), Avgv‡`i mvwnZ¨ (সম্পা. সরদার ফজলুল করিম), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(১৯৯৮), †gvnv¤§` gwbiæ¾vgvb Kve¨msMÖn, প্রতীতি প্রকাশনী, ঢাকা।

যতীন সরকার (২০১৩), cwK¯Ív‡bi Rb¥gZ¨-‘kb, চতুর্থ মুদ্রণ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

যশোবন্ত সিংহ (২০১৪), wRbœv fviZ †`kfvM I ¯vaxbZv, চতুর্থ মুদ্রণ, আনন্দ, কলকাতা।

রওশন ইয়াজদানী (১৯৬০), LvZvgb bexCb, জাকারিয়া লাইব্রেরী, বরিশাল।

রণেশ দাশগুপ্ত (২০১৫), 'পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের গতিপ্রকৃতি', i³v³ evsjv (সংকলিত), ষষ্ঠ প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা।

রফিকুল ইসলাম (১৯৭৪), ev0jv‡'k (সম্পা, মনসুর মুসা), নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

(১৯৮৮), diiæL Avng' : e¨w³ I Kwe (সম্পা. শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

(২০১৬), evsjv‡'‡ki ¯^vaxbZv msMÖvg, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

রফিক কায়সার (১৯৮৭), wZb cIæ‡li ivRbwZ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

রফিকউল্লাহ খান (২০১৬), nvmvb nvwdRi ingvb : Rxeb I mvwnZ¨, প্রথম বাংলাপ্রকাশ সংস্করণ, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪০২), iex›' iPbvejx, রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ সুলভ সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

রেজোয়ান সিদ্দিকী (২০০৬), ce evsjvi mvs¯‹…wZK msMÖvb I mvs¯‹…wZK Av‡›'vjb : 1947-1971, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা।

রেহমান সোবহান (২০০৭), Avgvi mgv‡jvPK Avgvi eÜ (iPbv msKjb), সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ, ঢাকা।

শাহাদাৎ হোসেন (১৯৫০), রূপচ্ছন্দা, মখ্‌দুমী অ্যাণ্ড আহসানউল্লা লাইব্রেরী, ঢাকা।

শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৯৫), GK‡ki wbeÜvPZ ceÜ : 1963-1976 (সম্পা. মোবারক হোসেন), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০১৪), Amgvß AvZ¥Rxebx, চতুর্থ মুদ্রণ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

সাঈদ-উর রহমান (১৯৮৩), ce evsjvi mvs¯‹…wZK Av‡›'vjb : 1940-82, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা।

(২০০১), ce evsjvi ivRbwZ-ms¯‹…wZ I KweZv, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ২য় সংস্করণ, ঢাকা।

সালাহ্‌উদ্দীন আহমদ (২০১৪), BwZnvm HwZn¨ RvZxqZvev' MYZš¿ : wbeÜvPZ ceÜ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০১১), evOvjxi RvZxqZvev', পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

সৈয়দ আলী আহসান (১৯৬৯), 'পূর্ব পাকিস্তানের বিশ বছরের কবিতা', Avgv‡'i mvwnZ¨ (সম্পা. সরদার ফজলুল করিম), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(১৯৮৩), mZZ ¯^vMZ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

(২০০৯), KweZv mgM, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা।

সৈয়দ শামসুল হক (২০১৪), wZb cqmvi †R¨vQbv, দ্বিতীয় মুদ্রণ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

হাসান আজিজুল হক (১৯৮৫), 'বায়ান্নর একুশ : ঢাকার বাইরে', GK‡ki ceÜ : 1984, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৭৩), AvaybK Kwe I KweZv, দ্বিতীয় সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(১৯৫৩) GK‡k †deæqvix (সম্পা.হাসান হাফিজুর রহমান), পুঁথিপত্র প্রকাশনী, ঢাকা।

(১৯৯৪), nvmvb nvwdRi ingvb iPbvejx-1, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হায়াৎ সাইফ (১৯৮৯), mgKvjxb evsjv mwnZ¨ (সম্পা. খান সারওয়ার মুরশিদ), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ (১৯৯৩), cm½ : RvZxqZvev' I ms¯‹wZ (সম্পা. আমিনুর রহমান সুলতান), নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা।

(২০০০), ভাষা-আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পটভূমি (সম্পা, আতিউর রহমান), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

(২০০৫), wkíKjvi wegvbveKxKiY I Ab¨vb¨ ceÜ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

(২০১২), wbewPZ ceÜ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

হুমায়ুন কবির (২০১২), evsjvi Kve¨, দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।

Gooch, G. P. (1931), *Study in Modern History*, Longmans, Green and Co. London.

Mohammad Ayub Khan (2008), *Friends Not Masters*, The University Press Limited.

Nehal Karim (2004), *The Emergence of National in Bangladesh*, Adhuna prakashan, Dhaka.

Jyoti Sen Gupta (1974), *History of Freedom Movement in Bangladesh*, Calcutta.

Keith Calldard (1957), *Pakistan : A political Study*, Allen and Unwin, London.

Rounaq Jahan (2015) *Pakistan : Failure in national integration*, Third impression,The University Press Limited, Dhaka.

তৃতীয় অধ্যায়

ষাটের দশকের জাতীয়তাবাদী চিন্তার স্বরূপ

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ষাটের দশকের জাতীয়তাবাদী চিন্তার স্বরূপ

ষাটের দশক পূর্ব বাংলায় সর্বাত্মক জাতীয়তাবাদী চিন্তা বিকাশের দশক। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন ও ১৯৫৪-এর নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনচৈতন্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার যে স্ফুরণ লক্ষ করা গিয়েছিল, তা ১৯৫৮-এর সামরিক শাসনের চাপে কিছুকাল চাপা থাকে। কিন্তু এই আপাত চাপা থাকা চেতনা ১৯৬০-এর দশকে এসে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উপলব্ধির নবতর পরিস্থিতির সংঘর্ষে পূর্বের চেয়ে অধিকতর গতিপ্রাপ্ত হয়। তবে ষাটের দশকের পুরোটা সময় জুড়ে জাতীয়তাবাদী চেতনার একই মাত্রা লক্ষ করা যায় না। এই দশকের প্রথমার্ধে জাতীয়তাবাদী চেতনার মাত্রা আর দ্বিতীয়ার্ধের মাত্রা ও রূপ এক নয়। প্রথমার্ধকে বলা যায় জাতীয়তাবাদী চেতনার পুনর্জন্ম, পুনর্সংজ্ঞায়ন ও পুনর্কাঠামোপ্রাপ্তির কাল, আর দ্বিতীয়ার্ধ এই চেতনার পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ, বন্ধনমুক্তি ও স্বাধিকার প্রাপ্তির বাসনায় চূড়ান্তভাবে সংগঠিত হওয়ার কাল।

ষাটের দশকের প্রথমার্ধ পূর্ব বাংলার অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময় ছিল পূর্ব বাংলার জন্যে এক অবরুদ্ধ সময়। এই অবরুদ্ধতা আইয়ুবি স্বৈরশাসনজাত। বাক-স্বাধীনতা, চিন্তা-প্রকাশের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার পথ ছিল এসময়ে তীব্রভাবে সংকুচিত। এসময়ের অবরুদ্ধ বাস্তবতার বর্ণনায় লেখক বলেছেন–

> ভীতত্রস্ত মনে চারিদিকে তাকালে মনে হয় যুদ্ধ জয় করে বিরাট সেনাবাহিনী দখল করেছে এই দুর্ভাগ্য দেশ। উদ্ধত বিজয়ীর উৎকট আস্ফালনে পরাভূত দেশবাসী সন্ত্রস্ত। মানুষের অন্তরাত্মা পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। সহজ-স্বাভাবিক জীবনধারা নিস্তব্ধ হয়ে উঠেছে। (আতাউর ২০০১ : ২২)

এছাড়া এই পর্বে পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টি প্রায় প্রকাশ্যে চলে আসে। কিন্তু এসব বৈরিতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ছিল পূর্ব বাংলার মানুষের জন্য দুরূহ। তদুপরি অর্থ দিয়ে কণ্ঠকেনার এক দুরভিসন্ধিও ক্রিয়াশীল ছিল আইয়ুবি স্বৈরশাসনের অন্তর্মূলে। তবু এই চাপা পরিস্থিতির মধ্যে পূর্ব বাংলায় যেসব তৎপরতা লক্ষ করা যায় অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও রাজনীতিকে কেন্দ্র করে, তা পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে পূর্ব বাংলায় জাতীয়তাবাদ বিকাশে ও শেষ পর্যন্ত এক নতুন জাতিসত্তার প্রতিষ্ঠায় অনবদ্য ভূমিকা রেখেছে। ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে অবরুদ্ধতার দেয়াল ভেঙে জাতীয়তাবাদী চিন্তা আন্দোলন-অভ্যুত্থান-যুদ্ধের মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়েছে তীব্র জলোচ্ছ্বাসে। নিচে ষাটের দশকের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে বিকশিত-প্রকাশিত জাতীয়তাবাদী চেতনার স্বরূপ আলোচিত হলো, যে-চেতনা অনিবার্যভাবে বাংলাদেশের সমসাময়িক কবিতায় দানাদার হয়ে উঠেছে।

ক. ষাটের দশকের অর্থনীতি ও জাতীয়তাবাদী চিন্তা

Dhaka University Institutional Repository

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদ বিকাশে এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় বুঝি বা রাজনীতিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাস গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখ যায় রাজনীতি, রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম, জাতীয়তাবাদী চেতনা ইত্যাদি সবকিছুর মূলে রয়েছে অর্থনীতি। পাকিস্তানের অর্থনীতির মধ্যেকার বৈষম্য এবং এই বৈষম্যের বোধই পূর্ব বাংলার মানুষকে বঞ্চিত হিসেবে একত্র করেনি শুধু; জাগিয়েও তুলেছে। কারণ মানুষের পেটে টান পড়লে অন্য সব জায়গায় সে টানের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তান সৃষ্টির ইতিহাসের মর্মমূলেও ছিল মূলত অর্থনৈতিক কার্যকারণ– এই সত্য আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখেছি। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ দানা বাঁধেনি। কারণ, যে অর্থনৈতিক সাম্যের আকাঙ্ক্ষায় পাকিস্তান রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল, সেই সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আর ‘অর্থনৈতিক সাম্য ছাড়া জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় ঐক্য ব্যর্থ হতে বাধ্য।’ (সৈয়দ আকরম ২০০৪ : ৪৫)

অর্থনৈতিক বৈষম্যের উপলব্ধি ও জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ

পূর্বের অধ্যায়ের অর্থনৈতিক আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দিন দিন বেড়েছে বৈ কমেনি। যে অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীকে ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে[১] পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, সেই স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেও অর্জিত হয়নি। পূর্ব বাংলার বাঙালিরা পূর্বের মতোই ‘অপর’ (other) হিসেবে বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু এই অর্থনৈতিক বঞ্চনার বিষয়টি ষাটের দশকের আগে মূলত ব্যক্তিগত পর্যায়ে, রাজনৈতিক নেতাদের পর্যায়ে ও বিচ্ছিন্ন একাডেমিক পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে। রাজনীতির ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি এলেও এটির এমন রাজনীতিকীকরণ ঘটেনি যা জনপর্যায়ে সংক্রমিত হয়ে সচেতনতা তৈরি করতে পারে বা এর বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী চেতনাঋদ্ধ জনমত তৈরি হতে পারে। ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারে ও প্রচারণায় অর্থনৈতিক বেশ কয়েকটি বিষয় প্রাধান্য পায়।[২] যেমন, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ, পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ করে পূর্ব বাংলা সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা, পূর্ব বাংলাকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা ইত্যাদি। কিন্তু সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণ ও পূর্ব বাংলার প্রতি অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো আলোকপাত করা হয়নি। অর্থাৎ অর্থনৈতিক শোষণের খতিয়ান তলিয়ে দেখার চেয়ে সেখানে ভাষা আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন আর পূর্ব বাংলার গরিব মানুষদের কিছু অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার প্রতিই বেশি আলোকপাত করা হয়। ১৯৫৪ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা অর্থনৈতিক বৈষম্যের যে পাহাড় গড়ে তুলেছিল তা সেই তুলনায় ১৯৫৪-এর নির্বাচনে উঠে আসেনি। কিন্তু ষাটের দশকের শুরু থেকে অর্থনৈতিক বঞ্চনার বিষয়টি সামনে চলে আসতে থাকে। ক্রমে অর্থনৈতিক বিষয়টি রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে ওঠে। এরই ধারাবাহিকতায় পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক সুবিধাদির দাবি বা পাকিস্তানের দুই অংশের অর্থনৈতিক বৈষম্য কমানোর দাবি বা পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য স্বতন্ত্র অর্থব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার দাবি প্রধান রাজনৈতিক দাবি হয়ে উঠতে থাকে। এভাবেই রাজনীতিতে অর্থনৈতিক বৈষম্যের উপলব্ধিকে কেন্দ্র করে এক ধরনের জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটে মূলত ষাটের দশক থেকে। এসময়েই ক্রমাগত ছাত্র,

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ এবং এক পর্যায়ে সচেতন-অর্ধসচেতন সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে আলোচিত হতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্ব বাংলার মধ্যেকার অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি। '১৯৬০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে পূর্ব-পশ্চিমের অর্থনৈতিক বৈষম্য রাজনৈতিক অঙ্গনে খুবই জীবন্ত বিষয়ে পরিণত হয়।' (নুরুল ২০০৭ : ৬১) ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন তোলে। তারা উপলব্ধি করে যে– দেশের সশস্ত্র বাহিনী সংগঠনে পূর্ব পাকিস্তান বেশি অবদান রাখে। অথচ যুদ্ধের সময় এই অঞ্চলকে ভারতের অনুকম্পায় ছেড়ে দেয়া হয়। সম্ভাব্য ভারতীয় আক্রমণের মুখে পূর্ব বাংলা ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। এই যুদ্ধের ফলে, বাঙালিরা এ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন হয়ে ওঠেন যে, ৯৫ শতাংশ জাতীয় বাজেট পশ্চিমাঞ্চলের অনুকূলে বরাদ্দ করে দেশের প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত চাকুরী, শিল্প, কারখানা ইত্যাদির অর্থনৈতিক সুবিধা কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। (হারুন ২০১৬ : ২৭, মওদুদ ২০১৫ : ৬৫)

১৯৬৫ সালের শেষ দিকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত-সমালোচিত হয়েছিল। পরিস্থিতি এমন ছিল যে–

> এ পর্যায়ে অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রশ্নটি ঘরে ঘরে আলোচিত হতে থাকে। প্রত্যেকটি বাঙালী মধ্যবিত্তের নাস্তার টেবিলে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি 'অবিচার' ছিল আলোচনা ও ক্ষোভের প্রধান বিষয়বস্তু। প্রাদেশিক ক্যাডারভূক্ত (ইপিসিএস) বাঙালী অফিসার, কেরানী, শিক্ষক, আইনজীবী, প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী সকলেই ছিলেন এই আলোচনার অংশীদার। (মওদুদ ২০১৫ : ৬৫-৬৬)

এর ঠিক পরপরই স্বায়ত্তশাসনের দাবি সংবলিত ছয় দফা উত্থাপিত হলেই দেখা গেল, তড়িৎ গতিতে ব্যাপকভাবে পূর্ব বাংলার জনগণ এই কর্মসূচি সমর্থন করে। (মোহাম্মদ ফরহাদ ১৯৮৯ : ৬, আবুল কাসেম ২০১২ : ৫৭) শেখ মুজিবের ছয় দফা দাবিকে তারা নিজেদের দাবি মনে করেছে। কারণ ছয় দফা দাবির তিনটি দাবিই (তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দফা) ছিল প্রত্যক্ষভাবে পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। এজন্যই ছয় দফার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ঐতিহাসিক ছয়দফার উত্থাপক শেখ মুজিবুর রহমান একে বলেছিলেন 'আমাদের বাঁচার অধিকার।' ছয় দফাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় ব্যাপক আন্দোলন হলে সরকার নির্যাতন আর গ্রেফতারের মাধমে সেই জাগরণকে সাময়িকভাবে থামিয়ে দেয়। এছাড়া ১৯৬৮ সালে আইয়ুব খানের 'উন্নয়ন দশক' পালন পশ্চিম পাকিস্তানের ২২ পরিবারের উদ্ভব আলোচনায় উঠে আসে। এটি পূর্ব বাংলায় আলোচনার ঝড় তোলে। পূর্ব বাংলায় এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আইউবের অর্থনৈতিক নীতিমালা শুধু পাকিস্তানের দুই অংশের বিদ্যমান ব্যবধান আরো প্রসারিতই করেনি, তা গরিব ও ধনির মধ্যেও সৃষ্টি করেছে বিশাল দূরত্ব। পরবর্তীতে আবার ১৯৬৯-এ গণ অভ্যুত্থানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের বোধটি সবার মধ্যে ক্রিয়শীল ছিল। একারণে দেখা যায়, গণ অভ্যুত্থানের সময় ছাত্র সংগ্রাম কমিটির দেয়া ১১ দফা কর্মসূচির একটা বিরাট অংশ জুড়ে ছিল অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া। ছাত্রদের এই এগার দফা কর্মসূচি ছিল মূলত 'জনগণের অন্তর্নিহিত ক্ষোভের একটি প্রতীকী দলিল' এবং গত দুই দশকে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। অবশেষে ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ সরকার পরিবর্তিতও হয় ব্যাপক গণজাগরণের কারণে। আবার অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনাতেই ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামি লিগকে পূর্ব বাংলার জনগণ এককভাবে ভোট দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আদতে অর্থনৈতিক বৈষম্য-চেতনাই বাংলার মানুষকে এসব জাতীয়তাবাদী গণজাগরণে একত্র করেছে। আর মুক্তিযুদ্ধের অন্য অনেক কারণের মূলে যে অর্থনৈতিক মুক্তির চেতনা পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে জাগ্রত ছিল এতে কোনো সন্দেহই নেই। আদতে ষাটের দশকের জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে অর্থনীতি মূল ভূমিকা পালন করেছে বললে অত্যুক্তি হয় না।

ষাটের দশকের অর্থনৈতিক বৈষম্যের কিছু চিত্র

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে ষাটের দশকের পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যেকার অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল মোটামুটি বাধাহীন এবং ক্রমবর্ধমান। এই বৈষম্যের ফলে পূর্ব বাংলায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন বরাবরই বাধাগ্রস্ত হয়েছে। যদিও আইয়ুব খান মনে করতেন 'পূর্ব পাকিস্তানের অনুন্নয়ন সমস্যার মূলে ছিল ঐতিহাসিক বিভিন্ন কারণ, বৈরী প্রাকৃতিক পরিবেশ, জাতিগতভাবে অক্ষমতা ও অদক্ষতা।' (নুরুল ২০০৭ : ২৬) তবু অবৈধ ক্ষমতা দখলের বিষয়কে আড়াল করার জন্যই হোক, আর পূর্ব বাংলার অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে এতদ্‌বিষয়ক সচেতনতা লক্ষ করেই হোক, ষাটের দশকের শুরুতে অর্থাৎ পাকিস্তানের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রাক্কালে তিনি পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যেকার অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্য ঘোষণা দেন। '১৯৬১ সালের অক্টোবরে ঢাকার এক জনসভায় জেনারেল আইয়ুব এ-সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ের সঙ্গে দুই অঞ্চলের বৈষম্য কমানোর পথ ও উপায় পরীক্ষা করার জন্য একটি অর্থ কমিশন গঠনের ব্যাপারে তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা দেন।' (নুরুল ২০০৭ : ৪১) পররবর্তীতে আইয়ুব খান একটি কমিশন গঠনও করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে বৈঠকও করেন। কিন্তু তাঁর আমলের গৃহীত অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৈষম্য আগের তুলনায় কমলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বেড়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে নানা ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার জন্য অথনৈতিক বরাদ্দ বেড়েছে। কিন্তু তা ব্যয় না হওয়ায় কোনো কাজে আসেনি। অর্থাৎ বরাদ্দগুলো এমন খাতে এবং এমনভাবে হয়েছে যে, তা খরচ করে পূর্ব বাংলার উন্নয়নে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ ছিল না। এও পশ্চিম পাকিস্তানের এক চাতুরি। যেমন, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এমন কি পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে বরাদ্দ বেশি দেওয়া হয়। ঐ পরিকল্পনার মোট চার হাজার কোটি টাকার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে বরাদ্দ দেওয়া হয় দুই হাজার একশ কোটি টাকা। কিন্তু মেয়াদান্তে দেখা গেল পূর্ব বাংলায় বরাদ্দকৃত অর্থের এক হাজার একশ কোটি টাকাই খরচ হয়নি। এই বৈষম্য দিন দিন পূর্ব বাংলার অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, সচেতন মহল, বুদ্ধিজীবী মহলে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ফলে এই ফাঁকি, চাতুরি ও বঞ্চনার বোধ থেকে অনেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ও পরিকল্পনাবিদদের উদ্দেশে প্রশ্ন তুলেছেন–

> অর্ধেক টাকাও খরচ হয় না, এটা কোন্ ধরনের পরিকল্পনা? এমন পরিকল্পনা কারা করেন? কেন করেন? কিসের বুনিয়াদ করেন? পরিকল্পনা ত শুধু কল্পনা-বিলাসিতা নয়। দেখিবার জন্য ছবি আঁকাও নয়, এটা বাস্তবায়িত করিবার কার্যক্রম মাত্র। অথচ তিন-তিনটা পাঁচসালা পরিকল্পনা আসিল, গেল। তিনটারই একই অবস্থা। ... অথচ পরের পরিকল্পনায় আরও বেশি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এইভাবে প্রতি বছরই ডিসপ্যারিটি বাড়িতেছে। তবুও বলা হইতেছে, আগামী পরিকল্পনায় ওটা কমিয়া যাইবে। কেন কি উদ্দেশ্যে এই তামশা করা হইতেছে? ... এর উত্তর দেশবাসী জানিতে চায়। (আবুল মনসুর ১৯৯৯ : ১২৮-১২৯)

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া অর্থনীতির নানা দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য। ১৯৬০-৬১ ও ১৯৬৯-৭০-এ পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু সরকারি উন্নয়নমূলক ব্যয় ছিল ২.২ থেকে ২.৬ গুণ বেশি। ১৯৬৪-৬৫ সালে মোট উন্নয়নমূলক সরকারি খরচে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ছিল ৩১ শতাংশ। বেসরকারি বিনিয়োগ খাতেও নিয়ন্ত্রক ছিল পশ্চিম পাকিস্তান তথা কেন্দ্রীয় সরকার। শিল্প বিনিয়োগের লাইসেন্স ও বৈদেশিক মুদ্রার বণ্টনের মাধ্যমে বেসরকারি বিয়োগে ১৯৬০-এর দশকের শুরুতে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ছিল মাত্র ১৩ শতাংশ এবং ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝিতে তা গিয়ে ২০ শতাংশে দাঁড়ায়। ১৯৬০-এর দশকের শেষে এই বিনিয়োগের সর্বোচ্চ মাত্রা দাঁড়ায় ২৫ শতাংশে। সরকারি ও বেসরকারি কোনো খাতেই পূর্ব পাকিস্তান ৫০ ও ৬০-এর দশকের কোনো সময়েই ৩৬ শতাংশের বেশি বিনিয়োগ পায়নি। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে ১৯৫৯-৬০-এ ৩২ শতাংশ আর ১৯৬৯-৭০-এ ৬১ শতাংশ বেশি ছিল। শুধু তাই নয় সম্পদের অসম বণ্টন ও ব্যবহারের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদও স্থানান্তরিত হয়েছে ব্যাপকভাবে। ১৯৬১-৬২ থেকে ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত পূর্বের মোট উৎপাদনের ২.৯ শতাংশ সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয়। (নুরুল ২০০৭ : ৬-৭) 'শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্য মাথাপিছু ৭১ টাকা ৪ আনা ১৫ পাই। আর পূর্ব বাংলার জন্যে মাথাপিছু মাত্র ৫ টাকা ১২ আনা ৫ পাই। সমাজ উন্নয়ন ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্য মাথাপিছু ৫ টাকা ২ আনা ৭ পাই। আর পূর্ববঙ্গবাসীদের জন্য মাথাপিছু মাত্র ৯ আনা ৬ পাই। কী নিদারুণ বৈষম্য। কী ভয়াবহ শোষণ। বাঙালি দেখলো। তার হাতে একটি কলকারখানাও নেই। সব অবাঙালি ধনকুবেরদের হাতে। বাঙালি দেখলো। ... তাদের হাতে একটিও ব্যাংক নেই। একটি বীমা কোম্পানিও নেই। সব অবাঙালিদের হাতে। ... পূর্ব বাংলার নবজাগ্রত মানুষ তাই সংগঠিত বিরোধী দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে স্বায়ত্তশাসনের আওয়াজ তুললো। আওয়াজ তুললো স্বাধিকারের। (জহির ২০১৫ : ৫৮-৫৯) এভাবে অর্থনীতির প্রতিটি স্তরে বিরাজমান বৈষম্য ক্রমাগত পূর্ব বাংলার মানুষের গোচরীভূত হয় এবং ষাটের দশকে এসে বিচিত্র আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রকাশ ঘটে।

দুই অর্থনীতির ধারণা

পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য দুটি ভিন্ন অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তার কথা পূর্ব বাংলার অর্থনীতিবিদগণ বেশ আগে থেকেই বলে আসছিলেন। আগে থেকে ব্যক্তিগতভাবে ও বিভিন্ন ফোরামে দুই অর্থনীতির ধারণা আলোচিত হলেও ১৯৫৬ সালের শেষ দিকে এটি রাষ্ট্রীয়ভাবে আলোচনায় আসে। ১৯৫৬ সালের আগস্টে পাকিস্তানের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নিয়ে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশন পূর্ব বাংলার কিছু বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদকে আলোচনায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানায়। আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন ড. এম. এন হুদা, ড. মাযহারুল হক, অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, এম. এ রাজ্জাক, এ. এফ, এ হুসাইন ও অধ্যাপক আবদুল্লাহ ফারুক। উক্ত আলোচনায় তাঁদের মতামত সংবলিত একটি প্রতিবেদন তাঁরা তৈরি করেন। আলোচনার মতামতগুলো নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। 'রিপোর্টটি পাকিস্তানের পরিকল্পনার প্রস্তুতির জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

দ্বৈত অর্থনীতির ধারণাকে বেশ জোরের সঙ্গে উপস্থাপন করে।' (নুরুল ২০০৭ : ২১) 'এই প্রতিবেদনে আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে কিছু আইনগত ও কাঠামোগত সংস্কারের সুপারিশের পাশাপাশি দেশের দুই অংশের জন্য দুই অর্থনীতির প্রস্তাব তুলে ধরা হয়।' (মোরশেদ ২০১৪ : ১৩২) দুই অর্থনীতি মতবাদের ভিত্তি সম্পর্কে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক অর্থনীতিবিদ বলেন–

> দ্বৈত অর্থনীতি মতবাদের প্রাথমিক ভিত্তি ছিল, হাজার মাইলেরও বেশি দূরত্বের কারণে দেশের দুই অংশ, পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে শ্রমিক যাতায়াতের স্বল্পতা এবং বাণিজ্য-পণ্য পরিবহনের দীর্ঘ সময় ও উচ্চমূল্য। এই কারণে একই মুদ্রাব্যবস্থা সত্ত্বেও পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের রূপটি ছিল বৈদেশিক বাণিজ্যের। অতএব পশ্চিমে ক্রমবর্ধমান ও উচ্চহারে বিনিয়োগে যে কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল তাতে পূর্বের শ্রমিকের অংশগ্রহণ অসম্ভব ছিল। (নুরুল ২০০৭ : ২২)

কিন্তু বিষয়টি আইয়ুব খানের গোচরীভূত করা হয় ১৯৬১ সালে, যখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অর্থনীতিবিদের সঙ্গে পাকিস্তানের অর্থনীতি নিয়ে আলোচনায় বসেন। এই আলোচনার মূলকথা সংবলিত একটি স্মারকলিপি তৈরি করা হয়। স্মারকলিপিটিতে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৈষম্য দূর করার জন্য পূর্ব অঞ্চলের দ্রুত উন্নয়নের পরামর্শ দেয়া হয়। এছাড়া স্মারকলিপিতে এক রাজনীতি ও দ্বৈত অর্থনীতির উল্লেখ করা হয়। অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আইয়ুব খান 'প্রথমবারের মতো আঞ্চলিক অসমতার সমস্যাটিকে স্বীকৃতি দেন এবং আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকারি সম্পদ বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনা ও সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি জাতীয় অর্থ কমিশন গঠন করেন।' (রেহমান ২০০৭ : ১৮) এটি ছিল আন্তঃআঞ্চলিক বৈষম্যের প্রশ্নে আলোচনার জন্য প্রথম সরকারি পদক্ষেপ, যার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদ ও আমলাবৃন্দ। আইয়ুব খানের নির্দেশে গঠিত জাতীয় অর্থ কমিশন পৃথকভাবে তিনটি রিপোর্ট পেশ করে। একটি পূর্ব বাংলার অর্থনীতিবিদদের তরফ থেকে, অন্য দুটি পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদ ও কমিশনের চেয়ারম্যনের পক্ষ থেকে। সরকারি পর্যায়ে দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়ে যখন চলছিল আলোচনা-সমালোচনা, তখন বাইরেও বিভিন্ন সভা-সেমিনার ও অর্থনৈতিক সমিতির আলোচনা অনুষ্ঠানে বৈষম্যের বিরুদ্ধে ও দুই অঞ্চলের জন্য দুই ভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে ব্যাপক আলোচনা চলতে থাকে। বাইরে ও ভেতরে এই প্রবল চাপের মুখে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার আন্তঃআঞ্চলিক বৈষম্যের বিষয়টিকে স্বীকৃতি দিতে এবং সম্ভব কম সময়ের মধ্যে তা নিরসনের লক্ষ্যে সরকারি সম্পদ বণ্টনে সুবিচারের অঙ্গীকার করতে বাধ্য হয়। তার প্রমাণ 'আইয়ুব সরকার ১৯৬২ সালের সংবিধানে আঞ্চলিক মাথাপিছু আয়বৈষম্য হ্রাসের স্পষ্ট উদ্দেশ্যে সরকারি সম্পদ বণ্টনের অঙ্গীকারটি অন্তর্ভুক্ত করতে রাজি হয়।' (রেহমান ২০০৭ : ১৯, মোরশেদ ২০১৪ : ১৩৮ এবং Rounaq 2015 : ৬৮-৬৯)

দুই অর্থনীতির ধারণা ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

দুই অর্থনীতির ধারণা ক্রমে যতই প্রকাশ্য হয়ে উঠছিল, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও সম্পদ বণ্টনের ভিত্তি হিসেবে অখণ্ড জাতীয় অর্থনীতির ধীকল্প ততই পূর্ব বাংলায় প্রবল প্রশ্নের

Dhaka University Institutional Repository

মুখে পড়তে শুরু করে। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ লক্ষ করা যায় পার্লামেন্টে। ‘১৯৬০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে পার্লামেন্টের এমন কোনো অধিবেশনই চলেনি যেখানে বৈষম্য বিষয়টি প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল না। ১৯৬২ সালে সামরিক আইন প্রত্যাহারের পর ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতারা বাঙালি অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বৈষম্যকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করে।’ (রেহমান ২০০৭ : ২০) অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে জেগে ওঠার রাজনৈতিক বাস্তবতা খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে মূলত পাকিস্তানের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬০-১৯৬৫) প্রকাশিত হওয়ার পরপরই। এই পরিকল্পনাটি মূলত বিবেচিত হয়েছিল ‘মার্শাল ল’ পরিকল্পনা’ হিসেবে। এই পরিকল্পনায় দেখা গেল, পূর্ববর্তী দশকে সংঘটিত পূর্ব বাংলার বঞ্চনাকে সংশোধন করা হয়নি। বরং এই বঞ্চনা স্থায়ী করার ব্যবস্থা রাখা হয়। অর্থনীতিবিদদের দুই অর্থনীতির ধারণার ওপর এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আগুনে ঘি ঢালার মতো কাজ করে। ফলে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামকারী থেকে শুরু করে জনগণের সচেতন অংশের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় প্রধানত অর্থনৈতিক বৈষম্যের দিকে। এই অর্থনৈতিক বৈষম্যকে কেন্দ্র করেই পূর্ব বাংলার রাজনীতির মাঠ গরম হয়ে ওঠে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, উন্নয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্যের অবসান ঘটানো আর পাকিস্তানের প্রদেশগুলোর হাতে স্বায়ত্তশাসনের আওতায় ক্ষমতা প্রত্যর্পণের দাবি দাওয়ায়। এটিই তখন জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রধান সুরে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন রাজনীতিতে ক্রিয়াশীল বা ছাত্র-রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা কিছু অর্থনীতিবিদ–

> কিছু কিছু অর্থনীতিবিদ এ সময় বাঙালিদের মধ্যে জাতীয় অধিকার ও দাবিদাওয়াভিত্তিক যে আন্দোলন গড়ে উঠছিল তার মুখ্য প্রচারক হয়ে পড়েন। ... এ-সব অর্থনীতিবিদদের (sic) কারো কারো দ্বারা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত ছাত্র-আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান জঙ্গিপনা আঞ্চলিক বৈষম্যের প্রশ্নকে রাজনৈতিক শক্তি প্রদান করে। তা না হলে প্রশ্নটি সেমিনার কক্ষগুলোতে পণ্ডিতী বিতর্কের মধ্যে আবদ্ধ থেকে যেত। (রেহমান ২০০৭ : ১৮)

পাকিস্তানের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬৫-১৯৭০) পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামে এবং চিন্তা বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কারণ এতে পরিকল্পনাকে বৈষম্য-হ্রাসকল্পে কাজে লাগানোর সাংবিধানিক অঙ্গীকার ছিল, কিন্তু তার বাস্তবায়ন ঘটেনি। বরং বৈষম্য আরো বেড়ে গিয়েছে। ‘আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসে তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতা আঞ্চলিক বৈষম্যের প্রশ্নকে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠার কেন্দ্রবিন্দু করে তোলে। আন্দোলনের লক্ষ্য সরে যায়, বৈষম্য দূরীকরণের থেকে স্বায়ত্তশাসনের দিকে।’ (রেহমান ২০০৭ : ২০, আতাউর ২০০১ : ১৩৭) এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ ১৯৬৬ সালের ছয় দফা। প্রকৃতপক্ষে শুধু ছয় দফা নয়, ‘ন্যাপের ১৪-দফা এবং সংগ্রামী ছাত্র সমাজের ১১-দফা দাবিনামার স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত অনুচ্ছেদগুলো প্রণয়নের ক্ষেত্রে বলা বাহুল্য এই দুই-অর্থনীতির ধারণার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব পড়েছে।’ (মোরশেদ ২০১৪ : ১৩৮)

এভাবে ষাটের দশকের প্রথমার্ধের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম ও চেতনা অর্থনৈতিক বৈষম্যের বোধ, দুই অর্থনীতির ধারণা ইত্যাদি অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট বিষয় দ্বারা পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত হয়েছে।

খ. রাজনৈতিক ঘটনাবলি ও জাতীয়তাবাদী চিন্তা

Dhaka University Institutional Repository

ষাটের দশক পূর্ব বাংলার রাজনীতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে ঘটনাবহুল ও উত্তাল সময়। এ সময়ে সংঘটিত নানা রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের অভিঘাতে পূর্ব বাংলায় জাতীয়তাবাদী চেতনা ক্রমে উত্তুঙ্গ রূপ লাভ করে। তবে ষাটের দশকের প্রথমার্ধের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং এর গতিপ্রকৃতি, ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের থেকে নানা কারণে বেশ খানিকটা আলাদা। ষাটের প্রথমার্ধে সামরিক শাসন যতটা কঠোর ও শক্ত ছিল এবং রাজনীতি যতটা অবরুদ্ধ ছিল, ষাটের দ্বিতীয় ভাগে ঠিক তেমন ছিল না। এসময় সামরিক শাসনের বন্ধন কিছুটা শিথিল, আর রাজনীতি বেশ শক্তি-সামর্থ্য অর্জন করে ক্রমে তীব্র রূপ ধারণ করে। দ্বিতীয়ার্ধে সামরিক শাসনের বন্ধন শৈথিল্যের পেছনে অবশ্য রাজনীতির সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধিই বড় কারণ। নিচে ষাটের রাজনৈতিক ঘটনাবলি এবং এর ভেতরে ক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদী চেতনার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হলো।

সামরিক শাসন, রাজনৈতিক অবরুদ্ধতা ও ঐক্য-প্রচেষ্টা

১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি ও ক্ষমতা দখল করেই প্রথম যে কাজটি করেন, তা হলো সর্ব প্রকার রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ। কারণ এ ধরনের সামরিক শাসন জারিই হয় দেশ ও রাজনীতির দুরবস্থার ব্যাখ্যা দিয়ে। ক্ষমতা দখল করে শুধু রাজনীতি নিষিদ্ধ করেই ক্ষান্ত হননি আইয়ুব খান, দেশকে তিনি বিরাজনীতিকীকরণের দিকে নিয়ে যান। এজন্য তিনি প্রধানত দুটি পথ অবলম্বন করেছেন। প্রথমত, পূর্ব বাংলার গুরুত্বপূর্ণ নেতাকর্মীদের নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করেছেন। সামরিক শাসন জারির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান, আবুল মনসুর আহমদ, মানিক মিয়াসহ আওয়ামী লীগের অসংখ্য নেতাকর্মী গ্রেফতার হন। যারা গ্রেফতার হননি, তাদের প্রহর কেটেছে নিখাদ গ্রেফতার আতঙ্কে। শুধু রাজনীতিক নয়, সর্বত্র বিরাজমান ছিল এক অবরুদ্ধ পরিস্থিতি–

> দেশে জঙ্গী আইন ঘোষণা করেছে– মার্শাল ল রেগুলেশন। রেগুলেশনের নির্দেশে সব কিছু উলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। হুকুম অমান্য করলে মার্শাল ল' রেগুলেশনের অপরাধ ও বিচার। রোজই দু'চার পাঁচটা রেগুলেশন জারী হচ্ছে। এটা করলে তিন সাল ওটা না করলে পাঁচ সাল, দশ সাল। শুধু সালই নয়, বেত্রাঘাতও সাথে সাথে। চরম দণ্ডও দেওয়ার অধিকার আছে রেগুলেশনের– মৃত্যুদণ্ড। (আতাউর ২০০১ : ১৯)

সামরিক শাসন শুধু উদার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রবাহ বন্ধ করেনি, সাধারণ জনজীবনের অন্তরাত্মায়ও এ-শাসন ত্রস্ত বাস্তবতা তৈরি করেছিল।

সামরিক শাসন জারি করেই ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ, সকল মৌলিক অধিকার, সভা-সমিতি-মিছিল স্থগিত ও বন্ধ করে দেয়া হয়। সংবাদপত্রের ওপর আরোপ করা হয় কঠোর সেন্সরশিপ। রাজনৈতিক নেতাদের কারারুদ্ধ করা হয় গণ-হারে। ব্যাপক অংশ রাজনীতিবিদদের বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ করানো হয়। কারো কাছ থেকে কারারুদ্ধ করার আগেই রাজনীতি না করার লিখিত হলফ নেয়া হয়, কাউকে কাউকে গ্রেফতারের পর হলফ নিয়ে কারামুক্ত করা হয়। কারারুদ্ধ করে ও এবডো (Elective Bodies Disqualification Ordinence 1959) আইনের মাধ্যমে প্রায় ৭ হাজার নেতাকর্মীকে রাজনীতি থেকে বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ করানো হয়। শুধু রাজনীতিবিদ নয় ১৯৫৯ সালের জুলাই মাস নাগাদ ৮১৩ জন সরকারি কর্মচারীকে বরখাস্ত ও ১৬৬২ জনকে নানা ধরনের শাস্তি দেয়া হয়। দেশকে রাজনীতিশূন্য ও ভিন্নমতশূন্য করার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬২ সালের ৩০শে জানুয়ারি। এদিন আওয়ামী লীগের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দিকে বিনা বিচারে জেলে আটক করা হয়। তিনি এমন একটি সময়ে গ্রেফতার হন, যখন তাঁর নেতৃত্বে নতুন করে পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি চলছিল। কিন্তু তাঁর গ্রেফতারে রাজনৈতিক অঙ্গনে নেমে আসে চরম হতাশা।[৩]

১৯৬২ সাল পর্যন্ত এভাবে অবরুদ্ধ ছিল পূর্ব বাংলার মূলধারার রাজনীতি। এই অবরুদ্ধতা ও আন্দোলনহীনতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আবুল মনসুর আহমদ জানাচ্ছেন যে, 'মার্শাল ল'র পৌনে চার বছর পশ্চিম পাকিস্তানে মার্শাল ল-বিরোধী কোনও আন্দোলন হইয়াছে কি না জানি না। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে হয় নাই।' (আবুল মনসুর ২০০১ : ৩৪৮) অন্য অনেক গবেষকও মনে করেন, "আইয়ুবী-দশকে' প্রগতিশীল রাজনৈতিকস্রোত আদর্শ বাস্তবায়ন ও সংগ্রামের প্রশ্নে আশানুরূপ সক্রিয় ছিল না।" (ভীষ্মদেব ২০০৪ : ১৮)

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় যে-জাতীয়তাবাদী জাগরণ ঘটেছিল তার ফসল ঘরে তুলতে পারেননি পূর্ব বাংলার রাজনীতিকগণ। কারণ ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর অন্তর্কলহ, ক্ষমতা ভাগাভাগির দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা, রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা, গণ-আকাঙ্ক্ষাকে যথাযথ মর্যাদা না দেয়া ইত্যাদি। এর ফল হিসেবে দেখা দেয় ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন। শুধু তাই নয় একই সঙ্গে পূর্ব বাংলার জাগ্রত জাতীয়তাবাদী চেতনাও সাময়িকভাবে চাপা পড়ে যায়।

বিপরীত দিক থেকে এই স্বৈরশাসন পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে এক নতুন বোধের সঞ্চার করে। আইয়ুবি সামরিক শাসন পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্বার্থপরতা, দ্বন্দ্ব, বৈপরীত্য ঘোচাতে কিছুটা হলেও সহায়তা করেছে। এরূপ ঐক্যের পরিস্থিতির অন্তত দুটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। একটি পরিষদ ভবনে আক্রান্ত স্পিকার শাহেদ আলি পাটোয়ারীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার বিবদমান রাজনৈতিক নেতৃত্বের মামলা তুলে নিয়ে এক হয়ে যাওয়া। অন্যটি বছর তিনেক পরে ১৯৬২ সালে সোহরাওয়ার্দির গ্রেফতার। এদুটি সংকটেই সামরিক শাসনের জাঁতাকলে পিষ্ট পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিবাদ ভুলে এক হওয়ার তাগিদ অনুভব করেছে। শাহেদ আলির মৃত্যুর পর পূর্ব বাংলার এক গ্রুপের নেতারা বিবদমান আরেক গ্রুপের বিরুদ্ধে মামলা করে। সামরিক শাসক চেয়েছিল মামলা চলুক এবং এর মাধ্যমে যাদের বিরুদ্ধে মামলা দেয়া হয়েছে তাদের দমন করা যাবে। মামলা না তুলে নেবার জন্য সরকারের পক্ষ থেকেও নানা প্রভাব ও চাপ তৈরি করা হয়।[৪]

নিজেদের মধ্যে মোকদ্দমা করে হয়রান না হওয়া বিষয়ে রাজনীতিবিদদের মধ্যে ঐক্য হলেও, তাদের এই ঐক্য সামরিক শাসনের চাপে পূর্ব বাংলার জনগণকে সে যাত্রায় সম্পৃক্ত করতে পারেনি। জনমনের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে জাগাতে না পারলেও রাজনীতিবিদদের মধ্যে এক ধরনের জাতীয়তাবাদী ঐক্যের জন্ম দিয়েছিল ঘটনাটি। কিন্তু তাও সামরিক শাসনের তীব্রতায় চাপা পড়ে যায়।

স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার রাজনীতিবিদরা আরেকবার একত্র হওয়ার প্রণোদনা প্রায় ১৯৬২ সালের জানুয়ারিতে সোহরাওয়ার্দির প্রযোজনায়। তিনি আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে পূর্ব বাংলার নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বলেন–

Dhaka University Institutional Repository

> দেশে রাজনীতি নেই– রাজনীতিক দলও নেই। এ অবস্থায় সকলে একসাথে মিলেমিশে কাজ করা ছাড়া উপায় নেই। দলাদলি কোন্দল বিগত জীবনের হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে যদি আমরা একত্রে একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারি তা'লে এই শাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে আমরা পথের সন্ধান পাব। যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে কোন ব্যক্তি গোষ্ঠী বা দল একককভাবে কিছুই করতে পারবে না। (আতাউর ২০০১ : ১২৩)

কিন্তু সোহরাওয়ার্দির এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয় ১৯৬২ সালের ৩০শে জানুয়ারিতেই তাঁর গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে। তবে এসময়, পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে এই উপলব্ধি প্রায়ই ধ্বনিত হতে শোনা যায় যে, তাদের মধ্যে দলগত কোনো পার্থক্য নেই; সবদল বিলুপ্ত; দলহীন দল নিয়ে তারা স্বৈরশাসনকে মোকাবিলা করতে চায়।

সোহরাওয়ার্দির গ্রেফতারে পূর্ব বাংলায় তাৎক্ষণিক তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। বিশেষত, ছাত্রদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দেয়। (মোরশেদ ২০১৪ : ৫৬-৫৭) ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ ছাত্র ধর্মঘটও পালিত হয়। এপ্রিলের ১৪ তারিখে ৭ জন বিশিষ্ট রাজনীতিক সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন। বিবৃতির মূল বিষয় ছিল সোহরাওয়ার্দিসহ সকল রাজনৈতিক বন্দি ও ছাত্রনেতার মুক্তি। ৭ নেতার এই বিবৃতির পর ১৯৬২ সালের ২৪শে জুন পূর্বের ৭ নেতাসহ মোট নয়জন নেতা আবার সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন। এই বিবৃতি 'নয় নেতার বিবৃতি' নামে খ্যাতি লাভ করে। এই বিবৃতির মূল বিষয় ছিল ১৯৬২ সালের ১লা মার্চ আইয়ুব খানের অনুমোদিত নতুন শাসনতন্ত্রের সমালোচনা।

এদিকে মার্চ মাসে অনুমোদিত শাসনতন্ত্রের আওতায় ২৮শে এপ্রিল জাতীয় পরিষদের এবং ৬ই মে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মৌলিক [?] গণতন্ত্রীদের ভোটে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬২ সালের ৮ই জুন জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। ২৮শে জুনে অনুষ্ঠিত পরিষদ অধিবেশনে আইয়ুব সরকারের নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপিত হয়। এছাড়া দুই তৃতীয়াংশের সমর্থনের সংকটে শাসনতন্ত্র অনুমোদন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনী করানো আইয়ুব সরকারের পক্ষে মুসকিল হয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার সপ্তাহখানেকের মধ্যে পূর্ব বাংলা থেকে নির্বাচিত ৬০ জন সদস্য তাঁদের এক যৌথ স্বাক্ষরে সরকারের কাছে একটি দাবিনামা পেশ করেন। এতে শাসনতন্ত্র সংশোধন করে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি, বিনা বিচারে আটক রোধ, রাজবন্দিদের মুক্তি, পাকিস্তানের দুই অংশের অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস, পূর্ব বাংলাকে প্রতিরক্ষার প্রশ্নে স্বাবলম্বী করে তোলা, বাজেট ও অর্থবিলের ওপর পরিষদ সদস্যদের ভোট প্রদানের ক্ষমতার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। আইয়ুব সরকারের এরকম একটা কোণঠাসা পরিস্থিতি যখন পরিষদের ভেতরে বিরাজ করছে, তখন ছাত্ররাও পরিষদের ভেতরের ব্যাপারে বাইরে পূর্ব বাংলার রাজনীতি আর নানা অধিকারের প্রশ্নে কমবেশি সোচ্চার থেকেছে।

কিন্তু এসব তৎপরতা কোনো জাতীয় চরিত্র ধারণ করতে পারেনি। এর কারণ নিহিত আছে সরকারের স্বৈরাচারী দমন-নিপীড়ন আর ১৯৬২ সালের ৩০শে জুন 'রাজনৈতিক দল আইন'-এর আওতায় সরকারের মদদপুষ্ট নতুন রাজনৈতিক দল 'কনভেনশন মুসলিম লিগ'- এর গঠনের মধ্যে।

তবু ১৯৬২ সালের ৮ই জুন মার্শাল ল' উঠে যাওয়ায় এবং সংসদের ভেতরে-বাইরে আইয়ুব সরকারের সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে নয়জন নেতার দেয়া সংবাদপত্রের বিবৃতি পূর্ব বাংলায় ব্যাপক আলোড়ন তুলেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

নূরুল আমীন, আতাউর রহমান খান, আবু হোসেন সরকার, হামিদুল হক চৌধুরী, শেখ মুজিবুর রহমান, ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া), মাহমুদ আলী, সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া) ও পীর মোহসিন উদ্দিন আহমেদ (দুদু মিয়া)-র দেয়া ১৯৬২ সালের ২৪শে জুনের (২৫শে জুন সংবাদপত্রে প্রকাশিত) বিবৃতির পক্ষে ব্যাপক জনমত তৈরি হয়েছিল পূর্ব বাংলায়। বিবৃতির শেষে বলা হয়েছিল– 'আসুন, সকলে মিলে যতশীঘ্র সম্ভব শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে সমস্ত বিতর্ক বন্ধ করে দেশকে অভীষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যাবার এক দুর্জয় সংকল্প নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করি।' (আতাউর ২০০১ : ১৬৮) নয় জন নেতার এই বিবৃতির সমর্থনে ঢাকার পল্টন ময়দানে প্রথম জনসভা হয়। এই জনসভায় ব্যাপক জনসমাগমে দারুণ প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষ করা যায়। ওই সমাবেশে লক্ষাধিক লোকের সমাগম প্রমাণ করে যে, দেশের মানুষ আইয়ুব খানের শাসনতন্ত্র গ্রহণ করেনি। রাজনীতির নতুন সম্ভাবনায় চট্টগ্রাম, বরিশাল, টাঙ্গাইল, সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কয়েকদিনের মধ্যে বিরাট বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়–

> বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ একই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে একই সুরে কথা বলেন এটা সত্যিই আশ্চর্য ঠেকেছে মানুষের কাছে। এটাই তাঁরা এতদিন চেয়েছে, কিন্তু হয়নি দেখে হতাশাগ্রস্ত হয়েছিল। আজ তাদের মনে অপূর্ব উন্মাদনা এনে দিল। ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনাময় সুখ সমৃদ্ধির রঙীন ছবি ভেসে উঠল তাদের চোখের সামনে। এতদিন পথ খুঁজে পায়নি। এখন তার সন্ধান পেয়েছে। (আতাউর ২০০১ : ১৬৯)

কিন্তু আইয়ুব খান জাতীয় পরিষদের ভেতরে ও বাইরে শাসনতন্ত্রবিরোধী জাগরণকে প্রতিহত করার জন্য ১৯৬২ সালের মে মাসে রাজনৈতিক দল গঠন অবৈধ বিবেচনা করে জারি করা অর্ডিন্যান্স বাতিল করে ছয় মাস পরেই জাতীয় পরিষদের দ্বারা 'পলিটিক্যাল পার্টিজ অ্যাক্ট' নামে আইন পাস করিয়ে নেন। এর মাধ্যমে গঠিত হলো কনভেনশন লিগ। আর অন্য পুরনো রাজনৈতিক দলগুলো নিজেরা পুনরুজ্জীবিত হবে না কি নতুন করে দল গঠন করবে, না কি দলহীনভাবে একসঙ্গে স্বৈরশাসনবিরোধী গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের রাজনীতি করবে– এসব প্রশ্নে নিজেদের মধ্যে ঘোরতর বিতর্কে লিপ্ত হয়। ইতোমধ্যে সোহরাওয়ার্দি কারা মুক্ত হয়ে নয়জন নেতার বিবৃতির ফলে সৃষ্ট গণজাগরণে মুগ্ধ হয়ে সবাইকে পরামর্শ দেন দল গঠন বা পুনরুজ্জীবিত না করে সম্মিলিতভাবে রাজনৈতিক তৎপরতা চালাতে। এজন্য তিনি ১৯৬২ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর ঘোষণা করেন জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এনডিএফ)। জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠিত হওয়ার পরপরই 'সারা দেশ জেগে উঠল। মানুষ অভূতপূর্ব উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে উঠল। রাস্তাঘাট ট্রেন-স্টীমার হাট-ঘাট বাজার-বন্দর লোকে লোকারণ্য। জনসভায় তিলধারণের স্থান থাকে না। জাগরণের হিল্লোলে দেশ কাঁপিয়ে তুলল।' (আতাউর ২০০১ : ১৮০) এনডিএফ এর অন্তর্ভুক্ত দলগুলো ছিল আওয়ামি লিগ, ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টি (ন্যাপ), জামায়াতে ইসলামি, নেজামে ইসলাম ও মুসলিম লিগের একাংশ। মূলত সোহরাওয়ার্দিকেন্দ্রিক এই জোটটির কিছু সভা সমাবেশ হলেও ক্রমে ক্রমে জোটটি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। 'নেতাদের ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব, শরিক দলগুলোর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ফারাক ও কৌশলগত মত পার্থক্য এবং জোটের নিজস্ব সাংগঠনিক শক্তির অভাবের কারণে বিবৃতি ও সাংবাদিক সম্মেলনের অতিরিক্ত এই জোটটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ... তবে সোহরাওয়ার্দী যতদিন জীবিত ছিলেন সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে বিরোধী দল ও নেতৃবৃন্দের ঐক্যমঞ্চ হিসেবে এনডিএফের অস্তিত্বের একটি প্রতীকী মূল্য অবশ্যই ছিল।' (মোরশেদ ২০১৪ : ৬৩-৬৪) মূলত এক ইউনিট বাতিলের বিষয়টি উপেক্ষিত হওয়ায়

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিম পাকিস্তানে এনডিএফ আবেদন হারিয়ে ফেলে। অন্যদিকে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে জোরদার ভূমিকার অভাবে এনডিএফ পূর্ব বাংলায় আবেদন হারিয়ে ফেলে। সোহরাওয়ার্দির মৃত্যুতে (১৯৬৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর) এনডিএফ আরো গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। সবচেয়ে বড় কথা, এনডিএফ-এর ব্যর্থতার পেছনে নানা কারণের মধ্যে একটি হলো, ১৯৬২-এর শেষ দিকে নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের আইন পাস। আবার ১৯৬৩ সালে এবডো বা প্রোডা আইন সংশোধন করে আরো কঠোরভাবে বলবৎ করা হয়। এর ফলে অধিকাংশ দলে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ দলীয় রাজনীতিতে সক্রিয় হতে পারেননি। নতুনদের সঙ্গে পুরাতনদের মতান্তর একই সময়ে বড় অনেক দলের মধ্যে বিভাজনও তৈরি করে। ফলে কোনো রাজনৈতিক ঐক্য-প্রচেষ্টাই আদতে ষাটের দশকের প্রথমার্ধে মূলধারার রাজনীতিতে সফল হয়নি। ফলে মূলধারার রাজনৈতিক তৎপরতার মধ্যে দৃশ্যমান তেমন কোনো জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম এসময়ে লক্ষ করা যায় না।

ষাটের দশকের প্রথমার্ধের দলীয় রাজনীতির অর্জন নেই বললেই চলে। রাজনৈতিক প্রত্যক্ষ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম এপর্বে খুব একটা চোখে পড়ে না। এই পর্বের স্বৈরশাসন-কর্তৃক অবরুদ্ধ রাজনীতি যতটা সমগ্র পাকিস্তানকেন্দ্রিক ততোটা পূর্ব বাংলাকেন্দ্রিক নয়। ১৯৫৪-এর নির্বাচন পর্যন্ত পূর্ব বাংলার রাজনীতি জাতীয়তাবাদের একটা শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়েছিল। এসময় বাঙালিত্বের বিষয়কে তথা পূর্ব বাংলার বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েই এই জাতীয়তাবাদী চেতনা আকরিত হয়েছিল। কিন্তু স্বৈরশাসন জারি হওয়ার পর থেকে ষাটের দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই চেতনা থমকে তো যায়-ই, এমনকি তা কিছুটা ঢাকাও পড়ে যায়। এ সময় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সমগ্র পাকিস্তানের রাজনৈতিক-গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ। তবে জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণ ষাটের দশকের প্রথমার্ধেও লক্ষ করা যায়, বরং তা ছিল একটু প্রবল, গভীর ও ঘনীভূত আকারে ছাত্র-আন্দোলন ও পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক কর্মতৎপরতার মধ্যে।

ষাটের দশকের ছাত্র-আন্দোলন ও এর জাতীয়তাবাদী রূপ

ষাটের দশকের প্রথমার্ধের রাজনীতির যা কিছু অর্জন, তার প্রায় পুরোটাই ছাত্র-আন্দোলনের অবদান। প্রত্যক্ষ ছাত্র-আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ১৯৬২ সালে হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দির গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে। ১৯৬২ সালের ৩০শে জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দি গ্রেফতার হলে ৩১শে জানুয়ারি রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর কেন্টিনে শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক (ছাত্রলীগ); মোহাম্মদ ফরহাদ, বদরুল হক, হায়দার আকবর খান রনো, আবদুর রহিম আজাদ (ছাত্র ইউনিয়ন); মওদুদ আহমদ (ছাত্রশক্তি); আবুল হাসনাত (এনএসএফ) প্রমুখের উপস্থিতিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। (মোহাম্মদ হাননান ২০০৬ : ২৩৬) ওই সভায় ১লা ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয় এবং সেদিন সফল ধর্মঘট পালিত হয়। ধর্মঘটের খবর পরদিন পত্রিকায় প্রকাশিত না হওয়ায় বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে সংবাদপত্র পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানায় এবং সেখানে ছাত্র ইউনিয়নের নেতা আবদুর রহিম আজাদ ভাষণ দেন। অনেকের মতে সেটিই ছিল সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য রাস্তায় প্রথম বক্তৃতা দানের ঘটনা। (হায়দার আকবর ২০১২ : ৩৫) এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঢাকায় ছাত্ররা মিছিল

Dhaka University Institutional Repository

বের করলে তাতে ছাত্রদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও শামিল হয়। ছাত্ররা এ সময় পূর্ব বাংলা সফররত আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিক্ষোভ ও মিছিল করে পুলিশ ও আর্মির তীব্র বাধার মুখে পড়ে। তারা বর্ধমান হাউস ঘেরাও কর্মসূচিও ঘোষণা করে। কিন্তু পুলিশ ও সেনাবাহিনীর কামান ব্যবহার, অব্যাহত গ্রেফতার ইত্যাদির কারণে ওই কর্মসূচি বাস্তবায়ন ব্যর্থ হয়।

শুধু সোহরাওয়ার্দির গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে নয়, আইয়ুব সরকারের গৃহীত শিক্ষা সম্পর্কিত নানা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার ছাত্র-রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো ও সাধারণ ছাত্ররা বরাবরই তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। ১৯৫৯ সালের ২৬শে আগস্ট পেশকৃত এবং ১৯৬২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত শরিফ কমিশনের[৫] সুপারিশের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে ছাত্র-আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। কমিশনের সুপারিশে শিক্ষার ব্যয়-বৃদ্ধি এবং এর ফলে উচ্চশিক্ষার সুযোগ কমে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। এটাকে তুলনামূলকভাবে অসচ্ছল পূর্ব বাংলার সাধারণ কৃষক পরিবারের সন্তানদের শিক্ষা লাভের জন্য হুমকি মনে করে ছাত্ররা। এছাড়া ছাত্ররাজনীতি বন্ধেরও সুপারিশ করা হয় উক্ত কমিশনের সুপারিশে। ছাত্ররা যাতে ভাষা আন্দোলনের মতো কোনো আন্দোলন না করতে পারে এবং সরকারবিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডে শামিল হতে না পারে, মোটাদাগে তাদের মধ্যে যাতে কোনো জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ না ঘটে এজন্য শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে এ ধরনের সুপারিশ করা হয়। কিন্তু ছাত্ররা তাদের শিক্ষা ও রাজনীতির অধিকারকে হরণ করার এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে তীব্রভাবে রুখে দাঁড়ায়। ছাত্ররা তাদের শিক্ষা আন্দোলনকে সব সময় শুধু শিক্ষা বিষয়ক দাবি দাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি। একারণে বিভিন্ন ছাত্রনেতা তাদের বিভিন্ন সময়ের বক্তব্যে বলেছে যে, শিক্ষার দাবিতে চলমান এই আন্দোলন এবং গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন ভিন্ন কিছু নয়। (মোহাম্মদ হাননান ২০০৬ : ২৫১) সংবাদপত্রের বিভিন্ন সময়ের বিবৃতিতে ছাত্রনেতারা যেসব কথা বলেছেন তা প্রায়শ শিক্ষা আন্দোলনের গণ্ডী অতিক্রম করে জাতীয়তাবাদী চেতনার পরিচায়ক হয়ে উঠেছে। যেমন– ১৯৬২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর শরিফ শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ বাতিলের দাবিতে হরতালের আহ্বানযুক্ত বিবৃতিতে শরিফ কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবি ছাড়াও আইয়ুব খান কর্তৃক গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হরণ, জনগণের ওপর ক্রমবর্ধমান বহুমুখী ট্যাক্স আরোপ ও রাজনৈতিক ধরপাকড়, গ্রেফতার, জেল-জরিমানা ইত্যাদির তীব্র সমালোচনা করা হয়। (আবদুল আজিজ ১৯৯৯ : ১১) ছাত্রদের বহুমুখী প্রবল আন্দোলনের মুখে আইয়ুব সরকার শরিফ কমিশনের রিপোর্ট বাতিল করতে বাধ্য হয়। ছাত্ররা শুধু শরিফ কমিশনের সুপারিশ বাতিল করেই ক্ষান্ত হননি, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইয়ুব খান-সরকারের পদস্থ ব্যক্তিদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করার সময় তীব্র বাধার সৃষ্টি করে। যেমন– ১৯৬২ সালের ২৭শে ডিসেম্বর ঢাকা কলেজে শিক্ষা সপ্তাহ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে গেলে পূর্ব বাংলার নবনিযুক্ত গভর্নর মোনায়েম খান ছাত্রদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন। ছাত্ররা তাকে কালো পতাকা প্রদর্শন করে। ছাত্র-পুলিশ ব্যাপক সংঘর্ষ হয়; ছাত্রদের বিরুদ্ধে মামলাও হয়। একই ঘটনা ঘটে মোনায়েম খান ১৯৬২ সালে ও ১৯৬৪ সালে যথাক্রমে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আচার্য হিসেবে যোগ দেয়ার সময়। দুই অনুষ্ঠানেই ছাত্রদের প্রবল বিক্ষোভ আর কালো পতাকা প্রদর্শনের কারণে সমাবর্তন অনুষ্ঠান পণ্ড হয়ে যায়। ১৯৬৪ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন পণ্ড হলে রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রনো, এ, কে বদরুল হক, গিয়াস কামাল চৌধুরী , শাহ

Dhaka University Institutional Repository

মোয়াজ্জেম হোসেন, কে, এম ওবায়দুর রহমান, সিরাজুল আলম খান প্রমুখের নামে হুলিয়া জারি হয়। (মোহাম্মদ হাননান ২০০৬ : ২৮০) এর প্রতিক্রিয়ায় অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র পূর্ব বাংলাব্যাপী। সরকার পূর্ব বাংলার সব কলেজ ও উচ্চবিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। এ ঘটনায় পূর্ব বাংলা থেকে প্রায় ১২০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। অনেকের ডিগ্রি বাতিল করা হয়। অনেককে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করা হয়। ছাত্ররা এর প্রতিবাদে ১৯৬৪ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ২২ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে।

উপর্যুক্ত ছাত্র-আন্দোলন সামাল দিতে সরকার ১৯৬৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে। এই কমিশন ছাত্রদের সমস্যা ও তাদের আন্দোলন-বিক্ষোভের ব্যাপারে কতকটা সহানুভূতিশীল হলেও,[৬] ছাত্র সংগঠনগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে কমিশনের কিছু পর্যবেক্ষণ বা মন্তব্যে ছাত্র সংগঠনগুলো বিক্ষুব্ধ হয়। এছাড়া কমিশনের শিক্ষা সংক্রান্ত কিছু সুপারিশেও– যেমন, কিন্ডারগার্টেন ও ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা চালু রাখা, সার্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে কমিশনের দ্বিমতে ছাত্র সংগঠনগুলো বিক্ষুব্ধ হয়। তাঁরা এই কমিশনের বিরুদ্ধেও আন্দোলন অব্যাহত রাখে। (মোরশেদ ২০১৪ : ৮১)

পূর্ব বাংলার ছাত্রদের এইসব শিক্ষা-আন্দোলন আপাত দৃষ্টিতে শিক্ষা-আন্দোলন হলেও, এটি ছিল অংশত জাতীয়তাবাদী চেতনার এক ধরনের প্রকাশ। কারণ শিক্ষা-আন্দোলনের কারণগুলো তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, শিক্ষা-সংস্কারের সেই সিদ্ধান্তগুলোর বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করেছে, যে সিদ্ধান্তগুলো পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। বিশেষত নিম্নবিত্ত কৃষিজীবী পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষা গ্রহণ দুষ্কর হয়ে পড়ে যেসব সিদ্ধান্তের কারণে, ছাত্ররা সেসব সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে। তারা সেই সিদ্ধান্তগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করেছে, যেগুলো পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে শ্রেণিগত বৈষম্য বাড়িয়ে দেবে। একধরনে সম্ভাব্য বা অনিবার্য ভবিষ্যৎ বঞ্চনার বোধ থেকে তারা আন্দোলন করেছে। যে-কারণে আমরা দেখি, বিভিন্ন সময়ে ছাত্রদের শিক্ষা বিষয়ক আন্দোলন-সংগ্রামে সাধারণ মানুষও সমর্থন দিয়েছে এবং কখনো কখনো আন্দোলনে শামিল হয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায়, ষাটের দশকের প্রথমার্ধের ছাত্র রাজনীতি প্রকৃতপক্ষে সামরিক আইনের বাধ্যবাধকতার কারণে মূলধারার নিষ্ক্রিয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিকল্প রাজনীতি। মূলধারার রাজনীতির অনুপস্থিতির জায়গা দখল করেছিল ছাত্রদের আন্দোলন। এদিক লক্ষ করেই বোধ করি হামুদুর রহমান কমিশন প্রতিবেদনে ছাত্রসংগঠনগুলোর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলেছিল, এদের স্বাধীন সত্তা নেই, এবং এরা মূলত তাদের পিতৃ-সংগঠনের নির্দেশেই কাজ করে থাকে । ছাত্রদের এই আন্দোলন যে মূলধারার গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনেরই প্রতিকল্প, তার প্রমাণ পাওয়া যায় শরিফ কমিশনবিরোধী ছাত্র-আন্দোলনের কারণ অনুসন্ধানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য ড. মাহমুদ হোসেনকে প্রধান করে গঠিত কমিটির প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনের এক পর্যালোচনায় মাহমুদ হোসেন মত প্রকাশ করে বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে ছাত্রদের মূল ক্ষোভ আইয়ুব খান ও তাঁর একনায়কতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে, ছাত্ররা এই ব্যবস্থার অবসান চায়। (মোরশেদ ২০১৪ : ৭৭)

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে দেখা যায়, ছাত্ররাজনীতি মূল ধারার রাজনীতির শূন্যতা পূরণ করেছে। ষাটের দশকের প্রথমার্ধে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে জাগিয়ে রেখে ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন মূলধারার রাজনীতি আবার চাঙ্গা হয়েছে, তখন তার সঙ্গে ছাত্ররাজনীতি যুক্ত হয়ে জাতীয়তাবাদী চেতনার আন্দোলন-সংগ্রামকে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছে।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ পূর্ব বাংলার তথা পাকিস্তানের রাজনীতিতে বেশ কয়েকটি নতুন মাত্রা যোগ করে। ১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর যুদ্ধ শুরু হলে পূর্ব বাংলায় এর যে প্রতিক্রিয়া হয় তা লক্ষ করার মতো। পাক-ভারত যুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে এবং ভারতের বিপক্ষে পূর্ব বাংলায় ব্যাপক উন্মাদনা সৃষ্টি হয়। 'পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী রাজনীতিকরাও এসময় দলমত নির্বিশেষে ভারতীয় হামলার নিন্দা এবং আক্রমণ মোকাবিলায় সরকারি পদক্ষেপের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য-বিবৃতি দেন।' (মোরশেদ ২০১৪ : ৯৯) শুধু পূর্ব বাংলার রাজনীতিকরাই নয়, প্রগতিবাদী-রক্ষণশীল, পাকিস্তানি চেতনাবাদী-বাঙালি চেতনাবাদী, ডানপন্থি-বামপন্থি নির্বিশেষে সব প্রায় লেখক-বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী সম্প্রদায়, ছাত্রসমাজ ভারতীয় হামলার নিন্দা ও পাকিস্তান সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে বিবৃতি দেন। 'Crush India' লেখা ব্যানার-ফেস্টুনসহ মিছিল বের করে অনেকে। পূর্ব বাংলার কবি লেখকরা পত্র-পত্রিকায় পাকিস্তানি যোদ্ধা ও জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য রচনা করেন অসংখ্য গল্প-কবিতা-গান-ছড়া-নাটিকা। আহসান হাবীব, শামসুর রাহমান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, কবীর চৌধুরী, হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দীন আল আজাদ, মুনীর চৌধুরী, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, আবু হেনা মোস্তফা কামালসহ অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক তখন প্রতিরোধ চেতনা ও স্বদেশপ্রেমমূলক প্রচুর কবিতা, প্রবন্ধ, নাটিকা ইত্যাদি রচনা করেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ছিল এমন–

> ... পূর্ব পাকিস্তানি জনগণ এক মুহূর্তও নীরব থাকতে পারেনি। এই অংশের জনগণ– আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা দলমত নির্বিশেষে শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। দেশের প্রতিটি ধুলিকণাকে দেহের শেষ রক্তবিন্দু দানে রক্ষা করার বজ্রকঠোর শপথ তারা গ্রহণ করেছিল।
>
> নৈতিক সমর্থনের মত চেষ্টাও করা হয়েছিল নানা প্রকারের। মেয়েরাও রাইফেলসহ কুচকাওয়াজ ও ফাস্ট এইডের মহড়া দিতে লাগল। (আতাউর ২০০১ : ২৬২)

পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব বাংলার এই প্রতিক্রিয়া দুটি মৌলিক প্রশ্নের উদ্রেক করে। প্রথমটি হচ্ছে, তখন পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৬৫ পর্যন্ত পাকিস্তানের অখণ্ডতা নিয়ে তেমন কোনো বড় প্রশ্ন পূর্ব বাংলায় ছিল বলে মনে হয় না। বিভিন্ন সময়ে, এমন কি অল্প কিছুকাল পরবর্তীতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযোগেরও যে বাস্তব ভিত্তি– পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করার ষড়যন্ত্র– তাও ছিল না। পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখার যে কথা বারবার পশ্চিম পাকিস্তানিদের মুখে এবং পূর্ব বাংলার পাকিস্তানবাদী লোকদের মুখে উচ্চারিত হয়েছে, তা কেবল রাজনীতির জন্যই মাত্র। নানা বঞ্চনা সত্ত্বেও মধ্য ষাটের দশক পর্যন্ত এমন কি আরো কিছুকাল পরেও পূর্ব বাংলার রাজনীতি অখণ্ড পাকিস্তানের আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই হয়েছে। এই অখণ্ড

Dhaka University Institutional Repository

চেতনার মধ্যেই পূর্ব বাংলায় জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ-প্রকাশ ঘটেছে। যার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটতে শুরু করেছে ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানের পর থেকে।

ছয় দফা আন্দোলন

পূর্ব বাংলা যখন সামরিক শাসনের চাপে আর পশ্চিম পাকিস্তানের ক্রমাগত শোষণে কোণঠাসা হয়ে পড়ছিল, এবং ক্রমে ভেতরে ভেতরে ধূমায়িত হয়ে উঠছিল, ঠিক তখন শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ছয় দফা উপস্থাপন করেন। এই ছয় দফা ঘোষণার মাধ্যমে দুটি ঘটনা ঘটে একই সঙ্গে; 'এর মাধ্যমে গোটা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নব্য ও সক্রিয় রূপ ধারণ করে এবং আন্দোলন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে চলে যায়।' (আফসান ২০০৭ : ৫০০)

১৯৬৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এক কনভেনশনে লাহোরে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি সংবলিত ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু লাহোরের ওই অধিবেশনের সাবজেক্ট কমিটি শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা দাবিকে সমর্থন করেনি। এমনকি তা নিয়ে কোনো আলোচনা করতেও সম্মত হয়নি। ফলে শেখ মুজিবুর রহমান ওই সম্মেলন বর্জন করেন। পরবর্তীতে ১১ই ফেব্রুয়ারি তিনি ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ছয় দফা দাবি জনগণের সামনে তুলে ধরেন। এরও পরে এই ছয় দফা প্রস্তাবের মূল বক্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে এ নিয়ে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয় সরকারের ভেতরে, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এবং বিশেষভাবে পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে। ছয় দফাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার ধূমায়িত জাতীয়তাবাদী চেতনা জ্বলে উঠতে শুরু করে। কারণ 'এর মধ্যে ছিল সেইসব দাবি যা জনগণ সুদীর্ঘকাল ধরে জানিয়ে আসছিল।' (কামাল ২০০৫ : ১২)

ছয় দফায় প্রতিরক্ষা আর পররাষ্ট্র কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রেখে ফেডারেল শাসন কাঠামো ও পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা চালুর কথা বলা হয়। শুধু তাই নয়, সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সার্বভৌম পার্লামেন্ট গঠন, পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য দুটি আলাদা মুদ্রাব্যবস্থা ও রিজার্ভ ব্যাংক, বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরের অধিকারসহ স্বাধীনভাবে ব্যবসা পরিচালনার অধিকার এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠনের কথাও বলা হয়। অর্থাৎ ছয় দফা মূলত ছিল স্বায়ত্তশাসনের দাবি।[৭]

ছয় দফা দাবিকে পশ্চিম পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সরকারবিরোধী অধিকাংশ দলই সমর্থন করেনি। এমনকি পূর্ব বাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও ছয় দফাকে সমর্থন না করে বরং এর পাশাপাশি কোনো কোনো রাজনৈতিক দল পৃথকভাবে দাবি-দাওয়া সংবলিত প্রচারপত্র ছড়িয়ে দেয়। যেমন, ন্যাপ-এর ১৪ দফা; যাকে আখ্যা দেয়া হয় 'জাতীয় মুক্তির কর্মসূচি'। পূর্ব বাংলার অধিকাংশ বিরোধী দলীয় রাজনীতিকরা পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন চাইলেও ছয় দফা দাবি উত্থাপিত হলে এবিষয়ে তেমন কোনো উৎসাহ দেখাননি। কেবল সরকার কিংবা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল নয়, পাকিস্তানের প্রায়

Dhaka University Institutional Repository

সবকয়টি রাজনৈতিক দল ছয়দফার তুমুল সমালোচনা করে। চারিদিকে বিতর্ক ও রাজনৈতিক যুক্তির ঝড় বয়ে যায়।[৮] (অলি ২০১২ : ২৮৪, জহিরুল ২০১২ : ৬৭, আবদুল হক ১৯৯৬ : ১১০, মওদুদ ২০১৫ : ৭৮)

ছয় দফা কর্মসূচি প্রকাশ্যে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পুরো সরকারি প্রশাসনযন্ত্র মুজিবের সুনামহানিতে তৎপর হয়ে ওঠে এবং কর্মসূচিটিকে রাষ্ট্রের শত্রুদের প্রণীত বলে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত কনভেনশন মুসলিম লিগের জনসভায় আইয়ুব খান ছয় দফা দাবিকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা' বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, ছয় দফা দাবিতে যারা তৎপর তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে 'অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করা হবে।' আদতে পরবর্তীতে হয়েছিলও তাই। শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক দলসমূহের সমর্থনের আর সরকারের বিরোধিতা তোয়াক্কা না করে দেশব্যাপী প্রচারাভিযানে নেমে পড়েন। এর মধ্যে চলতে থাকে ব্যাপক ধরপাকড়, জেল-জরিমানা। কিন্তু সারা দেশ সফরে শেখ মুজিব ছয় দফার পক্ষে অভূতপূর্ব সাড়া পান। ছয় দফার পক্ষে সমগ্র পূর্ব বাংলায় গণজাগরণ সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ইত্তেফাক পত্রিকায় এই আন্দোলনকে জনসাধারণের 'নিজেদের আন্দোলন' বলে উল্লেখ করেন তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া।

শুরুতে ছয় দফা ছিল বাঙালি শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি, উদীয়মান ব্যবসায়ী শ্রেণি, সীমিত পরিসরের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদদের স্বপ্নের প্রকাশ। অচিরেই এই দাবির সঙ্গে একাত্ম হয় পূর্ব বাংলার ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী সবাই। ছয় দফা অল্প সময়ের মধ্যে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনাবাহী রাজনৈতিক আন্দোলন হয়ে ওঠে–

> ছয়দফা দেশের জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলোকে অনুপ্রাণিত এবং সংঘবদ্ধ হতে সাহায্য করে এবং অচিরেই বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে। এই কর্মসূচী ছিল বাঙালীদের ঐতিহাসিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সুচিন্তিত বাস্তব বহিঃপ্রকাশ এবং দেশের যেকোনো রাজনৈতিক দলের যেকোনো রাজনৈতিক কর্মসূচীর চাইতে বেশী বলিষ্ঠ ও অকপট। (মওদুদ ২০১৫ : ৭৭)

ছয় দফার মধ্যে বাঙালি তার মুক্তির দিশা পেয়ে এর পক্ষে জাগ্রত হয়েছিল। দীর্ঘ আট বছরের গণতান্ত্রিক অধিকারহীনতা আর ক্রমবর্ধমান শোষণের মুহূর্তে ছয় দফা ছিল একটি লাগসই কর্মসূচি, যা জাতীয়তাবাদকে আগের তুলনায় প্রকাশ্য ও বিস্তৃত করেছে। '৬-দফা বাঙালির জাতীয় জাগরণকে এক উচ্চতম পর্যায়ে উন্নীত করে। ৬-দফাকে কেন্দ্র করে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং স্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে।' (নূহ-উল-আলম ২০১৫ : ৫৫)

কিন্তু ছয় দফাকে কেন্দ্র করে জ্বলে ওঠা জাতীয়তাবাদী চেতনা, আন্দোলন-সংগ্রামকে ব্যাপক দমন-নির্যাতন, গ্রেফতার, হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে আইয়ুবি স্বৈরশাসন দমিয়ে ফেলে। ১৯৬৬ সালের ৯ই মে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। প্রথম সারির নেতাসহ সহস্রাধিক নেতাকে একই সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়। এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে ডাকা হয় হরতাল। হরতালে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় ৪১ জন, একই দিনে গ্রেফতার করা হয় সহস্রাধিক নেতাকর্মী। সরকারের নিবর্তনমূলক পদক্ষেপে ছয় দফার পক্ষে গণঅনুভূতি ম্রিয়মান হয়ে পড়ে ও পরিস্থিতি ক্রমশ শান্ত হয়ে আসে। এই পরিস্থিতিতে সরকার নিশ্চিত হয় যে, তার

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনা আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচিকে বিনষ্ট করে দিতে সক্ষম হয়েছে এবং এখন থেকে প্রতিবন্ধকতাবিহীনভাবে পাকিস্তানের অখণ্ডতা সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। বাস্তবে হয়েছিলও তাই। অন্তত দুই বছর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামের তেমন কোনো দৃশ্যমান তৎপরতা দেখা যায় না।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

ছয় দফা আন্দোলনে সারাদেশের মানুষের অভূতপূর্ব সাড়া পাকিস্তানি শাসকচক্রকে বিচলিত করেছিল। কিন্তু হত্যা, গ্রেফতার, জেল-জরিমানা জারি রেখে সে-যাত্রায় সরকার পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী জাগরণকে দমন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু সরকার স্থায়ীভাবে পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং এর সঙ্গে যুক্ত প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের প্রধান নেতা শেখ মুজিবকে স্তব্ধ করার জন্য একটি রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দায়ের করে। এই মামলার অভিযুক্তরা ছিলেন কিছু সংখ্যক বাঙালি সরকারি অফিসার, কর্মচারী। ১৯৬৮ সালের ১লা জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে, কিছু সরকারি চাকুরিজীবী ও রাজনীতিবিদকে জাতীয় স্বার্থবিরোধী কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাদের পরিকল্পনা সরকার ভন্ডুল করে দিয়েছে। ৬ই জানুয়ারিতে আবার সরকারি প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে, একই ঘটনায় বন্দির সংখ্যা ২৮ এবং তারা ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারির সঙ্গে যোগাযোগ করে ভারতের আগরতলায় বৈঠক করেছে। ভারতের কাছ থেকে অস্ত্র-শস্ত্রের সহায়তা নিয়ে তারা পাকিস্তানের পূর্বাংশ অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করে ফেলতে চায়। ১৮ই জানুয়ারি ওই একই ঘটনার সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের যুক্ত থাকার কথাও সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়। আরও জানানো হয় যে, সব মিলিয়ে বন্দির সংখ্যা ৩৫ জন।

ঢাকা সেনানিবাসে এই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার শুরু হয় বিশেষ ট্রাইবুনালে। সরকার-পক্ষের বিবৃতি ও সাক্ষী-সাবুদদের বক্তব্যে দিন দিন কথিত ষড়যন্ত্রের রূপ ও ভয়াবহতা বাড়িয়ে তোলা হয়। কিন্তু বিপরীত দিক থেকে অভিযুক্তদের প্রতিদিনকার বিবৃতি প্রকাশিত হতে থাকে সংবাদপত্রে। এসব বিবৃতিতে তাঁরা নিজেদের নির্দোষ দাবি করতে থাকেন। এছাড়া কারাভ্যন্তরে তাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতনের কথা পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। পত্রিকায় মামলার প্রতিদিনকার বিবরণ যখন প্রকাশিত হতে থাকে, তখন সারাদেশের মানুষের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকৃষ্ট হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দিকে, দিন যত গড়াতে থাকে ততই সাধারণ মানুষ বুঝতে থাকে যে, মামলাটি বানোয়াট। ফলে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিরা ক্রমে দেশবাসীর সহানুভূতি আকর্ষণে সক্ষম হন। এই সহানুভূতি ক্রমে পাকিস্তানি শাসকচক্রবিরোধী চেতনাকে জাগাতে থাকে। যদিও পাকিস্তানি স্বৈরশাসনবিরোধী চেতনা তাৎক্ষণিক কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়নি বা কোনো গণজাগরণকে সম্ভব করে তুলতে পারেনি, তবু এই ঘটনা পূর্ব বাংলার বাঙালিদের মধ্যে একটা গভীর ক্ষত তৈরিতে সক্ষম হয়। এই ক্ষতের একই ধরনের বেদনার অনুভূতি পূর্ব বাংলার মানুষকে চেতনাগতভাবে একত্র করেছে। এই ক্রম পূঞ্জীভূত জাতীয়তাবাদী চেতনা ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মতো চূড়ান্ত জাতীয়তাবাদী জাগরণকে অনিবার্য করে তুলেছে। প্রকৃতপক্ষে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মাধ্যমে আইয়ুব খান যেসব উদ্দেশ্য হাসিল করতে চেয়েছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামকে নির্মূল করা এবং এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে প্রধানভাবে যুক্ত শেখ মুজিবকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেয়া। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। বরং বলা যায়, বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনা এককভাবে সবচেয়ে বেশি শক্তি অর্জন করেছে এই ঘটনা থেকে। শুধু তাই নয়, এই মামলাই বাঙালিকে পাকিস্তানি শোষকের হাত থেকে বাঁচবার আত্মবিশ্বাস, ঐক্যবদ্ধ ও সশস্ত্র হবার চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করেছে বলে অনেকে মনে করেন। (সাঈদ-উর ২০০১ : ৯৫, আবুল কাসেম ২০১২ : ৭৩, কাজী আরেফ ২০১৪ : ৫৫) এই মামলার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে আঘাত করে জাতীয়তাবাদের এক নতুন প্রবাহ। অনেকে মনে করেন এই মামলার অভিঘাতে পূর্ব বাংলার জনমানসে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটে তা উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানকে শুধু নয়, সত্তরের নির্বাচনের গণ জোয়ারকেও প্রভাবিত করেছে–

> ইতিহাসে স্পষ্ট যে, পূর্ব বাংলায় গণঅভ্যুত্থান ঘটেছিল বিদ্রোহের এই মামলার সূত্র ধরেই এবং শেখ মুজিবসহ অন্যদের মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহারের দাবি উত্থাপনের ভেতর দিয়েই। পূর্ব নির্ধারিত হলেও সেই অভ্যুত্থানের প্রবাহে সত্তর সালের সাধারণ নির্বাচনে বাংলদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের বিপুল বিজয় ঘটেছিল এবং আওয়ামী লীগ সেই বিজয়ের সিংহভাগ অর্জন করে। আবার শেষ পর্যন্ত সেই বিজয়কে কেন্দ্র করেই মুক্তিযুদ্ধের সূচনা। (ফয়েজ ২০০৬ : ৩৭)

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির পর থেকে পুরো পাকিস্তানে, বিশেষত পূর্ব বাংলায় সর্বদিক থেকেই প্রায় অবরুদ্ধ অবস্থা বিরাজ করছিল। পাকিস্তানের উভয় অংশেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিগন্ত সংকুচিত হতে হতে প্রায় শূন্যের কোঠায় চলে এসেছিল। আর শোষণ-বঞ্চনার অনুভূতিও নির্দিষ্ট কিছু প্রদেশ আর গোষ্ঠী ব্যতিরেকে পাকিস্তানের উভয় অংশেই কমবেশি ছিল। রাজনীতি আর স্বায়ত্তশাসনের অনুপস্থিতি পাকিস্তানের অধিকাংশ প্রদেশের মানুষের মধ্যেই বঞ্চনার বোধের জন্ম দিয়েছিল। এসব ক্ষেত্রে পুরো পাকিস্তানের পরিস্থিতিই এমন ছিল যে, সুযোগ পেলেই যেন জ্বলে উঠবে। ঠিক ঘটলও তাই। ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর অবসর প্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগর খান আইয়ুব সরকারের সমালোচনা করে এক কড়া বিবৃতি দিলেন। এই বিবৃতি ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। চারিদিকে ঝড় ওঠে আসগর খানের বিবৃতি নিয়ে। সরকারও এতে বেশ বিব্রত হয়ে পড়ে। এসময় জনমনে সরকারবিরোধী একটা ক্ষুব্ধ পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। ঠিক এই সময়ে নভেম্বর মাসে একটি সামান্য কারণে রাওয়ালপিন্ডিতে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ হয়। এতে এক ছাত্র নিহত হয় পুলিশের গুলিতে। ছাত্ররা এর প্রতিবাদে ধর্মঘট আহ্বান করে। ছাত্রদের এই প্রতিবাদের সঙ্গে একাত্ম হন রাজনৈতিক সুযোগসন্ধানী জুলফিকার আলি ভুট্টো। ছাত্রদের প্রতিবাদ আন্দোলনের সঙ্গে গণসম্পৃক্তি ঘটান ভুট্টো। সঙ্গত কারণেই এতকাল চুপ করে থাকা সরকারবিরোধী নানা অবস্থানের নেতাকর্মীরা এর সঙ্গে যুক্ত হন। সরকারবিরোধী এই বিক্ষোভ নেতাকর্মীদের নতুনভাবে উজ্জীবিত করে তোলে। সরকারবিরোধী এই আন্দোলনে ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের তরুণ ছাত্রসমাজের কাছে একচ্ছত্র নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। শুধু ছাত্র সমাজে নয়, এসময় তাঁর একটি গণভিত্তিও তৈরি হয়ে যায়। এই ঘটনার পর ভুট্টো পাকিস্তানের জেনারেলদের সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

যোগাযোগ ও সখ্য বাড়িয়ে তোলেন। বিশেষত ১৯৬৫ সালের পাক–ভারত যুদ্ধে যেসব সিনিয়র আর্মি অফিসার আইউবের আপোষমুখী মনোভাবের বিরুদ্ধে ছিলেন, ভুট্টো তাদের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে শুরু করেন। শুধু তাই নয় স্বল্পতম সময়ে এক ধরনের বাকচাতুর্য আর 'সাম্যবাদী চেতনা'-র কথা দিয়ে বুদ্ধিজীবীসুলভ মনোভাব প্রদর্শন করে ভুট্টো শহুরে এলিটদের এক বিরাট অংশের মধ্যে এক ধরনের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করেন। আগে থেকেই ওৎ পেতে থাকা ভুট্টো সাধারণ ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে ১৯৬৮ সালের নভেম্বরে পশ্চিম পাকিস্তানকে অস্থিতিশীল করে তোলেন।

পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব সরকার যখন বেকায়দায়, তখন শান্ত পূর্ব বাংলা ক্রমে অশান্ত হয়ে উঠতে থাকে। এমনিতেই পূর্ব বাংলায় দীর্ঘদিনের বঞ্চনা-ক্ষোভ-হতাশা বিরাজ করছিল রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের পর্যন্ত। অন্যদিকে প্রতিদিন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কার্যবিবরণী চলতে থাকায় পূর্ব বাংলার পরিস্থিতিও ছিল উত্তপ্ত। এমতাবস্থায় ১লা ও ২রা ডিসেম্বর ১৯৬৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এক প্রতিবাদসভা ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করেন। এতে তারা ব্যাপক গণ অসন্তোষ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। ৬ই ডিসেম্বর 'আইউব খানকে কৌশলে সমর্থন দানকারী' মাওলানা ভাসানী নির্যাতন বিরোধী দিবস পালনের আহ্বানের মধ্য দিয়ে আইয়ুব সরকার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।[৯] সরকারের সর্বাত্মক প্রতিরোধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও নির্যাতন বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে আহূত ধর্মঘট সফল হয়। এদিকে ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকেই প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নেতৃত্বে গঠন করে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি (ম্যাক)। এই কমিটির পক্ষ থেকে ১১ দফা দাবি ঘোষণা করা হয়।[১০] এই দাবিগুলো সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে, ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। কারণ এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, রাজনীতিবিদ, ইত্যাদি প্রত্যেক শ্রেণির মানুষের আকাঙ্ক্ষার কথা। এছাড়া এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল ছয় দফা কর্মসূচির দফাগুলোও। ফলে সঙ্গত কারণেই 'জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে ১১ দফা কর্মসূচী অচিরেই ঐতিহাসিক জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ... জনগণের মধ্যেকার পুঞ্জীভূত হতাশা ও বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে এই কর্মসূচী বিশেষভাবে সাহায্য করে। এই কর্মসূচী অনেকাংশে ছিল জনগণের অন্তর্নিহিত ক্ষোভের একটি প্রতীকী দলিল এবং গত দুই দশকে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।' (মওদুদ ২০১৫ : ১১২)

ছাত্র-আন্দোলনের তীব্রতা ও সম্ভাবনা দেখে ৭ই জানুয়ারি ১৯৬৯ ভাসানী ন্যাপ ও ভুট্টোর পিপলস পার্টি বাদে অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দল মিলে গঠন করে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি (ডাক)। 'ডাক' স্বায়ত্তশাসনের চেয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার ও সংসদীয় পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তনের ওপর বেশি জোর দিয়ে ৮ দফাভিত্তিক কর্মসূচি প্রণয়ন করে। কিন্তু 'ডাক'-এর এই অবস্থান পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ ও জাতীয়তাবাদী চেতনাসমৃদ্ধ প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের কাছে তেমন গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। ছাত্র-আন্দোলন ক্রমে গণ আন্দোলনে রূপ নিতে থাকলে তা সারাদেশে ক্রমে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। চট্টগ্রাম, রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন-সংগ্রাম-ধর্মঘটের কারণে অসংখ্য মানুষকে গ্রেফতার করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৯ সালের ১৭ই জানুয়ারি একই দিনে 'ডাক' ও ছাত্র সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট ও সভা হয়। পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের ওপর নির্যাতন করলে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় 'খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়। ছাত্ররা বাসে অগ্নিসংযোগ করলে বিকেলে পাকিস্তান রাইফেলস বাহিনী ছাত্রাবাসে হঠাৎ হানা দিয়ে ৩৪ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। ২০শে জানুয়ারি আবার ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান শহিদ হন। এই ঘটনা ঢাকা শহরে ছাত্রদের মধ্যে ক্রোধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ২২শে জানুয়ারিতে লেখা ডায়েরিতে ছাত্র আন্দোলনের ব্যাপকতা, তীব্রতা ও ছড়িয়ে পড়া সম্পর্কে একজন লিখছেন–

> ২০ তারিখে পুলিশের গুলী বর্ষণে ক'জন ছাত্রের মৃত্যু এরূপ আবেগের বন্যার সৃষ্টি করেছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা নিজেদের একটি শোক-মিছিল বার করতে বাধ্য হন, মোহসিন হলের প্রভোস্ট ডঃ ইন্নাস আলী ছাত্রদের শোকসভায় সভাপতিত্ব করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ছাত্রদের ওপর নির্যাতনের নিন্দা করে বিবৃতি দেন। এন.এস.এফ. নামক দ্বিধাবিভক্ত সরকার-সমর্থক ছাত্র-প্রতিষ্ঠানের দু'টি দলই হরতাল সমর্থন করেছিলো। ট্রাস্ট পেপার মর্নিং নিউজ, বিশেষ করে দৈনিক পাকিস্তান (এমন কি গভর্নর সমর্থক 'পয়গম'ও) বিস্তারিতভাবে ছাত্র ও গণবিক্ষোভের খবর এবং মিছিলের ছবি ছাপতে বাধ্য হয়। (আবদুল হক ১৯৯৬ : ১৩৩)

ছাত্ররা ২১, ২২, ২৩ জানুয়ারি ধর্মঘট এবং ২৪শে জানুয়ারি 'মহা গণ অভ্যুত্থান দিবস' পালন করার ঘোষণা দেয়। ২৪শে জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে মতিউর নামক এক স্কুল ছাত্র ও রুস্তম নামের এক তরুণ এবং পরদিন বাবুল ও আনোয়ার নিহত হন। এসব ঘটনা আন্দোলনকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তোলে এবং আন্দোলন কৃষক-শ্রমিক-জনতার মধ্যে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া আগে-পরে ঘটে যাওয়া বেশ কয়েকটি ঘটনা, যেমন– ১৫ই ফেব্রুয়ারি সামরিক কারাগারে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা, ১৮ই ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের জনপ্রিয় রিডার ড. শামসুজ্জোহাকে গুলি করে হত্যা বাঙালিদের জাতীয়তাবাদী জাগরণকে বিস্ফোরণোন্মুখ করে তোলে। এই দুটি ঘটনা এত তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল যে, এরপর বিভিন্ন মন্ত্রী, বিচারপতির বাড়িতে আগুন দেয়া হয়। সান্ধ্য আইন অমান্য করে মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। পুলিশের গুলিতে অসংখ্য মানুষ নিহত হন। দৈনিক পাকিস্তানের ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯-এর ভাষ্য মতে, শুধু ১৮ই ফেব্রুয়ারি রাতে ৩৯ জন নিহত হন।

শহরের আন্দোলন গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলে 'থানা আক্রমণ, মুসলিম লীগ অফিস দখল ও সাধারণ মানুষের শত্রু চোর-ডাকাত-জোতদার-মহাজন-তহসিলদার হত্যা শুরু হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মৌলিক গণতন্ত্রীদের পদত্যাগের খবরও ঢাকায় আসতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে শহর এলাকার বাইরে মুসলিম লীগের ও সরকারের প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়।' (সাঈদ-উর ২০০১ : ৯৭)

শুধু তাই নয়, গণ আন্দোলনের তীব্রতা পূর্ব বাংলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী-কর্মকর্তাদের অপ্রাপ্তি ও দীর্ঘ দিনের দাবি-দাওয়ার প্রশ্নে সোচ্চার হওয়ার বাস্তবতা তৈরি করে দেয়। অর্থাৎ তাদের ওপর সরকারের আগের সেই নিয়ন্ত্রণের বন্ধন শিথিল হতে শুরু করে। শুধু মার্চ মাসের প্রথম পঁচিশ দিনে পূর্ব বাংলায় প্রতিদিন গড়ে সাতটি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা তাদের দাবি-দাওয়া কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

আর মার্চ মাসে শুরু হওয়া ঘেরাও কর্মসূচির কারণে আদমজি জুট মিল, খুলনার বিভিন্ন মিল, টঙ্গির বেশ কিছু কারখানা, ঢাকায় অবস্থিত প্রাদেশিক সরকারের সচিবালয়, ওয়াপদা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ঘেরাওয়ের ফলে কার্যত অচল হয়ে যায়। সব মিলিয়ে দিন গড়ানোর সাথে সাথে সরকার ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন জায়গায় তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল।

এদিকে গণ আন্দোলনের দিন যত গড়াচ্ছিল তত ছাত্রদের এগার দফা এবং অন্যদের নানা দফা শেষ পর্যন্ত ৬ দফায় এসে মিশে যাচ্ছিল। ৬ দফার সঙ্গে শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের নাম ছিল একসূত্রে গাঁথা। ফলে সমগ্র আন্দোলনের নেতৃত্ব ক্রমে আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। আর সংগত কারণেই পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী জাগরণের সমস্ত আলো দিয়ে পড়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার হওয়া শেখ মুজিবের ওপর। তিনি পূর্ব বাংলার মানুষের যাবতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠেন। ফলে ছয় দফা দাবির সঙ্গে সঙ্গে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। ২০শে ফেব্রুয়ারির বাস্তবতা আর বাঙালির জাতীয়তাবাদী জাগরণ সম্পর্কে অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা বলেন–

> ঊনসত্তরের ২০ ফেব্রুয়ারিও ছিল কারফিউ। কিন্তু ইতিমধ্যেই মিলিটারী লরী সর্বত্র যেতে ভয় পাচ্ছে। শহরের কোথাও কোথাও অবস্থান নিচ্ছে, তবে নিজেদের রক্ষার জন্য বেশ প্রস্তুতি নিয়েই। আমরা কারফিউ ব্রেক করে প্রতিবাদ সভা করলাম। আবারো লক্ষ জনতার মিছিল। এবার শুধু শেখ মুজিবের মুক্তি। আমরাই লক্ষ্য করলাম একজন বাঙালি কেরানী বা অফিসার অফিসে যায়নি– তারা মিছিলে। স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানী জাতীয়তা ভেঙে গেছে। বাঙালি পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদকে লাথি মেরে প্রত্যাখ্যান করেছে। বাংলাদেশে এখন শুধু পূর্ব পাকিস্তান নামটি আছে। দোকানে দোকানে উর্দু ইংরেজি সাইনবোর্ড নেমে বাংলা সাইনবোর্ড উঠেছে। এমন কি গাড়ির পেছনের নম্বর পর্যন্ত কেউ কেউ বাংলায় লিখে ফেলেছে। ... কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী বেতার টেলিভিশন শিল্পী চলচ্চিত্র শিল্পী সহ সকল বাঙালী সাংস্কৃতিক কর্মী সকলেই পথের মানুষ তখন। (তোফায়েল ১৯৯৭ : ২৭-২৮)

প্রদেশব্যাপী আন্দোলন এত তীব্র হতে থাকে যে, সরকারের নিয়ন্ত্রণের প্রায় বাইরে চলে যায়। সংগ্রামী জনগণ দেশব্যাপী বিভিন্ন স্থানে সংগ্রাম কমিটি গঠন করে। এই সংগ্রাম কমিটিই সরকারের বিকল্প হয়ে ওঠে। (আবুল কাসেম ২০১২ : ৭৯) পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যত যাচ্ছিল সরকার তত কঠোর দমনমূলক ব্যবস্থার দিকে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় গুলি করে আন্দোলনকারীদের হত্যা করে। 'যতবারই এই ধরনের ঘটনা ঘটে, ততবারই বাঙালীদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অর্জন করতে থাকে উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা। এতে গণঅনুভূতি বহু গুণে বৃদ্ধি পায় ও জনতার ঐক্যবিধানে তা মূখ্য ভূমিকা পালন করে।' (মওদুদ ২০১৫ : ১১৫)

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে দেখে, আইয়ুব খান রাজনৈতিকভাবে সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনায় বসার উদ্যোগ নেন। কিন্তু ততদিনে পূর্ব বাংলার মানুষের একক নায়কে পরিণত হয়েছেন শেখ মুজিবুর রহমান। এঅবস্থায় একজন মাত্র লোকই গোটা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম ছিলেন এবং তিনি হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। আইয়ুব খান ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ ঘোষণা দিতে বাধ্য হলেন, তিনি আর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এবং আলোচনায় বসতে চান। পূর্ব বাংলার প্রধান জননেতা জেলে

Dhaka University Institutional Repository

থাকায় তাঁকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে আলোচনায় বসার ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা হলে শেখ মুজিব প্যারোলে মুক্ত হয়ে আলোচনায় বসতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে সরকার বাধ্য হয়ে ২২শে ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে। শুধু তাই নয়, আগরতলা মামলার আসামীদের সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ রাজবন্দিকেও মুক্তি দেয়া হয়। দীর্ঘ এক যুগ পর কারাগার রাজবন্দিশূন্য হয়। (মোহাম্মদ ফরহাদ ১৯৮৯ : ৭২, কামাল ২০১৬ : ৩৬-৩৭, মওদুদ ২০১৫ : ১২০) ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেওয়া হয় রেসকোর্স ময়দানে। ২৫শে ফেব্রুয়ারি রাওয়ালিপিন্ডিতে বৈঠকের আয়োজন করে আইয়ুব খান। শেখ মুজিব ১৭ জন সহকর্মী ও উপদেষ্টা সঙ্গে নিয়ে বৈঠকে যান। কিন্তু ওইদিনের সভায় কোনো মীমাংসা হয়নি। বেশ বিরতির পর আবার সভা হয় ১০ই মার্চ ১৯৬৯। সভায় শেখ মুজিব ছয় দফা দাবিতে অটল থাকেন। 'ডাক' নেতারা প্রত্যক্ষ সর্বজনীন ভোটে নির্বাচন আর সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার দাবি পেশ করেন। শেখ মুজিব তার সাথে একমত না হয়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা ব্যক্ত করে ঢাকায় ফিরলে আন্দোলন আরো সশস্ত্র রূপ নেয়। সরকার দুই প্রদেশের গভর্নরকে অপসারণ করেন। কিন্তু পরিস্থিতি কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আসেনি। অবশেষে আইয়ুব খান বলেন যে, It is with profound regret that all civil administration and constitutional authority in the country have become ineffective. (অলি আহাদ ২০০৪ : ৩৫২) ফলে আইয়ুব খান সেনাবাহিনীর প্রধান ইয়াহিয়া খানের নিকট ২৫শে মার্চ ১৯৬৯ ক্ষমতা হস্তান্তর করে দিয়ে তিন মাসের ছুটি নেন[১১] এবং একই দিন থেকে দেশে আবার সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয়। (আবুল কাসেম ২০১২ : ৮০, কামাল ২০১৬ : ৪৭)

তবে আবারও সামরিক শাসন জারি হলেও ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি-মার্চব্যাপী যে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ সমগ্র পূর্ব বাংলায় ঘটেছিল, তা আর প্রশমিত হয়নি। বরং নানাভাবে তা আরো বিস্তার লাভ করেছিল। সহিংস আন্দোলনের বেগ আপাতভাবে কমলেও এই অভ্যুত্থান বাংলার শহুরে মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে উঠতি বুর্জোয়া, কৃষক-শ্রমিক সবাইকে এক কাতারে, এক অনুভূতির সূতায় গেঁথে ফেলে। এর প্রমাণ লক্ষ করা যায় ১৯৭০-এর নির্বাচনে এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে। ১৯৬৯-উত্তর সালের পরের সময় সম্পর্কে লেখক যথাযথ বলেছেন–

> পরবর্তী দুই বছরে পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তা ছিল শুধু চলমান পরিস্থিতি ও ঘটনাবহুল ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার স্বাভাবিক ও যৌক্তিক পরিণতি। ১৯৬৯ সালে দেশ যে সমস্যার সমাধান ঘটাতে পারেনি, ১৯৭১ সালেও তা সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে। ইতিমধ্যে পরিস্থিতি শুধু জটিলই হয়েছে এবং তা চলে গেছে সংশ্লিষ্ট সবগুলো দলের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।' (মওদুদ ২০১৫ : ১৫৪)

তাছাড়া 'নতুন বিপ্লব হিসেবে প্রায় প্রতিষ্ঠিত একটি গণঅভ্যুত্থান মোকাবিলা করার জন্য মধ্যম মানের একজন আর্মী জেনারেলের নেতৃত্ব খুব উপযোগী ছিল না।' (মওদুদ ২০১৫ : ১৫৬)

১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং জাতীয়তাবাদী জাগরণ

১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ ক্ষমতায় আসীন হয়েই ইয়াহিয়া খান ২৬শে মার্চ বেতার ভাষণ দেন। সেখানে তিনি বলেন– দেশে একটি শাসনতান্ত্রিক সরকার গঠনের উপযোগী অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা ছাড়া তার অন্য কোন উচ্চাভিলাষ নেই। তিনি আরো নিশ্চয়তা দেন যে, জনপ্রতিনিধিরা সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের

Dhaka University Institutional Repository

ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন এবং সেই নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরই দায়িত্ব হবে দেশকে একটি কার্যোপযোগী সংবিধান উপহার দেয়া। এছাড়া এক ইউনিট ভেঙে চারটি ইউনিট করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে বলেন– যত দূর তা পাকিস্তানের জাতীয় অখণ্ডতা ও সংহতিকে ক্ষুণ্ন না করে ততদূর অবধি পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হবে। (কামাল ২০১৬ : ৪৯, মওদুদ ২০১৫ : ১৫৬-১৫৭) বেতার ভাষণে ১৯৬৯ সালের ২৮শে নভেম্বর আবার এসব কথা বলে ১৯৭০ সালের ৩১শে মার্চ ঘোষণা করা হয় আইন কাঠামো আদেশ বা Legal Framework Order (LFO)। এই আইন কাঠামো আদেশে ছিল একটি প্রস্তাবনা, ২৭টি অনুচ্ছেদ, তিনটি তফসিল, পরিষদের কার্যবিবরণীসহ ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য সবরকমের নিয়মবিধি, শর্ত ও বিধিনিষেধ। এই আদেশের ব্যাখ্যা মীমাংসার সমস্যায় প্রেসিডেন্টকেই সর্বেসর্বা রাখা হয়। সবমিলিয়ে এই আদেশে যদিও 'ক্ষমতা দখলকারীরা আসলে জাতিকে নতুন কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি', তবুও পূর্ব বাংলায় গণমানুষের জাতীয়তাবাদী জাগরণকে মাথায় রেখে পূর্ব বাংলার প্রধান জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ নির্বাচন চেয়েছে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে জনগণের মুক্তির দিশা খুঁজতে চেয়েছেন।

১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনকে সামনে রেখে সব দল নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। আওয়ামি লিগ, ন্যাপ (ভাসানী), ন্যাপ (ওয়ালী), কাউন্সিল মুসলিম লিগ, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, জামায়াতে ইসলাম, পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি (পিপিপি) সব দলই নির্বাচনকে সামনে রেখে তাদের ইশতেহার ঘোষণা করে। কিন্তু আওয়ামী লীগ ছাড়া কোনো দলের ইশতেহারই পূর্ব বাংলার আপামর জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি। আওয়ামী লীগের ইশতেহারের বিশেষত্ব সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্য যথার্থ বলেই মনে হয়–

> আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ইশতেহারে শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর কতকগুলো মৌলিক দাবী অত্যন্ত স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করায় ইতিমধ্যে বামপন্থীদের প্রভাবাধীন বিশাল সংখ্যক শ্রমিক কৃষকের সমর্থন অর্জনে সক্ষম হয়। ন্যাপের মতো বামপন্থী দলগুলো তাদের অস্পষ্ট অর্থনৈতিক কর্মসূচীগুলোর ভিত্তিতে ভোটারদের আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেও আওয়ামী লীগ ছিল এই দুইয়ের মধ্যবর্তী একটি সংগঠন এবং তারা স্বায়ত্তশাসনের জাতীয়তাবাদী দাবী ও বাঙালীদের অন্যান্য মৌলিক আকাঙ্ক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে উভয় শ্রেণীর ভোটারদের সমর্থন অর্জন করে। জাতীয়তাবাদী দাবীগুলো ইতিমধ্যেই জনগণের মধ্যে প্রবল সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিল এবং মুজিব ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ অন্য যে কোনো নেতা বা দলের চাইতে ঘনিষ্ঠভাবে জাতীয়তাবাদী দাবীগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় জনসমর্থন স্বাভাবিকভাবেই এই দলের প্রতি ধাবিত হয়। (মওদুদ ২০১৫ : ১৬৩)

এছাড়া ন্যাপ (ভাসানী) হঠাৎ নির্বাচন থেকে সরে যায়। পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগের প্রেসিডেন্ট আতাউর রহমান খানও নির্বাচন থেকে সরে যান এবং তাঁর দলের সবাইকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে নির্দেশ দেন। এছাড়া খান আবদুস সবুর (কাইউম লীগ), ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া, পি.ডি.পি), সৈয়দ আজিজুল হক (পি.ডি.পি), শাহ আজিজুর রহমান (পি.এন.এম) এবং আরো অনেকে পার্টি হিসেবে না হলেও ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান। (আবুল কাসেম ২০১২ : ৯২-৯৩, আবদুল হক ১৯৯৬ :

Dhaka University Institutional Repository

১৭৬, অলি ২০১২ : ৩৬৯) যদিও এসব দল এবং ব্যক্তির জনপ্রিয়তা তেমন ছিল না, তবু এর ফলে পূর্ব বাংলার জনগণের একত্র হওয়া আরো সহজ হয়ে যায়। আবার ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর ১৫০ মাইলবেগে প্রবাহিত সাইক্লোন ও ৪০ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস পূর্ব বাংলার বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানে। এসময় ইয়াহিয়া খান চীন সফর শেষে ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ও মানুষ সম্পর্কে কোনো উদ্বেগ প্রকাশ না করে ঢাকা ত্যাগ করলে সমগ্র পূর্ব বাংলাব্যাপী তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এটিকে পূর্ব বাংলার মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের চরম উদাসীনতা মনে করে। উপদ্রুত এলাকায় সশরীরে গিয়ে শেখ মুজিব ত্রাণ সহায়তা দেন এবং জনমতকে তাঁর দলের পক্ষে আনতে স্বভাবতই সফল হন। সবমিলিয়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচন পূর্ব বাংলার মানুষকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় প্রায় এক দলের অধীনে ভেদাভেদহীনভাবে একত্র হতে সহায়তা করে। নির্বাচনী প্রচারণাতেও দেশের দুই অংশের মধ্যেকার অর্থনৈতিক ও নানামাত্রিক বৈষম্যের বিষয়টি স্পষ্টভাবে সামনে চলে আসে। বৈষম্য বঞ্চনার বোধ পূর্ব বাংলার মানুষকে একত্র করে তোলে। নির্বাচনের ফলাফলেও পূর্ব বাংলার মানুষের জাতীয়তাবাদী জাগরণের প্রতিফলন ঘটে। ৭ই ডিসেম্বর সাইক্লোন কবলিত ৯টি আসন বাদে বাকি আসনগুলোতে জাতীয় পরিষদ নির্বাচন হয়। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের অনুষ্ঠিত হওয়া ১৫৩টি আসনের মধ্যে ১৫১টি আসন লাভ করে আওয়ামি লিগ। সাইক্লোন কবলিত ৯টি আসন ছাড়াই আওয়ামী লীগ বিজয়ী আসনসংখ্যার ভিত্তিতে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের উপযোগী সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন অর্জন করায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। অন্যদিকে ১৭ই ডিসেম্বরের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনেও পূর্ব বাংলার ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ লাভ করে ২৯৮টি আসন। পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোর পিপলস পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও সমগ্র পাকিস্তানে তার অবস্থান দাঁড়ায় দ্বিতীয় স্থানে। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সংবিধান গৃহীত হওয়ার বিধান থাকায় নির্বাচনের ফলাফল মোতাবেক আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার এবং সংবিধান প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা রইল না। ৯ই ডিসেম্বর ১৯৭০ তারিখে এক সংবাদ সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান এই নির্বাচনী রায়কে ৬ দফা ও ১১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে প্রণীত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির ওপর 'গণরায়' বলে উল্লেখ করেন। বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন, '৬ দফা ফর্মুলা ভিত্তিক পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সংবলিত একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং উহার বাস্তবায়ন করিতে হইবে।' (আবুল কাসেম ২০১২ : ১৩৫) বিবৃতির একই কথা বলেন ১১ই ডিসেম্বর সন্দীপে অনুষ্ঠিত এক জনসভার ভাষণে। তিনি বলেন– ছয় দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে দেশের সংবিধান প্রণয়ন করা হবে। আওয়ামী লীগ এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং আমরা এমন একটি সংবিধান করবো যা বাঙালীদের ওপর শোষণের অবসান ঘটাবে। (আবুল কাসেম ২০১২ : ১৩৫, মওদুদ ২০১৫ : ১৬৫) কিন্তু ১৯৭০ সালের এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার এই জাতীয়তাবাদী জাগরণকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র মেনে না নিয়ে একে নস্যাৎ করার নীল নকশায় লিপ্ত হয়। ক্ষমতা হস্তান্তরে নানা টালবাহানা শেষে পূর্ব বাংলার নিরীহ মানুষের ওপর চালায় গণহত্যা। আর বিপরীতে জাতীয়তাবাদী জনগণের দ্বিধামুক্ত জাগরণও অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। নতুন রাষ্ট্রের বাসনাকেই আসলে এই নির্বাচন উসকে দিয়েছিল। এই নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, দেশের দুই অংশের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে সাদৃশ্য নেই। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা যে-কথা বলে দুই পাকিস্তানের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্ক ও জাতীয়তা অটুট রাখতে চেয়েছিল সেই ইসলামও পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে কার্যত কোনো বন্ধনও সৃষ্টি করেনি। এর প্রমাণ কোনো রাজনৈতিক নেতা কিংবা দলই পাকিস্তানের দুই অংশে তাদের একক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। ফলে নির্বাচনের ফলাফল পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলে।

নির্বাচন পরবর্তী ঘটনাবলি ও চূড়ান্ত জাতীয়তাবাদী জাগরণ

১৯৭০ সালের নির্বাচনে দল হিসেবে জয় হয়েছে আওয়ামী লীগের। আর জাতি হিসেবে জয় হয়েছে পূর্ব বাংলার বাঙালির। পূর্ব বাংলার বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের নিরন্তর শোষণ-নির্যাতনে এমনভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনায় একাট্টা হয়েছে, এটি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র ভাবতেও পারেনি। সামরিক সরকারের ধারণা ছিল যে, জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচন হলেও শেখ মুজিব পূর্বাঞ্চলেও ৬০ শতাংশের বেশি আসন পাবেন না। কিন্তু নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালির প্রদর্শিত জাতীয়তাবাদী চেতনার তীব্রতা পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রকে বিস্মিত ও আতঙ্কিত করে তোলে। ফলে নিয়মানুযায়ী নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে তারা নানা টালবাহানা করতে থাকে। একদিকে শেখ মুজিব চান ৬ দফা ভিত্তিক একটি ফেডারেল রাষ্ট্রগঠনোপযোগী সংবিধান প্রণয়ন করতে, অন্যদিকে ভুট্টো এবং পাকিস্তানি জেনারেলরা চান শক্তিশালী কেন্দ্রভিত্তিক একটি শাসনতন্ত্র। শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লিগের পক্ষে এমন কি পশ্চিম পাকিস্তানের ভুট্টো ও তাঁর দল বাদে অধিকাংশ নেতা ও দলই অবস্থান নেয়। একদিকে ভুট্টো ও পাকিস্তানি কিছু জেনারেল অন্যদিকে শেখ মুজিব ও অন্যান্য দল ও তার নির্বাচিত প্রতিনিধি– এই দুইয়ের দোটানায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে হঠাৎ ভুট্টোর সম্মতিতে ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন যে, ৩রা মার্চ ১৯৭১ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। কিন্তু ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ হঠাৎ ভুট্টো ঘোষণা দেন যে, তার দল জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে অংশ নেবে না। সবদল ও অধিকাংশ মানুষ এর নিন্দা করে। আলোচনা চলতে থাকে মুজিব-ভুট্টো-ইয়াহিয়ার মধ্যে। এদিকে মুজিব ও তাঁর নির্বাচিত প্রতিনিধিরা প্রস্তুত হতে থাকেন জাতীয় পরিষদের আসন্ন ৩ তারিখের অধিবেশনের জন্যে। ভেতরে ভেতরে আওয়ামী লীগের অধীনে একটি দল কাজ করতে থাকে ৬ দফা ভিত্তিক একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য। কিন্তু ১লা মার্চ ১৯৭১ হঠাৎ সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চের পূর্ব ঘোষিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল করার ঘোষণা দেন। এই ঘোষণাটিই প্রকৃতপক্ষে পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে নতুন রাষ্ট্রের বাসনাকে একটি স্থায়ী ভিত্তি দেয়। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষিত হওয়ায় পূর্ব বাংলায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এই প্রতিক্রিয়া ছিল তাৎক্ষণিক ও সহিংস। বাঙালিরা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর ওপর সম্পূর্ণরূপে আস্থা হারায়। শান্তিপূর্ণ ও যথাযথ প্রক্রিয়ায় যে আর ক্ষমতা হস্তান্তর করা হচ্ছে না এবিষয়ে তারা নিঃসন্দেহ হয়ে যায়। এই ঘোষণাকে পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠী তাদের একটি জাতিগত অমর্যাদাকর বিষয় বলে বিবেচনা করে। তাছাড়া অবাধ ও নিরপেক্ষ একটি নির্বাচনের মাধ্যমে বৈধতা অর্জন করার পর পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর কাছে আত্মসমর্পণ করার মানসিকতাও লুপ্ত হয়ে যায়। জনগণের মধ্যে সশস্ত্র প্রস্তুতির তাগিদ তীব্র হয়ে ওঠে। লাঠি, লোহার রড ইত্যাদি হাতে উন্মত্ত প্রায় মানুষ রাস্তায় মিছিলে আসে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, সাংবাদিক, সরকারি কর্মচারী, ছাত্র, শ্রমিক সকলে স্বাধীনতার দাবিতে রাস্তায় নেমে আসে। জনগণ ট্রেন

Dhaka University Institutional Repository

চলাচল বন্ধ করে দেয়। শহরে স্থানে স্থানে অগ্নি সংযোগ করা হয়। কোথাও কোথাও শোনা যায়, ছাত্ররা স্বাধীন বাংলা ঘোষণা করেছে। বিভিন্ন শিল্প এলাকার শ্রমিকরা কাজ বাদ দিয়ে দলে দলে ঢাকায় আসতে শুরু করে। বাস্তবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোকে ধ্বংস করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত সর্বত্র পরিলক্ষিত হতে থাকে। (আবদুল হক ১৯৯৬ : ১৮৮-১৮৯, আবুল কাসেম ২০১২ : ১৯৭, মওদুদ ২০১৫ : ১৮১, অলি ২০১২ :৩৭৭)

শেখ মুজিবুর রহমান ২রা মার্চ ঢাকায় এবং ৩, ৪, ৫ ও ৬ মার্চ প্রদেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করেন। হরতালে বিভিন্ন জায়গায় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রের নির্দেশে গুলিবর্ষণ করে অনেককে হত্যা করা হয়। ২রা মার্চ আ. স. ম আব্দুর রব ও শাজাহান সিরাজের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের দাবি জানাতে থাকে। ৭ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে উত্তেজিত ও ঐক্যবদ্ধ লাখো জনতার উদ্দেশে এক উদ্দীপনামূলক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তাতে তিনি পাকিস্তানি শাসকদের যাবতীয় বেইনসাফি রুখে দেয়ার জন্য; 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলা'র জন্য জনগণকে নির্দেশ দেন এবং বাঙালির এই পর্যায়ের সংগ্রামকে 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' ও 'মুক্তির সংগ্রাম' বলে আখ্যা দেন। ইত্যবসরে ঢাকা এবং সারা পূর্ব বাংলা প্রদেশে আসতে থাকে অতিরিক্ত সেনা ও অস্ত্রশস্ত্র। এর মধ্যে আবার সাজানো হয় আলোচনা-সমঝোতার নাটক। অবশেষে ২৫শে মার্চ থেকে জেনারেল টিক্কা খানের নেতৃত্বে চালানো হয় 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামে অতর্কিত আক্রমণ ও গণহত্যা। পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগণ এর বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে জেগে ওঠে। সবাই একই জাতীয়তাবাদী চেতনায় জাগ্রত হয়ে নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করে। এই ঐতিহাসিক বিজয় মূলত পূর্ব বাংলার বাঙালিদের জাতীয়তাবাদী জাগরণের ফল।

১৯৪০ সালের পর থেকে পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদী চেতনা ক্রমে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথম দিককার পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ ক্রমে নানা বঞ্চনা-বৈষম্য, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আন্দোলন-সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হয়েছে। এই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটিয়ে পূর্ব বাংলার জনগণ অবশেষে প্রতিষ্ঠা করেছে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র।

গ. সাংস্কৃতিক ঘটনাবলি ও জাতীয়তাবাদী চিন্তা

বাংলাদেশে সংস্কৃতি চর্চা আর রাজনীতি বরাবরই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল এবং আছে। যেকোনো রাজনৈতিক সংকটে সংস্কৃতি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ষাটের দশকের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির রাজনৈতিক ব্যবহার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। 'দেখা গেছে রাজনৈতিক কিছু মুনাফা আদায়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সাংস্কৃতিক আন্দোলন। আবার শেষোক্ত আলোড়ন উপরি উপরি যাই হোক, তার দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য কিন্তু রাজনৈতিক।' (শওকত ২০১৫ : ৭৪)

পূর্বেই বলা হয়েছে, সামরিক শাসন জারির পর থেকে ষাটের দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মূলধারার রাজনীতি সামরিক শাসনের প্রবল নিয়ন্ত্রণের মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো সক্রিয়তা রক্ষা করতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

মূলধারার রাজনীতির যে ক্ষীণ তৎপরতা ছিল, তা মূলত ছিল আইয়ুবি স্বৈরাচার ও রাজনৈতিক অবরুদ্ধতার বিরুদ্ধেই বেশি ক্রিয়াশীল ছিল। ছাত্র রাজনীতির ক্রিয়াশীলতার উদ্দেশ্যেরও একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল মূলত আইয়ুবি স্বৈরাচার ও অবরুদ্ধতার বিরোধিতা করা। 'ছাত্রলীগ প্রধানত সামরিক শাসনের পরিবর্তে সারা পাকিস্তানব্যাপী একটি সংসদীয় (পার্লামেন্টারি) গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিত এবং নেতৃবৃন্দের একটা বড় অংশের মধ্যেই আইয়ুব খানের পরিবর্তে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট করার স্বপ্নই ছিল প্রধান।' (মোহাম্মদ হাননান ২০০৬ : ২৩৬) তবে এসময় ক্রিয়াশীল ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের ছাত্রনেতাদের একটা অংশের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষাও ক্রিয়াশীল ছিল না তা নয়। ছাত্রদের কিছু কিছু চিন্তা এবং এর সঙ্গে সাধারণ জনগণের সম্পৃক্তির মধ্যেও জাতীয়তাবাদী চরিত্র কখনো কখনো ফুটে উঠেছে। তবে ষাটের দশকের প্রথমার্ধে পূর্ব বাংলাকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রত্যক্ষ প্রকাশ বরং লক্ষ করা যায়, নানা সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের মধ্যে। এক কথায় সাংস্কৃতিক তৎপরতা, উদ্‌যাপন ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট আন্দোলন-সংগ্রাম ষাটের দশকের প্রথমার্ধে রাজনীতির স্থান দখল করেছিল। পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড জাতীয়তাবাদী চেতনার রঙে রঙিন হয়ে রাজনীতির স্থান দখল করেছিল। পরবর্তীতে রাজনীতি আর সংস্কৃতির যৌথ সংগ্রামের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছে। শেষ পর্যায়ে রাজনীতি আর সংস্কৃতি একই আবেগের দুটি উৎসারণ হিসেবে কাজ করেছে–

> বস্তুত বাঙালি সংস্কৃতির চেতনা সুপ্ত অথবা স্বতস্ফূর্তভাবে প্রবাহিত হয়ে আসছিল গণ-মনে। এর মধ্যে অধিকাংশই ছিল চর্চার অভাবে বিস্মৃতির অন্ধকারে নিমজ্জিত। কিন্তু পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রাম যত বেশি এগিয়ে এসেছে, সংগ্রামী তত বেশি আত্মসচেতন হবার সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রয়োজনীয়তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছে। (রণেশ ২০১৪ : ৯৫/২)

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন, একুশে ফেব্রুয়ারি পালন, নববর্ষ বরণ ও ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ উদ্‌যাপন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি ক্রমে রাজনীতির পোশাকে আবৃত হয়ে ওঠে। ষাটের দশকে যখন ছাত্র রাজনীতিও তোপের মুখে পড়ে তখন ছাত্র-আন্দোলনও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে জাতীয়তাবাদী তৎপরপতা চালিয়ে গিয়েছে–

> সামরিক শাসনে প্রকাশ্যে ছাত্র সংগঠনের নামে রাজনীতি বা আন্দোলন পরিচালনা কিংবা নির্বাচনে অংশ নেওয়া একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে ছাত্র আন্দোলন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে রূপ নেয়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেই নয় শুধু, নির্বাচনেও তারা সংস্কৃতিমনা নাম নিয়ে আসরে নামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়নের ছিল সংস্কৃতি সংসদ, ছাত্রলীগের শিল্পসাহিত্য সংঘ, ছাত্রশক্তির সাংস্কৃতিক পরিষদ এবং ছাত্র মজলিশ ও তামিয়ে মিল্লাত নামে ইসলামী ছাত্রসংঘ কাজ করে। এমন নাম সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেই ছড়িয়ে পড়ল, যেমন– অগ্রদূত, প্রগতি, অগ্রগামী, যাত্রিক, দিশারী ইত্যাদি নামের মধ্যে ছাত্র সংগঠনগুলো প্রকৃতপক্ষে আত্মগোপন করে। (মোহাম্মদ হাননান ২০০৬ : ২২০)

রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয়তাবাদী চেতনা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষার প্রতি দরদ পূর্ব বাংলার মানুষের সবসময়ই ছিল। ১৯৫২ সালে তারা তার চূড়ান্ত স্বাক্ষরও রেখেছে। এরপর থেকে ভাষা পূর্ব বাংলার বাঙালিদের জাতীয়তাবাদী চেতনায় বরাবরই একত্র ও উদ্বুদ্ধ করেছে। ভাষাকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী চেতনা পূর্ব বাংলার বাঙালিকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও একাত্ম করেছে। পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমানেরা ১৯৪৭ সালে ভাষাকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী চেতনাকে অগ্রাহ্য করে অর্থনৈতিক বঞ্চনাকে প্রাধান্য দিয়েই ভারত-ভাগজনিত কারণে পশ্চিমবাংলা থেকে আলাদা হয়েছিল– এ এক ঐতিহাসিক সত্য। ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠী ভাষাকেন্দ্রিক ঐক্য থেকে রাজনৈতিক কারণে বেরিয়ে এলেও, বাংলা ভাষার অর্জন আর ভাবসম্পদকে অস্বীকার করেনি। বরং তাদের কায়েম করা স্বপ্নের পাকিস্তান রাষ্ট্র বাংলা ভাষা ও এর ভাবসম্পদকে যতই অস্বীকার ও দমনের চেষ্টা করেছে ততই তারা এর প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। তারা ক্রমাগত এই ভাষা, এর ভাবসম্পদ ও এই ভাষার শ্রেষ্ঠ অহংকার রবীন্দ্রনাথের প্রতি নিষ্ঠ থাকা তাদের চেতনাগত ও রাজনৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করেছে। ভাষা এবং রবীন্দ্রনাথকেন্দ্রিক এই চেতনার উত্থান ঘটে মূলত ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের পর। আর ১৯৫৮ সালের পরে আইয়ুবি স্বৈরশাসনামলে রাজনৈতিক প্রবল অবরুদ্ধতার কালে রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন (১৯৬১) পূর্ব বাংলার জনগণের সচেতন অংশের জন্যে সংস্কৃতির আড়ালে এক রাজনৈতিক তৎপরতা ও চ্যালেঞ্জের অংশ হয়ে ওঠে। এই তৎপরতা ও চ্যালেঞ্জের মর্মমূলে নিহিত ছিল রবীন্দ্রনাথকে জাতীয়তাবাদী চেতনার অংশ মনে করার প্রবণতা।

১৯৬১ সালের রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন পূর্ব বাংলায় জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ হিসেবেই কাজ করেছিল। একারণে দেখা যায়, সরকারি ও বেসরকারি নানা বাধা-বিপত্তি ও সমালোচনার তোপের মুখে পড়ে এই উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান। 'আসল কথা পূর্ব বাংলার অধিবাসীবৃন্দের জাতিসত্তার স্বাধীন বিকাশের সংগ্রামে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের বৈপ্লবিক উপকরণ হিসেবে কাজ করার সম্ভাবনাকে আঁচ করেছে প্রথমে বিপক্ষ ঔপনিবেশিক চক্র। তারা হমলা চালিয়েছে বাঙালি সংস্কৃতির যে-কোন রকমের অভিব্যক্তির উপর।' (রণেশ ২০১৪ : ৯৫) একারণে বাঙালি সংস্কৃতির উত্তরাধিকার রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের কিছুকাল আগে নানা অজুহাতে গ্রেফতার হন আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯), কে. জি. মোস্তফা (১৯২৮-২০১০) ও আনোয়ার জাহিদ (জ. ১৯৩৮) প্রমুখ সংস্কৃতিসেবীরা। রবীন্দ্রনাথ ও শতবর্ষ উদ্‌যাপনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের কঠোর সমালোচনা করা হয় ˆ'wbK AvRv' পত্রিকায়। এ পত্রিকার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকে সাম্প্রদায়িক প্রমাণের চেষ্টা করা হয় নানা লেখার মাধ্যমে। স্বতন্ত্র সংস্কৃতি-আকাঙ্ক্ষী পাকিস্তানবাদী সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা উদ্‌যাপনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বলেন– এরা পাকিস্তানবিরোধী, জাতীয়তার শত্রু, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার শত্রু, অখণ্ড বাংলা গঠনের পাঁয়তারাকারী। কিন্তু সরকারি ভয়ভীতি ও পাকিস্তানবাদীদের বিশেষ প্রচারণায় তেমন কোনো ফল ফলেনি–

> ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখ ব্যাপী নিরবচ্ছিন্নভাবে সারা প্রদেশে সেমিনার, সাহিত্য-প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি-সঙ্গীতানুষ্ঠান, গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্য-নাটক মঞ্চায়ন চলতে থাকে এবং বহুদিনের জড়তা ও নিস্তব্ধতা কেটে গিয়ে সংস্কৃতিক্ষেত্রে প্রবল প্রাণস্পন্দনের সৃষ্টি হয়। (সাঈদ-উর ২০০১ : ৮১)

প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিক উদ্‌যাপনের বিরুদ্ধে সংঘটিত বিভিন্ন তৎপরতা ও রাজনৈতিক অবরুদ্ধতা রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব বাংলার বাঙালিদের কাছে জাতীয়তাবাদী চেতনার অন্যতম স্থায়ী উপাদানে

Dhaka University Institutional Repository

পরিণত করে। রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের অন্যতম কর্মী এ অনুষ্ঠানকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করার কারণ সম্পর্কে বলেছেন–

> গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করার অনেকগুলো কারণ ছিল। প্রধান কারণ ছিল সাংস্কৃতিক এবং একারণে রাজনৈতিক। ... পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশেও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এই সময় আলোচনা হবে, তাঁর মূল্যায়ন হবে, আর ব্যতিক্রম হবে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা ভাষীর দেশ পাকিস্তানে? পাকিস্তানি শাসক মহল তা-ই চেয়েছিল। তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বাধা ও নিষেধের ফলে আমাদের একটি স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক আকাঙ্ক্ষা একটি রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ালো। (খান সারওয়ার ২০০১ : ১০৭)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পূর্ব বাংলার বাঙালিদের কাছে আরো রাজনৈতিক হয়ে ওঠেন বোধ করি ১৯৬৭ সালের ২১শে জুনের পর থেকে। এদিন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে তৎকালীন পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন ভবিষ্যতে রেডিও পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানের কৃষ্টি ও মূল্যবোধ বিরোধী রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ করার কথা বলেন। (মোরশেদ ২০১৪ : ১৮০) এই ঘোষণা পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল, জাতীয়তাবাদী চেতনাঋদ্ধ বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, সংস্কৃতিকর্মী, ছাত্র-তরুণ সমাজে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। পূর্ব বাংলার অনেক সাংবাদিক জাতীয়তাবাদী চেতনার জায়গা থেকে 'ছোট খবরটি প্রথম পৃষ্ঠায় প্রাধান্য দিয়ে' ছাপেন। খাজা শাহাবুদ্দীনের বক্তব্যের প্রতিবাদে গণস্বাক্ষরও সংগ্রহ করেন অনেকে। (এবিএম মূসা ২০১৫ : ১৮৮) ২৪শে জুন উনিশ জন লেখক-শিল্পী-শিক্ষাবিদ-সাংবাদিক সরকারি ওই ঘোষণার বিরোধিতা করে সংবাদপত্রে দফায় দফায় বিবৃতি দেন। এর বিপরীতে স্বাতন্ত্র্যবাদী লেখক-শিল্পী-শিক্ষাবিদ-সাংবাদিকরাও রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্রবাদীদের বিরুদ্ধে দফায় দফায় সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন।

উভয়পক্ষের মুখোমুখি অবস্থানের কারণে যে কাজটি হয়, তা হলো– পূর্ব বাংলায় 'সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা পরিষদ' (১৯৬৭), 'সংস্কৃতি সংগ্রাম পরিষদ' (১৯৬৭) গঠিত হয়। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে এই ধরনের বক্তব্য বেরিয়ে আসে যে, সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ অর্থনীতি ও রাজনীতির ওপর আক্রমণেরই নামান্তর। পাকিস্তান সরকার ইসলাম ও পাকিস্তানের সংহতির নামে এই কাজটিই ধারাবাহিকভাবে করে যাচ্ছে। পাকিস্তান একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র এবং প্রত্যেকটি অঞ্চলের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির উপলক্ষ্য রবীন্দ্রনাথ এবং সাংস্কৃতিক হলেও মর্মার্থ যে রাজনৈতিক তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসংগীত-বিতর্কে অবশেষে সরকার নমনীয় হয়। খাজা শাহাবুদ্দীন ১৯৬৭ সালের ৪ঠা জুলাই স্বীকার করেন যে, রবীন্দ্রনাথের সব গান পাকিস্তানি আদর্শের পরিপন্থি নয়। এছাড়া তিনি দাবি করেন যে, তাঁর বক্তব্য সংবাদপত্রে বিকৃত করা হয়েছে। খাজা শাহাবুদ্দীনের এই ঘোষণায় পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্র–ভাবমূর্তি জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগানোর উপাদান হিসেবে আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে–

> সরকার-পক্ষ তথা রবীন্দ্র-বিরোধী পক্ষের পশ্চাদপসরণ প্রকৃতপক্ষে সাংস্কৃতিক স্বাধিকারে বিশ্বাসীদের শক্তি অর্জনের ইঙ্গিত দেয়। আর একটি প্রমাণ পাওয়া যায় মাসখানেক পরে রবীন্দ্র-মৃত্যুবার্ষিকী পালনের কালে। সেবারই প্রথমবারের মত সাড়ম্বরে কবির মৃত্যুদিবস পালিত হয় এবং অনুষ্ঠানে দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতি ছিল অদৃষ্টপূর্ব। (সাঈদ-উর ২০০১ : ১০৮)

Dhaka University Institutional Repository

আদতে ষাটের দশকে রবীন্দ্রনাথ পূর্ব বাংলায় যেন পুনর্জীবিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক পাঠই ষাটের দশকের পূর্ব বাংলায় বদলে যায়। 'ষাটের দশকে রবীন্দ্রনাথের গান রাজনৈতিক কারণেই জনপ্রিয় হয়ে উঠল অবিশ্বাস্য রকমে' (আসাদ ২০১৫ : ২৪৩)– একথা রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে সমগ্র রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেই ষাটের দশকে এই ঘটনাটিই ঘটেছে; রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিকভাবে পঠিত ও গৃহীত হয়েছে। এছাড়া এই কালপর্বে অর্থাৎ ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কবিতা রচনার সংখ্যাও অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় বেড়ে যায়। এই ঘটনাটিও নিছক নিরীহ ব্যাপার নয়, এটিও জাতীয়তাবাদী রাজনীতির কারণেই ঘটেছে।

পাকিস্তান লেখক সংঘ ও জাতীয়তাবাদী চেতনা

শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র শাসন দুরূহ ব্যাপার। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আধিপত্যের সঙ্গে জনগোষ্ঠীর অপরাপর ক্ষেত্রেও আদর্শিক আধিপত্যের প্রয়োজন হয়। এরই অংশ হিসেবে ১৯৫৯ সালের জানুয়ারি মাসে সামরিক শাসনের প্রায় প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গঠিত হয় পাকিস্তান লেখক সংঘ। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারি মাসের ২৯-৩১ তারিখ করাচির গোয়ানিজ হলে তিন দিনব্যাপী এক লেখক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় লেখক সংঘ। উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষাসচিব, বিশিষ্ট উর্দুলেখক কুদরতুল্লাহ শেহাব ও কেন্দ্রীয় তথ্যসচিব আলতাফ গহর। ২৯-৩১শে জানুয়ারি লেখক সম্মেলনে বিভিন্ন ভাষী প্রায় আড়াইশ লেখক উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব বাংলার প্রায় অর্ধশত লেখক সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন। পূর্ব বাংলার গুরুত্বপূর্ণ অধিকাংশ লেখক ওই সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন। পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের ছাতার নিচে সবাইকে একত্র করা এবং পাকিস্তানি ভাবাদর্শের অনুকূলে শিল্প-সাহিত্য রচনার ধারা প্রবর্তন করাই ছিল এই সংঘের মূল উদ্দেশ্য। এই সংঘের কেন্দ্রীয় একটি কমিটি ছাড়াও ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করা হয় একটি আঞ্চলিক শাখা। কেন্দ্রীয় সংঘের অধীনে গঠিত পূর্ব বাংলার এই শাখা-সংঘেরও উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের চেতনার অনুকূল জাতীয় সাহিত্য নির্মাণ করা। এর বৃহত্তর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা যায়–

> সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পাকিস্তানি আদর্শ বা ভাবধারার প্রতিফলন ও বিকাশ ঘটানোর বক্তব্যের আড়ালে পাকিস্তান লেখক সংঘ গঠনের উদ্দেশ্য ছিল আসলে সামরিক শাসনের পক্ষে লেখকদের সমর্থন আদায়, অন্তত তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সম্ভাবনা রোধ করা। লেখকদের নানা কর্মসূচিতে ব্যস্ত রেখে ও তাদের সামনে সুযোগ-সুবিধার টোপ ঝুলিয়ে তারা এই উদ্দেশ্য অর্জন করতে চেয়েছিল। (মোরশেদ ২০১৪ : ১৪৭)

বেশ কিছুকাল পর্যন্ত লেখক সংঘের এই উদ্দেশ্য সফলও হয়েছিল। পূর্ব বাংলার অধিকাংশ লেখক সামরিক শাসন জারির পর থেকে অন্তত ১৯৬২ সাল পর্যন্ত লেখক সংঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে, এর থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে, প্রকারান্তরে স্বৈরশাসনের পৃষ্ঠপোষকতাই করেছেন।

লেখক সংঘ পূর্ব বাংলা শাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পী-সাহিত্যিকরা পূর্ব বাংলার রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রায় পুরো দশক জুড়ে এই সংঘ ক্রিয়াশীল ছিল। এই ষাটের দশকেই একদিকে স্বৈরশাসন এবং অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী নানা আন্দোলন-সংগ্রাম যুগপৎভাবে চলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু লেখক সংঘ পূর্ব বাংলা শাখা এই আন্দোলন-সংগ্রামের পক্ষে উল্লেখযোগ্য কোনো ক্রিয়াশীলতা দেখায়নি। বরং লেখক সংঘ থেকে এর সদস্যরা পুরস্কারগ্রহণ করেছেন, বিদেশ ভ্রমণ করেছেন এবং পাকিস্তানি জাতীয়তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রন্থও প্রকাশ করেছেন। তবে ইতিহাস লক্ষ করলে দেখা যাবে, ১৯৬২ সালের ছাত্র-আন্দোলন, ছয় দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর নির্বাচন লেখক সংঘের সরকারি আনুগত্যের মাত্রায় বিভিন্ন সময়ে কিছুটা চিড় ধরিয়েছিল। বিশেষত ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে এটি লক্ষ করা যায়। 'বস্তুত ষাটের দশকের শেষার্ধে এসে লেখক সংঘ বিশেষ করে তার পূর্বাঞ্চল শাখার নেতৃত্ব থেকে পাকিস্তানবাদী লেখকরা প্রায় পুরোপুরিই বাদ পড়েন।' (মোরশেদ ২০১৪ : ১৫২) কিন্তু লেখক সংঘ এতে করে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে জাগ্রত করার ক্ষেত্রে কাজ করেছে বা এর সঙ্গে পুরোপুরি একাত্ম হয়েছে তা কিন্তু নয়। এ পর্যায়ে সংঘের কর্তৃত্ব যাঁদের অধিগত হয়, ব্যক্তিগত সুবিধাবাদ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দোদুল্যমানতা ইত্যাদি মধ্যবিত্তসুলভ নানা বৈশিষ্ট্য দ্বারা তাঁরা চিহ্নিত ছিলেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার ও এবিষয়ক আন্দোলন-সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া সত্ত্বেও লেখক সংঘের সঙ্গে সম্পর্কিত কবি- সাহিত্যিকদের এহেন আচরণের মূল নিহিত ছিল বোধ করি কারো কারো চাকুরির নিরাপত্তা ও সরকার বিরোধী তালিকায় থাকতে না চাওয়ার মানসিকতা। ১৯৬৮ সালেও পূর্ব পাকিস্তান লেখক সংঘের এক সম্মেলনে 'অঙ্গুলিমেয়' দু-চারজন ছাড়া পূর্ব বাংলার প্রায় সব সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই অংশগ্রহণ একটু প্রশ্নের উদ্রেক করে বটে। কিন্তু অনেকে মনে করেন–

> এই সময়টাতে পাকিস্তানি চাপে পড়ে মানুষ ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়ছিল। এর কারণ সামরিক ও স্বৈরশাসনের ভীতি নয় কেবল। আমার মনে হয়, পরম আগ্রহে যে-স্বাধীন রাষ্ট্রকে মেনে নেওয়া হয়েছিল তাকে ভেঙে ফেলার মতো চরম সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়েছিল। বাস্তবিক স্বাধীনতার জন্যে ব্যাকুলতা সত্ত্বেও এই দোলাচল মনোবৃত্তি অস্বাভাবিক নয়। (সন্‌জীদা ২০০৪ : ৩৭)

সব মিলিয়ে পূর্ব বাংলায় লেখক সংঘের ভূমিকা ও ক্রিয়াশীলতা পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী চিন্তা বিকাশের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই সদর্থক হয়নি।

কতিপয় সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা ও তৎপরতা

ষাটের দশকে পূর্ব বাংলায় জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে বেশ কয়েকটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শুধু ষাটের দশকেই প্রতিষ্ঠিত হয় এমন সংগঠনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– করতোয়া শিল্পী গোষ্ঠী (বগুড়া, ১৯৬২), ছায়ানট (১৯৬৩), ঐকতান (১৯৬৩), সন্দীপন সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় (খুলনা, ১৯৬৩), সংস্কৃতি সংসদ (রাজশাহী, ১৯৬৫), সৃজনী লেখক ও শিল্পী গোষ্ঠী (১৯৬৬), শিখা সংসদ (রংপুর, ১৯৬৬), ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠী (১৯৬৭), উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী (১৯৬৮), সমস্বর (সিলেট, ১৯৬৯), কলম-তুলি শিল্পী পরিষদ (সিলেট, ১৯৬৯), খেয়ালি থিয়েটার (বরিশাল, ১৯৬৯) প্রভৃতি। এছাড়া সংস্কৃতি সংসদ (১৯৫১)-এর মতো ষাটের দশকের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত কিছু সাংস্কৃতিক সংগঠনও ষাটের দশকে তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

Dhaka University Institutional Repository

করে। 'স্বাধীনতা পূর্বকালে এ দেশের মানুষের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ এবং ঐতিহ্য সচেতনতা সৃষ্টি; স্বাধিকার বোধ জাগ্রত করা এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও সাম্যবাদী চেতনা সৃষ্টিতে এই সংগঠনগুলো ও তাদের কর্মকাণ্ড কমবেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।' (মোরশেদ ২০১৪ : ১৬৪)

বাংলা নববর্ষ পালন

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর থেকে পূর্ব বাংলায় ভাষা কেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ প্রায় সর্বাত্মক রূপ লাভ করে। কিন্তু ১৯৫৮ সাল থেকে সামরিক স্বৈরশাসন কায়েমের মধ্য দিয়ে রাজনীতি ও সংস্কৃতি উভয় শাখাতেই পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী চেতনা কমবেশি বাধাগ্রস্ত হয়। এই কালপর্বটি বিশেষত মূলধারার জাতীয়তাবাদী রাজনীতির এক অবরুদ্ধ সময়। জাতীয়তাবাদী রাজনীতির এই অবরুদ্ধতার কালে বাধাগ্রস্ত হলেও সংস্কৃতি চর্চাই জাতীয়তাবাদী চেতনার ধারণ ও বিকাশের প্রধান আশ্রয় হয়ে উঠেছে। বিশেষত ষাটের দশকে এসেই পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি চর্চায় একের পর এক যেন নতুন নতুন অনুষঙ্গ এসে যোগ দিয়েছে। এই দশকে এসেই রবীন্দ্রনাথ নতুনভাবে যুক্ত হলেন পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ধারায়। আবার এই দশকে এসেই নতুনভাবে শুরু হলো বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন। আবহমান কাল ধরে গ্রাম বাংলায় বিচিত্র মেলা, হালখাতা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নববর্ষ পালিত হলেও ৬০-এর দশকে এসে পূর্ব বাংলায় বিশেষত নাগরিক পর্যায়ে জাতীয়তাবাদী চেতনার অংশ হিসেবে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন শুরু হয়। আর ব্যাপকভাবে পূর্ব বাংলায় নববর্ষ পালনের প্রচলন হয় ১৯৬৪ সাল থেকে। ১৯৬৪ সালের 'এই পটভূমিতে ১৯৬৬ সালে নববর্ষ নতুন উদ্দীপনা ও জঙ্গীপনা নিয়ে পালিত হয়। ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-এর পক্ষ থেকে প্রকাশ্য জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল প্রভাতফেরি। রাজপথে এতে ছাত্র-জনতার ঢল নামে। অভাবিত লোক-সমাবেশে ও প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টির কারণে সরকারও বিচলিত হয়ে ওঠে।' (মোহাম্মদ হাননান ২০০৬ : ৩১৩) এইভাবে নববর্ষ পালনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার নাগরিক সমাজ পাকিস্তান রাষ্ট্রের ইসলামি সংস্কৃতির বিপরীতে ধর্মনিরপেক্ষতার সংস্কৃতির জানান দিয়েছিল। কীর্তন-পদাবলি পরিবেশন, মেয়েদের বিশেষ সাজসজ্জা, নৃত্য-গীতাদির মধ্য দিয়ে নববর্ষ পালন করে পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য জানান দিয়েছিল পূর্ব বাংলার সচেতন মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজ। অর্থাৎ সেদিন নববর্ষ পালন পূর্ব বাংলার জনগণের জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার অন্যতম উপাদান হয়ে উঠেছিল। একারণেই বোধ করি ষাটের দশকের এই নববর্ষ উদ্‌যাপন পাকিস্তানপন্থিদের পাকিস্তানি তাহজিব-তমদ্দুন বিরোধী বিষয় হিসেবে সেদিন যথেষ্ঠ সমালোচনার শিকার হয়েছিল।

বাংলা প্রচলন সপ্তাহ এবং ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ উদ্‌যাপন

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর ভাষাকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রবলতা পূর্ব বাংলায় দিন দিন বেড়েই চলছিল– একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। বিশেষত ষাটের দশকের প্রথমার্ধের মূলধারার রাজনীতির প্রায় অনুপস্থিতির কালে ভাষাকেন্দ্রিক তীব্র আবেগ পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠীকে জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেয়নি। বরং এই ভাষাকেন্দ্রিক তীব্র আবেগ পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠীকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় ধরে রেখেছে। একারণে লক্ষ করি, ২১শে ফেব্রুয়ারিকে সামনে রেখে ১৯৬৩

Dhaka University Institutional Repository

সালের ১৪ই থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলা ছাত্রলীগ 'বাংলা প্রচলন সপ্তাহ' পালনের ঘোষণা দেয়। 'এ উপলক্ষে সংগঠনটির পক্ষে প্রচারপত্র প্রকাশ ও অন্যান্যভাবে প্রদেশবাসীর প্রতি নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মর্যাদা সমুন্নত রাখার আহ্বান জানানো হয়।' (মোরশেদ ২০১৪ : ১৭১) 'বাংলা প্রচলন সপ্তাহ' শুরু হয় মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রধান সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের ইংরেজি ভাষার পক্ষে দেয়া বিবৃতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে। তিনি তাঁর এক বক্তব্যে ইংরেজিকে আরো ২৫ বছর শিক্ষার মাধ্যমে রাখার কথা বলেছিলেন। তাঁর এই বক্তব্যকে ছাত্র সমাজ বাংলার বিরুদ্ধে অবস্থান বলে গণ্য করেছিল। তারা সেদিন মনে করেছিল উর্দুকে দিয়ে এক সময় যেমন বাংলাকে আড়াল করার প্রচেষ্টা সরকার করেছিল, এটিও তারই একটি অংশ। এবার ইংরেজি দিয়ে বাংলাকে আড়ালের প্রচেষ্টা চলছে। ফলে ইংরেজির বিরুদ্ধে ছাত্রদের অবস্থান ছিল উর্দুর বিরুদ্ধে অবস্থানেরই নামান্তর। 'বাংলা প্রচলন সপ্তাহ'-এ ছাত্ররা বিভিন্ন যানবাহনের কাচে যে স্টিকার সেঁটে দিয়েছিল তাতে লেখা ছিল 'একটি বাংলা অক্ষর একজন বাঙালির জীবন'। এই শ্লোগান পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে যেমন প্রকাশ করেছিল, তেমনি প্রদেশব্যাপী ছাত্রসমাজের মধ্যে ভাষাকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে আরো বেশি সংহত ও বিস্তৃত করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

একইভাবে ১৯৬৩ সালের ২রা থেকে ২৮শে সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-সপ্তাহ' উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানও ভাষাকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ। কারণ এই আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে দেশবাসীকে কৌতূহলী করা, এর প্রতি দেশবাসীকে শ্রদ্ধাবান করে তোলা ও ঐতিহ্য সচেতন করে তোলা। আয়োজনটিতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্যের ইতিহাস, লেখচিত্র, ছবি, পুরনো পুঁথি, কবিদের বাণী ইত্যাদির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। আয়োজনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগকেন্দ্রিক হলেও তা ছিল সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ব্যাপক আগ্রহ নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং প্রদর্শনী দেখেন। ব্যাপক সংখ্যক মানুষের এই সমাগম সাধারণ মানুষের বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী চেতনারই প্রকাশ। মুহম্মদ আবদুল হাই যথার্থই বলেছেন–

> শিক্ষাবিষয়ক অনুষ্ঠানে সর্বস্তরের মানুষের এত বিপুল সমাবেশ যে হতে পারে, তা ধারণাতীত ছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের যে কত দরদ, তা আরেকবার প্রমাণিত হলো।' (মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৯৪ : ১০৯)

প্রকৃতপক্ষে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে অস্ফুট বিকাশ শুরু হয়েছিল সে-কালে, তাই টেনে নিয়ে গেছে সবাইকে অনুষ্ঠানের দিকে।' (সাঈদ-উর ২০০১ : ৮৩)

নজরুল একাডেমীর প্রতিষ্ঠা ও জাতীয়তাবাদী কাউন্টার

১৯৬১ সালে পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন এবং এর পর থেকে পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্রনাথের প্রায় পুনর্জন্মের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের কাউন্টার সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয় কাজী নজরুল ইসলামকে। সন্‌জীদা খাতুনের ভাষায় 'আটষট্টি সালে নজরুলকে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দাঁড়

Dhaka University Institutional Repository

করাবার পরিকল্পিত চেষ্টা হলো নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে।' (সন্‌জীদা ২০০৪ : ৪০) অর্থাৎ পূর্ব বাংলায় ছায়ানট এবং অপরাপর ব্যক্তি ও সংগঠনের তৎপরতার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ যখন শিল্পসাহিত্য-সচেতন মানুষের কাছে জাতীয়তাবাদী চেতনার আইকন হয়ে উঠছিলেন, ঠিক তখনই নজরুলকে তার বিপরীত জাতীয়তাবাদী চেতনার আইকন হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়। এই চেষ্টার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন রাষ্ট্র ক্ষমতার খুব কাছাকাছি অবস্থান করা ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে পূর্ব বাংলার সেইসব কবি-সাহিত্যিক যাঁরা তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের 'আদর্শ'-কে ধারণ ও লালন করতেন। এমনকি খোদ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানও এ ব্যাপারে অলক্ষ্যে থেকে প্রণোদনা ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন।

১৯৬৪ সালে নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে এর কার্যনির্বাহী কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সুফিয়া কামাল ও সিরাজউদ্দীন হোসেনসহ ইব্রাহীম খাঁ, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, খান মুহম্মদ মঈনউদ্দীন, তালিম হোসেন, কাজী দীন মুহম্মদ, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, হাসান জামান, ফেরদৌসী রহমান প্রমুখ। পরবর্তীতে অবশ্য এঁদের অনেকেই এই কমিটি থেকে সরে আসেন। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ১৯৬৮ সালের ২৪শে মে নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে আয়োজিত একটি সভার মধ্য দিয়ে। সেদিনের সভায় রাষ্ট্রের একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। বাণী পাঠিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানসহ আরো অনেকে।

নজরুল একাডেমী নজরুলকেন্দ্রিক একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হলেও এর উদ্দেশ্য-আদর্শ ছিল পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। এ বিষয়ে পূর্বেই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির গঠনতন্ত্র দেখলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। নজরুল একাডেমীর গঠনতন্ত্রে প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে এর ৩নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–

(ক) মহান কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাবমূর্তি এবং আদর্শকে সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত ও জাগরূক রাখা।

(খ) পাকিস্তানের মন-মানসে ও সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এদেশের স্বকীয় চারিত্র্য ও ধ্যান ধারণার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ আধুনিক ও প্রগতিশীল ভাবধারাকে সম্পৃক্ত ও সুসমন্বিত করা।

(গ) মুসলিম ঐতিহ্যের ভিত্তিতে পাকিস্তানী সংস্কৃতির নির্মাণ ও সংরক্ষণ। (রেজোয়ান ২০০৬ : ১৫৭)

১৯৬৮ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে নজরুল একাডেমীর পক্ষ থেকে আইয়ুব খানের সম্মানে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আইয়ুব খান তাঁর ভাষণে যা বলেন, তার সঙ্গে রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ও একাডেমীর গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দারুণ মিল লক্ষ করা যায়–

> এককথায় যদি আমাদের জনসাধারণ তাঁদের মৌলিক অনুপ্রেরণাসমূহ উপলব্ধি করে এবং সেগুলো তলিয়ে দেখে, এবং তাদের ইতিহাস ও সেই ইতিহাসের তাগিদ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়, তাহলে দেশব্যাপী জনসাধারণের ব্যাপক সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হবে। (রেজোয়ান ২০০৬ : ১৬৩)

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ নজরুলকে মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে একাকার করে 'দেশব্যাপী জনসাধারণের ব্যাপক সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত' করাই ছিল মূলত নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য।

কিন্তু এই উদ্দেশ্য বেশিদিন সার্থক হয়নি। পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমানরা নজরুলকে আইয়ুব খানের ও নজরুল একাডেমীর ঘোষিত আদর্শ মোতাবেক নেয়নি। একারণে ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানের পর নজরুল একাডেমীর পাকিস্তানবাদী তৎপরতা প্রায় নিষ্ক্রিয়তার পর্যায়ে চলে যায়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামের তীব্র তোড়ে নজরুলের তথাকথিত সাম্প্রদায়িক পাঠ ভেসে যায়। পরবর্তীতে অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের সময় নজরলকে পূর্ব বাংলার মানুষ ইসলামি ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত না করে বরং তাঁকে আধিপত্যবাদ আর শোষণের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে।

পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক তৎপরতা

পূর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী ধারার নানা সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই ধারার সংগঠন প্রতিষ্ঠা বেড়েছে বৈ কমেনি। এর সঙ্গে যুক্ত সাহিত্যিক-কর্মীরাও বেশ সরব ও সক্রিয় ছিলেন। এমনকি ভাষা আন্দোলনের পরও জাতীয়তাবাদী এসব সাংস্কৃতিক সংগঠনের তৎপরতা মোটামুটি অব্যাহত ছিল। পূর্ব বাংলাকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর কাউন্টার সংগঠন হিসেবে বেশ কিছু সংগঠন ভাষা আন্দোলনের পরেও সক্রিয় ছিল। এসব সংগঠন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সম্মেলনও করেছে। কিন্তু ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের পর থেকে প্রায় পুরো ষাটের দশকব্যাপী পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর উল্লেখযোগ্য কোনো তৎপরতা চোখে পড়ে না। আবার নতুন করেও তেমন কোনো সংগঠনও এসময়– বিশেষত ষাটের দশকে– ব্যতিক্রম ছাড়া তেমন চোখে পড়ে না। এসময়ের দুটি সংগঠনের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। একটি রওনক সাহিত্য সংস্থা (১৯৫৮) এবং অন্যটি নজরুল একাডেমী (১৯৬৪)। প্রথমোক্ত সংগঠনটি মাত্র আড়াই বছরের মতো সময় সক্রিয় ছিল। 'রওনকের অস্তিত্ব ১৯৬১ সালের দিকে বিলুপ্ত হয়ে যায়।' (রেজোয়ান ২০০৬ : ১০৯) আর নজরুল একাডেমীও যে খুব একটা উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারেনি তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। সাংগঠনিকভাবে খুব একটা তৎপরতা দেখাতে না পারলেও পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী ধারার কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা তাঁদের ব্যক্তিগত রচনার মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে প্রকাশের ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। সংগত কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে, এক সময়ের খুবই সক্রিয় সাংস্কৃতিক ধারার সংগঠন ও এর তৎপরতা ষাটের দশকে এসে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল কেন। এর দুএকটি কারণ নির্দেশিত হয়েছে রেজোয়ান সিদ্দিকীর (২০০৬) গ্রন্থে। তিনি রওনক সাহিত্য সংস্থার টিকে না থাকার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, 'এর সাংগঠনিক কাঠামোর অভাব'-এর কথা। তিনি আরো বলেন–

> তাছাড়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এর উদ্যোক্তারা সমাজে নানাভাবে প্রতিষ্ঠা পান। সেই অবস্থায় ব্যাপক কোন সাহিত্য আন্দোলনের উদ্যোগ গ্রহণ এদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অপরদিকে অপেক্ষাকৃত তরুণদের সম্পর্কে এদের মনোভাবে কিছুটা তাচ্ছিল্যের ভাবও ছিল বলে মনে হয়। তার কারণ, এরা ভাবতেন, তরুণরা পাকিস্তান আন্দোলনের অংশীদার ছিল না। ফলে তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত নয়। এতে সংগঠনের ব্যাপ্তি বাধাগ্রস্ত হয়। (রেজোয়ান ২০০৬ : ১০৯)

Dhaka University Institutional Repository

এই কারণগুলো শুধু রওনক সাহিত্য সংস্থা নয়, ষাটের দশকের পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী ধারার অপরাপর সাংস্কৃতিক তৎপরতা ও সাংগঠনিক তৎপরতা ঝিমিয়ে পড়ার পেছনেও হয়ত ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু পাশাপাশি এটাও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার যে, ষাটের দশকের প্রথম দিকে স্বৈরশাসনের একক দাপটে অন্যসব তৎপরতা প্রায় বিলীন হয়ে গিয়েছিল। স্বৈরশাসন ছিল প্রায় নির্দ্বন্দ্ব। স্বৈরশাসনের সেই অর্থে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনাঋদ্ধ নিত্যকার সাংস্কৃতিক সাংগঠনিক তৎপরতার সমর্থন প্রয়োজন হয়নি। আর ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে যখন প্রয়োজন পড়েছে, তখন পূর্ব বাংলার বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম এবং সাংস্কৃতিক জাগরণ এত তীব্র রূপ ধারণ করেছে যে, পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী ধারার কোনো সাংস্কৃতিক সংগঠনই সক্রিয় হতে পারেনি। ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে এই ধারার সাহিত্য-ব্যক্তিত্বদের সক্রিয়তা লক্ষ করা যায় শুধু বাঙালি জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক ধারার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ইতউতি বিরোধিতার মধ্যে।

পরিশেষে বলা যায়, ষাটের দশক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার এক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার দশক। আবার এই ষাটের দশকই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ-প্রকাশ-পরিণতির দশক। সংঘর্ষ-সংকটে যেমন প্রাণের স্ফুর্তি তেমনি ষাটের দশকের বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাও সংঘর্ষে-সংকটে পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছিল পূর্ব বাংলার জনমনে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক যাবতীয় কর্মকাণ্ড জাতীয়তাবাদী চেতনাকে শাণিত আর অব্যর্থ করে তুলেছিল এই ষাটের দশকে। 'আমরা বুঝতে পারি সে-এক আশ্চর্য সময় এসেছিল আমাদের জীবনে যখন নিবিড় অন্ধকারেও ফুটে উঠছিল আলোর ইশারা এবং বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন প্রয়াস ও ছোট-বড় নানা ঘটনা মিলিয়ে দেশ ক্রমে যেন তৈরি হয়ে উঠছিল বড় ধরনের পরিবর্তনের জন্য, তারপর যখন ডাক এলো ইতিহাসের পালাবদলের কী প্রবলভাবেই না বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই দায় মেটাতে! এভাবেই তো আমরা চিহ্নিত করতে পারি ষাটের দশককে।' (মফিদুল ২০১৪ : ৫৯)

টীকা

১. ১৯৪৬ সালের এই নির্বাচনটি ছিল মূলত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন। এই নির্বাচন সম্পর্কে নির্বাচনকালীন হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দির রাজনৈতিক সচিব মাহমুদ নূরুল হুদা বলেন– 'এই নির্বাচনে ভারতে যে ভোটযুদ্ধ হয়েছিল, তা সাধারণভাবে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে। কংগ্রেসের নির্বাচনী শ্লোগান ছিল স্বাধীন ও অবিভক্ত ভারত। মুসলিম লীগের শ্লোগান ছিল লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক ভারতের দুই প্রান্তে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। ... তবে বর্তমানকালের নির্বাচন থেকে পৃথক ১৯৪৬ সালের নির্বাচন ছিল পাকিস্তান ইস্যুর ওপর ভিত্তি করে। বাংলার মুসলমান আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে সকলেই পাকিস্তানের জন্য যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল।' (মাহমুদ নূরুল ২০১১ : ৯৪) অনেকে মনে করেন, '১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বাঙালিদের বিপুল ভোটদান ও সর্বাত্মক সমর্থন ব্যতীত পাকিস্তান রাষ্ট্র আদৌ প্রতিষ্ঠিত হতো কিনা সন্দেহ।' (হারুন ২০১৬ : ৩৭)

২. যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট কয়েকটি দফা নিম্নরূপ:

দফা দুই: বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে। উচ্চহারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হইবে এবং সার্টিফিকেটযোগে আদায়ের প্রথা রহিত করা হইবে।

দফা তিন : পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ করতঃ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়া পাট চাষীদের পাটের ন্যায্য মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা আমলের পাট কেলেংকারী তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

দফা চার : কৃষির উন্নতির জন্য সমবায় কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইবে এবং সরকারী সাহয্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হইবে।

দফা পাঁচ : পূর্ব পাকিস্তানকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির শিল্পের ও বৃহৎ শিল্পের লবণ তৈরির কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং লবণ কেলেংকারীর জন্য দায়ী মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার সদস্যদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

দফা ছয় : খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের হাত হইতে রক্ষা করা হইবে।

দফা সাত : পূর্ব পাকিস্তানকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করিয়া ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া শিল্প ও খাদ্যে স্বাবলম্বী করা হইবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

দফা আট : শিল্পী ও কারিগর মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করা হইবে।

দফা নয় : দেশে একযোগে প্রাথমিক, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

দফা উনিশ : ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বশাসিত ও ‘সভেরন’ করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রাব্যবস্থা ব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয় অবশিষ্টাত্মক (residuary power) ক্ষমতাসহ পূর্ব পাকিস্তানে নৌ-বাহিনীর হেড কোয়ার্টার স্থাপন এবং অস্ত্র তৈরীর কারখানা নির্মাণ করতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইবে। আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হইবে। (অলি আহাদ ২০১২ : ১৮২-১৮৪)

এছাড়াও বাকি দফাগুলোর অনেকগুলোতেই অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে অর্থনৈতিক বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে।

৩. আতাউর রহমান খানের ভাষ্য লক্ষ করা যাক–

> সারা দেশ শঙ্কিত হয়ে গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় ও হঠকারিতায় আমরা বিমূঢ় হয়ে গেলাম। জনগণের অবসংবাদিত নেতা– পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা, গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী, এই বৃদ্ধ বয়সে স্বৈরাচারী শাসকের নির্দেশে কারাবরণ করতে বাধ্য হলেন? কোন দোষে?
>
> যে আশার আলো আমাদের চোখের সামনে জ্বলে উঠেছিল মাত্র কয়েকটি দিন আগে, তা ধপ করে নিভে গেল। চারদিক যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। অন্ধকার নেমে এল রাজনৈতিক আকাশে। আমাদের সংগ্রাম কি বন্ধ হয়ে গেল?
>
> কিন্তু সংগ্রাম যে শুরুই হয়নি। শুধু পাঁয়তারা চলছিল। প্রস্তুতির পক্ষে দু-একটি পদক্ষেপ মাত্র। আয়ুব সরকার অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিল। এই সংগ্রাম কবে শুরু হবে– হবেই কিনা কে বলতে পারে। (আতাউর ২০০১ : ১২৫)

৪. আতাউর রহমান খানের ভাষ্য লক্ষ করা যাক–

> মোকদ্দমাগুলি তুলে নেয়া হয়। বিভিন্ন দলের কর্মীরাও সন্তোষ প্রকাশ করল। সঙ্গে সঙ্গে তারা নেতাদের উপরও চাপ দিল যে, এই ঐক্য যেন অটুট থাকে। প্রয়োজন হলে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালাতে হবে। বিচ্ছিন্ন থাকলে একে একে সবই শিকারে পরিণত হবে। গণঐক্যের এই ছিল প্রথম সূচনা। বাঙালি এক হতে পারে না। ... আমরা এই অপবাদ মিথ্যা প্রমাণিত করার প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করলাম। (আতাউর ২০০১ : ৩৩)

৫. আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে ক্ষমতা দখলের অব্যবহিত পরেই ৩০শে ডিসেম্বর শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য একটি কমিশন গঠন করার ঘোষণা দেন। সেই মোতাবেক পশ্চিম পাকিস্তান শিক্ষাবিভাগের সচিব এবং আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে আইয়ুব খানের শিক্ষক এস.এম. শরিফকে চেয়ারম্যান করে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনের কার্যক্রম ১৯৫৯ সালের ৫ই জানুয়ারি স্বয়ং আইয়ুব খান উদ্বোধন করেন। এই কমিশনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৬ জন এবং পূর্ব বাংলা থেকে ৪ জন সদস্য নিয়োগ করা হয়। এই কমিশনের সুপারিশসমূহ গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। কমিশনে বেশ কিছু বিতর্কিত বিষয়ের সুপারিশ করা হয়। যেমন– সুপারিশে বলা হয়–

ক) বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে আমরা অতীব জোরের সহিত সুপারিশ করিতেছি যে, স্নাতক ডিগ্রী কোর্সকে সম্প্রসারণ করিয়া তিন বছর মেয়াদী করা উচিত হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

খ) পাকিস্তানের জাতীয় ভাষার জন্য যদি একটি সাধারণ বর্ণমালা প্রবর্তন করিতেই হয় তাহা হইলে পবিত্র কোরান যাহাতে লেখা এবং যাহা সকল মুসলমানই পাঠ করে সেই আরবীয় (নাস্‌খ্) দাবি কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।

গ) আমরা মনে করি যে, একদিকে উর্দু ও বাংলা বর্ণমালাসমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন করা উচিত এবং অপরদিকে রোমান বর্ণমালায় এমন একটি আকারের উদ্ভব ও মান নির্ধরণ করা উচিত যাহা পাকিস্তানী ভাষাসমূহকে অক্ষরান্তর করার উপযোগী হইবে।

ঘ) উর্দুকে মুষ্টিমেয় লোকের পরিবর্তে জনগণের ভাষায় পরিণত করিতে হইবে। (মোহাম্মদ হাননান ২০০৬ : ২৪৮-২৫০)

শুধু তাই নয়, এই শিক্ষানীতির সুপারিশের মর্ম উদ্‌ঘাটন করে অনেকে বলেছেন, এটি বড় লোকের জন্যই শুধু শিক্ষাকে খোলা রাখার ব্যবস্থা করেছে। 'এতে দরিদ্র পিতার সন্তান মেধাবী হলেও শিক্ষার দ্বার তার জন্যে বিলাসিতা বলেই গণ্য হয়।' এই শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে বিশেষত পূর্ব বাংলায়।

৬. ১৯৬৬ সালে হামুদুর রহমান কমিশন গঠিত হয় মূলত শরিফ কমিশনকে কেন্দ্র করে সংঘটিত ছাত্র আন্দোলনের কারণ

অনুসন্ধান এবং শরিফ কমিশনের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করার জন্য। এই কমিশনের মুদ্রিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। এই প্রতিবেদনে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের আন্দোলন সম্পর্কে বলা হয়–

... সকল ছাত্র-অসন্তোষকে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও বৈরীভাবাপন্ন মনে করার মানসিকতা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আমরা যারা ছাত্রদের মঙ্গলার্থী অথবা যারা মনে করি ছাত্রদের আন্দোলনে যাওয়া উচিত নয়, তাদের উচিত সময়মতো এবং দ্রুততার সঙ্গে ছাত্রদের ক্ষোভ ও অভিযোগে (রক্ত ঝরার পূর্বেই) মনোযোগ দেওয়া। এ ধরনের বিলম্বিত ও দমনমূলক কার্যক্রম, ছাত্রদের এই বিশ্বাসকেই শুধু দৃঢ়তর করে যে, তাদের সমস্যাদি কেবলমাত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই আদায় হতে পারে এবং তা মূলত এসবের মধ্যদিয়ে যারা নেতা হয়েছে তাদের আন্দোলনের উপকরণে বিরাট শক্তি যোগায়।

আমাদের মতে, যদি আমরা ছাত্র-বিক্ষোভ বন্ধ করতেই চাই, তাহলে আমাদের উচিত (ক) ছাত্ররা যাতে আন্দোলন করার মতো সত্যিকারের কোনো ইস্যু না পায় তার ব্যবস্থা করা এবং (খ) সব একসঙ্গে দূর না করতে পারলেও বিক্ষোভের মূল কারণসমূহ যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রণ করা। (মোহাম্মদ হাননান ২০০৬ : ২৮৯)

হামুদুর রহমান কমিশনের প্রতিবেদনে ছাত্রদের আন্দোলনকে এভাবে সহানুভূতির সঙ্গে দেখা হয়। যদিও একই রিপোর্টে নানা বিরূপ মন্তব্যও প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া এই কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষা বিষয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শরিফ কমিশনের প্রতিবেদনকে সমর্থন করা হয়। একারণে ছাত্ররা এই কমিশনের বিরুদ্ধেও আন্দোলন গড়ে তোলে এবং এই কমিশনের রিপোর্ট ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করে।

৭. যে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় সেই লাহোর প্রস্তাবের মূলে বলা হয়েছিল (ক) ভৌগোলিক দিক থেকে

সংলগ্ন এলাকাগুলোকে পৃথক অঞ্চল বলে গণ্য করতে হবে। (খ) এ সকল অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা প্রয়োজনমত পরিবর্তন করে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যেসকল স্থানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(গ) এ সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হবে সার্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত। স্বায়ত্তশাসন বলতে বোঝায় 'স্বশাসন বা স্ব-আয়ত্তের শাসন।

... কোনো পরাধীন দেশ স্বায়ত্তশাসন চাইতে পারে। আবার একই দেশের ভেতরে কোনো অঞ্চল বা প্রদেশ বা জাতিসত্তা নিজেদের স্বকীয়তা ও অধিকার রক্ষার্থে স্বায়ত্তশাসন দাবি করতে পারে।' (হারুনুর রশিদ ২০০০ : ৪১৭) কিন্তু লাহোর প্রস্তাব মোতাবেক পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়নি। অঙ্গরাজ্যগুলোর স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি হয়েছে ভূলুণ্ঠিত। এরই সুযোগ নিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকচক্র। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে পূর্ব বাংলা মূলত পরিণত হয় পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশে। এর বিরুদ্ধে শুরু থেকেই সোচ্চার থেকেছে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। কিন্তু এই স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে বড় কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। স্বায়ত্তশাসনের দাবি পরিচ্ছন্ন, সুনির্দিষ্ট ও তীব্রভাবে প্রথম উত্থাপিত হয় ছয় দফার মধ্যে। ছয় দফার দফা ছয়টি দেখলে সেটি স্পষ্টতই বোঝা যায়। ছয় দফা ছিল নিম্নরূপ–

প্রস্তাব-১

Dhaka University Institutional Repository

দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এমনি হতে হবে যেখানে পাকিস্তান হবে ফেডারেশন ভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং তার ভিত্তি লাহোর প্রস্তাব। আইন পরিষদের ক্ষমতা হবে সার্বভৌম এবং পরিষদও নির্বাচিত হবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণের সরাসরি ভোটে।

প্রস্তাব-২

কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা কেবলমাত্র দুটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে, যথা– দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

প্রস্তাব-৩

মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত যে কোনো একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা চলতে পারে:

(ক) দুটি পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু করা যেতে পারে।

অথবা

(খ) সমগ্র দেশের জন্যে একটি মুদ্রা চালু করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে এমন কার্যকর শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচারের পথ বন্ধ হয়। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভের পত্তন করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে পৃথক আর্থিক ও অর্থবিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

প্রস্তাব-৪

ফেডারেশনের অঙ্গরাজ্যগুলির কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনরূপ কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্যে অঙ্গরাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অঙ্গরাষ্ট্রগুলির সব রকম করের শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

প্রস্তাব-৫

(ক) ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে।

(খ) বহির্বাণিজ্যের মধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এখতিয়ারাধীন থাকবে।

(গ) কেন্দ্রের জন্যে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত হারে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিই মেটাবে।

(ঘ) অঙ্গরাষ্ট্রগুলির মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদির চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোনো বাধা-নিষেধ থাকবে না।

(ঙ) শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্ব-স্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা

দিতে হবে।

প্রস্তাব-৬

আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্যে শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীন আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে '৬ দফার মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানকে একটি কনফেডারেশনে পরিণত করতে চেয়েছিলেন, যাতে পূর্ব পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক অবস্থার অবসান ঘটে, অথচ পাকিস্তান অটুট থাকে।' (রফিকুল ২০১৬ : ৭৪)

৮. ছয় দফার প্রচারাভিযানে আওয়ামী লীগের অনেক বড় বড় নেতা অংশগ্রহণ করেননি। শুধু তাই নয়, আবুল মনসুর আহমদ, আতাউর রহমান খান, মানিক মিয়া, জহির উদ্দীনসহ আরো অনেকে ছয় দফার বিরুদ্ধে প্রচারণা করেছেন। ছয় দফা সংবাদপত্রে না ছাপানোরও সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। অলি আহাদ জানাচ্ছেন– ' শেখ মুজিব প্রদত্ত ৬ দফা সংবাদ পত্রে প্রকাশ না করতে সর্ব জনাব আবুল মনসুর আহমদ, আতাউর রহমান খান ও মানিক মিয়া একমত হন এবং সে মতে মানিক মিয়া তার পত্রিকা দৈনিক ইত্তেফাকে তা প্রকাশ করেননি।' (অলি ২০১২ : ২৮৪) অধিকন্তু পিডিএম-এর পক্ষ থেকে ১৯৬৬ সালের ১০ই মার্চ সাত দফা প্রকাশ করা হয়। অবশ্য পিডিএম (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট)-এ থাকা না থাকা নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান ও এঁদের মধ্যে আগে থেকেই মতান্তরের সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিরোধিতা হয়ত

Dhaka University Institutional Repository

তারই বহিঃপ্রকাশ। যাহোক, প্রাদেশিক কাউন্সিল মুসলিম লীগের দু'জন নেতা (জেনারেল সেক্রেটারী শফিকুল ইসলাম ও এম.এন. এ. খাজা খায়রুদ্দিন) এক সাংবাদিক সম্মেলনে ৬ দফাকে 'বিপজ্জনক' বলে অভিহিত করেন। নিখিল পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী মাহমুদুল হক উসমানী ৬ দফার বিরোধিতা করেন। এবিষয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, 'ছয়-দফা নিশ্চিতভাবেই দেশের সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করবে'। পূর্ব পাকিস্তানের আইন ও পার্লামেন্টারী দফতরের মন্ত্রী আবদুল হাই চৌধুরী ৬ দফার বিরুদ্ধে বিবৃতি দিতে গিয়ে একে তিনি 'দেশদ্রোহিতার নামান্তর' বলে অভিহিত করেন। (আবদুল হক ১৯৯৬ : ১১০, শ্যামলী ২০০৭ : ১৩২) আওয়ামী লীগের ছয় দফা প্রচারিত হওয়ার পরপরই ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টি ১৪ দফা কর্মসূচি পেশ করেছিল। তাদের কর্মসূচির শিরোনাম ছিল '১৪ দফা জাতীয় মুক্তির কর্মসুচি'।

৯. আইয়ুব সরকার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেও ছাত্রদের নেতৃত্বে গণ অভ্যুত্থান শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ১১ দফা মাওলানা ভাসানী সমর্থন করেননি। এবিষয়ে ১৯৬৯-এর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ও তৎকালীন ডাকসুর সহসভাপতি ছাত্রলিগ নেতা তোফায়েল আহমেদ বলেন—

> আমরা মরহুম জননেতা মাওলানা ভাসানী সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি। তিনি গম্ভীর থাকলেন কতক্ষণ। অতঃপর তিনি আমাদের বললেন আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯) খুলনায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সম্মেলন। সেই সম্মেলনে আমরা সিদ্ধান্ত নেবো এগারো দফা সমর্থন করবো কি করবো না। অবশ্য ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি, তার আগেই (সম্মেলনের) তারা আমাদের এগারো দফা সমর্থন করেছিলেন এবং সংগ্রামের মাঝপথে অংশগ্রহণও করেছিলেন। (তোফায়েল ১৯৯৭ : ১৮)

১০. ১১-দফা দাবিতে ছাত্র সংগ্রাম কমিটির যাঁরা স্বাক্ষর করেন তাঁরা হলেন—

(ক) আবদুর রউফ, সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ

(খ) খালেদ মোহাম্মদ আলী, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ

(গ) সফিউদ্দিন আহমেদ মানিক, সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)

(ঘ) শামসুদ্দোহা, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)

(ঙ) নূরুল হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)

(চ) নূর মোহাম্মদ খান, প্রচার সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)

(ছ) তোফায়েল আহমেদ, সহ-সভাপতি, ডাকসু

(ঝ) নাজিম কামরান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, ডাকসু

এছাড়া পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)-এর দীপা দত্ত এবং এন. এস. এফ-এর ফকরুল ইসলাম মুন্সি ছাত্র সংগ্রাম কমিটির বিকল্প সদস্য ছিলেন। (মোহাম্মদ হাননান ২০১৩ : ৩৬৩)

১১. অধিকাংশ ইতিহাসে বলা হয়েছে, আইয়ুব খান ইয়াহিয়ার কাছে 'স্বেচ্ছায়' ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। যদিও সবারই জানা যে, তিনি গণ অভ্যুত্থানের মুখে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু আবুল কাসেম ফজলুল হক তাঁর gw3msMvg(২০১২) গ্রন্থে জানাচ্ছেন যে, '১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চে সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দিয়ে তিনি তিন মাসের ছুটি নেন। ... তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও আইয়ুব আর ক্ষমতায় আসেননি এবং এ সম্পর্কে আর কোনো ঘোষণাও দেওয়া হয়নি।' (আবুল কাসেম ২০১২ : ৮০)

সহায়কপঞ্জি

অলি আহাদ (২০০৪), RvZxq ivRbxwZ : 1945 †_‡K 75, ৪র্থ সংস্করণ, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ঢাকা।

আতাউর রহমান খান (২০০১), ˆ¯'ivPv‡ii 'k eQi, দ্বিতীয় সংস্করণ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

আফসান চৌধুরী (২০০৭), evsjv‡'k 1971, দ্বিতীয় খণ্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আবুল কাসেম ফজলুল হক (২০১২), gw3msMvg, চতুর্থ সংস্করণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

আবুল মনসুর আহমদ (১৯৯৯), †k‡i evsjv nB‡Z esMeÜ, পঞ্চম মুদ্রণ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

(২০০১), Avej gbmi Avng‘ iPbvejx, ৩য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আবদুল আজিজ বাগমার (১৯৯৯), ¯vaxbZvi ¯c : D‡b¥l I ARb, অপূর্ব সংসদ, ঢাকা।

আবদুল হক (১৯৯৬), †jL‡Ki †ivRbvgPvq Pvi ‘k‡Ki ivRbxwZ-cwiµgv, †cÿvcU : evsjv‡‘k (1953-ʹ93), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

আসাদ চৌধুরী (২০১৫), ‘সংস্কৃতির বিকাশধারা’, i³v³ evsjv (সংকলিত), ষষ্ঠ প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা।

এবিএম মূসা (২০১৫), Avgvi †ejv †h hvq, তৃতীয় মুদ্রণ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

কাজী আরেফ আহমেদ (২০১৪), evOwji RvZxq ivó, ইন্টারন্যাশনাল হিস্টোরিক্যাল নেটওয়ার্ক, ঢাকা।

কামরুদ্দীন আহমদ (২০০৪), evsjvi ga¨we‡Ëi AvZ¥weKvk, অখণ্ড সংস্করণ, ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন, ঢাকা।

কামাল হোসেন (২০০৫), ¯vqËkvmb †_‡K ¯vaxbZv : 1966-1971, দ্বিতীয় সংস্করণ, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা।

(২০১৬) gy³h× †Kb Awbevh wQj, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

খান সারওয়ার মুরশিদ (২০০১), Kv‡ji K_v, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

জহির রায়হান (২০১৫), ‘পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ’, i³v³ evsjv (সংকলিত), ষষ্ঠ প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা।

জহিরুল ইসলাম (২০১২), evsjv‡‘‡ki ivRbxwZ : AvIqvgx jxM I AvIqvgx jxM we‡ivax ivRbxwZ, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা।

তোফায়েল আহমেদ (১৯৯৭), EbmË‡ii MY Af¨Ìvb I e½eÜ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

নুরুল ইসলাম (২০০৭), evsjv‡‘k RwZ MVbKv‡j GK A_bxwZwe‡‘i wKQ K_v, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

নূহ-উল-আলম লেনিন (২০১৫), KwgDwb÷ cwUi BwZnvm cm½ I ‘wjjcÎ, ১ম খণ্ড, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

ফয়েজ আহ্মদ (২০০৬), ʹAvMiZjv gvgjvʹ, †kL gwRe I evsjvi we‡‘vn, তৃতীয় মুদ্রণ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

মওদুদ আহমদ (২০১৫), evsjv‡‘k : ¯vqËkvmb †_‡K ¯vaxbZv, (অনু. জগলুল আলম), পঞ্চম মুদ্রণ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

মফিদুল হক (২০১৪) evsjv‡‘‡ki gy³mvabv : UK‡iv K_vi Swc, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা।

মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯৯৪), gn¤§‘ Ave‘j nvB iPbvejx, (সম্পা. হুমায়ুন আজাদ) ৩য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মোরশেদ শফিউল হাসান (২০১৪), ¯vaxbZvi cUf‚wg : 1960 ‘kK, ২য় সংস্করণ, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা।

মোহাম্মদ ফরহাদ (১৯৮৯), EbmË‡ii MYAf¨Ìvb, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা।

মোহাম্মদ হাননান (২০০৬), evsjv‡‘‡ki QvÎ Av‡›‘vj‡bi BwZnvm, ৩য় মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

রফিকুল ইসলাম (১৯৭৪), ‘বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : সংক্ষিপ্ত রূপরেখা’, evsjv‡‘k (সম্পা. মনসুর মুসা), নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

(২০১৬), evsjv‡‘‡ki ¯vaxbZv msMvg, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

রণেশ দাশগুপ্ত (২০১৪), i‡Yk ‘vk¸ß iPbvmgM (সম্পা. সৌমিত্র শেখর), দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

রেজোয়ান সিদ্দিকী (২০০৬), ce evsjvi mvs¯‹…wZK msMVb I mvs¯‹…wZK Av‡›`vjb (1947-1971), জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা।

রেহমান সোবহান (২০০৭), Avgvi mgv‡jvPK Avgvi eÜ (iPbv msKjb), সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ, ঢাকা।

হারুন-অর-রশিদ (২০১৬), ‘Avgv‡`i evPvi ‘vexÕ 6 ‘dvÕi 50 eQi, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হারুনুর রশিদ (২০০০), ivRbxwZ‡Kvl, দ্বিতীয় সংস্করণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

হায়দার আকবর খান রনো (২০১২), kZvãx †cwi‡q, তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা।

শওকত ওসমান (২০১৫), ‘বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আন্দোলন’, i³v³ evsjv (সংকলিত), ষষ্ঠ প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা।

শ্যামলী ঘোষ (২০০৭), Avlqvgx jxM : 1949-1971, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

সন্‌জীদা খাতুন (২০০৪), ms¯‹…wZ-K_v mwnZ¨-K_v, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা।

সাঈদ-উর রহমান (২০০১), ce evsjvi ivRbxwZ-ms¯‹…wZ I KweZv, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ২য় সংস্করণ, ঢাকা।

(১৯৮৩), ce evsjvi mvs¯‹…wZK Av‡›`vjb : 1940-1982, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা।

সৈয়দ আকরম হোসেন (২০০৪), ‘বাংলাদেশ’, evsjv‡`k, (সম্পা. মনসুর মুসা), দ্বিতীয় সংস্করণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

Rounaq Jahan (2015) *Pakistan : Failure in national integration*, Third impression, The University Press Limited, Dhaka.

চতুর্থ অধ্যায়

ষাটের দশকের কবিতায় জাতীয়তাবাদী চেতনার রূপ ও রূপান্তর

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ষাটের দশকের কবিতায় জাতীয়তাবাদী চেতনার রূপ ও রূপান্তর

ষাটের দশকে বাংলাদেশের কবিতা যত বৈচিত্র্যকে ধারণ করেছে, এত বৈচিত্র্য অন্য কোনো সময়ে দেখা যায় না। কেউ কেউ বলে থাকেন, পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশের কবিতায় সৃজনশীলতার ঢল নেমেছিল। একথা সত্য। বাংলাদেশের কবিতা আধুনিকতাকে ধারণ করে নিজস্বতায় আত্মপ্রকাশ করে প্রথম প্রবল সুজনমুখর হয়ে ওঠে পঞ্চাশের দশকে। এই দশকেই বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের কবিরা প্রথম নির্দ্বিধ প্রকাশের সক্ষমতা আবিষ্কার ও অর্জন করেন। কিন্তু ষাটের দশকে এসে বাংলাদেশের কবিতা গত দুই দশকের অভিজ্ঞতা আর ষাটের তারুণ্যসহ হয়ে উঠেছে সর্বত্রগামী। চল্লিশ, পঞ্চাশ আর ষাটের দশকের কবিদের মিলিত সৃজন-কলতানে ষাটের দশকই বোধ করি বাংলাদেশের কবিতার সবচেয়ে শক্তিমান সময় উদ্‌যাপন করেছে। তিন দশকের কবিরাই এসময়ে তীব্রভাবে সৃজনমুখর। ষাটের দশক বাংলাদেশের কবিতার সেই মধ্যবর্তী দশক যখন পুরো বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাস এক জায়গায় মিলিত হয়ে সৃজনকলরবে মেতে উঠেছিল। একারণে বাংলাদেশের কবিতা ষাটের মতো আর কখনো এত বৈচিত্র্যের মুখোমুখি হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

এত বৈচিত্র্য আর এত কবির সম্মিলন ঘটা সত্ত্বেও ষাটের দশকে রচিত কবিতার মধ্যে একটি ঐক্য খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই ঐক্য রাজনৈতিকতার ঐক্য। এই দশকে বাংলাদেশের কবিতা সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক হয়ে উঠেছে। ষাটের দশকে নতুন-পুরাতন এমন কোনো কবি খুঁজে পাওয়া ভার হবে যিনি অল্পবিস্তর ষাটের উন্মাতাল রাজনীতির ঝাপটা কবিতায় মোকাবিলা করেননি। ষাটের কবিতায় কবিদের মোকাবিলাকৃত এই রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, এটি জাতীয়তাবাদী চেতনার রঙে রাঙানো। এই সময়ের কবিদের কবিতায় সমকালীন জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ঢেউ আছড়ে পড়েছে। এতে কবিদের অনেক কবিতার মেজাজ, আচরণ, উচ্চারণ, অলংকরণ ভিন্নতাপ্রাপ্ত হয়েছে। এই অধ্যায়ে ষাটের কবিতার এই জাতীয়তাবাদী রাজনীতি আর কবিতার রসায়ন আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়েছে। খুঁজে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে, ষাটের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে কিভাবে, কী মাত্রায় ষাটের কবিতা ধারণ করেছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ : ষাটের দশকের প্রথমার্ধের কবিতায় জাতীয়তাবাদী চেতনার স্বরূপ

বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাসে ষাটের দশক বোধ করি একমাত্র দশক যে দশকের কবিতা আলোচনার জন্যে একটি দশককে ভেঙে দুইভাগ করতে হয়। কারণ মাত্র দশ বছরের মধ্যে কবিতা এমন বাঁক পরিবর্তন করেছে যে, আলাদা না করে কোনো উপায় নেই। ষাটের প্রথম পাঁচ বছরের কবিতা দ্বিতীয় পাঁচ বছরের তুলনায় আলাদা। বলা বাহুল্য, মাত্র পাঁচ বছরের ব্যবধানে কবিতার মেজাজগত এই পরিবর্তনের মূলে রয়েছে সমকালীন রাজনীতি। ষাটের দশকের জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ষাটের কবিতাকে দুটি মেজাজ দিয়েছে। একারণে বর্তমান অনুচ্ছেদে ষাটের কবিতাকে দুইভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। প্রথমে ষাটের দশকের প্রথমার্ধের কবিতায় জাতীয়তাবাদী চেতনার স্বরূপ অনুসন্ধান করা হলো।

পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনাধারার পূর্বানুসৃতি

ষাটের দশকে এসে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী ধারার কবিতা রচনার প্রয়াসও অব্যাহত থেকেছে। কিন্তু এই ধারা ক্রমে শ্লথ ও নির্জীব হয়ে পড়েছে। ভাষা আন্দোলনের পূর্বেকার এই ধারার কবিতার মধ্যে যে একটা উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হতো তা আর দেখা গেল না। বিশেষত '১৯৫৪ সালের পর থেকে ধর্ম-নির্ভর সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রবক্তারা ক্রমশ নীরব হয়ে গেছেন।' (আবু হেনা ২০০১ : ৪০০/১) এর কারণ বহুমাত্রিক। ভাষা আন্দোলন-উত্তর নতুন প্রজন্মের কবিরা কবিতায় যে-আধুনিক জীবনচেতনাকে নতুন ভাষা ছন্দ আর অলংকারে প্রকাশ করেছেন, এই ধারার কবিরা সেই আধুনিকতাকে আত্মস্থ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। এটা বোধ হয় কালের নিয়মেই ঘটেছে এবং শিল্পসাহিত্যে ঘটেও থাকে। তাছাড়া নতুন প্রজন্মের কবিরা পূর্ব বাংলায় জাগ্রত নতুন জাতীয়তাবাদী চেতনার সঙ্গে গভীরভাবে লীন ছিলেন। তাঁরা উপহার দিয়েছেন প্রবল স্বাদেশিক চেতনার কবিতা। এই স্বদেশ ছিল মূলত পূর্ব বাংলা। কিন্তু পূর্বতন ধারার কবিরা তাঁদের কবিতায় মূলত স্বদেশের চেয়ে বিদেশ অর্থাৎ মুসলিম জাহানের দিকে তাঁদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রেখেছিলেন। যুগের, স্বদেশের, স্বজাতির ভাব-ভাষা-চৈতন্যকে তাঁরা প্রায় অগ্রাহ্য করেছেন। সেই পঞ্চাশের দশক থেকেই পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনাধারার কবিরা আধুনিক জীবনকে উপলব্ধি করতে ও রূপায়ণ

Dhaka University Institutional Repository

করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। শুধু আধুনিক জীবন নয়, তাঁরা পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমানের জীবনচিত্রণেও মনোযোগী হননি। একারণে পঞ্চাশের দশকের নতুন প্রজন্মের কবিরা তাঁদের পরিত্যাগ করেছিলেন। আর ষাটের দশকে এসে এঁরা প্রায় সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য হন। সমালোচকের ভাষায়–

> তাঁদের মুসলিম জাতিভিত্তিক সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ যতটুকু না মুসলিম জীবন-চিত্রণ প্রয়াসজাত তার চেয়ে বেশি ছিল ধর্মগত সাম্প্রদায়িকতা ও শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণ মানসিকতাজাত। এই ধর্মগত ধ্যান-ধারণা সমাজজীবনের প্রধান-দ্বন্দ্ব মূল-উত্থিত না হওয়ায় এবং প্রগতিশীল নয় বিধায়, তৎকালের এবং বিভাগ-পরবর্তী পূর্ববাংলার বুর্জোয়া ভাবাদর্শী ও মার্কসবাদী কবিগণ কর্তৃক পাঁচের দশকে হয়েছিল পরিত্যাজ্য। (সৈয়দ আকরম ১৯৮৫ : ৩৭)

ষাটের দশকে এসে তাঁদের কবিতার আর চেতনার ধারা জনবিচ্ছিন্নও হয়ে গিয়েছে। এছাড়া এই ধারার কবিদের মধ্যে নতুন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার চেয়ে বরং এক ধরনের আত্মতৃপ্তি ক্রিয়াশীল ছিল বলে অনেকে মনে করেন–

> ... যেহেতু যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কল্পনা তাঁরা করেছিলেন সে রাষ্ট্র বাস্তবায়িত হয়েছে সুতরাং হঠাৎ সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মনে হল, যা পাবার ছিল তা তাঁরা পেয়েছেন। আর তাঁদের করণীয় কিছু নেই। তার ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কবি ও সাহিত্যিকদের পূর্বেকার সেই উদ্যম, সেই উৎসাহ নিয়ে আর অগ্রসর হতে দেখলাম না। (সৈয়দ আলী ১৯৬৯ : ২৩)

তাছাড়া এই ধারার কবিরা ইতোমধ্যে পূর্ব বাংলার জনমানসে ঘটে যাওয়া জাতীয়তাবাদী রূপান্তর, ক্ষোভ-বিক্ষোভকে ধরতে পারেননি। ফলে তাঁরা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু ঢাকার তরুণ কবি-সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁদের মনে হয়েছে নতুন প্রজন্মের কবিরা তাঁদের উপেক্ষা করেন। শুধু তাই নয়, এই পূর্বতন ধারার কবিদের মধ্যে ইসলামি ধারায় পড়াশোনা এবং বোঝাপড়ায়ও যথেষ্ট ঘাটতি ছিল বলে অনেকে মনে করেন–

> আমাদের কবিদের মধ্যে যাঁরা ইসলাম সম্পর্কে বাণী উচ্চারণ করেছেন, তাঁরা কেউ আরবী-পারসী জানতেন না। এটা দুর্ভাগ্যের বিষয়। যখন তাঁরা সত্যিকার আনন্দে ইসলামের কথা বলতে চাইলেন তখনো সে বলতে চাওয়ার জন্য যে প্রস্তুতি দরকার সে প্রস্তুতি তাঁদের নিজেদের জীবনে তাঁরা ঘটালেন না। ... আমরা যে মুসলমান সে তো আমরা মুসলমান গৃহে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই। কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাসকে উত্তরাধিকারসূত্রে নয়, উপলব্ধিসূত্রে পেতে হয়। ... আমাদের কবিদের আন্তরিকতা ছিল। কিন্তু যে বস্তুর অভাব ছিল সে হচ্ছে প্রজ্ঞা। সে প্রজ্ঞার অভাবেই তাঁদের কবিতা ভাবাবেগপূর্ণ কবিতা হয়েছে। তাঁদের কবিতায় রোমান্টিক রসের আশ্রয় আছে। কিন্তু তাঁদের কবিতায় প্রগাঢ় দিব্যানুভূতির পরিচয় নেই। প্রগাঢ় বিশ্বাসের পরিচয় নিয়ে তাঁদের কোন কবিতা জাগ্রত হয়নি। তাই ইসলাম বিষয়ক যে-সমস্ত কবিতা রচিত হল এবং এখনো রচিত হচ্ছে সেগুলো যেন বাইরের আলো দেখে উল্লসিত হবার কবিতা। ... এই ধারার অগ্রবর্তী কবি ফররুখ আহমদ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে 'সাত সাগরের মাঝি' লিখেছিলেন। ... তিনি প্রাথমিক যুগের ইসলামের উদ্দীপনা, সচলতা, আগ্রহ এবং অনেক দূরে চিত্তকে প্রসারিত করার আকাঙ্ক্ষা তাঁর কবিতায় উপস্থিত করেছেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'সিরাজুম মুনীরা' বা আরো পরের অন্যান্য কাব্য-গ্রন্থের উচ্ছলতা তিনি আর অতিক্রম করতে পারেননি। সেটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তার কারণ, তিনি আনন্দের সঙ্গে শুধু রোমান্টিক ভাবাবহকে গ্রহণ করেছিলেন, বিপুল পৃথিবীর বিচিত্র বিস্ময় এবং যন্ত্রণা তাঁর চিত্তকে অধীর করেনি।
>
> ফররুখ আহমদের পরে আর যাঁরা ইসলামী বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন, তাঁরা ফররুখ আহমদকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু ফররুখ আহমদের মধ্যে শব্দ ব্যবহারের যে একটা সচলতা ছিল, যে সচলতা এসেছিল কবিতার

Dhaka University Institutional Repository

> ধ্বনি এবং ছন্দ সম্পর্কে তীক্ষ্ণ জ্ঞান থাকার দরুন, ফররুখ আহমদের অনুসারীদের মধ্যে তা' ছিল না। ফলে তাঁদের কাব্যে অনুকরণের রূঢ়তা এসেছে, কিন্তু কবিতায় কোন প্রকার প্রাণচাঞ্চল্য দীপ্যমান হয়ে ওঠেনি। (সৈয়দ আলী ১৯৬৯ : ২৫-২৭)

সৈয়দ আলী আহসান 'পূর্ব পাকিস্তানের বিশ বছরের কবিতা' শিরোনামের এই প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেছিলেন ১৯৬৮ সালে বাংলা একাডেমির সাহিত্য-সংস্কৃতি সপ্তাহ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে। দীর্ঘ উদ্ধৃতাংশে একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট যে, তিনি পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী কবিতাধারার ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করেছেন। তিনি এই অনুসন্ধান করেছেন ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে। আরো লক্ষণীয় যে, এই কবিতাধারার ব্যর্থতার শিল্পতাত্ত্বিক অনুসন্ধানেই তিনি অধিক মনোযোগী হয়েছেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণটি অনুসন্ধান করতে হবে রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে। কারণ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর, বিশেষত ভাষা আন্দোলনের পর পূর্ব বাংলায় যে-জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ হয়, এই কবিতাধারা সেই চেতনাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছে। আর ষাটের দশকে এসে এই জাতীয়তাবাদী চেতনার পক্ষে যেসব রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন-সংগ্রাম হয়েছে এই কবিতাধারা সেই আন্দোলন-সংগ্রাম এবং জনচৈতন্যের অস্থিরতা, যন্ত্রণা, স্বপ্নাকাঙ্ক্ষাকেও উপেক্ষা করেছে। শুধু উপেক্ষা করেনি, কার্যক্ষেত্রে এগুলোর বিরুদ্ধাচারণ করেছে। কিন্তু যত দিন গড়িয়েছে পূর্ব বাংলাকেন্দ্রিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা সর্বব্যাপী রূপ লাভ করেছে। ফলে, ওই ধারার কাব্য-কবিতা নিস্তেজ হয়ে গিয়েছে। ওই ধারায় একারণে ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে কোনো প্রতিনিধিত্বস্থানীয় কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী কবিতাধারার ব্যর্থতার উপর্যুক্ত কারণটিই সমালোচক আবিষ্কার করেছেন এভাবে–

> এঁরা কেউ রাজনীতিক ন'ন, হয়ত ধর্ম প্রবুদ্ধ তবে কবি। এবং যে উদার মানবিক আবেদন নিয়ে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছিল তার স্বপ্নধ্যান তাঁদেরকে কাব্য প্রেরণা দেয়। পাকিস্তান আন্দোলন তাই এঁদের কাছে রাজনৈতিক বিষয় যতটা নয় তার চেয়ে বেশী ইসলামী মানবতার আদর্শ বাস্তবে রূপায়ণের পরিবেশ সৃষ্টির সম্ভাবনার উজ্জ্বল স্বপ্ন। রাজনীতিক ন'ন বলেই, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যে কোন নতুন রাষ্ট্র আজ যে সমস্ত জটিল ও দ্রুত পরিবর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বিচিত্রবিধ বহির্বিশ্বের প্রচারের সম্মুখীন হয় তা এঁদের অনেকেরই চিন্তার পটে ধরা পড়েনি। (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৬৯ : ৩৯)

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের এই বক্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এজন্য যে, এই বক্তব্যের মধ্যে ভাষা আন্দোলন-পরবর্তী পূর্ব বাংলার পরিবর্তিত রাজনৈতিক চেতনার বিষয়টি প্রচ্ছন্নভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী ধারার বাংলাভাষী কবিকুল এই পরিবর্তন ধরতে পারেননি বলেই তাঁদের কাব্যপ্রয়াস– বিশেষত ষাটের দশকে এসে– মুখ থুবড়ে পড়েছে। ভাষা আন্দোলন-পরবর্তী সময়ে পূর্ব বাংলায় যে জাতীয়তাবাদী জাগরণ ঘটে, সেই জাগরণকে শোণিতে ধারণ করে নতুন সাহিত্যধারা গড়ে ওঠে। এই সাহিত্যধারার সঙ্গে দ্বন্দ্বে পূর্ববর্তী সাহিত্যধারা বলা যায় এক প্রকার পরাজয় বরণ করে। সমালোচকের ভাষায়–

> একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তঝরা আবেগ সাহিত্য অঙ্গনের সবকিছু তছনছ করে দিয়েছিল। তীব্রজ্বালাময় অভিব্যক্তি নিয়ে কবিতাই প্রথম একুশের পতাকা কাঁধে তুলে নিয়েছে। হয়তো অত্যধিক আবেগ ও তারুণ্যের রোমান্টিক চেতনা এর কারণ। ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণচূড়ার সমান নয়। তবুও কৃষ্ণচূড়ার রক্তিম প্রতীকে রক্তাক্ত আন্দোলনের কাব্যিক প্রকাশ ঘটেছে, কমবেশি অনেকেরই হাতে। গুলিবর্ষণের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সব বন্ধ দরজা এক আঘাতে খুলে

Dhaka University Institutional Repository

> গিয়েছিল; সংবেদনশীল কবিচিত্তে সঞ্চারিত হয়েছিল উত্তাপ আর সৃষ্টিশীল উত্তেজনা। পাকিস্তানবাদী সাহিত্যের পরাজয় সেই শুরু, ক্রমে পিছু হটে হটে ওরা অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। (আহমদ রফিক ১৯৯৩ : ৩৫)

ষাটের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম এবং এই কেন্দ্রিক কাব্য-কবিতার তীব্র ঝাপটায় এই পরাজয় ষাটের উপান্তে এসে প্রায় চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

ব্যঙ্গ কবিতার আরশিতে জাতীয়তাবাদী চেতনা

অসঙ্গতি যখন চরমে ওঠে সাহিত্যে তখন জন্ম নেয় ব্যঙ্গাত্মক রূপ। কবি যখন কাব্যিক আড়াল ও আর্টের মাধ্যমে বলার রুচি হারিয়ে ফেলেন, তখন তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাতে অসঙ্গতিকে হানেন। আল মাহমুদের ভাষায়, 'সামাজিক অন্যায়ের প্রতিবাদ যখনই কবিতায় উচ্চারণের অসুবিধাগুলি একজন কবি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন তখন স্বভাবতই তিনি বিদ্রূপে ফেটে পড়বেন।' (আল মাহমুদ ১৯৯৫ : ৩৯) ষাটের দশকের প্রথমার্ধে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের অসঙ্গতি ও 'অসুবিধা' কবিদের মধ্যে জন্ম দিয়েছে ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব। রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দেউলিয়াত্ব, আত্মবিক্রয়, নতজানু আর ব্যক্তিগত লাভক্ষতির ডামাডোল নিয়ে কবিরা রচনা করেছেন বেশ কিছু ব্যঙ্গ কবিতা। এসব কবিতায় কবির একটি অবস্থান ফুটে উঠেছে। এই অবস্থান কোনো নিরীহ সাধারণ অবস্থান নয়। এসব কবিতা কোনো সাধারণ কবিতা নয়। দেশকালের পরিস্থিতির মধ্যে এসব কবিতায় কবির যে-রাজনৈতিক অবস্থান তার সঙ্গে জাতীয়তাবাদী চেতনার সূত্র সহজেই ধরে ফেলা সম্ভব। এসব কবিতার মধ্য দিয়ে কবি সুপ্ত জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। যেমন–

যাদের কথায় জগৎ আলো
বোবা আজকে তারা,
মুখে তুবড়ি ছোটে যাদের
আকাট মূর্খ যারা।

দিনদুপুরে ডাকাত পড়ে
পাড়ায় রাহাজানি
দশের দশায় ধেড়ে কুমির
ফেলছে চোখের পানি।
পৃথিবীটা ঘুরছে ঘুরুক
মানুষ উড়ুক চাঁদে,
ফাটায় বোমা সাগর তলায়
পড়ছে পড়ুক ফাঁদে।

তোর তাতে কি? খড়বিচুলি
পেলেই পোয়াবারো।

Dhaka University Institutional Repository

জাবর কেটে দিন চলে যায়,

পশম বাড়ুক আরও। (শামসুর ২০১২ : ২৪৬/১)

শামসুর রাহমানের †iŠ` K‡iv¾¡jØ (১৯৬৩) কাব্যের শুধু এই কবিতা নয়, 'হাতির শুঁড়', 'ইচ্ছে তার ইচ্ছে', 'কৃতজ্ঞতা স্বীকার', 'নরমুণ্ডের নৃত্যে' প্রভৃতি কবিতায়ও ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ কশাঘাতে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অসঙ্গতিকে অস্থির করে তুলেছেন কবি। হাসান হাফিজুর রহমানের ¯egL cvšÍi (১৯৬৩) কাব্যের মধ্যে এই বিষয়টি বেশ সহজেই চোখে পড়ে। ব্যক্তির নতজানু, চাতুরি আর সত্তাহীন চরিত্র ইত্যাদি ষাটের দশকের খুব পরিচিত কিছু অনুষঙ্গ হাসান ফুটিয়ে তুলেছেন ব্যঙ্গাত্মভাবে–

...আমরা সবাই

রাজা

আমাদেরই রাজার রাজত্বে। চালাক আমরা সবে

চেহারার চাতুরিতে সব বুঝি,

শুধু জানি সকলের বোধ এক

মেলেনা কখনো।

আমরা মুখর হাস্যে শুধুই এড়িয়ে সয়ে

আপন বাঁচাই, নকল নখের মুখেও যাবোনা

ভীরু বীর! (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ৭/১)

উদ্ধৃতাংশে ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর চাতুরি-আশ্রয়ী টিকে থাকার রাজনৈতিক বাস্তবতা উঠে এসেছে। একারণেই বোধ করি ষাটের শুরুতে বড় কোনো জাতীয়তাবাদী জাগরণ সম্ভব হয়নি। এই একই বাস্তবতা ধরা পড়েছে নিচের উদ্ধৃতিতেও–

অশ্রাবণের মতো নদী

দারুণ আবেগে যদি ধেয়ে যায়,

চমকানো বিদ্যুতেই ভরামুখ

আর যদি দেখি তার কখনো সহসা

ভয়ে কেঁপে ওঠে প্রাণ;

আমি নই সাহসের উদ্যত উতরাইয়ে

অজ্ঞ অভিসারী, বিচক্ষণ আত্মজ্ঞানে

সংসারের পথ চলা প্রভুর ইচ্ছার ছকে ঢালা

আমাকে বুঝি না আমি সমবায়ে স্ফূর্তি নেই

অথচ উল্লম্ফনের সমবায় রীতি চালাক বুদ্ধিতে মানি

জীবনের কান্না নেই,

তবু সংগোপন কান্নাহীন রোদনের

অভিশাপে জ্বলি বুঝি শুধু... (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ৭/১)

Dhaka University Institutional Repository

আবার কোনো কোনো কবি কবিতায় ব্যঙ্গের কশাঘাত হেনেছেন স্বৈরশাসকের ওপর। স্বৈরশাসকের ঈশ্বরপ্রতিম মনোভঙ্গি এবং বাঙালির পড়ে পড়ে মার খাওয়া উভয়কেই ব্যঙ্গের মাধ্যমে আঘাত করে কবি লিখেছেন–

> ঈশ্বর মহা শক্তিমান
> দানব হবার দুঃসাহস
> তাই তার আছে অবশ্যই।
> এবং নীরবে মার খাবো
> তাই তার হাতে দিনান্ত।
> স্খলিত জীবন-শক্তিতে
> তবু জীবন-তপস্যা
> বাঁচতেই হবে একান্ত
> মার খাব তবু মরব না। (সিকান্দার ২০১৭ : ১৫৯)

কবিতায় ঈশ্বর তথা স্বৈরশাসনবিরোধী অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট। আর বাঙালিকে ব্যঙ্গের কশাঘাতে জাগানোর চেষ্টাও দুর্লক্ষ্য নয়। কোনো কোনো ব্যঙ্গ কবিতায় কবি বাঙালিকে জাগানোর বাসনায় তার তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন। eWðK jM (১৯৭১) কাব্যের প্রথম কবিতায়– যেটি মূলত ষাটের দশকের প্রথমার্ধে ১৯৬৪ সালে রচিত– এমনটি লক্ষ করা যায়।[১] এই কবিতায় কবি বলেছেন, আমাদের সব আছে। আছে ‘হুক্কাহুয়া রব’, ‘বালিশ কাঁথা মাদুর’, ‘হাঁক-ডাক’, ‘আইন-কানুন-ধর্ম’, ‘শ্মশান-গোর’, ‘যম-শূল’। কিন্তু যা নেই বলে কবি উল্লেখ করেছেন তা ভয়াবহ। কবির ভাষায়, ‘শুধু নেই তো নেই ভাই খুলির খোলে/একটি ছটাক ঘৃত,/তাই বলে কি আমরা সবাই পশুর খাচায় ধৃত?’ (সিকান্দার ২০১৭ : ৪০৪) এর উত্তরে কবি নাগরিকদের পক্ষ থেকে বলেছেন, ‘না না না আমরা স্বাধীন/ আমরা স্বাধীন/ধাগে ধিনাগ তাকিটি ধিনাগ/তাক তাক তাক ধিনাগ ধিনাগ/আমরা স্বাধীন আমরা আজাদ.../এমন স্বাধীন কে আর আছে/ এমন স্বাধীন কে আর আছে/সব আছে ভাই সব আছে।’ (সিকান্দার ২০১৭ : ৪০৪) এভাবে কবি স্বাধীনতা ও নির্জীব বাঙালিকে ব্যঙ্গের মাধ্যমে আঘাত করে জাগাতে চেয়েছেন। একারণে ষাটের দশকে এইসব ব্যঙ্গ কবিতার আলাদা রাজনৈতিক তথা জাতীয়তাবাদী চেতনাগত গুরুত্ব আছে।

কবিতায় সর্বৈব নাস্তি, হতাশা, নৈরাশ্য, অবক্ষয় এবং ষাটের রাজনীতি

ষাটের দশকের কবিতা সম্পর্কে একটি কথা প্রতিষ্ঠিত যে, এ কবিতা নাস্তি, হতাশা, নৈরাশ্য এবং অবক্ষয়ের সঙ্গে ঘর করেছে। একারণে, বিশেষত ষাটের দশকে, যেসব তরুণ কবি বাংলাদেশের কবিতায় আবির্ভূত হন তাঁদেরকে ঢাকার ‘হাংগ্রি জেনারেশন’ বলা হতো। এদশকের তরুণ কবিদের চেতনার মধ্যে কোনো প্রাতিষ্ঠানিকতা ছিল না। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাতেই তাঁদের যত আনন্দ। প্রচলিত মূল্যবোধকে তাঁরা লাথি মেরে ভাঙতে চেয়েছেন। পঞ্চাশের দশকের এক কবির ভাষায়, ‘... আপাতত করে মণ্ডপাত/রীতি নীতির আর সমস্বরে চেঁচিয়ে হঠাৎ/কাঁপায় কাচের ঘর, ভেঙে পড়ে থাম সারি সারি।’ (শামসুর ২০১২ : ২৯৮/১) অথবা ষাটের দশকের একজন কবির ভাষায়, ‘অবশ্য কারো বন্দনা দিতে/পারে না তৃপ্তি/ কোনো বিশ্বাস

Dhaka University Institutional Repository

অনির্বচন/দেয়না দীপ্তি/আমি শুধু বমনার্ত সংকলিত মলভাণ্ড সামনে রেখে/বলি : জননী তো প্রজননী পিতৃদেব অস্তিত্বঘাতক...।' (হুমায়ুন ২০০৮ : ১৯) ষাটের তরুণ কবি 'জন্মদাতার প্রতি' বলেছেন, 'দুঃস্বপ্নে উত্যক্ত আমি... এই দ্যাখো, তোমার সন্তান/মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে, বালুকায়, দুরূহ সময়ে।' (রফিক ২০১৩ : ১৯) ষাটের তরুণ কবির কণ্ঠে নিখিল নাস্তি ঘোষিত হয়েছে এভাবে–

> আমি কার কাছে যাব? কোনদিকে যাব?
>
> অধঃপতনের ধুম সবদিকে, সভ্যতার সেয়ানা গুণ্ডার মতো
> মতবাদ; রাজনীতি, শিল্পকলা শ্বাস ফেলছে এদিকে ওদিকে,
> শহরের সবদিকে সাজানো রয়েছে শুধু শাণিত দুর্দিন, বন্যা অবরোধ
> আহত বাতাস! (আবুল হাসান ২০১২ : ৪৫)

কিন্তু একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, ষাটের দশকের কবিতার মধ্যকার অবক্ষয়, নৈরাশ্য, হতাশা আর আশভঙ্গতার সঙ্গে সমকালীন রাজনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক অবরুদ্ধতা, পূর্ব বাংলাকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ, পূর্ব বাংলার শিক্ষিত তরুণদের বেকারত্ব, চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে জাতিগত বৈষম্য, চারদিকে অনেক পূর্বসূরির পাকিস্তানি শাসকচক্রের কাছে নির্লজ্জ আত্মবিক্রয়, পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে পারস্পরিক অনৈক্য ও রেষারেষি ইত্যাকার নানা বিষয়ের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ষাটের দশকে কবিকুল তাঁদের সামনে বড় কোনো আদর্শ এবং সম্ভাবনা দেখতে পাননি। অধিকন্তু তাঁরা কথা বলতে গিয়ে লক্ষ করলেন যে, কথা বলার ক্ষেত্রে নানা ধরনের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। শুধু তাই নয়, একজন লেখক কী নিয়ে লিখবেন তারও ফিরিস্তি পাকিস্তানের অখণ্ডতার নামে লেখকদের প্রায়শই আইয়ুব খানের স্বৈর সরকারের পক্ষ থেকে ঠারেঠোরে বলে দেওয়া হতো। এই পরিস্থিতি নিশ্চয় নতুন প্রজন্মের জন্যে আদৌ কোনো সুখকর ব্যাপার নয়। তাঁদের সুস্থ বিকাশ-প্রকাশের নিশ্চয় অনুকূল নয়। এসব কারণে ষাটের তরুণ কবিকুল সর্বৈব নাস্তিকে, নৈরাশ্য, হতাশা আর অবক্ষয়কে আলিঙ্গন করেছেন।[২] এই নাস্তি, নৈরাশ্য, হতাশা, আশাভঙ্গতা আর অবক্ষয় প্রকাশের মধ্যে ছিল তীব্র দহন এবং দ্রোহী চেতনা। ষাটের দশকের অন্যতম কবি রফিক আজাদ স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, তাঁদের কবিতার নাস্তি-নৈরাশ্যের সঙ্গে সমকালীন রাজনীতির ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে।[৩] তিনি যখন কবিতায় বলেন, 'সমুদ্র অনেক দূর, নগরের ধারে-কাছে নেই:/চারপাশে অগভীর অস্বচ্ছ মলিন জলরাশি।/রক্ত-পূঁজে মাখামাখি আমাদের ভালোবাসাবাসি;/এখন পাবো না আর সুস্থতার আকাঙ্ক্ষার খেই' (রফিক ২০১৩ : ৯) তখন তা সমকালের অবরুদ্ধ রাজনৈতিকতার স্মারক হয়ে ওঠে। অথবা 'মানুষ নিঃসঙ্গও বাঁচতে পারে,– পারে না শুধু এই দম-আটকে-আসা অনুভূতি নিয়ে।' (রফিক ২০১৩ : ১২) এই চরণ কেবল ব্যক্তির দম-আটকে-আসার বিষয় নয়। এর সঙ্গে ষাটের প্রথমার্ধের দম-আটকে-আসা রাজনৈতিক বাস্তবতার যোগের অন্বেষণ একেবারে অমূলক নয়। ষাটের নৈরাশ্যবাদী ও নৈরাজ্যবাদী কবিতা ও কবিকুল সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন–

> ষাটের দশকের শুরুতে আমাদের জাতীয় জীবনে যে-অবক্ষয় শুরু হয়, এই তরুণ-লেখকদের চেতনাজগতে তা প্রথম সাড়া তোলে। কিন্তু কোনো নতুন চেতনাকে কেবলমাত্র অনুভব করার ভেতরেই একজন লেখকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, ঐ চিত্রকে শৈল্পিক পরিপূর্ণতা দেবার প্রয়োজনে এর বাস্তবতার ভেতর তাকে আমুণ্ডপদনখ ডুবে

Dhaka University Institutional Repository

> যেতে হয়; আপেলের মতো রক্তিম সজীব ভাষায় ঐ অনুভূতিলোকের চিত্র ভাবীকালের জন্য তাকে এঁকে রেখে যেতে হয়। ষাটের ঐ তরুণদের মধ্যেও ছিল সেই চেষ্টা। এই ভূমিকা ঠিকমতো পালনের মধ্যদিয়ে নিজেদের অজান্তে লেখকেরা একটি বড় ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে বসেন। এর ভেতর দিয়েই তাঁরা হয়ে ওঠেন সমাজবাস্তবতা পরিবর্তনের শক্তিশালী অচেতন হাতিয়ার। রাজনীতিবিদদের কাজ শুরু হয় এর পরে। শিল্পীদের এঁকে-যাওয়া সমাজের জীবনের ঐসব বেদনাদীর্ণ চিত্র থেকে সমাজের প্রকৃত বাস্তবতা টের পেয়ে তাঁদের কাজ হয় ঐ দুঃখময় সমাজবাস্তবতাকে পাল্টে সমৃদ্ধিমুখী উচ্চতর ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া। (আবদুল্লাহ ২০০৬ : ৩৫)

এমনকি এই সময়ের পরাবাস্তব কবিতা ও কবিতার মধ্যে যৌনতার প্রাদুর্ভাবের সঙ্গেও সমকালীন রাজনীতির সম্পর্ককে অনেকে শনাক্ত করেছেন। (আবু হেনা ২০০১ : ৪০২/১) বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাসে কোনো সময়ের কবিতা-ই বোধ করি এত নৈরাশ্য, নাস্তি, অবক্ষয় আর দমবন্ধ পরিস্থিতি মোকাবিলা করেনি। প্রকাশের ক্ষেত্রে এতটা তাপ আর ভাঙচুরের মুখোমুখি হয়নি। ষাটের তরুণ কবিদের কবিতা পড়তে গেলে প্রতিষ্ঠা আর প্রতিষ্ঠানের হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ার শব্দ সহজেই কানে লাগে।

অনেকেই মনে করেন, ষাটের তরুণ কবিদের এই নাস্তির আর প্রচলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উৎস ত্রিশের দশকের কলকাতার আধুনিক কবিদের প্রভাব।[৪] কিন্তু বলা বাহুল্য ত্রিশের দশকের কবিদের আধুনিকতাবাদী চেতনা এবং সেই চেতনানুসারী কবিকুলের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় পঞ্চাশের দশকের কবিদের মধ্যে। চল্লিশের দশকের বাংলাদেশের কবিতার পাকিস্তানবাদী ধর্মীয়চেতনার প্রজন্মের পরে পঞ্চাশের দশকে যে আধুনিক বুর্জোয়া চেতনার তরুণ প্রজন্ম দেখা দিয়েছিল সেই প্রজন্মের ওপর তাদের আত্মপ্রকাশের প্রথম দিকে ত্রিশের আধুনিকতা একটা বড় প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু তাঁরাও দ্রুতই সেই প্রভাব কাটিয়ে উঠে নিজস্ব কাব্যভুবন গড়ে তুলেছিলেন।[৫] তাঁদের কবিতা দ্রুত স্বদেশে আর স্বকালে প্রত্যাবর্তন করেছিল। এক্ষেত্রে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বোধ করি এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। এই পঞ্চাশের দশকের কবিকুল যখন ষাটের দশকে প্রবেশ করেছে তখন তাঁদের কবিতা কিভাবে দেশকালের বাস্তবতাকে ধারণ করে বিশেষ হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ বর্তমান অধ্যায়ের বিভিন্ন জায়গায় লক্ষ করা যাবে। শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আল মাহমুদ, সৈয়দ শামসুল হক, ফজল শাহাবুদ্দীন প্রমুখ কবি কিভাবে তিরিশি আত্মরতি, আত্মক্ষরণ আর নৈরাশ্য থেকে ষাটের দশকে এসে বেরিয়ে এসেছেন তা তাঁদের ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে প্রকাশিত যেকোনো কাব্য দেখলেই বোঝা যায়। যেমন, শামসুর রাহমান তাঁর ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ weaÿ¯Í bxwjgv-র 'আত্মজৈবনিক' কবিতায় স্পষ্ট করেই বলেছেন, তাঁর জীবনের 'মধ্যপথে কেড়েছেন মন/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নন, সম্মিলিত তিরিশের কবি'। (শামসুর ২০১২ : ১৭৮/১) আর ষাটের শেষার্ধে এসে স্পষ্টভাবে বলেছেন তাঁর কবিতা ত্রিশের কবিতা থেকে অনেক দূরে।[৬] পঞ্চাশের দশকের কবি আল মাহমুদ ভাষা আন্দোলন উত্তর কবিতা ও কবিদের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই বিষয়টির অবতারণা করেছেন। তিনি, বিশেষত ষাটের দশকে এসে শামসুর রাহমানের বিবর্তন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, শামসুর রাহমানের মতো বড় কবির পক্ষে বিদেশি বা পাশ্চাত্য চেতনার জগতে থাকা সম্ভব হয়নি তার বড় প্রমাণ wbR evm f‡g কাব্য। এই কাব্যে তিনি শুধু আমাদের ঐতিহ্যগত জীবন ধারায় ক্রমপরিবর্তনের রাজনৈতিক রূপরেখাটিকে স্পর্শ করতে চাননি, তিনি তা অধিকারও করতে

Dhaka University Institutional Repository

চেয়েছেন। (আল মাহমুদ ১৯৯৫ : ৪১) পঞ্চাশের দশকের কবির ষাটে এসে এই বিবর্তন। সুতরাং পরবর্তী প্রজন্মের অর্থাৎ ষাটের দশকের তরুণ কবিদের ওপর ত্রিশের দশকের আধুনিকতাবাদী কবিদের প্রভাবের বিষয়টি বোধ করি মূল্যায়নের সরলীকরণের ফল। সমালোচকের বক্তব্য দেখা যেতে পারে–

> বাংলাদেশের পঞ্চাশের কবিকুল বা তাঁদের উত্তর-সাধকগণ পশ্চিমবঙ্গের-পরিমণ্ডলের বাইরে পূর্ববঙ্গে নতুন ধারা তৈরি করতে চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু দৃষ্টি তাঁদের ছিল পশ্চিমবঙ্গের দিকেই (আরব-ইরানের দিকে যাঁরা চেয়েছিলেন তাঁদের কথা এখানে আলোচনা করা হয় নি)। এঁদের অনেকে পশ্চিমবঙ্গকে কবিতার ঠিকানা বলেও মনে করেন। ষাটের কবিরা সে পুরো ধারাকেই করলেন অস্বীকার। (সৌমিত্র ২০১১ : ২৪)

উদ্ধৃতাংশের পঞ্চাশের দশকের কবিদের পশ্চিমবাংলামুখীনতার মূল্যায়নটি সরলীকরণাক্রান্ত হলেও ষাটের দশকের কবিদের সম্পর্কিত সমালোচকের বক্তব্য যথার্থ। ষাটের তরুণ কবিরা পশ্চিমবাংলার কবিতাধারার উপজাত নয় একারণে যে, ষাটের এই তরুণ কবিকুলের কবিতা ও কবিতার চৈতন্য সমকালের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, রাষ্ট্রনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কিত। বোদলেয়ারের কবিতার অবক্ষয় যেমন তাঁর সমকালের স্বদেশের অবক্ষয়ের শিল্পভাষ্য, তেমনি ষাটের তরুণ কবিদের কবিতাও স্বকালের স্বদেশের বিনষ্টি, অপচয় আর অবক্ষয়ের সঙ্গে যুক্ত। সমালোচক যথার্থই বলেছেন–

> যাঁরা এই অবক্ষয়কে সমকালীন আমেরিকান বা পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্যের অবক্ষয়ী ধারার অনুকরণসর্বস্ব উত্তরপুরুষ বলে রায় দিয়েছিলেন তাঁরা এই সামাজিক পচনের ইতিহাসটি সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন না। অনুভব করেননি যে এই অবক্ষয়ের মূল প্রোথিত ছিল আমাদেরই সমাজের ক্লেদাক্ত বাস্তবতার ভেতরে এবং তরুণেরা আমাদের সেই জাতীয় অবক্ষয়েরই ক্লেদজ কুসুম। (আবদুল্লাহ ২০০৬ : ৩৪)

একই ধরনের ইঙ্গিত লক্ষ করা যায় অন্য সমালোচকের কথায়, 'পঞ্চাশ-এর এবং ছয়ের দশকের কবিবর্গের যৌথ কাব্যভাবনা, চেতনাপ্রবাহ ও জীবনদর্শনে এবং তাঁদের চিত্রকল্প-উপমা-রূপক-প্রতীক নির্মাণের অস্থিরতায়, অবজ্ঞায়, অবিশ্বাসে, অভিনবত্বে আমাদের বন্দীচেতনা-স্রোত বিধৃত...।' (সৈয়দ আকরম ১৯৮৫ : ৪২) এই বিচারে ষাটের কবিতার নাস্তি, নৈরাশ্য, অবক্ষয়ের উল্লসিত অভব্য-বর্বর-প্রকাশ রাষ্ট্রনৈতিক অবরুদ্ধতা আর স্বৈরতার বিরদ্ধে প্রতিবাদ আর বিদ্রোহ। স্বজাতির অক্ষমতাকে তারা ভিন্নভাবে ভিন্ন ভাষায় আর ভিন্ন অবলম্বনে সওয়ার হয়ে প্রকাশ করেছেন। একারণে তাদের কবিতার দ্রোহ, প্রথাবিরোধিতা, ধ্বংসামি, আর্ত চিৎকার, অস্থিরতাকে ব্যক্তিগততার মধ্যে রেখে দেখা যায় না। একটি কবিতাংশ লক্ষ করা যাক–

> সুপ্রচুর বিমুক্ত হাওয়ায় তবে কেন কষ্টশ্বাস?
> কেন এই স্বদেশ-সংলগ্ন আমি, নিঃসঙ্গ, উদ্বাস্তু,
> জনতার আলিঙ্গনে অপ্রতিভ, অপ্রস্তুত, অনাত্মীয় একা,
> আঁধার টানেলে যেন ভূ-তলবাসীর মতো, যেন
>
> সদ্য উঠে-আসা কিমাকার বিভীষিকা নিদারুণ!
> আমার বিকট চুলে দুঃস্বপ্নের বাসা? সবার আত্মার পাপ
> আমার দু'চোখে শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ কালির মতো লেগে আছে?
> জানি, এক বিবর্ণ গোষ্ঠীর গোধূলির শেষ বংশজাত আমি,

বস্তুতই নপুংসক, অন্ধ, কিন্তু সত্যসন্ধ দুরন্ত সন্তান! (শহীদ ২০০০ : ১৫)

শহীদ কাদরীর এই কবিতাকে আর যাই হোক ব্যক্তিগত সংকট বলে চালানো যায় না। তাঁর নিঃসঙ্গতা, উদ্বাস্তু মনোভাব, নিজেকে 'আঁধার টানেলে ভূ-তলবাসী' ভাবা, নিজের 'বিকট চুলে দুঃস্বপ্নের বাসা' অনুভব করাকে ষাটের উচ্ছন্নতা বলে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। একটি রাষ্ট্রের মধ্যে কবির প্রেমভাবনাও রাষ্ট্রের বাস্তবতার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। কালিদাসের †gN'Z কাব্যে প্রকৃতি সম্ভোগ আর নারী সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষার যে উত্তুঙ্গ রূপ, যে ঐশ্বর্যপূর্ণ রূপ আমরা লক্ষ করি, তার সঙ্গে কালিদাসের রাষ্ট্রের ঐশ্বর্যের নিবিড় সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে। রাষ্ট্রে না থাকলে কবিতায় ধরা দেয় না। তা সে কবি যতই দেশকাল-সংলগ্ন হোন বা না হোন। ফলে শহীদ কাদরীর এই কবিতাকে সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করে দেখার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কবির এই বিপন্নতার বোধের উৎস সমকালীন রাষ্ট্রীয় অবরুদ্ধতা। আর এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির যে তাড়না তা কবিতাটিকে অন্য এক রাজনৈতিক গুরুত্ব এনে দিয়েছে। কবি যখন বলেন আমি 'বস্তুতই নপুংসক, অন্ধ' তখন ষাটের দশকের প্রথমার্ধের চারপাশের বন্ধ্যা পরিস্থিতির বিষয়টি আর অকথিত থাকে না। কিন্তু যখনই বলেন কিন্তু আমি 'সত্যসন্ধ দুরন্ত সন্তান!' তখন কবিতায় ঝলক দিয়ে ওঠে কবির অস্তিত্ব-ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বই ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা জাতীয়তাবাদী চেতনার অকুণ্ঠ প্রকাশকে সম্ভব করে তুলেছে। এযেন ব্যক্তির হয়ে ওঠার, জেগে ওঠার প্রস্তুতিরই কাব্যভাষ্য। হুমায়ুন আজাদের কবিতার মধ্যেও দেখা যায় নৈরাশ্য। কিন্তু অতল নৈরাশ্যের অন্তরালে আশাবাদের ঝলকও কোথাও কোথাও লক্ষ করা যায়। এই আশাবাদ বোধ করি ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের জাতীয়তাবাদী নানা তৎপরতাজাত। লক্ষ করা যাক একটি কবিতাংশ–

বড্ডো ময়লা যেনো জমে গেছে এ-শরীরে
স্নান তাই অতি আবশ্যক
অথচ স্নানের যোগ্য জল কই নদীতে বা গৃহে

স্নান স্নান চিৎকার শুনে থাকো যদি
নেমে এসো পূর্ণবেগে ভরাস্রোতে হে লৌকিক অলৌকিক নদী। (হুমায়ুন ২০০৮ : ১৯)

এভাবে ষাটের কবিতা নৈরাশ্যকে ধারণ করে সময় আর স্বদেশের বাস্তবতাকে প্রকাশ করেছে। নাস্তি-নৈরাশ্যই মুখ্য হয়ে উঠেছে ষাটের প্রথমার্ধে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর দিকে সেই নাস্তির উত্তরাধিকারের সাথে সাথে কোথাও কোথাও অলক্ষিত আশাবাদও উঁকিঝুকি দিয়েছে। আশা-নিরাশা, স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন, অন্ধকার আর আলোর দ্বৈরথ অন্য কবিদেরও ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে দুলিয়েছে–

আমাকে বিশ্বাস নেই হিমাংশু, কোনো কিছুতেই কোনো কিছু না পাওয়ার ক্লিন্ন
অবসাদ আমার শরীরময় পাপ; স্বপ্ন যদি আমার অনুভবে জনতার বিপ্লবের
কথা বলে, দুঃস্বপ্ন আমার রক্তে কণায়-কণায় অন্য এক প্লাবনের গান গেয়ে
যায়। মুখের গোলাপ যদি সূর্যালোকে স্বর্ণের মতো ফোটে, বুকের গোলাপ
তখন গায়ে কাদা মেখে যন্ত্রণায় নীল হয়ে কাঁদে। (নির্মলেন্দু ২০১১ : ৫১/১)

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রীয় নৈরাশ্য যখন চরমে থাকে তখন প্রেমও কাঙ্ক্ষিত পরিণতির রূপ পায় না। প্রেম তো পারিপার্শ্বিকতা মুক্ত নয়। একারণে দেখি ষাটের দশকের তুলনামূলক স্নিগ্ধ কবি মোহাম্মদ রফিক (জ.১৯৪৩)-এর কবিতায় প্রেম আর প্রকৃতির সম্মোহন থাকলেও তাঁর প্রায় সব কবিতা-ই শেষ পর্যন্ত দীর্ঘশ্বাসে, অপঘাতে, হতাশায়, নৈরাশ্যে সমর্পিত হয়। ষাটের কবিদের মধ্যে তাঁর কবিতা বোধ কবি প্রেম আর প্রকৃতির সবচেয়ে কাছে থেকেছে। তাঁর প্রথম কাব্য ˆekvLx cwYgv প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭০ সালে। এর অধিকাংশ কবিতা রচিত হয়েছে ষাটের প্রথমার্ধের বন্ধ্যা সময়ে আর ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের উত্তাল জাতীয়তাবাদের ঢেউয়ের মধ্যে। কিন্তু তাঁর কবিতা আশ্চর্যজনকভাবে এসবের স্বাদ আর গন্ধমুক্ত। কিন্তু তাঁর কবিতার দীর্ঘশ্বাস, হতাশা আর নৈরাশ্যের সঙ্গে দেশকালের গভীর সম্পর্ক একবোরে অস্বীকার করা যায় না। ‘বৃষ্টি’, ‘প্রেম’, ‘গোলাপ’, ‘পূর্ণিমা’ সব কিছুই কবিকে দারুণভাবে আলোড়িত করেছে। কিন্তু কোনো কিছুই কবিকে শেষ পর্যন্ত তুষ্ট করতে পারেনি বা কবি এসবকিছুকে যেভাবে চান সেভাবে পাওয়া হয়নি। উদাহরণ দেখা যাক–

সারাটা জীবন যেন কার কাছে গিয়েছি কোথায়
সামান্য আশ্রয় দয়া স্নেহ প্রীতি সামান্য হৃদয়;–
কতবার হতভাগা এ আমার হয়েছি শিকার,
যায়নি তো খুলে তবু অলৌকিক বাগানের দ্বার।

শুধুই দাঁড়িয়ে বাইরে ভিজেছি বৃষ্টির ধারাজলে
ভিজেছি কান্নায় ঘামে আকণ্ঠ সে রৌদ্রের গহনে
অতঃপর সন্ধ্যা এলে ঢুলেছি তন্দ্রার স্মিত কোলে
এবং এখন শেষে স্মৃতিতপ্ত অন্তিম বিজনে।

হলাম নীরবে ধ্বংস শুধু প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায়
পশুর পশুত্বে নয়; গোলাপের মৌন অনীহায়। (মোহাম্মদ রফিক ২০১১ : ১৬)

এছাড়া ষাটের দশকের পরিপ্রেক্ষিতে মোহাম্মদ রফিকের কবিতার মধ্যকার ভূমিলগ্নতার একটি আলাদা মানে আছে বলে মনে হয়। কারণ অনেক সমালোচক বলে থাকেন মোহাম্মদ রফিক ‘ক্ষেত্রস্পর্শী কবি। এদশের ভূমিকে ধারণ ও অবলম্বন করে তিনি কবি-প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করেছেন।’ (সৌমিত্র ২০১১ : ৭৮) ষাটের দশকে কবিদের ভূমিলগ্ন চেতনার গভীরে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি এক গভীর জাতীয়তাবাদী আবেগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল– একথা অস্বীকার করা যায় না।

কবিতায় রাজনীতি ও রাজনৈতিক সচেতনতা

ষাটের দশকের প্রথমার্ধের প্রধান সংকট ছিল অবরুদ্ধতা। ‘দেখলাম আমি বুঝলাম বসে থাকলাম তবু/বৃক্ষের মত বোবা’। (সিকান্দার ২০১৭ : ১৪৯) কবির ভাষায় এই ছিল ষাটের অবরুদ্ধতার ধরন। স্বৈর শাসনের প্রবল দাপটে যূথবদ্ধ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছিল। শুধু রাজনৈতিক কেন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডও ছিল এক দারুণ অবরুদ্ধতার মধ্যে।[৭] তখন একত্র হয়ে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিরোধ দূরে থাক সাধারণ কর্মকাণ্ড চালানোই ছিল দুরূহ। একারণে জাতীয়তাবাদী চেতনায় একত্র হওয়াটাই ছিল তখনকার প্রধান রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ। ষাটের দশকের এক কবি-সাংস্কৃতিক কর্মীর স্মৃতিতে অবরুদ্ধতার কথা এপ্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে–

> শশাঙ্ক পাল বোধ হয় কিছু দিন ছিল আজিমপুরের কোনো বাড়িতে। একদিন, ২০ মে ১৯৬৬, সে আমাকে সেই বাসায় নিয়ে যায়। কী?– না, রবীন্দ্র-নজরুল-জয়ন্তী হবে। রবীন্দ্রনাথের ওপরে অনুষ্ঠান করা তখন সরকারিভাবে বিপজ্জনক, নাকি শশাঙ্ক পালের ব্যক্তিগত রাজনীতিলিপ্ততার ফলে– আমার পরিষ্কার মনে আছে– বেশ একটু তাড়াহুড়ো করেই অনুষ্ঠান শুরু ও শেষ করে দেওয়া হয়েছিল। আমি আর শশাঙ্ক ছাড়া আর-কোনো লেখক ছিল বলে মনে পড়ছে না। হয়ত আবুল হাসান ছিল। একটা বাড়ির বাইরের ঘরে মেজেয় চাদর পাতা, দুচারজন বালক-বালিকা বসে। একজন তরুণী দুএকটি গান (রবীন্দ্রসংগীত) গাইল। আমি রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল সম্পর্কে দুএকটা কথা বললাম। ... অতিদ্রুত, প্রায় গোপনভাবেই, এই বৈঠক সম্পন্ন হয়েছিল। (আবদুল মান্নান ২০০০ : ৫৫-৫৬)

এই কারণে কবিরা তাঁদের কবিতা এবং সাংস্কৃতিক চর্চা থেকে চাইলেই রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি। তাই কবিতায় প্রায়শই লক্ষ করি একত্র হওয়ার রাজনৈতিক চেতনা। যেমন, আহসান হাবীবের mviv ‘ci কাব্যগ্রন্থের ‘এসো সঙ্গী হই’ কবিতায় সাধারণ মানুষের সমব্যাথী নেতার নেতৃত্বের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার কথা বলেছেন। একাত্ম হয়ে নেতার চোখ-মুখের বিপন্নতার কালি মুছে দেয়ার কথা বলেছেন; বলেছেন সবাই একাত্ম হয়ে জেগে উঠে মরা নদীতে জোয়ার আনতে–

> এসো
> এসো তার মুখের সমস্ত কালি মুছে দিয়ে
> এক সঙ্গে পার হই,
> শুক্‌নো ঘাটে জোয়ারের ডাক
> আসুক, দুলুক নৌকো আর মরা ঘাসে
> দুলুক সমুদ্রপ্রাণ আশায়
> এবং বিবর্ণ বকুল যুঁই পলাশ-ছলনা
> পার হয়ে নিষ্প্রদীপ কুটীরের সব বেড়া
> ছুঁয়ে যাক অকৃত্রিম আত্মীয়তা এবং আত্মার
> মলিনতা ধুয়ে নিয়ে এসো পরস্পর সঙ্গী হই। (আহসান হাবীব ১৯৯৫ : ১০৬/১)

একের সঙ্গে একের যোগ তার সঙ্গে বহুর যোগ মানেই মিছিল, ঐক্যবদ্ধতা, জাগরণ। এই একত্র হওয়ার বাসনাদীপ্ত রাজনৈতিক চেতনা ষাটের দশকে রচিত কবিতাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে–

> বন্ধু এবার তুলে নাও হাতে হাত।
> ফুটেছে নবীন দীপ্ত চিত্ততলে
> রৌদ্রধারে অক্ষত পারিজাত,
> মুগ্ধ প্রেমের অতন্দ্র কৌশলে।
>
> চেতনা ছড়ায় বৃন্তে নতুন প্রাণ,

Dhaka University Institutional Repository

আরক্ত মেঘে মন্দ্রভেরীর যাদু
গলে ঝরে পড়ে প্রসন্নতার গান,
পরম লগন অচিন্ত্যনীয় স্বাদু!

বিড়ম্বনার প্রেতের মায়াবী ছলে
কেটেছে কুটিল ক্লান্ত অমার রাত;
দীপ্ত সূর্য এখন দুয়ারে জ্বলে
বন্ধু এবার তুলে নাও হাতে হাত। (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৯৮ : ৭১)

কোনো কোনো কবির কবিতায় খুব সুস্পষ্টভাবে রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। কবিরা তাঁদের কবিতায় অধিকার সম্পর্কে সচেতন থেকে কথা বলেছেন; অধিকার আদায়ের কথা বলেছেন–

হাত ভ'রে নাও
কুড়িয়ে দু'হাত ভরে
যতটুকু নিতে পারো।
চোখ ভরে নাও
বুক ভরে নাও
কানায় কানায় প্রাণের পাত্র
ভরে নাও সবটুকু
যত নিতে পারো।
যদি নিতে চাও
সব নিতে হবে
এখানে দাঁড়িয়ে
অবিচল অধিকারে। (সিকান্দার ২০১৭ : ১৩০)

এভাবে ষাটের প্রথমার্ধের কবিতা সরাসরি রাজনীতিকে ও রাজনৈতিক সচেতনতাকে ধারণ করে সময়ের স্মারক হয়ে উঠেছে।

ষাটের কবিতার একটি বিশেষ দিক হচ্ছে এর অস্থি আর শোণিতে প্রবাহিত গোপন রাজনৈতিক চেতনা। একটা বড় অংশ কবিতা আপাতদৃষ্টিতে অরাজনৈতিক কবিতা বলে মনে হলেও গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, এসব কবিতার ভেতরে গোপন-গহীনে ক্রিয়াশীল থেকেছে রাজনৈতিক চেতনা। এই রাজনৈতিক চেতনা প্রকাশিত হয়েছে দুইভাবে; ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর আত্মসমর্পণ, পরাভব ও ব্যর্থতার উপলব্ধি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এবং এই ব্যর্থতা থেকে উত্তরণের আশাবাদ ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের কবিতার এই ধারাটি মূলত লক্ষ করা যায় আইয়ুবি স্বৈর শাসন শুরুর পর থেকে।

ষাটের অবরুদ্ধতাকে কোনো কোনো কবি মড়কের সঙ্গে তুলনা করেছেন। স্বৈর শাসনের থাবা যেন মড়কের মতো সবখানে আঘাত করেছে। কবির ভাষায়–

মড়কেরা আসে অলিতে গলিতে বিষ-পতঙ্গের
ঝাঁকের মতো, হাসে খিলখিল নাচে কানকান, ঘরেঘরে
ঢোকে পিলপিল রোকা পাখনায় উড়ে গিয়ে বসে শিশুর
চোখে বধূর বুকে স্বামীর ক্লান্ত মুখের ছায়ায়;
বইয়ের পাতারে জড়িয়ে ধরে হরফেরে সরু
সরু সুইয়ের মতো ছুঁচোলো দাঁতে কাটে আনন্দে
শব্দ, কথা, পড়ে ঝুরঝুর আর যত বাণী নিরুপায়
বেড়জালে জড়ানো মৎস্যদল পায়না সিন্ধুর স্বাদ। (আলাউদ্দিন ২০০৬ : ৭৮/১)

কিন্তু কবিদের চেতনায় এবং জনমনে সংগুপ্ত থাকা জাতীয়তাবাদী জাগরণের আকাঙ্ক্ষা কবিদের উদ্বেলিত ও আশাবাদী করে তুলেছে। কবির এই রাজনৈতিক চেতনার আভাস আবিষ্কার করা যায় নিচের কবিতাংশে–

সারাক্ষণ নীলজলে ধৌত হও,
প্রাণপণে জীবনের স্রোত রাখো
ছায়ামগ্ন প্রাচীন প্রথার মতো
অচেনা উৎস নদী, নদীর বুঝিবা
শেষ নেই। পদ্মাভূমি,
প্রাণফাটা উচ্চকিত গান ধরো তবে,
ভয়ের ভয়ার্ত মুখে মারো ছুঁড়ে
জ্ঞানহারা বুদ্ধিহারা
ধ্বনি থৈথৈ মরিয়ার গর্জিত উল্লাস,
– শঙ্কিত শব্দের ঠোঁটে
ধিকি ধিকি প্রাণ যদি বেঁচে থাকে
বিস্ফারিত প্রাণ পাবে নাকি তবে অবশেষে?

সমূহ স্খলন আছে, তবু জানি
স্রোতের বুঝিবা অন্ত নেই অন্ত নেই। (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ৮/১)

একই ধরনের আশা জাগানিয়া জাগরণী বাণী শোনা যায় আলাউদ্দিন আল আজাদের পূর্বোল্লেখিত একই কবিতার শেষাংশে–

সবখানেই অন্ধকার জেগে থাকে শুধু এখানে
ওখানে কয়টি শিখা, ওদের ডানাঝাপটানোর
ঝড়ো হাওয়ায় কাঁপে শিরশির, কখনোবা নিবু নিবু:
কিন্তু তবু জ্বলতেই থাকে যেন কয়টি যুবতীর প্রেম!

সেই শিখা ক্রমে বাড়ে তিলে তিলে, প্রসারিত লাল

Dhaka University Institutional Repository

শাখা-প্রশাখা, আর তাতে পোড়ে মহামারীর জঞ্জাল। (আলাউদ্দিন ২০০৬ : ৭৮/১)

উদ্ধৃতাংশে জাতীয়তাবাদী জাগরণের যে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে তাতে 'বিমুখ প্রান্তর' কেবল বন্ধ্যা সময়ের অভিক্ষেপ থাকেনি, সবকিছু কেবল মড়কের দখলে যায়নি, বরং তা সমকালীন রাজনৈতিক অবরুদ্ধতা এবং এই অবরুদ্ধতা থেকে পরিত্রাণের রাজনৈতিক আশাবাদে বিশেষ হয়ে উঠেছে। আরো লক্ষ করা যাক–

নিষেধ কোরো না অকারণ
শুনব না সে তো জানো।
হৃদয় পাখীটি অবারণ
খাঁচায় মিথ্যে টানো।
ঝড়ের শঙ্কা থাকবেই
বিঘ্ন থাকবে আরো
পথ যে সামনে ডাকবেই
কঠিন মায়া যে তারও।

দুই ডানা যদি ভেঙে যায়
না হয় থাকবে প্রাণ
সে তবু তো পাখী রইল না
না পেলে গতির ঘ্রাণ। (সিকান্দার ২০১৭ : ১৩২)

আন্দোলন-সংগ্রাম ও ষাটের কবিতা

পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানবিরোধী বা স্বৈরশাসনবিরোধী আন্দোলন-সংগ্রাম ষাটের দশকে যখনই হয়েছে তখনই সেই আন্দোলন-সংগ্রাম নিয়ে নানাভাবে কবিতা রচিত হয়েছে। এসব কবিতা নানা প্রকারে রচিত হয়েছে। কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কখনো আভাসে-ইঙ্গিতে আবার কখনো রূপক-প্রতীকী তাৎপর্যে। যেভাবেই রচিত ও প্রকাশিত হোক না কেন, এসব কবিতা শোণিতে ও কখনো কখনো প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের তথা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামের ফসল। রাজনৈতিক কবিতাই বলি আর জাতীয়তাবাদী চেতনার কবিতাই বলি, এসব কবিতা যে পূর্ব বাংলার মানুষের সমকালীন আবেগকে ধারণ করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যেমন, আল মাহমুদ (জ. ১৯৩৬)-এর লোক লোকান্তর (১৩৭০) কাব্যের 'দুরূহ আভাস' কবিতাটি। কবিতাটিতে খুব প্রত্যক্ষভাবে বলা হয়নি কোনো আন্দোলন-সংগ্রামের কথা। কিন্তু অধিকার আদায়ের সংগ্রামে রত তরুণদের কথা, তাদের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার কথা কবিতাটিতে যে বলা হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কবিতাটি সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতা আর বাঙালিত্বের অহংকার নিয়ে কালের স্মারক হয়ে উঠেছে–

আর সে দুর্গম পথে দেখা গেলো প্রথম সওয়ার
আমাদের, অহঙ্কার বিন্দু বিন্দু ঘাম হয়ে ঝরে;
কেউ নেই, ছেলেগুলো পার হবে দুর্জয় পাহাড়

Dhaka University Institutional Repository

একটু করুণা ছিলো ঈশ্বরের নিষিদ্ধ অধরে?

লোকালয়ে দেখিয়েছি আমাদের পূর্বপুরুষের

অতি জীর্ণ ভাঙা এক জংধরা ঋজু তরবারি

কেমন নরমভাবে হাসে তারা, যেন সম্মুখের

উপত্যকা ভরে যাবে, টলে যাবে তীক্ষ্ণ পাহাড়-ই। (আল মাহমুদ ২০০০ : ৪৭)

কবিতাংশের 'দুর্গম পথের', 'দুর্জয় পাহাড়' জয়ের বাসনায় দীপ্ত অহংকারী 'ছেলেগুলো', 'পূর্বপুরুষের ঋজু তরবারি' আর 'তীক্ষ্ণ পাহাড় টলে' যাওয়ার অনুষঙ্গ সমকালীন ছাত্র আন্দোলনের মর্মশ্বাসকে ধারণ করেছে। একই ধরনের প্রকাশ লক্ষ করা যায় একই কবির K√‡ji Kjm (১৩৭৩) কাব্যের 'জল দেখলে ভয় লাগে' কবিতায়। সেখানেও লক্ষ করা যায় 'ক'জন সমান বয়েসী সহোদর'-এর এক দুর্গম অভিযাত্রা। এই অভিযাত্রা এমন, যেখানে 'বাঁচার মতন জল, জলস্রোত' নেই, 'সূর্য থাকে সর্বদা মাথায়/নিঃশব্দে চলতে হয় রুদ্ধশ্বাসে, অসহ্য গরম/ভেদ করে অন্ত্রনালী'। কিন্তু তারা বাংলাকে সঙ্গী করেছে। তাদের ভাষ্যটি এরূপ–

আমরা প্রতীকহীন হাতে কোন পতাকা নিইনি।

আমাদের সঙ্গে এক বাউলের বিধবা স্ত্রী যাবেন

উষ্ণ বয়সিনী এই বঙ্গ নাম্নী বৈষ্ণবীটি ছাড়া

তৃষ্ণার রাস্তায় আর অন্য কোন যুবতী যাবে না। (আল মাহমুদ ২০০০ : ৫৫)

একই রকম আন্দোলন-প্রতিবাদের আভাস স্পষ্ট হয়েছে আল মাহমুদের K√‡ji Kjm কাব্যের 'শরীর থেকে মা'র' কবিতাটিতে। কবিতাটিতে বাঙালির প্রতিবাদী রূপ, প্রতিবাদের শপথের রূপ মূর্তিমান হয়েছে এভাবে–

স্বদেশভূমি, তুমি, তোমার নাম

শুনেছিলাম মাংস থেকে মা'র

ফাটিয়ে দিয়ে শহর ঘর গ্রাম

আমরা ক'টি পুত্র কানু পা'র।

শবরী পা'র চোখের মতো শ্যাম

গভীর ঘাসে রাখতে দাও মা

আমার নাম, আমার পরিণাম

ছিন্ন করে নিজেকে শতধা।

হতাশা কই? হতাশ নইতো

হতাশা আজ বাতাসে মেলে ধরি

এখনও বয়, যেমন বইতো

গুপ্ত লাল তপ্ত নির্ঝরই। (আল মাহমুদ ২০০০ : ৬৪)

সুনির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও এটি নিশ্চিত যে, কবিতাটি ষাটের মাঝামাঝি সময়ের দিকের কোনো জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামের তাপ-চাপ আর শাঁসকে ধারণ করে কালের সাক্ষ্য বহন করছে। আবার

Dhaka University Institutional Repository

কোনো কোনো কবি ষাটের মধ্যভাগেই চকিতে জনচৈতন্য জাগানিয়া কবিতায় মুখর হয়েছেন। কবি অতীত বঞ্চনা আর সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট করে বলেছেন, সংগ্রামই মুক্তি এনে দেবে। বাঁচার অধিকারের কথা, দাসত্ব থেকে মুক্ত হবার কথা, প্রতারণা-প্রলোভন থেকে মুক্ত হবার কথা কবি স্পষ্ট করেই বলেছেন–

হতমানে অপমানে নয়, সুখ সম্মানে

বাঁচবার অধিকার কাড়তে

দাস্যের নির্মোক ছাড়তে

অগণিত মানুষের প্রাণপণ যুদ্ধ

চলবেই চলবেই

আমাদের সংগ্রাম চলবেই।

প্রতারণা প্রলোভন প্রলেপে

হ'ক না আঁধার নিশ্ছিদ্র

আমারা তো সময়ের সারথী (sic)

নিশিদিন তো শান্তি আরও দেবো স্বস্তি

দিয়েছি তো সম্ভ্রম আরও দেবো অস্থি

প্রয়োজন হলে দেবো একনদী রক্ত। (সিকান্দার ২০১৭ : ১৫৫)

এই কবিতায় আন্দোলন-সংগ্রামের যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে সময়ের তুলনায় বেশ অগ্রসর। কবি যেন ষাটের উপান্তের কবিতা ষাটের মধ্যভাগে লিখে ফেলেছেন। কবিতাটি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষেত্রেও গণ-পর্যায়ে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছিল। এই কবিতাটি– উত্তরকালে যেটি গান আকারে প্রচলিত হয়েছিল– সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন–

> মুক্তিযুদ্ধের সূত্রপাতে ১৯৭১ সালের ১৫ই এপ্রিল আমি ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। চট্টগ্রামের রামগড় থেকে সাবরুম হয়ে আগরতলা। আমরা একটা জীপে করে যাচ্ছিলাম। সাবরুমের রাস্তায় একদল স্কুলের ছাত্র আমাদের জীপ থামিয়ে চারিদিকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গান করতে লাগলো "আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবে"। সিকান্দার [সিকান্দার] এই গানটি লিখেছিলো কিছুদিন আগে। তখন এই গানটির তাৎপর্য বুঝতে পারিনি, কিন্তু অপরিচিত পরিমণ্ডলে শংকিত সময়ের পদক্ষেপে গানটির বাণী আমার কাছে অসাধারণ তাৎপর্যবহ মনে হলো। আমার মনে হলো ঠিক এমন করে হৃদয়ের সর্বস্ব দিয়ে কেউ হয়তো তাঁর জাতির বেদনাকে রূপ দিতে পারেনি। (সৈয়দ আলী ১৯৮৩ : ১৩২)

কবিতায় পূর্ব বাংলা

ষাটের দশকের প্রথমার্ধের কবিতায় জাতীয়তাবাদী চেতনার যে রূপটি লক্ষ করা যায়, তাকে বলা যায় জাতীয়তাবাদের অন্তঃসলিল প্রবাহ। ব্যতিক্রম ছাড়া কবিতা তখনো মিছিলের বিকল্প হয়ে ওঠেনি; দাহ্য হয়ে ওঠেনি। কিন্তু কবিতার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছে জাতীয়তাবাদী চেতনার বীজ। কবিতায় কবিরা পূর্ব

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাকে অর্থাৎ তাঁর নিজ আবাস আর জন্মভূমিকে বিশেষভাবে আলাদা করতে শুরু করেছে। এই আলাদা শুধু পূর্ব বাংলার প্রকৃতির প্রতি কবিতায় টান দেখিয়ে নয়, বরং পূর্ব বাংলা শিরোনামে কবিতা রচনার মাধ্যমে। লক্ষণীয় যে, ষাটের প্রথমার্ধে কবিরা যখন পূর্ব বাংলা বিষয়ক বা 'পূর্ব বাংলা' শিরোনামের কবিতা লিখছেন তখন পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রীয় নাম কিন্তু 'ইস্ট পাকিস্তান'। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের চাপে পূর্ব বাংলার কবিরা আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, তাঁরা পূর্ব বাংলার স্বাতন্ত্র্য রাখতে ও দেখতে চায় না। তারা এটিকে পাকিস্তান হিসেবেই দেখতে চায়। পূর্ব বাংলার কবিরা এও বুঝেছিলেন যে, পাকিস্তানি শাসকচক্রের চেতনা আর কর্মকাণ্ডের মধ্যে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসন বলে কিছু নেই। ফলে পূর্ব বাংলার কবিরা পূর্ব বাংলাকে তাঁদের জাতীয়তাবাদী চেতনার আবেগে মুড়িয়ে নিখিল পাকিস্তান থেকে আলাদা করে নিয়েছিলেন। এই আলাদার চেতনা থেকে তাঁরা রচনা করেছেন পূর্ব বাংলা বিষয়ক বা পূর্ব বাংলা শিরোনামের কবিতা। সানাউল হকের wePY Awk‡ত (১৯৬৮) কাব্যে রয়েছে 'পূর্ব বাংলা– এক' এবং 'পূর্ব বাংলা–দুই' শিরোনামের দুটি কবিতা। সানাউল হকের পূর্ব বাংলা বিষয়ক কবিতায় উঠে এসেছে পূর্ব বাংলার নদীমাতৃকতা আর এর দীর্ঘ 'কর্ম-শ্রম-রক্তক্ষয়'-এর ইতিহাসের ইঙ্গিত–

কী গান শোনাও তুমি– মাঙ্গলিক অভিজ্ঞান
জয়-পরাজয়-উর্ধ্ব, (ধরিত্রীর প্রান্তিক দুহিতা)
কর্মেশ্রমে প্রস্ফুটনে রক্তক্ষয়ে, ওগো শুচিস্মিতা?
করতোয়া শঙ্খনদী কুলুধ্বনি : কী আনন্দ স্নান।
পাত্রমিত্র সভাসদ লুপ্ত হোক ; তুমি কী ঈপ্সিতা
ছিন্নভিন্ন ছেঁড়াতন্ত্রী সম্পূর্ণ সহাস এক গান? (সানাউল ১৯৯৮ : ১৪৪-১৪৫/১)

এই পর্বে পূর্ব বাংলাকে কবিরা শুধু পাকিস্তান থেকে আলাদা করে দেখেননি; সারা পৃথিবীতে পূর্ব বাংলা অনন্য বলে মনে করেছেন–

কতদিন কত বিদেশে
কত পাথর, গাছ, বরফ আর
ধোঁয়া দেখেছি–
কত সমুদ্রের সমৃদ্ধি
গাঢ় ঘন নীল, কুয়াশা রং
অথবা কালো
সূর্যকে দেখেছি আকাশে কত দেশে
ডাইনে বাঁয়ে দিগন্ত ছুঁয়ে
আবার বরফের উপর
লাল নীল স্বচ্ছ স্ফটিক
উত্তর ব্যাভেরিয়ার অরণ্যের বিস্তারে

Dhaka University Institutional Repository

বাতাস সূর্যের আলো আর
প্রতিটি প্রহর যেন সবুজ
এবং শিথিল বিশ্রামের মতো
তারা আমাকে আচ্ছন্ন করেছিলো

হঠাৎ নতুন প্রত্যাগত আমার কাছে
বন্য উচ্ছলতায় সবুজের ঔদার্য
এখানে আমার পৃথিবী অনেক
রূপময়ী
এখানে নদীর মতো এক দেশ
শান্ত, স্ফীত, কল্লোলময়ী
বিচিত্ররূপিণী অনেক বর্ণের রেখাঙ্কন
এ-আমার পূর্ব-বাংলা
যার উপমা একটি শান্ত শীতল নদী। (সৈয়দ আলী ২০০৯ : ৫৯)

উদ্ধৃতাংশে কবির তীব্র দেশপ্রেম লক্ষ করা যায়। এই দেশপ্রেম সম্পর্কে বলেতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন, 'নরনারীর যে সম্বন্ধকে আমরা প্রেম বলি, তিনি [সৈয়দ আলী আহসান] এই প্রেম এবং নৈসর্গিক সৌন্দর্যমণ্ডিত অবস্থায় দেশকে স্থাপন করে, প্রেম এবং দেশপ্রেম তাঁর কবিতার উপজীব্য করে তুললেন।' (আল মাহমুদ ১৯৯৫ : ৩৮) উদ্ধৃতাংশে পূর্ব বাংলা সারা পৃথিবীর বিপরীতে এক অনন্যতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পৃথিবীর বিচিত্র জায়গায় কবি বিচিত্র ধরনের প্রকৃতি দেখেছেন এবং রীতিমত মুগ্ধও হয়েছেন। কিন্তু পূর্ব বাংলার প্রতি মুগ্ধতা তাঁর অতুলনীয়। এর অন্তত দুটি কারণ কবিতাংশে লক্ষ করা গিয়েছে; একটি সবুজের 'বন্য উচ্ছলতা' এবং অন্যটি 'বিচিত্ররূপিণী'। কিন্তু কবিতায় বিশ্বের নানা দেশের অভিজ্ঞতার কথা যখন বলেছেন, তার মধ্যেও বৈচিত্র্য নেই তা নয়। তাহলে কবি পূর্ব বাংলার প্রতি কবিতাংশের শেষের দিকে তাঁর যে পক্ষপাত বা তীব্র আকর্ষণ প্রকাশ করলেন এর উৎস কী! এর উৎস পূর্ব বাংলার প্রতি কবির তীব্র আবেগ; অন্ধ আবেগ। এই অন্ধ, নিঃশর্ত আবেগেই তো জাতীয়তাবাদ।

ষাটের প্রথমার্ধের অবরুদ্ধ বাস্তবতার মধ্যে পূর্ব বাংলার জন্য কবিরা অনুভব করেছেন বেদনা। তাঁদের সেই বেদনার অনুভূতি বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে উপমা-রূপকে। পূর্ব বাংলার প্রতি অনুভূত কবির এই বেদনার উৎস এর প্রতি তীব্র প্রেম। স্বদেশ নিপীড়িত হলে তার জন্যে কবি বেদনা বোধ করবেন এটাই স্বাভাবিক। যেমন– হাসান হাফিজুর রহমানের A‰š Íg k‡ii g‡Z¨ (১৯৬৮) কাব্যের 'জীবনের ঘণ্টারোলে' কবিতায় কবি ব্যক্তিগত ভাবানুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন– 'আমি ব্যথিত পূর্ব বাংলার ঈপ্সিত আলেখ্যের/চৌচির প্রতিলিপি'। (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ১০১/১) পূর্ব বাংলার প্রতি কবির এই বেদনাবোধের উৎস যে খাঁটি দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী চেতনা এতে আর সন্দেহ কী!

Dhaka University Institutional Repository

কবিরা ব্যক্তিগত অনুভব-অনুভূতি প্রকাশ করার সময় পূর্ব বাংলাকে উপমান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কখনো এই উপমান দুঃখের-বেদনার অনুভূতি প্রকাশক হয়েছে কখনো আনন্দের-সুখের অনুভূতি প্রকাশক হয়েছে। যে অনুভূতি প্রকাশই করুক না কেন, পূর্ব বাংলা স্বদেশ হিসেবেই কবিদের ভাবনা-চেতনার কেন্দ্রে অবস্থান করেছে।

কবিতায় নদীর ব্যবহার ও জাতীয়তাবাদী চেতনা

পূর্ব বাংলা নদীমাতৃক এলাকা। নদীর গর্ভ থেকেই বাংলার জন্ম– একথা বোধ করি অত্যুক্তি নয়। এ অঞ্চলের জনচৈতন্যে এবং জনজীবনে নদীর রয়েছে সুদূর প্রসারী প্রভাব। 'বাংলাদেশের জনগণের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্তমানে যেমন অতীতেও তেমনি নির্ধারিত হয়েছে এখানকার নদীগুলো এবং নদী-বাহিত জল দ্বারা।' (আবদুর রাজ্জাক ১৯৮৭ : ৯) একারণে লক্ষ করা যায়, বাংলাদেশের দেশাত্মবোধক গানে শুধু নয়, যেকোন ভাবপ্রকাশের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে নদী। 'বাংলাদেশের মনের ছবি এখানকার কবিরা চিরদিনই নদ-নদীকে অবলম্বন করেই ফুটিয়ে তুলেছেন। ছড়ায়, গানে, কিংবদন্তিতে, কাব্যে, মহাকাব্যে বাংলাদেশের রূপ যে নানাভাবে নদ-নদীর ছবি দিয়ে আঁকা, তা কারও অবিদিত নেই।' (শহীদুল্লাহ্ ১৯৯৯ : ৫৪) পূর্ব বাংলার কবিতায় বরাবরই নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কবিতার উপমা, রূপক, চিত্রকল্পের একটা ব্যাপক অংশ দখল করে আছে নদী। নদী এখানকার মানুষের যেমন আশ্রয়, তেমনি সংগ্রাম আর জীবিকারও আধার। আবার এই নদী কখনো কখনো ব্যবহৃত হয়েছে শোষকের শোষণের হাতিয়ার হিসেবে। কারণ নদীকে ব্যবহার করেই দরকারি পণ্য বহন করে নিয়ে গিয়েছে শোষকরা। ফলে বাংলাদেশের কবিতায় নদী নানাভাবে উঠে আসবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ষাটের দশকে, যখন পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনা আর বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে, তখন পূর্ব বাংলার মানুষের চিন্তা আর এর প্রকাশের অনুষঙ্গগুলো আর নিরীহ থাকেনি। একারণে ষাটের দশকে একজন কবি যখন তাঁর কবিতায় নদীর পৌনঃপুনিক ব্যবহার করছেন, তখন তার এক ভিন্ন তাৎপর্য দেখা দেয়। এই নদী পশ্চিম পাকিস্তানের মরুপ্রবণ বিশুষ্ক প্রকৃতির বিপরীতে এক ভিন্ন বিপরীত প্রকৃতি, জীবন আর চৈতন্যেরই আওয়াজ তোলে। যেমন–

বর্ষায় বন্যায় তুমি অতলান্ত
অপরিমিত হৃদয়ের বৈকুণ্ঠ
আদিগন্ত জীবনের পরিধি
স্রোতবাহী নৌকোর মতো সম্ভাষণ
গলুয়ের উপর বসে
গলা ছেড়ে গান গাওয়ার মতো... (সৈয়দ আলী ২০০৯ : ৫৮)

কবির কবিতার এই নদী বাঙালির স্বাধীনচেতা মানসিকতার উৎস হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, নদী আর বাঙালি জাতির চরিত্রের মধ্যে মিল আবিষ্কার করে কবি কখনো কখনো নদী আর বাঙালিকে মেজাজে অভিন্ন করে তুলেছেন। যেমন– 'নিরবধি কাল পদ্মা যমুনা বাংলারই,/যদিও একরোখা, গোঁ-ধরা

ষাঁড়ের/ মতো কিংবা বাঙাল চাষার মতো ঘাড় বাঁকানো।' (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ১৩/১) আল মাহমুদের কবিতায়ও দেখা যায় নদী আর পূর্ব বাংলার মানুষকে কবি অভিন্নতায় গেঁথে দিয়ে স্বতন্ত্র এক জাতীয় চৈতন্যকে বাঙ্ময় করে তুলেছেন–

নদী, নদী–
সন্তানেরা উল্লসিত আনন্দের মধ্যে আঙুল তুলে
যে স্পষ্ট জলধারা দেখালো, তা আমাদের প্রাণ।
এই সেই স্রোতস্বিনী, যার নকশায় আমাদের রমণীরা
শাড়ি বোনেন। ঐ সেই বাঁক যার অনুকরণে
আমার বোনেরা বঙ্কিম রেখায় এঁটে দেহ আবৃত করেন।
দেখো সেই পুণ্যতোয়া,
যার কলস্বর আমাদের সঙ্গীতে নিমজ্জিত করে। (আল মাহমুদ ২০০০ : ৯০)

এভাবে নদী ষাটের কবিতায় বাঙালি জাতিসত্তার ভিন্নতার পরিচায়ক হিসেবে কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে।

নদী বাঙালির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত। পূর্ব বাংলার সমতল ভূমির ওপর দিয়ে শিরা-উপশিরার মতো যে নদী-উপনদীগুলো বয়ে চলে গিয়েছে, তার মধ্য দিয়ে বিচিত্র পণ্য বাহিত হয়ে যায় দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে। ব্যবসা-বাণিজ্যকে সচল রাখে এই নদী। কিন্তু ষাটের দশকে এসে বাঙালি কবির চৈতন্যে ধরা দেয় নদীর অন্যতর ব্যবহার। ষাটের কবি এসে আবিষ্কার করলেন, এই নদী দিয়েই পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যায় পূর্ব বাংলার অন্যতম অর্থকরী ফসল পাট এবং এরকম আরো অনেক কিছু। কবির ভাষায়–

কে অস্বীকারের পাখি ডানা ঝাড়ো আমার ভিতরে
বেয়াদব শিসে তোর ছলকে ওঠে রক্ত চলাচল?
নিসর্গের মানচিত্র ছেঁদা করে একদা যে নদী
আনতো গভীর জল কর্মপরায়ণ ঘরে ঘরে
সেও আজ নদী নয়, কালসাপ, ধূর্ত বণিকের
গোপন দালাল যেন। পাটের চালান ভরা নাও
ভাসাও উদ্দাম গতি, হাসির গমকে নেড়ে পাল
পাটাতনে ভেঙে পড়ো বিশ্বাসঘাতক নীল জল। (আল মাহমুদ ২০০০ : ১১৯)

কবিতায় স্পষ্ট যে, কবি এখানে নদীকে আবিষ্কার করেছেন 'ধূর্ত বণিক' পশ্চিম পাকিস্তানিদের 'গোপন দালাল' হিসেবে। কারণ এই নদীকে ব্যবহার করেই পাকিস্তানিরা পাটের চালান নিয়ে গিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। অর্থাৎ নদী এই কবিতায় কবির মধ্যে অর্থনৈতিক শোষণের বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে তুলেছে। একই সঙ্গে কবির মধ্যে তীব্র জাতীয়তাবাদী চৈতন্যেরও প্রকাশক হয়ে উঠেছে এই নদী। কবি নদীকে উদ্দেশ করে বলেছেন–

একদিন আমাদের হবে। অজগর এই নদী
হবে জাগর ভাস্বর ঘোলা, হবে চঞ্চল তরল

Dhaka University Institutional Repository

পেশীতে মচকাবে দাঁড়, পালে আর দড়িতে বিদ্যুৎ। (আল মাহমুদ ২০০০ : ১১৯)

এভাবে নদী নিয়ে কবিতা রচিত হয়েছে পুরো ষাটের দশক ধরে। যদিও এটি পূর্ণ সচেতন কোনো কাব্যধারা নয়, তবু নদী আর পূর্ব বাংলার বাঙালির জীবন যেহেতু অভিন্ন সূত্রে গাঁথা, সেহেতু নদী আর মানুষের অস্তিত্ব, অস্তিত্বের ভাঙাগড়া, আবেগ, ভালো লাগা, মন্দ লাগা, আশাবাদ, হতাশা নিয়ে কবিরা কবিতা রচনা করেছেন নিজেদের জ্ঞাতসারে কখনো অজ্ঞাতসারে। যেভাবেই রচিত হোক না কেন, ষাটের দশকে অনেক কবিতায় নদী কবিদের জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রকাশের কখনো প্রত্যক্ষ কখনো প্রতীকী আধারে পরিণত হয়েছিল।

কবিতায় নৈঃশব্দ্য, নীরবতা এবং জাগরণের আকাঙ্ক্ষা

ষাটের দশকের প্রথমার্ধের রাজনীতি ছিল কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া মূলত নৈঃশব্দ্যে মোড়ানো। স্বৈর শাসনের তীব্র চাপে জনগণের কণ্ঠ ছিল রুদ্ধ। অথচ জনগণ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে ছিল জেগে ওঠার, সশব্দ হয়ে ওঠার অন্তর্গত আগুন। মাঝে মাঝে তার প্রকাশও আমরা দেখেছি রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ আলোচনার সময়ে। ষাটের প্রথমার্ধের এই চাপা জাতীয়তাবাদী চেতনার কথা, সশব্দ হয়ে ওঠার বাসনা-কাতরতার কথা ষাটের প্রথমার্ধের প্রচুর কবির কবিতায় লক্ষ করা যায়। কবি যখন বাংলাকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করেন, ‘কী এমন মর্মন্তুদ ঝড় পুষে রাখো মনে/স্বচ্ছ স্বপ্নে জ্যোতি ক্ষরে/পাখনার আলোড়নে/আকাশে মাতাল পাখি/গতি হানে’ (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ১২/১) তখন কবির কথা আর ভাবনা আভিধানিক অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এই কথা এক স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনা তৈরি করে। আর সময়টা যদি হয় ষাটের দশক তাহলে তার রাজনৈতিকতা আর অস্পষ্ট থাকে না। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের কবিতায় জাগরণের বাসনা নৈঃশব্দ্য আর প্রকাশের ব্যকুলতার মধ্য দিয়ে ধরা পড়েছে। যেমন, আহসান হাবীবের A\kvq em\Z (১৩৮১) কাব্যের প্রথম কবিতা–

আমি কিছু মনোরম কথার কাঙাল।
জীবনের আটপৌরে রঙ্গমঞ্চে কিছু সুর
সঙ্গীতের দুটি একটি মোহন কলির
অতলে বিশ্রাম চাই কিছুক্ষণ,

অথচ প্রত্যহ
অবিশ্রাম নিরাশ্রয় চীৎকারে খণ্ডিত আর সচকিত
এই লোকালয়ে
কোথাও কথার মালা পড়ে না আমার চোখে, আমি সারাদিন
নৈঃশব্দের (sic) ভয়াবহ ভারী এক শব কাঁধে নিয়ে
ঘুরিফিরি। কথার কাঙাল
আমি। তবু নৈঃশব্দের নির্মম তাড়ায়
সমস্ত শহর আর জনপদ প্রদক্ষিণ আমার নিয়তি যেন। যেন

Dhaka University Institutional Repository

নিশিলগ্ন নিঃসঙ্গ পথিক। (আহসান হাবীব ১৯৯৫ : ১৪৯/১)

উদ্ধৃত কবিতাংশে কবির প্রকাশিত বক্তব্যে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, এটি রোমান্টিক কবি মনের অকারণ খারাপ লাগার বর্ণনা। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, প্রকাশের এই অপরগতা, বেদনার এই বাস্তবতা দেশকালের গভীর অবরুদ্ধতা থেকে উদ্‌গত। প্রকাশের তীব্র ব্যাকুলতা অথচ প্রকাশ করতে না পারার গ্লানিই তো ষাটের প্রথমার্ধের পূর্ব বাংলার প্রধান রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বাস্তবতা। এই পর্বের কবিতায় প্রকাশিত এই বাস্তবতাকে বলা চলে, ছাইচাপা আগুনের মতো জাতীয়তাবাদী চেতনা। ষাটের প্রথমার্ধের সুপ্রচুর কবিতা এই চাপা জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ধারণ করে আছে। এরকম আরো উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, যেখানে কবি নিজেকে ব্যক্ত করতে চান কিন্তু কোনো অব্যক্ত অবরুদ্ধতা বা আশঙ্কা বা দ্বিধা তাঁর সেই প্রকাশে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে–

চোখের সামনে কে দোলায় কালো কালো
মলিন পর্দাটা
পর্দা তুলে দাও।

প্রাণের সব আলো
পুড়েই নিঃশেষ
আঁধার গুহাতে,
কেটেছে সারা রাত
আঁধার ঠেলে ঠেলে
ব্যর্থ দু'হাতে।

আসতে দাও হাওয়া
উঠুক ভরে বুক
রোদের আরশিতে
দেখতে দাও মুখ। (আহসান হাবীব ১৯৯৫ : ১৫৪/১)

এই কালো পর্দা এবং তা অপসারণের বাসনা সমকালীন জাতীয় রাজনীতির রূপক হিসেবেই পাঠ্য।

রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক কবিতা ও জাতীয়তাবাদী চেতনা

পূর্বের অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ষাটের প্রথমার্ধে রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে পূর্ব বাংলায় জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রেরণা হয়ে উঠলেন, কিভাবে রাজনৈতিক হয়ে উঠলেন। একদিকে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে পাকিস্তানি শাসকচক্র ও পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী চেতনার অনুসারীদের নেতিবাচক মনোভাব, অন্যদিকে পূর্ব বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও সংস্কৃতিকর্মীদের রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণার উৎস মনে করে আঁকড়ে ধরা– এ দুয়ের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সমকালীন কবিরা প্রেরণা বোধ করেছেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কবিতা লেখার। ভাষা আর ভাবসম্পদগত মিলের কারণে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পূর্ব

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে বরাবরই অহংকার ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু সেই অহঙ্কারে যখন আঘাত এসেছে, তখন পূর্ব বাংলার কবিরা অধিক আবেগে রবীন্দ্রনাথকে আঁকড়ে ধরেছেন। নিজেদের মধ্যে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের অবস্থিতিকে খুঁজে পেয়েছেন।[৮] তবে এই রবীন্দ্রনাথ নতুন বিন্যাসে মেরুকরণকৃত; অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে রাজনৈতিক। কবি যখন বলেন, 'আমার মননে/রাবীন্দ্রিক ধ্যান জাগে নতুন বিন্যাসে/এবং মেলাই তাকে বাস্তবের তুমুল রোদ্দুরে/... (শামসুর ২০১২ : ২৭২/১) তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, রবীন্দ্রনাথ কবির চেতনায় ধরা দিয়েছে রাজনেতিকভাবে অর্থাৎ 'নতুন বিন্যাসে'। একারণে রবীন্দ্রনাথকে অশেষ প্রেরণার উৎস দেখিয়ে তাঁরা রচনা করেছেন অসংখ্য কবিতা। যেমন–

আমার দিনকে তুমি দিয়েছ কাব্যের বর্ণচ্ছটা
রাত্রিকে রেখেছ ভরে গানের স্ফুলিঙ্গে, সপ্তরথী
কুৎসিতের ব্যূহ ভেদ করবার মন্ত্র আজীবন
পেয়েছি তোমার কাছে। ঘৃণার করাতে জর্জরিত
করেছি উন্মত্ত বর্বরের অট্টহাসি কী আশ্বাসে।

প্রতীকের মুক্ত পথে হেঁটে চলে গেছি আনন্দের
মাঠে আর ছড়িয়ে পড়েছি বিশ্বে তোমারই সাহসে। (শামসুর ২০১২ : ২৫৫-২৫৬/১)

আরো এক ধাপ এগিয়ে কোনো কোনো কবি রবীন্দ্রনাথকে আদ্যপান্ত পূর্ব বাংলার রাজনীতির মোড়কে মুড়ে দিয়ে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথকে জুড়ে দিয়েছেন 'বিপ্লব' আর একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনার সঙ্গে। উদাহরণ দেখা যেতে পারে–

আমরা কতিপয় যুবা
তাই আর সব পরিচয় যখন ভুলে যাই এমনকি ভুলে
যাই নিজেদের নাম, তখনো মনে রাখি
রবীন্দ্রনাথ আমাদের আবহমান বাংলাদেশ
আমাদের প্রদীপ্ত বিপ্লব,
রবীন্দ্রনাথ আমাদের চিরদিন একুশে ফেব্রুয়ারি। (মহাদেব ২০১১ : ৩৯/১)

রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় ও সাহসের উৎস ভেবে লেখা কবিতার সংখ্যা ষাটের দশকে যত দিন গড়িয়েছে ততোই বেড়েছে। শুধু পূর্ণ কবিতা নয়, বিচিত্র কবিতায় রবীন্দ্রনাথের অনুষঙ্গ, উপমান বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। শামসুর রাহমানের weaŸ¯Í bxjgv কাব্যের 'স্বর্গে গেলাম দর্শক হিসেবে' কবিতায় কবি স্বর্গে কী কী দেখেছেন তার একটা তালিকা হাজির করেছেন। সেখানে কবি পিকাসোর ছবি দেখেছেন, দেখেছেন সার্ত, ফকনার বিষয়ক আলোচনা। আরো অনেক কিছু দেখেছেন। কিন্তু কবি দেখতে ভোলেননি যে, সেখানে রবি ঠাকুরের গান ভেসে আসছে আর লোকে তাঁর সুরের টানে ছুটে যাচ্ছে। কবির ভাষায়, 'রবিঠাকুরের গান ভেসে আসে,/ছুটে যায় লোক সুরের টানে।/পিকাসোর ছবি ড্রয়িংরুমের/ দেয়ালকে দেয় অন্য মানে।' (শামসুর ২০১২ : ১৮৫/১) আবার weaŸ¯Í bxjgv কাব্যের 'কাননবালার জন্যে' কবিতায়

Dhaka University Institutional Repository

কবি রবীন্দ্রনাথের ছবিকে টাঙিয়ে দিয়েছেন গণ মানুষের মধ্যে। কবির ভাষায়, ‘বিজয়িনী তুমি, তাই সেলুনে কি পানের দোকানে/রবীন্দ্রনাথের পাশে ঝুলত তোমার ফটোগ্রাফ।’ (শামসুর ২০১২ : ২০০/১) সেলুনে পানের দোকানে রবীন্দ্রনাথের ছবি ষাটের দশকে টানানো থাকত কিনা সেটি এখানে অবান্তর। মূল বিষয় হচ্ছে, কবি রবীন্দ্রনাথকে গণ মানুষের মধ্যে আবিষ্কার করে তাঁকে গণ-ঐতিহ্যে পরিণত করেছেন। ষাটের শেষের দিকে সৈয়দ শামসুল হক তো মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী গেরিলাকে রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে তুলনা করে লিখেছেন, ‘যেন তুমি আমাদেরই দ্বিতীয়/শরীর কোনো এক রবীন্দ্রনাথের/গান সমস্ত কিছুর কেন্দ্রেই আছো’। (সৈয়দ শামসুল ২০১২ : ১৭২/১) উদ্ধৃত কবিতাংশ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক তাৎপর্যের স্বরূপ। বাংলাদেশের আধুনিক চেতনার এমন কোনো কবি ষাটের দশকে পাওয়া দুষ্কর হবে যিনি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কবিতা রচনা করেননি। সিকান্দার আবু জাফর তাঁর ˆeix eŵó‡Z (১৯৬৫) কাব্যের ‘রবীন্দ্রনাথ’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথের নানা সমালোচনা[৯] সত্ত্বেও বলেছেন, ‘আমাকে বেষ্টন করে আছো,/অবিশ্বাস্য অদৃষ্টের মতো;/আমাকে আচ্ছন্ন করে আছো/প্রতি মুহূর্তের বর্জনের প্রয়াসে ধিকৃত/অনিবার্য অভ্যাসের মত।’ (সিকান্দার ২০১৭ : ১৩৭) শহীদ কাদরীর ‘রবীন্দ্রনাথ’ শিরোনামের কবিতায় তিনি রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন এভাবে–

জানি চিকিৎসক নও তুমি
কিম্বা ড্রাগস্টোরের কোনো ওষুধ বিক্রেতা;
দিনের শুরুতে তুমি,
মিশে আছো অন্ত্রের অম্লরসে,
অনিদ্র রাতের ভোরে যেন টেবিলে সাজানো প্রাতঃরাশ
মেধার ভেতরে তুমি, মজ্জায়, শিরায়, মর্মে
ওঁৎ পেতে
শিকারী বিড়ালের মতো
নিয়ে গেছো আমাদের সবগুলো সোনালি-রূপালি মাছঃ...(শহীদ ২০০০ : ৭৮)

কাদরী রবীন্দ্রনাথকে ‘আমাদের চৈতন্যপ্রবাহের ট্রাফিক আইল্যান্ড’ এবং ‘ডাক্তার’ বলতেও কসুর করেননি। তিনি †Zvgv‡K Awfev‘b wcqZgv (১৯৭৪) Kv‡e¨i ‘টাকাগুলো কবে পাবো?’ কবিতায় অহম্ নিয়েই স্বীকার করেছেন যে, ‘রবীন্দ্র রচনাবলী’ নামক বিশাল বাণিজ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ’ আছে তাঁর। ষাটের দশকে কাদরীর এই রবীন্দ্রদর্শনের নিশ্চয় একটি রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে। সৈয়দ আলী আহসান তাঁর GKK mÜ¨vq emšÍ (১৯৬২) কাব্যের ‘রবীন্দ্রনাথকে’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন তাঁর প্রেরণার উৎস হিসেবে। শুধু প্রেরণার উৎস নয়; রবীন্দ্রনাথকে তিনি দুইভাবে আবিষ্কার করেছেন কবিতায়। তিনি রবীন্দ্রনাথকে একাধারে ইতিহাস আর বর্তমান হিসেবে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ যখন কবির কাছে ইতিহাস–

একদিন আশ্চর্য উষ্ণতায়
শব্দের ঐশ্বর্য পেয়েছি
অতি পরিচিত শব্দ হঠাৎ সমুদ্র হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

এবং আমার সমস্ত আগ্রহ

চিলের মতো ডানা মেলেছে

এসব সত্য ইতিমধ্যেই ইতিহাস (সৈয়দ আলী ২০০৯ : ৬৫)

আবার ষাটের দশকে এসে রবীন্দ্রনাথ যে 'নতুন স্বাদ'-এ হাজির হয়েছেন একথাও বলতে কবি কুণ্ঠিত নন–

এখন আবার আমাদের শব্দে

নতুন স্বাদ আসছে–

নতুন মৃত্যু, বিচার, পদচারণ এবং বিশ্বাস–

তুমি আমৃত্যুর সাধনায় এ-সব সম্ভাবনাকে প্রদীপ করেছ

তাই তুমি আমার আকাশ

এবং শব্দের পরিসরে হৃদয়ের নীলাম্বর। (সৈয়দ আলী ২০০৯ : ৬৫)

এভাবে কবিতায় এবং চেতনায় রবীন্দ্রনাথ ষাটের দশকে এসে নতুনভাবে নির্মিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের নতুন আবেদন সম্পর্কে কবি বলেছেন–

রবীন্দ্রনাথের

গানে বাংলার কি হয়, কিভাবে হৃদয়

ভাঙে, নড়ে ওঠে স্বপ্নের বোমারু, জোড়া

লাগে রূপালি দরোজা, অলৌকিক স্পর্শে

নতুন গর্ভের মতো ফুলে ওঠে পেট–

এসব সংবাদ কারো অপেক্ষা রাখে না। (সৈয়দ শামসুল ২০১২ : ১৩১/১)

কোনো কোনো কবি রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করেছেন বাঙালি জনগোষ্ঠীকে জাগানোর এবং খোঁচানোর অঙ্কুশ হিসেবে। যেমন, আল মাহমুদ। তিনি তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন বাঙালির জাগারূক শক্তি হিসেবে। তিনি ভেবে অবাক হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের দেশে কিভাবে মানুষ 'উত্থানরহিত' থাকে। একারণে তীর্যক ভঙ্গিতে কবি বলেছেন–

বুঝি না, রবীন্দ্রনাথ কী ভেবে যে বাংলাদেশে ফের

বৃক্ষ হয়ে জন্মাবার অসম্ভব বাসনা রাখতেন।

গাছ নেই নদী নেই অপুষ্পক সময় বইছে

পুনর্জন্ম নেই আর, জন্মের বিরুদ্ধে সবাই। (আল মাহমুদ ২০০০ : ৭৯)

এর মধ্য দিয়ে আল মাহমুদ ষাটের দশকের অবরুদ্ধ বাস্তবতাকে যেমন ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনি পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্রনাথের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে পুনর্জাগরণ ঘটানোর, উত্থান ঘটানোর গোপন আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে নিয়েছেন পূর্ব বাংলা তথা 'বঙ্গদেশ' এর 'উত্থান'-এর দ্বিজমন্ত্র হিসেবে। একারণে তিনি বলেছেন, 'এ কেমন অন্ধকার উত্থান রহিত/নৈঃশব্দের (sic) মন্ত্রে যেন ডালে আর পাখিও

Dhaka University Institutional Repository

বসে না।' কবি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথকে আঁকড়ে ধরলেই যেন নৈঃশব্দ্য আর নিষ্ফলতা কেটে যাবে। যেমন, শামসুর রাহমানের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ চিত্রিত হয়েছেন বাঙালির সত্তা হিসেবে–

যেমন রৌদ্রের তাপ জ্যোৎস্নার মদির মায়ালোকে
হাওয়ার নির্ঝরে
অথবা শ্রাবণে
অক্লান্ত বর্ষণে বেঁচে থাকি মাঝে-মাঝে
নিজেরই অজ্ঞাতে,
তেমনি তোমার
কবিতায়, গানে প্রতিধ্বনিত হয়ে জাগে
আমাদের সত্তার আকাশ। (শামসুর ২০১২ : ২৩১/১)

শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ বাঙালির সংকটে এক বিরাট আশ্রয় হিসেবে কবির কাছে কীর্তিত হয়েছেন–

জীবন যখন ক্রমে কেবলি শুকিয়ে যায়, ডোবে
পাঁকের আবর্তে আর বর্বরের বাচাল আক্রোশে
অবলুপ্ত জ্ঞানীর সুভাষ,
জেনেছি তখন
অলৌকিক পদ্মের মতন
তোমার স্মরণ
উন্মোচিত হয়,
হয় উদ্ভাসিত
অসংখ্য প্রাণের তীর্থে এবং তোমার
গানে গানে মৃত্যুর তুহিন শীতে ফোটে
ফোটে অবিরত
জীবনের পরাক্রান্ত ফুল। (শামসুর ২০১২ : ২৩১-২৩২/১)

ষাটের দশকে কবিরা যখনই অবরুদ্ধ বোধ করেছেন, তখনই অনেকে নিজের আশ্রয় খুঁজেছেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছে তাঁদের বদ্ধ ঘরের একটি মুক্ত জানালা; মুক্তির এক টুকরো আকাশ। অনেকে বোধ করেছেন চারদিকে সবকিছু যখন বন্ধ, তাদের কাছে যখন কেউ আসে না বা আসতে দেওয়া হয় না, তখনও রবীন্দ্রনাথ দেখা দেন তাদের চৈতন্যের গভীরে–

নিষ্প্রদীপ ঘরে থাকি রাত্রিদিন। দরজা-জানালা
বন্ধ সবি। বড় শ্বাসকষ্ট হয়; হঠাৎ কখনো
ইচ্ছে করে 'এ্যাম্বুলেন্স চাই' বলে তারস্বরে দূর
আকাশ ফাটাই। কখনো-বা মাছ শিকারির মতো

Dhaka University Institutional Repository

ব’সে থাকি, নিবিড় অপেক্ষমাণ। এ বন্ধ ঘরেও

ভিড়ছে সোনার তরী, আপনারা স্বচক্ষে দেখুন। (শামসুর ২০১২ : ৩১০/১)

এই যে রবীন্দ্রনাথের পাঠ এই পাঠ কোনো নিরীহ সাধারণ পাঠ নয়। এই পাঠ রাজনৈতিক। এই পাঠের সঙ্গে সমকালীন জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগ। একারণেই বোধ করি কবি বলেছেন, ‘তুমি নও সীমিত শুধুই কোনো পঁচিশে বৈশাখে/তোমার নামের ঢেউ একটি দিনের/সংকীর্ণ পরিধি ছিঁড়ে পড়েছে ছড়িয়ে/রূপনারাণের কূলে, বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘে/অনন্তের শুভ্রতায়/তুমি নও সীমিত শুধুই/ পঁচিশে বৈশাখে।’ (শামসুর ২০১২ : ২৩১/১) আর কোনো কোনো কবি রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন প্রতিরোধের হাতিয়ার আর পরিণতি হিসেবে–

কাঠের লাঙল যারা চেপে রাখতো মাটির ঔরসে,

সেইসব শিল্পী, সেইসব শ্রমিক,

যারা গান গাইতো বাঁশিতে আঙুল রেখে,

যারা স্বপ্ন দেখতো রাতে–; ধলেশ্বরী নদী-তীরে

পিসীদের গ্রাম থেকে ওরা এখন শহরে আসছে।

কাঠের লাঙল ফেলে লোহার অস্ত্র নিয়েছে হাতে,

কপালে বেঁধেছে লালসালুর আকাশ,

শহর জয়ের উল্লাসে ওরা রবীন্দ্রনাথকে বলছে

স্বাধীনতা, রবীন্দ্রনাথের গানকে বলছে স্টেনগান। (নির্মলেন্দু ২০১১ : ৫৬/১)

রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক কবিতা এবং বিভিন্ন কবিতায় রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ তোলার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনার এই ধরনের প্রকাশ ষাটের দশকের সমগ্র সময় জুড়ে অর্থাৎ ষাটের প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধ উভয় সময়েই লক্ষ করা গিয়েছে।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ষাটের দশকে যেসব কবি রবীন্দ্রনাথ নিয়ে কবিতা লিখছেন, তাঁরা কাব্যতত্ত্বের দিক থেকে, কাব্যরুচির দিক থেকে রবীন্দ্রাথকে গ্রহণ করার কথা নয়। তাঁরা রবীন্দ্রবিরোধী ত্রিশের কবিদেরও উত্তর-যুগের কবি। ফলে রবীন্দ্রনাথের জীবনচেতনা আর জীবনদৃষ্টি থেকে তাঁদের দূরত্ব যোজন যোজন। তবে রবীন্দ্রনাথ এইসব কবির শরণস্থল হয়ে উঠেছে কোন দিক থেকে? এই প্রশ্নের মধ্যেই ষাটের দশকে বাংলাদেশের কবিদের রবীন্দ্রানুগত্য ও রবীন্দ্রমুগ্ধতার প্রাণভোমরা নিহিত রয়েছে। আসলে ওই সময় রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা নিয়েছিলেন তাঁদের বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার অংশ হিসেবে।

ভাষা আন্দোলন বিষয়ক কবিতা

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালির চৈতন্যকে দারুণভাবে নাড়া দেয়া এক ইতিহাসের নাম। বাঙালির মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে প্রথম স্থায়ীভাবে জাগ্রত করেছে এই ঘটনাটি। ‘একুশের রক্তরাঙা পথ বেয়েই বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং স্বাধিকার চেতনা ধীরে ধীরে এক দুর্বার গতি লাভ করে।’

Dhaka University Institutional Repository

(শেখ মুজিবুর ১৯৯৫ : ৩০২) কবি এই ঘটনাকে বলেছেন ‘একটি মহৎ জন-জাগৃতি’। (সিকান্দার ২০১৭ : ১৩৩) ষাটের দশকের অবরুদ্ধ সময়ে বাঙালি জনগোষ্ঠীর কাছে এই ইতিহাসটি ছিল ইঞ্জিনের তেলের মতো। যখনই বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনা সংকটের মধ্যে পড়েছে তখনই ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসকে সে স্মরণ করেছে এবং উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে নতুন আলোয়, নতুন উদ্যমে। একারণে আমরা দেখি, ষাটের দশকে এসেও ভাষা আন্দোলনের সময়কার বাঙালি দামাল ছেলেদের আত্মদানের ইতিহাস, স্মৃতি কবিরা বারবার স্মরণ করেছেন। স্মরণের আবরণে বর্তমানে জাগতে এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে জাগাতে চেয়েছেন। কবিরা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন সেদিনের সেই একত্র হওয়াকে। একারণে কেউ কেউ ভাষা আন্দোলন বিষয়ক কবিতা সম্পর্কে বলেছেন, এসব কবিতার শৈল্পিক মূল্যের চেয়ে কাব্যিক উত্তাপই বেশি, যা প্রতিবাদী চেতনার সলতেয় আগুন ধরানোর কাজে সেদিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। (আহমদ রফিক ১৯৯৩ : ৩৬) ষাটের দশকে রচিত সিকান্দার আবু জাফরের কবিতায় যেন একথারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়–

দেশের মানুষ একটি দণ্ডে
একাত্ম হয়েছিল,
স্নায়ু গ্রন্থিতে পাঁজরে পেশীতে,
মেখে নিয়েছিল একটি অঙ্গীকার–
সেদিন প্রথম।
এবং প্রথম নতুন দিগ্বলয়ে
সঞ্চরমান এ-দেশের ইতিবৃত্ত।

চেতনার পথে দ্বিধাহীন অভিযাত্রা।
নানানমুখীন হাজার লোকের
একত্র অস্তিত্ব
একুশে ফেব্রুয়ারী। (সিকান্দার ২০১৭ : ১৩৩)

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিকে ‘স্বার্থপরায়ণের’ ‘দুর্ভাবনা’ হিসেবেও উল্লেখ করেছেন কবি। কবির ভাষায়, ‘অতন্দ্র রাতে বিবেক-বিদ্ধ স্বার্থপরায়ণের/পাতা-ঝরবার শব্দ-চকিত/দুর্ভাবনায় লেখা/একুশে ফেব্রুয়ারী।’ (সিকান্দার ২০১৭ : ১৩৩) আবু হেনা মোস্তফা কামালের Avcb †h֌eb ˆeix কাব্যের ‘আমার অগ্রজ’ কবিতায় লক্ষ করা যায় কবি ১৯৫২ সালের ভাষা শহিদদের নিজের ‘অগ্রজ’ বলে সম্বোধন করেছেন। বর্তমানে তাদের প্রতি কবির মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে এভাবে–

দ্যাখো, চোখ মেলে দ্যাখো, আমার অগ্রজ,
তুমি একা নও, সবচেয়ে নির্বিরোধ নিরীহ তরুণ, সেও
কেমন সাহসী পায়ে নেমে আসে, প্রেমিকের মতোন নির্ভয়,
সবচেয়ে নিখুঁত যুবতী, সেও কেমন নির্ভুল হাতে

খোঁপা খুলে হলো রুক্ষকেশী, দ্যাখো, আমার অগ্রজ,
আজ ছাত্রাবাসে কেউ নেই, ফাল্গুনের রক্তিম গ্যালারি
শূন্য ক'রে নেমে আসে তোমার অনুজ, সবচেয়ে দর্পিত নায়ক
সেও নগ্ন পায় সঙ্গিনীর হাত ধ'রে তোমার শিয়রে
দাঁড়ালো, এখন সব ফাল্গুনের বৃক্ষ থেকে অভিভূত কৃষ্ণচূড়া ঝরে। (আবু হেনা ২০০১ : ৮/১)

উদ্ধৃতাংশে 'সবচেয়ে নির্বিরোধ নিরীহ তরুণ'-এর 'সাহসী পায়ে নেমে আসা', 'নিখুঁত যুবতীর' 'খোঁপা খুলে রুক্ষকেশী' হয়ে নগ্ন পায়ে শহিদের 'শিয়রে' দাঁড়ানোর মধ্যে যে তীব্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনী রূপ লক্ষ করা যায়, তা-ই এই কবিতাটিকে ষাটের দশকের চেতনা প্রকাশের ক্ষেত্রে আপসহীন করে তুলেছে।

ভাষা আন্দোলনের আত্মত্যাগকে ষাটের দশকে এসে কবিরা তাঁদের কবিতায় আবার স্মরণের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে জাগাতে চেয়েছেন। এধরনের স্মৃতিমূলক কবিতা ষাটের দশকের অবরুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেছে। যেমন, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৩৬-২০০৮)-এর k¼Z A‡jvK (১৯৬৮) কাব্যগ্রন্থের 'কৃষ্ণচূড়ার মেঘ' কবিতায় স্মরণ এবং নির্মাণ করা হয়েছে ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি আর ইতিহাস। এই স্মরণ এবং ইতিহাস নির্মাণের মধ্য দিয়ে বর্তমানে জাতীয়তাবাদী চেতনারই উৎসারণ কবির লক্ষ্য। কবিতার প্রথমাংশে লক্ষ করা যায়, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির শহিদদের আত্মত্যাগের কারণের স্মরণ–

তারা ভালোবেসেছিল গোধূলির
রক্তিম আকাশ, সুদূর বিস্তৃত মাঠ,
ফুল, পাখী, প্রজাপতি, হাওয়া ও ভরাট
শস্যের এ ক্ষেত, কিষাণের ভাটিয়ালী, মাঝিদের নির্ভীক সংঘাত–
তারা ভালোবেসেছিল
    জীবনের প্রত্যেকটি ভালো লাগা রাত।
দৈনিক দারিদ্র্য ঠেলে আমরা যে গানে
হেসে উঠি, মেয়েরা ঢেঁকিতে ধান ভানে,
মায়ের যে গানে ফোটে দোলনার কচিমুখে হাসি
যে সুরে কবিতা লিখি–
    যেই গানে প্রেয়সী নারীকে ভালোবাসি
তারা ভালোবেসেছিল সে গানের
    জন্মে জন্মে পরিচিত ভাষা। (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৯৮ : ৪৭)

ভাষা শহিদদের আত্মোৎসর্গ এবং তাদের আত্মোৎসর্গের কারণ বর্ণিত হয়েছে কবিতাংশে। আপাতদৃষ্টিতে কবিতাটিকে নিরীহ মনে হতে পারে। কিন্তু কবিতায় ব্যবহৃত অনুষঙ্গের গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে যে, এর প্রত্যেকটি অনুষঙ্গের ভেতর লুকিয়ে আছে প্রবল রাজনৈতিক চেতনা আর জাতীয়তাবাদী প্রকল্প। কবিতায় শহিদদের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, তারা পছন্দ করত গোধূলির 'রক্তিম আকাশ', 'সুদূর বিস্তৃত

মাঠ', 'ফুল', 'পাখী', 'প্রজাপতি', 'হাওয়া ও ভরাট শস্যের ক্ষেত'। কবি বলেছেন, এসবের জন্যেই শহিদরা আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। লক্ষণীয় যে, এর প্রতিটি অনুষঙ্গই স্বাধীন চেতনার দ্যোতক। এসবের ওপর নিঃশর্ত অধিকার কেবল তখনই আসতে পারে, যখন চেতনাগত ও ভূগোলগত স্বাধীনতা থাকে। কিন্তু তা ছিল না। এই না থাকা বিষয়ের প্রতি অধিকার কায়েম করার বাসনা থেকেই তো ভাষা আন্দোলনে শহিদরা আত্মাহুতি দিয়েছিল। উদ্ধৃতাংশের দ্বিতীয় অংশে দারিদ্র্যের মধ্যেও ভাষা যে ব্যক্তিগত আনন্দ প্রকাশের বাহন সেদিকে ইঙ্গিত দিয়ে কবি বলেছেন যে, এই আনন্দিত-প্রকাশের স্বাধীনতার জন্যেই ভাষা শহিদরা আন্দোলন করেছেন। ভাষাকে শহিদরা মনে করতেন দারিদ্র্যের মহার্ঘ, অবলম্বন, মুক্তির আকাশ। এর পরেই কবি বলেছেন–

> বিষণ্ন পিপাসা
>
> নিয়ে তাই তাঁরা ছড়িয়েছে
>
> কী দুরন্ত কৃষ্ণচূড়া মেঘ
>
> ঝড়ের আবেগ
>
> তার– জুড়ে আছে এ দেশের সমস্ত হৃদয়
>
> তাই তারা বিস্মৃতির ইতিহাস নয়। (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৯৮ : ৮৭)

এখানে কবি সুস্পষ্টভাবেই ভাষা শহিদদের দেখেছেন প্রেরণা হিসেবে। আর তাদের প্রেরণা কবি দেখেছেন কৃষ্ণচূড়ার মাধ্যমে সারা পূর্ব বাংলাময়। উদ্ধৃতাংশে সবচেয়ে লক্ষণীয় শব্দবন্ধ 'ঝড়ের আবেগ'। এই শব্দবন্ধের মধ্যে লুকিয়ে আছে ষাটের দশকের অবরুদ্ধ বাস্তবতায় কখনো গোপনে, কখনো প্রকাশ্যে ভাষা আন্দোলন কিভাবে জাতীয়তাবাদী ঝড় তুলেছিল সারা দেশময়, বাঙালির চৈতন্যে সেই সত্য। ষাটের দশকের গোড়ার দিকের 'হৃত যৌবন' পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিই জাতীয়তাবাদী চেতনাকে এবং রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত রেখেছিল। ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিই অন্ধকার দূর করার মশাল হিসেবে কাজ করেছে–

> ভাষা আছে তাই সংলাপ গেঁথে সখ্যে বাঁচি;
>
> – বাঁচি না বাঁচাই, একে অপরের আঁধার পোড়াই;
>
> প্রাণের কথার অশেষ আশার
>
> হৃত যৌবন অস্থির এই দগ্ধ দিনে
>
> উদ্গাত এই মৃত্যুকে হেনে শেষ প্রহরেও আমরা আছি। (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ২০/১)

ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি এই কবিতায় বর্তমানের 'উদ্গাত মৃত্যুকে হানার' হাতিয়ার হিসেবে কবির চৈতন্যে দেখা দিয়েছে।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ষাটের দশকের জাতীয়তাবাদী চেতনা বা প্রতিবাদী চেতনা-প্রকাশক কবিতার শোণিতে প্রবল ছাপ ফেলেছে। দেখা গিয়েছে, কবিতার মূল বিষয় ভাষা আন্দোলন নয়, কোনো

Dhaka University Institutional Repository

গণচেতনা প্রকাশ করাই কবিতায় কবির অন্বিষ্ট, এসব ক্ষেত্রেও ইশারা-ইঙ্গিতে ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি বা ইতিহাসকে কবিরা হরহামেশাই ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ দেখা যেতে পারে–

পাতাল ফুঁড়ে আসছি
কেননা শিরা কম্পনে কার
গাঢ় কণ্ঠস্বর, বলছে সে
সিদ্ধ ঋষির মন্ত্রের মতো :
সূর্য আছে
এক সূর্য
আছে আছে সে সূর্যের ইতিহাস
বলে তারা, ওরে সে প্রচুর কৃষ্ণচূড়া
কিংশুক করবী শিমুল
বহ্নি-শিখর রক্তমুকুল;
সে নাকি রে প্রেমের প্রেক্ষণ
অধর চুম্বন
রমণ-গৌরব
উৎসঝর্ণা নবীন জাতির। (আলাউদ্দিন ২০০৬ : ১২৭-১২৮/১)

ষাটের দশকের শুরু থেকে যত দিন গড়িয়েছে তত ভাষা আন্দোলনের চেতনা পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে বেশি তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ যত দিন গিয়েছে ততই ভাষা আন্দোলনের দ্রোহ আর শক্তির দিকটিই মুখ্য হয়ে উঠেছে। কবিরাও নিঃশঙ্ক হয়ে উঠেছেন ভাষা আন্দোলনের দ্রোহমূর্তির রূপাঙ্কনে। আল মাহমুদের Kv‡ji Kjm (১৩৭৩) কাব্যের 'নিদ্রিতা মায়ের নাম' কবিতায় এমনটিই লক্ষ করা যায়–

তাড়িত দুঃখের মতো চতুর্দিকে স্মৃতির মিছিল
রক্তাক্ত বন্ধুদের মুখ, উত্তেজিত হাতের টঙ্কারে
তীরের ফলার মত
নিক্ষিপ্ত ভাষার চিৎকার :
বাঙলা, বাঙলা– (আল মাহমুদ ২০০০ : ৭৯)

বাংলা ভাষা বিষয়ক কবিতা

পাকিস্তান শাসনামলে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার যে কয়টি স্তম্ভ ছিল তার একটি ভাষা আর অন্যটি সংস্কৃতি। একারণে অনেকে স্বাধীনতাপূর্ব জাতীয়তাবাদী লড়াই-সংগ্রামকে বলতে চেয়েছেন 'বিভাষী ও বিদেশি সংস্কৃতির আধিপত্যের প্রতিবাদে নিজের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম'। (হায়াৎ ২০১৫ : ১৫৭) তাই লক্ষ করা যায়, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর থেকে বাংলা ভাষা পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদী চেতনার অন্যতম অনুষঙ্গে পরিণত হয়। একুশ প্রতি বছর ফিরে ফিরে এসেছে আর বাঙালি প্রতিবছরই নতুন জাতীয়তাবাদী চেতনায় শানিত হয়েছে; রচিত হয়েছে একুশ ও ভাষা

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলন বিষয়ক অসংখ্য কবিতা। ভাষা আন্দোলন ও একুশ বিষয়ক কবিতার পাশাপাশি বাংলা ভাষার প্রতি গভীর মমত্ব প্রকাশক বেশ কিছু কবিতা রচিত হয়েছে বিশেষত ষাটের দশকে। কারণ বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের পর বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সাংবিধানিকভাবে স্বীকার করলেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী, বিশেষত আইয়ুব খানের শাসনামলে, পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদকে সমুন্নত রাখার জন্যে অভিন্ন ভাষা কাঠামো গঠনের নানা উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল রোমান হরফে বাংলা লেখা প্রচলনের উদ্যোগ। এছাড়া অখণ্ড জাতীয়তার নামে নানা সময়ে নানা উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা আইয়ুব খান প্রায়শই বলতেন।

বাংলা ভাষার ওপর এসব অব্যাহত চাপের কারণে পূর্ব বাংলার বাঙালি কবিরা বাংলা ভাষা বিষয়ে এক ধরনের তীব্র আবেগ বোধ করেছেন। এই আবেগ থেকে রচিত হয়েছে বেশ কিছু কবিতা। এসব কবিতায় কখনো ব্যক্ত হয়েছে বাংলা ভাষার প্রতি টান, আবার কখনো প্রকাশিত হয়েছে বাংলা ভাষাকে আরো কাছে পাবার তীব্র আকুলতা। যেমন, আবু হেনা মোস্তফা কামাল (১৯৩৬-১৯৮৯)-এর Avcb †hŠeb ˆeix (১৯৭৪) কাব্যগ্রন্থের 'বাংলা' শিরোনামের কবিতাটি। কবিতায় কবি বাংলা ভাষার উদ্দেশে বলেছেন–

চর্যার হরিণী তুই, বৈরী তোর আপন যৌবন, তুই
জন্মভূমি স্বদেশের বৃক্ষ তৃণ লতা মেঘ বৃষ্টি
বাতাসের ঘ্রাণ ভুলে কতোকাল পালিয়ে বেড়াবি?
কোন্ নিষাদের ভয়ে চিত্রল শরীর ম্লান, যে ছিলো একদা
নক্ষত্রের সহজ উপমা– তোকে খুঁজে আনবো বলে আমি
নৌকোয় তুলেছি পাল, মনসার আক্রোশী দু চোখে
উপেক্ষার ধুলো ছুঁড়ে সর্বস্বান্ত হয়েছি, তবুও সখি
তোর জন্যে ছেড়েছি সংসার, হাতে তুলেছি মন্দিরা, রাজ্যপাট
কিছুই রাখিনি, তুই চিরদিন আমার রাধিকা। (আবু হেনা ২০০১ : ৬/১)

কবিতায় 'চর্যার হরিণী', 'মনসা' আর 'রাধিকা'-এর উল্লেখে কবির জাতিগত যে বিশেষত্ব আর ঐতিহ্যের প্রতি যে আনুগত্য প্রকাশিত হয়েছে তার সঙ্গে সমকালীন জাতীয়তাবাদী চেতনার যোগসূত্রটি আর অপ্রকাশ্য থাকেনি। আর 'কোন্ নিষাদের ভয়ে চিত্রল শরীর ম্লান'-এর উল্লেখে সমকালীন বাংলা ভাষার প্রতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরূপ মনোভাবটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে সর্বোপরি কবিতাংশে বাংলা ভাষার প্রতি কবির যে তীব্র অনুরাগ, তাকে পাবার জন্যে কবির যে ব্যাকুলতা প্রকাশিত হয়েছে, তা ভাষাগত জাতীয়তাবাদী চেতনার দ্যোতক হয়ে উঠেছে। বাংলা ভাষার হাজার বছরের ইতিহাসের স্মরণ ষাটের কবিদের মধ্যে প্রায়শই লক্ষ করা গিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে কবিরা বোঝাতে চেয়েছেন পূর্ব বাংলার ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের শক্তিকে। কবি নিজেকে তরুণ লেখক বলে পরিচয় দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল হাজার বছরের বাংলা ভাষার প্রবাহের কথা বলতে ভুলে যান না। কবির ভাষায়, 'আমি নব্য কালের লেখক,/আমার হৃদয়ে চর্যার হরিণী নিত্য করে আসা-যাওয়া।' (শামসুর ২০১২ : ২৭১/১) নির্মলেন্দু গুণের 'অসমাপ্ত কবিতা' শিরোনামের এক কবিতায় কবি সব কিছুকেই আঘাত করতে চেয়েছেন,

Dhaka University Institutional Repository

তছনছ করতে চেয়েছেন। কিন্তু বাংলা ভাষার প্রতি কবি এমনই টান অনুভব করেন যে, বাংলা ভাষাকে কবি অক্ষত রাখতে চান পরম প্রেমে। কবি বলেছেন, “আপনারা আমার সঙ্গে নদী যেমন জলের সঙ্গে/সহযোগিতা করে, তেমনি সহযোগিতা করবেন,/অন্যথায় আমি আমার ঘিয়া পাঞ্জাবির গভীর পকেটে/আমার প্রেমিকা এবং ‘আ মরি বাঙলা ভাষা’ ছাড়া/অনায়াসে পল্টনের ভরাট ময়দান তুলে নেবো।” (নির্মলেন্দু ২০১১ : ৪১/১)

কবিতায় পাকিস্তান বিরোধিতা

ষাটের কবিতায় দুইভাবে পাকিস্তান বিরোধিতা ফুটে উঠেছে; প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে। এক সময় ব্যাপক আগ্রহ নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করলেও দ্রুত সেই মোহভঙ্গ হয়েছে। এই নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা অনেক কবিতায় কখনো ঠারেঠোরে, কখনো স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, আহসান হাবীবের mvi ‘ci কাব্যের ‘প্রাজ্ঞ বণিকের প্রার্থনা’ কবিতায় বণিকের ভাষ্যে কবি বলেছেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কথা এভাবে–

জানি শুধু
জনারণ্যে একদা নির্মল বাসনার মুক্ত সোনা
যখন ছড়ালো ভোরের প্রথম পাখি
তখন হৃদয়ে সোনার ছলনা নেই, আমি এক
কিশোর সৈনিক দেশপ্রাণ। সেই দেশ
মুক্ত আজ। (আহসান হাবীব ১৯৯৫ : ১০৪/১)

মুক্ত দেশপ্রাপ্তিকে কবি সোনাপ্রাপ্তি ভেবেছিলেন। উচ্ছ্বসিত হয়ে ‘প্রাজ্ঞ বণিক’-রূপী কবি লক্ষ করেছেন ‘দেখি এ হৃদয় কবে একখণ্ড বিশুদ্ধ সোনায় পরিণত।’ কিন্তু কিছুকাল যেতে না যেতেই কবি বলে উঠেছেন–

সোনার কুৎসিত কর্কশ কাঠিন্যে প্রাণ ওষ্ঠাগত–
আকণ্ঠ পিপাসা আজ এক বিন্দু নির্মল জলের
সে-নদী যে-নদীর অশান্ত কল্লোল
অতিক্রম করে গেছে দীর্ঘ বহু বৎসরের পথ,
আমার এ কারাকক্ষ দূরে রেখে দিনে দিনে সমুদ্র উধাও। (আহসান হাবীব ১৯৯৫ : ১০৫/১)

এভাবে ষাটের দশকের কবিতায় পাকিস্তান বিরোধিতা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যেই। এই ধরনের পাকিস্তান রাষ্ট্র বিরোধী কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, এগুলো সাধারণত পরোক্ষভাবে রচিত। তবে ষাটের দশকের শেষের দিকে গিয়ে পাকিস্তান বিরোধিতা বেশ স্পষ্টতা লাভ করেছে। এই বিরোধিতার স্বরূপ স্পষ্ট হয়েছে এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের বিভিন্ন উপশিরোনামের আলোচনায়।

কবিতায় স্বদেশপ্রেম

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব বাংলার খুব কম কবিকে পাওয়া যাবে যারা ষাটের দশকে এসে স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতা রচনা করেননি। আসলে পূর্ব বাংলার ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রের নির্যাতন বৈষম্য অবহেলা যত বেড়েছে পূর্ব বাংলার কবিকুল তত জাতীয়তাবাদী চেতনায় সিক্ত হয়েছেন। আর কবিচৈতন্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ মানেই স্বদেশানুরাগের কবিতা। এই ধরনের কবিতা লেখার প্রবণতা পুরো ষাটের দশক জুড়েই দেখা যায়। অর্থাৎ ষাটের উভয় পর্বেই লক্ষ করা যায়। যেমন ষাটের প্রথমার্ধে কবি লিখেছেন–

আজন্ম পিপাসার প্রতীক তুমি
তুমি অবিনশ্বর–
আমার তৃষ্ণা পুড়েছে
বিভ্রান্ত দিনের পথে পথে–
তুমি আমার সঙ্গী হয়ে
আমার আত্মাকে করেছো অমর,
আমাকে স্নিগ্ধ করেছো, করেছো গৌরবান্বিত। (আহসান হাবীব ১৯৯৫ : ১৩০/১)

আহসান হাবীবের অন্য কবিতায়ও লক্ষ করা যায় তীব্র স্বদেশপ্রেম। বলা বাহুল্য যে, কবি এই স্বদেশ বলতে পূর্ব বাংলাকেই বুঝেছেন এবং বুঝিয়েছেন। যেমন–

মায়ের বুকের মত বুক পেতে রাখা এই
দেশকে আমি ভালোবাসি সে কথা সে সোনার দেশের
আকাশে অরণ্যে আর সমুদ্রের ঢেউয়ে লেখা আছে। (আহসান হাবীব ১৯৯৫ : ৫৭/১)

অরণ্য আর সমুদ্রের এই উল্লেখ কবিতাংশকে পূর্ব বাংলার সঙ্গে এমনভাবে সেঁটে দিয়েছে যে, এই কবিতার স্বদেশকে অন্য কোনো ভূখণ্ড দিয়ে চিন্তা করা অত্যন্ত কঠিন। আর এই কবিতা যখন ষাটের দশকে পূর্ব বাংলার কোনো কবির লেখা হয় তখন তো আর কোনো কথাই থাকে না। ষাটের দশকের প্রথমার্ধে কোনো কোনো কবির স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতায় ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন, সিকান্দার আবু জাফরের K¡eZ¡ 1372 (১৯৬৮) কাব্যের 'যে কোনো মূল্যে' কবিতায় কবি প্রয়োজনে আত্মাহুতির মাধ্যমে দেশমাতার আঁচলকে অক্ষুণ্ণ রাখার কথা বলেছেন। দেশপ্রেমের মাত্রা কবির মধ্যে এত গভীর যে, তিনি দেশের মানুষের জন্যে পেতে রাখা দেশমাতার আঁচলকে সৌরবৃত্তের মতোই অসীম মনে করেছেন। কবির দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যাক–

পৃথিবী অনেক বড়
সৌরবৃত্ত তারও চেয়ে দুর্নিরীক্ষ্য-সীমা
তবু তার সীমার বাঁধন।
হৃদয়ের অভিসার অন্তহীন লোক-লোকান্তরে,
সে-হৃদয় একান্ত আশ্রিত
জননীর যে-অঞ্চলে, তারও নেই কোনো
সীমারেখা;

Dhaka University Institutional Repository

তাই সে-অঞ্চল
বহুমূল্য পৃথিবীর সাম্রাজ্যের চেয়ে,
তাই তার ছায়াতলে প্রাণ দিয়ে বাঁচাবার
এত প্রয়োজন।
আমরা জেনেছি
মূল্য যদি দিতে হয় অসহ্য ঘৃণার,
আগুন জ্বালতে হয় আরণ্য-হিংসার
বজ্রদীপ্ত ঘূর্ণিঝড়ে সর্বগ্রাসী বন্যার তাণ্ডবে
প্রাণ যদি দিতে হয়
তুচ্ছ তৃণ পালকের মত
তবু তার বিনিময়ে বারম্বার পেতে হবে
তৃপ্ত জননীর
মুক্ত শুদ্ধ অঞ্চলের প্রশান্ত বাতাস। (সিকান্‌দার ২০১৭ : ১৭১-১৭২)

ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম তুঙ্গে তখন কবিরা স্বদেশকে আবিষ্কার করেছেন ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে এক সার্বিক সত্তায়। যদিও স্বদেশকে অনুভবের মধ্যে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণির বিষয়টি সর্বদাই লুপ্ত থাকে, তবু ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে কবিরা জাতীয়তাবাদী চেতনার ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণির নির্বিশেষ রূপের মধ্য দিয়েই স্বদেশকে উপলব্ধি করেছেন। স্বদেশকে নিঃশর্ত ভালোবাসায় আবিষ্কার করেছেন। একারণে ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে হুমায়ুন আজাদ তাঁর A‡jŠwKK w÷gvi (১৯৭৩) কাব্যের ‘শ্রেণিসংগ্রাম’ কবিতায় স্বদেশকে অনুভব করেছেন একমাত্র শ্রেণিহীন দোসর হিসেবে—

থরোথরো পদ্য লিখে লাল নীল মেয়েদের
এই বুকে কতো যে ডেকেছি
আমার সোনালি বউ হয়ে
তারা সব ধনীদের উপপত্নী হয়েছে

বালটিতে জল টেনে কতো দিন
গোলাপের শেকড়ে ঢেলেছি
আমার উঠোনে না ফুটে
উল্লাসভরে তারা ধনীদের ফুলদানিতে ফুটেছে

হে পথ হে দেশ একবার ডাকতেই
বুকের ভেতর এমন নিবিড় ক’রে টেনে নিলে। (হুমায়ুন ২০০৮ : ৪২-৪৩)

Dhaka University Institutional Repository

এই ষাটের দশকের শেষ দিকেই কবির পক্ষে একথা বলা সম্ভব এবং অনিবার্য ছিল যে, 'জন্মভূমির ছায়া সবুজ কাকের মতো/জীবনের রক্তে বসে আছে।' (নির্মলেন্দু ২০১১ : ২৯/১) অর্থাৎ কবির স্বদেশপ্রেমমূলক চিন্তার মধ্যে 'রক্ত' ঢুকে পড়েছে। অথবা বলা যায় স্বদেশপ্রেমের বিষয়টি কবির রক্তে ঢুকে পড়েছে। অর্থাৎ ষাটের শেষের দিকে স্বদেশপ্রেমের জন্যে আত্মাহুতির বিষয়টি অনিবার্যভাবে চলে এসেছে। ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে কবির স্বদেশ প্রেমের অভিজ্ঞতা রক্তরঞ্জিত। তাই ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে আর নিরীহ স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতা নেই বললেই চলে। এই পর্বে আন্দোলন-সংগ্রাম, প্রতিরোধ-প্রতিবাদের কবিতাই স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতার নামান্তর হয়ে উঠেছে।

কবিতায় গ্রাম-বাংলার জীবন ও চিত্র

পূর্ব বাংলা চল্লিশের দশকে ছিল এক অবিকশিত ভূখণ্ডের নাম। এই অবিকশিত রূপ প্রকটিত ছিল এই অঞ্চলের জীবন-যাত্রায়, নগরায়ণে, চিন্তায় আর সংগত কারণেই শিল্পসাহিত্যেও। একারণে লক্ষ করা যায়, বাংলাদেশের সাহিত্যের শুরুটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিল গ্রামীণ জীবন নির্ভর। উপন্যাসের দিকে তাকালে বিষয়টি বেশি স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। কিন্তু পঞ্চাশের দশকে এসে পূর্ব বাংলায় দেখা দেয় আধুনিক বুর্জোয়া চেতনা ঋদ্ধ এক প্রজন্ম। এই সময় নতুন রাজধানী ঢাকায় নানা নাগরিক সুযোগ-সুবিধা দেখা দিতে থাকে। গড়ে ওঠে নতুন আমলাতন্ত্র। শুধু তাই নয় ঢাকায় গড়ে উঠতে থাকে নতুন নতুন বিপণিবিতান, দালানকোঠা, আবাসন ব্যবস্থা। মোটকথা ঢাকা ক্রমে ঢুকতে থাকে নগরজীবনের বাস্তবতার মধ্যে। একারণে পঞ্চাশের দশকের প্রজন্মের শিল্পসাহিত্য সহজেই অঙ্গীকৃত করে নিয়েছে আধুনিক জীবনচেতনা। এর ফলে এসময় থেকে সাহিত্যে গ্রামীণ জীবন ও এর রূপায়ণ কিছুটা কমতে থাকে। কিন্তু পঞ্চাশের দশকের পরে জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক কবিতায় জাতীয়তাবাদী চেতনার স্বভাব মোতাবেক ফিরতে শুরু করে গ্রাম-বাংলা ও এর জীবনচিত্র। কারণ জাতীয়তাবাদী যেকোনো প্রয়াস সাথে রাখতে চায় একটি জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষকে। ব্যাপক মানুষের একত্রকরণ ছাড়া জাতীয়তাবাদী চেতনা সফলভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। পূর্ব বাংলা যেহেতু গ্রামপ্রধান ভূখণ্ড, সেহেতু এর জাতীয়তাবাদী জাগরণের সঙ্গে গ্রামকে সম্পৃক্ত করতে না পারলে এই জাগরণ ব্যর্থ হতে বাধ্য। একারণে আমরা লক্ষ করি, ষাটের দশকের পুরোটায় এমনকি পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকেই যেন পরিকল্পিতভাবেই কবিতায় গ্রামীণ জীবন রূপায়িত হওয়া শুরু করেছে। গ্রাম বাংলার খেটে খাওয়া মানুষকে কোনো কোনো কবি তাঁদের চিন্তার কেন্দ্রে স্থাপন করতে চেয়েছেন। দাবি করেছেন তাঁর কাব্য-কবিতা-চিন্তার কেন্দ্রে আছে সাধারণ খেটে খাওয়া গ্রামের মানুষ–

> কাঁটাঝোপ ঘাস আগাছার বন
>
> চষামাঠ পথ ধুলো ধোঁয়া ব্যাধি
>
> নিঃশ্বাসে ভ'রে আমি আছি তবু
>
> অতি সাধারণ পরিচিত প্রত্যহ।
>
> ঝলসানো রোদে
>
> হাল কাঁধে জোড়া বলদের পায়ে পায়ে

Dhaka University Institutional Repository

ঘামস্যাঁৎসেতে কৃষকের রোমে রোমে

আমি আছি,

হাতে-হুঁকো পায়ে-দাঁড়া টানা জেলে

শীত কুয়াশায় থুথুতে কাশিতে

মাছে জালে একাকার :

সে তো আমার পৃথিবী।...

কঠিন মাটির পথ ভেঙে ভেঙে

দৈনন্দিন জীবনের অন্বেষা,

তবু আছে স্বাদ–

জীবনকে যেন দশটি আঙুলে

জড়িয়ে ধরার তৃপ্তি। (সিকান্দার ২০১৭ : ১২৬)

'দশ আঙুলে জীবনকে জড়িয়ে ধরার তৃপ্তি' ষাটের কবিতায় গ্রামকে এক গভীর রাজনৈতিকতায় নিয়ে এসেছে। এটি কৃষকজীবনের সঙ্গে কবির রোমান্টিক আবেগে যুক্ত হওয়ার বিষয় নয়। কোনো কোনো কবির কবিতায় কখনো গ্রামে ফিরে যাবার ব্যাকুলতা, কখনো গ্রামীণ জীবনের স্মৃতিকাতরতা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। সমালোচকের ভাষায়, 'স্বদেশের মাটি মানুষের উপলব্ধি ষাটের দশকের কবিতার অপর একটি প্রধান সুর।' (মোহাম্মদ হারুন ১৯৮৯ : ৩১) সমালোচকের এই উক্তি ষাটের দশকের কবিকুল নিয়ে হলেও প্রকৃতপক্ষে ষাটের দশকে এসে ক্রিয়াশীল চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের কবিদের মধ্যেও এই একই চেতনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। কারণ ষাটের দশকের জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশধারায় সব কবি-সাহিত্যিকই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাই লক্ষ করি ষাটের দশকে রচিত একটা বড় অংশ কবিতা জাতীয়তাবাদী জাগরণের ধাক্কায় গ্রামীণ জীবন আর গ্রামীণ প্রকৃতিকে আত্মস্থ করেছে। যেমন–

সোনামুখী নারকেলের শাখায়

আর দুধ-সুপুরির বনে

এখনো কি হাওয়া বয় বঙ্গোপসাগর থেকে

বিকেলে? সোনালি রোদ

এখনো কি মুখ দেখে জোয়ারের জলে?

ডবকেলে ঢেঁকির পাড়ে ক্লান্তি এলে

ঘুম পেলে

পা নামিয়ে–

হেলির পাতায় বোনা নরম পাখায়

কিছু হাওয়া খেয়ে,

তার পরে,

পুকুরে ঘাটের শেষে

Dhaka University Institutional Repository

গলাজলে বুক রেখে
এখনো কি দুই চোখ ছলছল করে
আর জল ঝরে? (আহসান হাবীব ১৯৯৫ : ৫৮-৫৯/১)

একই ধরনের অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায় হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায়–

কতদিন হাঁটি নাতো আমি ধু ধু করা মাঠে
শুনি না নৌকার মাঝি ডাকে দূর থেকে তরল আঁধারে
হাট শেষে সঙ্গী সাথীদের সাথে বাড়ি ফেরবার তাড়া
জাগে না চলায় কতদিন
কতদিন মাঠে একা একা জলে ভুলে
অজানায় কেঁপে কেঁপে হারাই না সন্ধ্যার শ্যামলে
দেখি না দুচোখ ভরে শেফালির বকুলের
ঝরে পড়া আর ভেজা শিশিরের পরে
শীতের সকালে (হাসান ১৯৯৪ : ১০)

গ্রাম ও এর প্রকৃতির সঙ্গে লীন হবার কবির এই বাসনা কেবল শহর থেকে মুক্ত হয়ে গ্রামে সাময়িক স্বস্তি খোঁজার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শহর-সত্তার সঙ্গে গ্রামীণ সত্তার একীকরণের বাসনাই এখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে। আর ষাটের দশকে বসে বা ষাটের উপকণ্ঠে বসে একজন আধুনিক কবির এই বাসনা কিছুতেই নিরীহ কোনো বিষয় নয়। স্বৈর অবরুদ্ধতাই কবিকে গ্রামের সঙ্গে চেতনাগতভাবে গেঁথে দিয়েছে। লক্ষণীয় যে, কবিতাগুলোর প্রকাশ আধুনিক কিন্তু এর ভেতরের ব্যাকুলতা বহুর আবেগের সঙ্গে লীন হওয়ার বাসনায় কাতর।

এই গ্রামের রূপচিত্র অংকন আর গ্রামে ফিরে যাওয়ার বাসনা শুধু বহুর সঙ্গে মিলনের রাজনৈতিক বাসনাই নয়, এর মধ্যে সংস্কৃতির লড়াইটাও যুক্ত রয়েছে। পূর্ব বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির বিপরীতে ষাটের দশকে যে পাকিস্তানি সংস্কৃতির তোড়জোড় লক্ষ করা গিয়েছিল তার বিপরীতে কবিরা গ্রামপ্রধান পূর্ব বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির রূপায়ণে মনোযোগী হয়েছিলেন। নিচের কবিতাংশে আমরা লক্ষ করব স্বৈর অবরুদ্ধতা, পাকিস্তানি আরোপিত কৃত্রিম সংস্কৃতির বিপরীতে খাঁটি বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি ব্যাকুলতা–

ফিরে যেতে সাধ জাগে, যেন ফিরে যাওয়ার পিপাসা
জাগায় সুদূর স্মৃতি : মায়ের আঁচল ধরে টেনে
দেখায় দূরের নদী, ওইতো নাও মাগো
দখিনা বাতাসে দ্যাখ ভেসে গেলো সমস্ত সোয়ারি;
হরিণবেড়ের মাঠে পৌঁছে যাব সন্ধ্যার আগেই
এ বেলা ভাসালে নাও রাত অত আঁধার হবে না
আকাশের দিকে দ্যাখ্, কোথায় ঝড়ের দাগ বল?

Dhaka University Institutional Repository

মিছেমিছি ভয় পাস অনর্থক অশুভ ভাবিস। (আল মাহমুদ ২০০০ : ৫৭)

কবিতায় পূর্ব বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির যে আকাঁড়া রূপ ফুটে উঠেছে, তার তাৎপর্য ষাটের রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে সহজেই আবিষ্কার করা যায়।

এভাবে ষাটের দশকে আধুনিকতার প্রবল প্রতাপের মধ্যে গ্রাম ঢুকে পড়েছে তার সংস্কৃতিসহ। ষাটের কবিতার গ্রামে নোঙর করার ব্যাখ্যা জাতীয়তাবাদী চেতনা ছাড়া আর কী দিয়ে সম্ভব! ষাটের দশকের কবিতায় একদিকে আধুনিক কাব্যরুচি, প্রকরণ-প্রকৌশল এবং অন্যদিকে গ্রামীণ অনুষঙ্গের প্রবেশ দেখে বলা যায়, ষাটের কবিতা বর্মে আধুনিক-নাগরিক-স্মার্ট কিন্তু মর্মে তার গ্রামীণ জীবন-পিপাসা। কেন এমন? এই প্রশ্নের উত্তর ষাটের দশকের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ইতিহাসের মধ্যেই অনুসন্ধেয়।

কবির চেতনায় ইতিহাস-ঐতিহ্য

কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে যখন জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে তখন ওই জাতি তার নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য স্মরণে এবং পুনর্গঠনে মনোযোগী হয়। এই কাজটি সংগঠিত হয় মূলত সংস্কৃতি চর্চার ধারার মধ্যে। আর এর বিশেষ প্রকাশ ঘটে ওই জনগোষ্ঠীর কবি-সাহিত্যিকদের কাব্য-কবিতা এবং অপরাপর সাহিত্য ও শিল্পকর্মে। বাংলা সাহিত্যে এই প্রবণতাটি বরাবরই ক্রিয়াশীল থাকলেও ষাটের দশকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামের সময় এটি এক সচেতন রাজনৈতিকতার রঙে রঙিন হয়ে ওঠে। অর্থাৎ কবি-সাহিত্যিকগণ পাকিস্তানি রাজনৈতিক আর সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মধ্যে নিজেকে জাহির করার অংশ হিসেবে কবিতায় নিজেদের অর্থাৎ পূর্ব বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্যের পৌনঃপুনিক ব্যবহার করেছেন। ষাটের দশকের প্রথমার্ধের কবিতার ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে চোখে পড়ে। কারণ ষাটের দশকের প্রাথমার্ধে রাজনৈতিক অবরুদ্ধতা এত তীব্র ছিল যে, এসময় রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার মূল ধারার রাজনীতি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ তেমন ঘটাতে পারেনি। কিন্তু এসময়ের কাব্য-কবিতার মধ্যে কবিরা ইতিহাস-ঐতিহ্যের ব্যবহার করে ওই প্রায় অনুপস্থিত জাতীয়তাবাদী চেতনাকে জারি রেখেছেন। সানাউল হকের ☐ePY A☐k‡Z (১৯৬৮) কাব্যের 'পূর্ব বাংলা– দুই' কবিতায় পূর্ব বাংলার বিশেষত্ব বলতে গিয়ে এর কিছু লক্ষণ আবিষ্কার করে কবি বলেছেন–

কথার আগেই চোখে পানি

ছোবলে বেহুলা,

ভেলায় ভাসিয়ে দিয়ে আশা

তরঙ্গ মৃদুলা। (সানাউল হক ১৯৯৮ : ১৪৫/১)

কবিতায় 'বেহুলা'-র প্রসঙ্গের উল্লেখ ষাটের প্রথমার্ধে কবিতাটিকে আর নিরীহ রাখেনি; কবিতাটি কবির বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার দ্যুতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। একই ধরনের ঐতিহ্যগত স্মরণ লক্ষ করা যায়, আবু হেনা মোস্তফা কামালের কবিতায়। কবি বাংলা ভাষার উদ্দেশে বলেছেন, 'মনসার আক্রোশী দু চোখে উপেক্ষার ধুলো ছুঁড়ে হয়েছি সর্বস্বান্ত' অথবা 'তুই চিরদিন আমার রাধিকা',। (আবু হেনা ২০০১ :

Dhaka University Institutional Repository

৬/১) আসাদ চৌধুরী (জ. ১৯৪৩) তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ZeK †' Iqv cvb (১৯৭৫)-এ কবিতার ঐতিহ্যের প্রয়োজনে মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীতেও ডুব দিয়েছেন। তাঁর 'আয়না' কবিতায় তিনি আধুনিক নারীর মনোবাঞ্ছাকে রাধার সমান্তরালে চারিয়ে দিয়ে নিজেকে সচেতনভাবে ঐতিহ্যে সমপণ করেছেন। ঐতিহ্যের এই শরণ ষাটের দশকে মাঠের রাজনীতির সমান্তরালে চলমান কাব্যের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিই বটে।

নিজস্ব গৌরবময় ইতিহাসের স্মরণের মধ্য দিয়ে বর্তমানে জেগে ওঠার বাসনা-খচিত কবিতা ষাটের দশকে বেশ রচিত হয়েছে। ষাটের প্রথমার্ধে জাতির সুপ্ত চেতনাকে আঘাত করার জন্য কবিরা কখনো কখনো অভিমানী উচ্চারণের মাধ্যমে অতীত ইতিহাসকে স্মরণ করেছেন–

আমাকে শান্তির কথা বোলোনা তোমরা আর
শবের শান্তির ছায়া
মজ্জায় গ্রথিত হয়ে ঢেকেছে আমার কায়া।
আর কোনো শান্তি আছে এরো চেয়ে আনন্দে অপার?
অহেতুক সোরগোল তুলেছিল যারা তারা মরে গেছে।
সাজানো বাগানে এসে অজানা মেষের দল গেছে নেচে
মুহূর্তের ভুলে। ভাঙা ডাল তুলে ফেলে দাও, বলে দাও
আপদ গিয়েছে কেটে, তার পাপচিহ্নও উধাও।
কেনো ওই অকস্মাৎ ঘটনার রেশ আনো টেনে
শুধু ঘৃতাহুতি দিতে অনাত্মীয় স্মৃতির আগুনে।
তার চেয়ে সাজানো বাগানে ফুল তোলো গান গাও
রক্তে লীন পূর্বপুরুষের নাম গান করো
স্বাভাবিক ভাবাবেগে বসে আনমনা।

তাদের প্রশান্ত রক্তে যন্ত্রণার বিন্দু এক কণা
সুনিশ্চিত ভুলেও কখনো ছিল না ছিল না। (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ৬২/১)

১৯৫৪-এর জাগরণের পর ১৯৫৮-এর অবরুদ্ধতা বাঙালি কবির চৈতন্যে তৈরি করেছিল এক কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা। তাকে মেনে নিতে হয়েছে পরাজয়, আবার জাগরণের স্মৃতি তাকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। এই বাস্তবতায় অনেক কবি বাঙালির স্বাতন্ত্র্যের ইতিহাস আর ঐতিহ্যকে স্মরণ করেছেন ষাটের দশকে এসে। অনেক ক্ষেত্রে সেখানে জাগরণ নেই বটে, কিন্তু স্মরণ আছে। কোথাও কোথাও কবি অতীতের গৌরবময় ইতিহাস স্মরণ করে তার ধারাবাহিকতা না থাকার জন্যে, বর্তমানের ব্যর্থতার জন্যে আফসোস করেছেন। অর্থাৎ অতীতের গৌরবময় ইতিহাসের স্মরণের মধ্য দিয়ে বর্তমানের নির্বীর্যতাকে খোঁচাতে চেয়েছেন। কোথাও কোথাও অতীতের ইতিহাসের ঘটনার মধ্যে কবি খুঁজে পেয়েছেন ক্রটি। KveZv 1372 (১৯৬৮) কাব্যের 'একটি বিধ্বস্ত প্রতিজ্ঞা' কবিতায় সিকান্দার আবু জাফর বাঙালি জীবনের অতীতের সফল কিন্তু বর্তমানে অনুপস্থিত সাহসিকতার সামলোচনা করেছেন এভাবে–

Dhaka University Institutional Repository

স্পর্ধা যেখানে সাহসের নামান্তর
চেতনা যেখানে উদ্দেশ্যের মুখোশ
আত্মতুষ্টির অবিরাম রথে
নির্লজ্জতা যেখানে প্রবল সারথি
তেমন পলিমাটিতে বুঝি
প্রতিজ্ঞার বীজ থেকে
মহীরুহ জন্মে না। (সিকান্‌দার ২০১৭ : ১৭৮)

কবির এই সমালোচনার মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ খোঁচা সহজেই চোখে পড়ে। বর্তমানের বন্ধ্যাত্ব কবিকে ব্যথিত করেছে। একারণে এই খোঁচা। কারণ একটা সময় তো ছিল যখন–

অতল সমুদ্রের গম্ভীর কণ্ঠ
নিজের কণ্ঠে তুলে নিয়ে
ঝড়ের হাফর থেকে কেড়ে-নেওয়া
এক বুক বাতাসের ভরে ওরা চেঁচিয়ে উঠেছিল;
সূর্যের সমস্ত জানালা খুলে
ছুঁড়ে দিয়েছিল
সেই আশ্চর্য সংকেত।

নিস্তব্ধ কবরে পুরোনো বিশীর্ণ লাশ
এই আমি
যেন মন্ত্রমুগ্ধ
সহসা দু'চোখ মেলেছিলাম।
সামনে দিয়ে পলায়নরত
বিবর্ণ ভীত অন্ধকারকে
জাপটে ধরেছিলাম,
তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেঙে
গুঁড়ো করে দিয়েছিলাম।

সে যেন দু'চোখের দীপ্তিতে
এই মুহূর্তের চলমান চিত্রাভাস
যেন নয় অস্পষ্ট স্মৃতি-অবগাহন। (সিকান্‌দার ২০১৭ : ১৭৮)

অতীতের স্মরণের মধ্য দিয়ে বাঙালিকে কবিরা আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছেন। আলাদা করার বিষয়টি স্পষ্ট না হলেও যূথবদ্ধ ইতিহাসের স্মরণের অন্তরালে কবির জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রবহমানতার বিষয়টি অলক্ষিত থাকেনি–

পাথর পাহাড় খুঁড়ে মিলেছে যে করোটি ও হাড়
বিস্ফারিত চোখে দেখি আত্মীয়ের জংধরা খুলি,
কেমন মমতা বাড়ে, হাতে নিই ঝেড়ে মুছে ধূলি,
কালোত্তীর্ণ রক্ত যেন কেঁপে ওঠে তোমার আমার।
কখনো বর্শার ফলা কখনোবা পাথরের তীর,

Dhaka University Institutional Repository

যূথবদ্ধ জীবনের নারীদের অলঙ্কার, আরো–

এখানে দাঁড়িয়ে তুমি যত খুশি ভেবে নিতে পারো

তোমার রক্তের পিছে ইতিহাস কতটা নিবিড়। (আল মাহমুদ ২০০০ : ১৯)

কবিতায় ইতিহাসের এই স্মরণ, যূথবদ্ধ জীবনের এই স্মরণ নিঃসন্দেহে দেশ-কালের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বাস্তবতার মধ্যেই সম্ভব হয়ে উঠেছে। একারণেই আল মাহমুদ সম্পর্কে বলা হয় তাঁর কবিতায় বারবার 'ফিরে আসে শৌর্য-বীর্যগাথা, পুরোনো ইতিহাস, আবহমান আবেগসংখ্যার হিসেব।' (শহীদ ২০১৩ : ১৬১) ষাটের প্রথমার্ধের কোনো কোনো কবিতায় কবিরা বাঙালির প্রতিবাদী-আত্মপ্রতিষ্ঠ ইতিহাসের স্মরণের মধ্য দিয়ে বর্তমানকে জাগাতে চেয়েছেন, উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন। উদাহরণ দেখা যেতে পারে–

আমার জননী জন্মভূমি

যে-উদার স্নেহাঞ্চল মেলে

আমার প্রাণের ভাগী ভাই-বোনদের

দিয়েছেন প্রত্যহের নিশ্চিন্ত আশ্রয়

সেই স্নেহাঞ্চল

শক্তির লোলুপ দম্ভে ছিন্ন করে দিতে

অতর্কিতে যারা এসেছিল

তাদের অনেকে

বিস্তীর্ণ ইক্ষুর ক্ষেত্রে গোধূমের ক্ষেতে

এখন সারের কীট জন্ম-জন্মান্তের। (সিকান্‌দার ২০১৭ : ১৭১)

বাঙালির যা কিছু বিশেষ, তা আরো বিশেষ হয়ে দেখা দিয়েছে জাতীয়তাবাদী চেতনার স্পর্শে। বাঙালির চিন্তা আর সংস্কৃতির মূল প্রবণতার অন্যতম স্মারক হচ্ছে লালন শাহ। বাউল দর্শন আর বাউল গানের সংস্কৃতি বাঙালির মর্মের বিষয়। বাঙালির ভাবসম্পদের একটি বড় আকর যেমন রবীন্দ্রনাথ তেমনি আরেকটি আকর লালন শাহ। একারণে দেখি ষাটের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যেমন অবলম্বন হয়ে উঠেছেন তেমনি লালনও স্মরিত হয়েছেন কবিদের কবিতায়। পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকের আধুনিক চেতনার সঙ্গে লালন ঠিক খাপ খায় না। কিন্তু জাতীয়তাবাদী চেতনার চাপ শামসুর রাহমানের মতো আধুনিক কবিকেও লালনের কাছে প্রত্যাবর্তন করিয়েছে। কারণ লালনে প্রত্যাবর্তন বা লালনের স্মরণ মানে বাংলার ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তন ও ঐতিহ্যের স্মরণ। উদাহরণ দেখা যেতে পারে–

কাল মন্থনে চেতনায় জাগে

অতীতের দ্বীপ, স্মৃতির প্রবালে লাল।

বর্তমানের মুক্ত আঁধারে

ভবিষ্যতের দীপাবলি ওঠে ভেসে।

Dhaka University Institutional Repository

সে-গানের ধ্বনি ফিরে ফিরে আসে
মর্ত্যজীবীর রঙিন ধুলোর পথে–
তারই মাধুর্যে ঋতুতে ঋতুতে
রৌদ্রছায়ায় শান্ত বাগানে বাঁচি।

সে-গান আমার বৈশাখী দিনে
যাত্রী-প্রাণের তৃষ্ণার সরোবর।
তারই টানে চলি বাকাচোরা পথে–
লালনের গান স্মৃতির দোসর সে-যে। (শামসুর ২০১২ : ২৪৩/১)

কবিতায় অবরুদ্ধতার বোধ এবং মুক্তির বাসনা

কবির মনোভূমির শেকড় প্রোথিত থাকে দেশকালের মর্মমূলে। তাঁর প্রেম-অপ্রেমের বোধও এক অর্থে দেশকালের বাস্তবতার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থাকে। দেশকালের মধ্যে কবি যখন বিপন্ন বোধ করেন তখন তাঁর কবিতার ইমেজে, শব্দের গাঁথুনিতে, অনুষঙ্গের নির্বাচনে, রঙের ব্যবহারে, চিত্রকল্পের চৌহদ্দিতে এর প্রভাব পড়তে বাধ্য। ষাটের অবরুদ্ধতা কবিদের চেতনায় দুইভাবে ধরা দিয়েছে; নিজেকে ও সমষ্টিকে বিপন্ন ভাবার মধ্য দিয়ে এবং সেই বিপন্নতা থেকে বেরিয়ে আসবার তাগিদের মধ্য দিয়ে। একারণে বিপন্নতা আর উচ্চকণ্ঠ দ্রোহ বা বেরিয়ে যাবার প্রত্যয় ষাটের কবিতাকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। ষাটের দশকে যিনিই কবিতা লিখেছেন তাঁর কবিতাতেই এই বৈশিষ্ট্য কমবেশি দেখা দিয়েছে। তবে এই প্রবণতাটি বেশি স্পষ্ট হয়েছে আবদুল গণি হাজারী (১৯২১-১৯৭৬) হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯), দিলওয়ার (১৯৩৭-২০১৩), সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫) প্রমুখের মধ্যে। উচ্চকণ্ঠ-দ্রোহের প্রকাশের দরুন এঁদের অনেককেই মার্কসবাদী কবি হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এঁরা আদৌ মার্কসবাদী কবি কি না সে বিষয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। কিন্তু দেশকালের দীর্ঘ অবরুদ্ধতা এঁদের কবিতাকে যে উচ্চকণ্ঠ এবং কখনো কখনো রাজনৈতিক করে তুলেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। সিকান্দার আবু জাফরের ষাটের প্রথমার্ধে রচিত কবিতায় অবরুদ্ধতার বোধ এবং তা থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা শিল্পিত হয়েছে। ˆeix ewó‡Z (১৯৬৫) কাব্যের ‘বীজ-বোনার কান্না’ কবিতায় কবির অবরুদ্ধতার বোধ এবং তা থেকে বের হয়ে আসার ব্যাকুলতা ধরা পড়েছে–

তীক্ষ্ণ সূচের মত অসহ যে বেদনা
এই বুক বিক্ষত করছে
প্রাণপণ সহ্যের আবরণ ছিঁড়ে ছিঁড়ে
তবু তো চোখের জল ঝরছে;
এই যে স্বপ্নে-গড়া বিশ্ব
নিয়ত নরক হয়ে জ্বলছে

আহা যদি বলতেও পারতাম।
অনেক বাঁচার চির-চৈত্রে
নিবিড় গভীর হবে চিত্ত;
অনেক রাত্রি দিল মৃত্যু
হয়ত চলেই যাব রিক্ত
দীর্ঘনিশ্বাসগুলো তবু যদি অন্তত
কোনোখানে রেখে যেতে পারতাম
তবু যদি বলতেও পারতাম। (সিকান্‌দার ২০১৭ : ১১৫)

কবিতাটি হয়ত কাঙ্ক্ষিত কবিতাসৃষ্টির ব্যাকুলতায় বিশিষ্ট। কিন্তু ষাটের অবরুদ্ধতার মধ্যে বলতে না পারার, লিখতে না পারার অক্ষমতায় কবিতাটি বিমর্ষ। এই বিমর্ষতা, হতাশা সিকান্‌দার আবু জাফরের ষাটের প্রথমার্ধের কবিতাকে দারুণভাবে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে রেখেছে। তবে এই বিমর্ষতা ও হতাশা ব্যক্তিগত নয়। 'সিকান্‌দার আবু জাফরের কবিতা প্রধানত দেশ-ও-সমাজ-পটভূমিকা থেকে জাগ্রত...।' (আবদুল মান্নান ১৯৯৪ : ২৬৬) দেশ ও সমাজের সাম্প্রতিকতায় উচ্চকিত সিকান্‌দারের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি হতাশা ও বিমর্ষতা থেকে উত্তরণের ব্যাপারে ছিলেন খুবই আশাবাদী, অকুতভয় ও উচ্চকিত। নিরাশার মধ্যে আশাবাদের পতাকা তুলে ধরার চেতনা তাঁর ষাটের প্রথমার্ধের কবিতাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। উদাহরণ দেখা যেতে পারে–

আয়ুর ফাল্গুন অনেক হয়েছে রিক্ত
ত্রুটিমুক্তির কাল তাই সংকীর্ণ
চলে যেতে হবে এখন যে-কোনো লগ্নে–
সারা জীবনের অর্জিত যত শূন্য
নিতে হবে বয়ে ঘৃণা অপবাদ তিক্ত,
মৃত্যুর আগে লাঞ্ছিত-ফণা সর্পের
টানতেই হয় নিষ্ফল দেহ-দৈর্ঘ।
হঠাৎ জেনেছি আর এক পরম সত্য;
নিত্য কালের উর্বরা এই পৃথ্বী,
সোনা-স্বপ্নের কোনো বীজকণা ঝরলে
এখানে মরে না, এখানে হয় না মিথ্যে।

আমি তো' বুনেছি দিনরাত্রির পঙ্কে
হাজার হাজার স্বপ্ন...
সব মানুষকে প্রাণ-বিত্তের অংশ
ভাগ করে দিয়ে বাঁচার মধুর স্বপ্ন। (সিকান্‌দার ২০১৭ : ১১৭)

Dhaka University Institutional Repository

হাসান হাফিজুর রহমানের অধিকাংশ কাব্যই অবরুদ্ধতা আর তা থেকে উত্তরণের ব্যাকুলতায় কম্পিত। `egL cÖvšÍi কাব্যের নামকরণেই দেশকালের বাস্তবতা সহজেই অনুমেয়। অনেকে `egL cÖvšÍi-এর মধ্যে টি.এস. এলিয়টের ওয়েস্ট ল্যান্ডের ছায়াপাত লক্ষ করেছেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার হাসানের কবিতা প্রায় এক উপনিবেশিত পরাধীন দেশকালের চৌহদ্দিতে রচিত। একারণে তাঁর একাব্যের কবিতা সম্পর্কে তিনি নিজে বলেছেন–

> বিমুখ প্রান্তর – মুখ ঘুরিয়ে আছে যে প্রান্তর, আর Waste Land-এ মরা মাটির কথা। অবক্ষয়ের কথা আমি বলিনি, আটকা পড়া জিনিসের মুক্তি চেয়েছি আমার কাব্যে। (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ৭৬৫/১)

এই বিষয়টি তাঁর কাব্য-কবিতায় লক্ষ করা যায়। `egL cÖvšÍi কাব্যে শেষ এবং দীর্ঘ কবিতা 'রক্তিম হৃদয় ফুল' কবিতাটিতে অবরুদ্ধতা আর তা থেকে মুক্তির বাসনার দ্বৈরথ খুব স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। কবিতার শুরুতে এই দ্বৈরথের রূপ ধরা পড়েছে এভাবে–

> রক্তিম হৃদয় ফুল ফোটে, আরক্তিম হৃদয়ের পটে;
>
> রক্তপদ্ম? সূর্যের তুলনা? না, চাঁদ তা– সুপ্রভা সুনীলে বিগলিত
>
> রাত্রির লাবণ্যে?
>
> যেন ফোটে রক্তের বুদ্বুদ খণ্ডিত চূর্ণিত,
>
> সম্বৃত সত্তার শতবুদ্ধি শত কথার শননে
>
> আগলানো ঘর ফেলে মৃতকল্প ছোটে বাহির প্রাঙ্গণে
>
> জন্মমৃত্যু জড়াজড়ি জীবনের স্খলিত বাসরে অকালে যেখানে। (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ৫০-৫১/১)

খুব স্পষ্টভাবেই কবি ষাটের বাস্তবতা তুলে ধরেছেন–

> দেশপ্রেম নিলামে উঠেছে
>
> আত্মবিক্রয়ের চড়া দামে মিলছে তো সবি– সিংহাসন, মোসাহেব,
>
> রুটি রুজি! পেয়দারা বসেছেন পদে, গোলামের ধমনীতে
>
> বাদশাহি লোহু ফুসে ফুসে ওঠে, গর্মিতে উত্তাল, বেচাল বেতাল
>
> – কালচক্র উন্মুলিত জীবনপাশার ছক, মতিচ্ছন্ন
>
> বিভ্রান্ত বিপাকে। (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ৫২-৫৩/১)

ষাটের দশকে কেবল আত্মবিক্রিত মানুষের বিবরণেই কবি ক্ষান্ত হননি। স্বৈরশাসককে AvZ kãvej¨ (১৯৬৮) কাব্যে 'নকল রাজা' আখ্যা দিয়ে কবি স্বৈরশাসকের নকল পরাক্রমের বর্ণনা দিয়েছেন। একারণে AvZ kãvej¨ কাব্যের কবিতার চরিত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন– 'ষাটের দশকের দীর্ণ, বিচূর্ণ ও রক্তাক্ত সময় ও সমাজচেতনার অঙ্গীকার যন্ত্রণায়-বেদনায়-হাহাকারে মূর্ত হয়ে উঠেছে কোনো কোনো কবিতায়।' (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ৭৭৮/১) স্বৈর শাসনের পরাক্রম যে সাময়িক সে বিষয়ে

Dhaka University Institutional Repository

কবির কোনো সংশয় ছিল না। ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে কবি বর্ণনা করেছেন স্বৈরশাসকের মূর্তি, মূর্তির আশপাশের মানুষ আর এই পরিস্থিতির ভঙ্গুরতা–

আপামর সবাইকে ধন্যধন্য করে যান। রাজা মাত করে যান
বিজয়ীর ভাণে। অনেক দানের বদলে
শুধুই আকুতির প্রতিদান অবশেষে
তাঁকে নিতে হয়, এমনিই অবলীলায়
গুরু গরিমায় মহিম সিংহের মতোই রাজা
উজান উতরিয়ে যান। আবার তখুনি
ফিরে শুরু হয় সেই একই খেলা, পাছে
লোকচোখে ঘোর যায় কেটে, নকল রঙের
পোছ ঝড়ের ঝাপটায় যায় মুছে, যদি সাজানো
বাগান ভেসে যায় খর জলে। (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ৯২/১)

রাজার দাপট আর তাঁর মোসাহেবদের ভোগ যে সাময়িক, এর বিরুদ্ধে যে এক সময় জেগে উঠবে কোটি জনগণ এতে কবির মনে কোনো সংশয় ছিল না। একারণেই কবি অবরুদ্ধ মানুষের ভবিষ্যতে জেগে ওঠার ইঙ্গিত খোদাই করে রচনা করেন নিম্নোক্ত তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীকী চরণ–

লক্ষ কোটি লোক শুধু চোখ মেলে দেখে, দেখে যায় শুধু
দিন গোণে
খোলে না হৃদয়-কপাট। (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ৯২/১)

একই ধরনের জাগরণী বাসনা প্রকাশিত হয়েছে কবি যখন বলেছেন, 'নিরঙ্কুশ স্বাধিকারে ও অবারিত সম্মানে ফেরবার/আকাঙ্ক্ষা-উন্মুখ এই ফুল/দুঃস্বপ্নের কালে দুঃশাসনের দৃষ্টির তলে, রক্তজবা এই ফুল তোমাকেই দিলাম,/ দিলাম তুলে।' (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ৫৩/১) দেয়াল আর অবরুদ্ধতাকে অতিক্রম করার বাসনা প্রকাশিত হয় কবি যখন বলেন, 'যতই নিরেট হোক, দেয়ালটা থাকুক আমাকে/ঘিরে পাহারায়,/দৃষ্টি তবু যায় দূরে, দরজা-জানালা/পড়ে থাক' (শামসুর ২০১২ : ১৯৪/১) তখন তা আর কেবল কৌতূহলী ব্যক্তির নিরুদ্দেশ যাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা হয়ে ওঠে দেশকালের অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তির আশাবাদ ও প্রত্যয়। একই রকম অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তির বাসনা থেকেই আলাউদ্দিন আল আজাদ লিখেছেন 'গণতন্ত্র' নামক কবিতা। সবখানেই কবি ব্যক্তির আর সমষ্টির গণতান্ত্রিক মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা দেখিয়েছেন–

দেয়ালের সব লেখা মুছে দাও
তারপরে লেখো প্রকাণ্ড অক্ষরে
প্রকাণ্ড অক্ষরে তারপরে লেখো
লেখো আমি ভালোবাসি গণতন্ত্র!

Dhaka University Institutional Repository

আকাশের ছিটানো তারা সাজাও

এক এক ক'রে সাজাও, সাজিয়ে

তেঁতুলবীচির মতো, স্পষ্ট করে

লেখো আমি ভালোবাসি গণতন্ত্র!

নিশান ওড়াও লেখো গণতন্ত্র

পাল তুলে দাও লেখো গণতন্ত্র

বেলুন ছড়াও লেখো গণতন্ত্র

ঘুড়ির ঝাঁকেও লেখো গণতন্ত্র! (আলাউদ্দিন ২০০৬ : ১৩৬/১)

গণতন্ত্রের জন্য কবির এই ব্যাকুলতা যে ষাটের অবরুদ্ধতার বিরুদ্ধে এক ধরনের দীপ্ত উচ্চারণ এতে আর সন্দেহ কী!

কবিতায় নেতিবাচক জীবনচেতনা ও উত্তরণের আশাবাদ

ষাটের প্রথমার্ধের কবিতায় নেতিবাচক জীবনচেতনার অনুপ্রবেশ বেড়ে যায়। এর কারণ হিসেবে অনেকেই স্বৈরশাসনের দাপটকে দায়ী করেন। ষাটের দশকের শুরুটা প্রকৃতপক্ষে এক সর্বৈব জাতীয় হতাশার জন্ম দিয়েছিল। রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক অধিকারের ভবিষ্যৎ এসময় অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় কবিদের চৈতন্যে দেখা দেয় এক ধরনের হতাশা, অনিশ্চয়তা, আশঙ্কা। একারণে কোনো কোনো কবির কবিতায় লক্ষ করি মরুভূমি আর বালুর অনুষঙ্গ বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। যেমন, রফিক আজাদের কবিতায় বারবার এসেছে 'বালু', 'বালিয়াড়ি'র অনুষঙ্গ। আর 'মৃত্যু' তো তাঁর কবিতার মর্মে গেঁথে আছে। জীবনের অগ্রগতিকে তিনি মৃত্যুর দিকে ধাবমানতা হিসেবে দেখতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। 'মূর্খের মতন শুধু অযথা বিদ্রোহ/প্রতিটি মুহূর্তে তুমি অগ্রসরমান/মহান মৃত্যুর দিকে;/সময় গড়ায়, হায়, সুমুখের পানে,/অর্থাৎ মৃত্যুর দিকে–/' (রফিক ২০১৩ : ৩৪) Am¤‡ei c‡¶q (১৯৭৩) কাব্যের 'জন্মদিনের জর্নাল' অথবা 'স্বগত মৃত্যুর পটভূমি' অথবা 'অনুগমন' কবিতায় মৃত্যুকে কবি যেভাবে আরাধ্য হিসেবে দেখেছেন তা বিস্ময়কর। 'অবাস্তব কোনো-এক দেবতায় সমর্পিত নয়/আমার প্রার্থনা,– অহেতুক উৎসর্গিত নই কোনো/অলৌকিক ঈশ্বরের স্তবে; মহান মৃত্যুর দিকে/উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান, জেনো, এই আমার জীবন।' (রফিক ২০১৩ : ২০) এই একই কবির কবিতায় 'রাজহাঁস' বা 'গোলাপ'-এর অনুষঙ্গও দুর্লক্ষ নয়। কবির কবিতায় আশাবাদ উঁকিঝুকি দিয়েছে, কিন্তু দেশকালের নেতি যেন কবির চৈতন্যকে আঁকড়ে ধরেছে বারবার। একে বলা যায় ইতি-নেতির দ্বৈরথ। এই দ্বৈরথ ষাটের অন্য কবিদের মধ্যেও লক্ষ করা যায়। শামসুর রাহমানের কবিতায় এই দ্বৈরথী জীবন চেতনার একটি উদাহরণ লক্ষ করা যাক–

আজকাল লোকে যায় না বাগানে,

তবু তো ধুলায় গোলাপ বাগান বাঁচে।

সেখানে পাখির কণ্ঠে ধ্বনিত

হৃদয়-মথিত কত মানবিক গান।

বিপদের এই ভীষণ আঁধিতে

আজকে আমার একটি ভাবনা শুধু :

ফাগুনের স্মৃতি ঝলকিত ফুল

কী করে বাঁচাই বারুদের ঘ্রাণ থেকে? (শামসুর ২০১২ : ১৯১/১)

কবির এই আশঙ্কার নিছক ব্যক্তিগত নয়। এর সঙ্গে জাতীয় জীবনের বিপর্যস্ত পরিস্থিতির রয়েছে গভীর সম্পর্ক। তবে পাশাপাশি এও সত্য যে, বারুদের ঘ্রাণ থাকলেও ‘গোলাপ বাগান’ আর ‘হৃদয়-মথিত মানবিক গান’-এর প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা কবির চেতনায় দুর্লক্ষ নয়। বন্ধ্যা আর অবরুদ্ধ সময়ের হতাশা প্রকাশিত হয়েছে হাসান হাফিজুর রহমানের A‡š Íg k‡i i g‡Z¨ (১৯৬৮) কাব্যে–

নষ্ট এক সময়ের জালে বন্দী অবিরাম প্রাণ,

যেন সব গান বিনষ্টির সুরে বেতালের সমে

আসে ঘুরে ঘুরে। অদ্ভুত সময় এক স্বভাবের

গূঢ় নাড়ি দেয় কেটে। সত্তায় নিবিড় থেকে

অবিচল পায়ে হেঁটে এমন শুকনো শক্ত

মাটি নেই কোথাও জীবনে, চোরাবালি নেয় টেনে

বিচিত্র আপষে, নিজেরি একান্ত রক্ত নীরব ক্ষরণে

লেখে নাম বাঁকে বাঁকে, নিজেরি বিদ্রূপ হাঁকে

বিভিন্ন বিরোধী উচ্চারণে। (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ১০৬/১)

কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, এই হতাশার সঙ্গে জাতীয়তাবাদী জাগরণের আগ্রহের এক ধরনের সম্পর্ক রয়েছে। কবিদের অনেকেও এটি মনে করতেন। এজন্য মৃত্যুকে জীবনের আসক্তি বলে বর্ণনা করেছেন অনেকেই–

যখন বন্ধুর মৃত্যুভয়ে নীলমুখ

বিস্ফারিত চোখে দেখে

তারই সাথে কেঁদে কেঁদে

বলেছি, এ ভয় নয়, জীবনকেই ভালোবাসা,

ভয় নয়, জীবনের শিরায় শিরায় বাঁধা

অকাতর স্নায়ুর ক্ষরিত

নীল কান্না এ; মৃত্যুকে ভয় নয়,

জীবনেরই বিরহের ভয়...(হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ৯৮/১)

ষাটের দশকে এসে অশাবাদী এবং সংগ্রামবিশ্বাসী কবির মধ্যেও আমরা লক্ষ করেছি হতাশা বা মৃত্যুর ছদ্মাবরণে জাতীয় জীবনজাত হতাশা। কবি বলছেন ‘জীবন নিহত আমি জীবনের ঘণ্টারোলে’। এই হতাশা

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় জাগরণের আকাঙ্ক্ষারই নামান্তর। হাসান হাফিজুর রহমানের A¤šÍg k‡ii g‡Zv কাব্য থেকে হতাশার উদাহরণ দেয়া যাক–

আমি কারো মুখে আর দেখি না চোখ,
দীপ্ত আঁখি পটলচেরা, জীবনের ছায়া ছলছল
নিষ্পাপ সরল-উদ্‌গ্রীব
শিহরিত আনন্দিত স্পন্দিত
ব্যথাসুখ নন্দিত
ভায়ের মায়ের দুই চোখ, প্রতিবেশী দুই চোখ
আত্মার ঘনিষ্ঠ দুই চোখ
আমি আর দেখতে পাইনে
শুধু ত্রাসের গহ্বরে দেখি ডুবে গেছে
গাছপালা আকাশ নদী শিশু
শৈশব কৈশোর যৌবন (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ৯৯-১০০/১)

এই হতাশার মধ্যে আশাবাদ লুকিয়ে আছে বলেই কবি একটু পরেই বলেন–

কি করে বা বলি, আজো তো কৃষ্ণচূড়া
রাঙামাথা হয়ে ওঠে নিয়মিত, মদির আবেশে
ঘন হয় নিঃশ্বসিত বুক, ঢল নামে
আদিম বিপুল জলের
শুষ্কতার নিগূঢ়ে
জল পড়ে আলিশায়, অন্তহীন ছায়া
ঘুম যায় রঞ্জিত মূর্ছনায়। (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ১০০/১)

কবিতায় অনমনীয় চেতনার প্রকাশ

পূর্বেই বলা হয়েছে সাহিত্যিকদের একটা অংশ স্বৈরশাসনের চাপে নতি স্বীকার করে আত্মবিক্রয়ের পথ বেছে নিয়েছিলেন। আবার একটা অংশ ছিল যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও ঠারেঠোরে অনমনীয় মন-মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। নিজের সত্তার সঙ্গে দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আত্মবিক্রয়ের পথ বেছে না নিয়ে আত্মপ্রত্যয়ী থেকেছেন। কবিদের এই আত্মপ্রত্যয় বাঙালি জনগোষ্ঠীকে আত্মপ্রত্যয়ী হতে সাহায্য করেছে। এই ক্ষেত্রে কবি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের সহায়ক হয়ে উঠেছেন। আলাউদ্দিন আল আজাদের †fv‡ii b‘xi †gvnbvq RvMiY (১৯৬২) কাব্যের ‘ফাউস্টের সংলাপ’ তেমনি একটি কবিতা। এই কবিতায় কবি ফাউস্টের ছদ্মাবরণে নিজের আত্মপ্রত্যয়ী চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এ কবিতায় ফাউস্ট নানা প্রলোভন ও হুমকির শিকার। কিন্তু আত্মবিক্রয়ে অস্বীকৃত। ‘সত্য, ন্যায়, আর প্রেম’-এর

বোধকে ফাউস্ট বলেছেন তার মূল। এই মূল থেকে ফাউস্ট তথা কবি সরতে চান না। কারণ তিনি অনেক হিসাব-নিকাশে অনুভব করেছেন যে–

তবে আজ নয়, ক'দিন সময় দাও, কারণ এই সব
মূল বড় গর্বী বড় অহঙ্কারী যতই শাস্তি দাও
যত মারো রক্তাপ্লুত হয় শুধু
চিরতরে ছিন্ন হয় না'কো
বরং আঘাত খেয়ে কখনো কখনো আসে ফিরে
মহাপ্লাবনের মতো অবিকল, যার পরে থাকে
নয়া পত্তনের অঙ্গীকার এবং সূর্যের নিচে
কবোষ্ণ বুকের উচ্চে হিল্লোলিত ডানা জাপটিয়ে
উড়ে-চলা শ্বেতকপোতের ঠোঁটে
অলিভের শাখা! (আলাউদ্দিন ২০০৬ : ৮৪/১)

রূপকের ছদ্মাবরণে একই চেতনা প্রকাশিত হয়েছে একই কাব্যের 'কাব্যতত্ত্ব' নামক কবিতায়। কবিতায় কবি অলংকারবিদ বা কাব্য সমালোচকদের বিপরীতে দাঁড় করিয়েছেন স্বাধীনচেতা কবিকে। কবিতায় ছন্দবিশ্লেষক বা আলংকারিক হচ্ছে ষাটের স্বৈরশাসকের প্রতীক, যে-শাসক নির্দিষ্ট করে দিতে চাইত কবি-সাহিত্যিকরা কী নিয়ে লিখবেন। কবি-সাহিত্যিকদের করে তুলতে চাইত নিয়ন্ত্রিত আর গৃহপালিত। উদাহরণ দেখলেই বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যাবে–

ছুরির ফলার মতো তাদের চোখে
নির্ধারিত ব্যাকরণ
আমার গলার গান
ভুরুর ভঙ্গিমা
কটিদেশ
ও পায়ের ছন্দ
হতে হবে অবিকল তাদের রচিত বিধির শিকলকে
জড়িয়ে জড়িয়ে
একচুল ব্যতিক্রম যেন গন্দম্ খাওয়ার অপরাধ।
তা'রা কানুনের রাজা। (আলাউদ্দিন ২০০৬ : ৮৮-৮৯/১)

কবিতাটি শুরুই হয়েছিল এই বলে যে, 'তোমরা তৈরী করেছ অনেক বৃত্ত'। কিন্তু কবি তো বৃত্ত, বাধা, নিয়ন্ত্রণ মানেন না। স্বজাতি আর স্বদেশের প্রতি নিষ্ঠ থাকাটা তাঁর স্বভাব। একারণে কবি পরেই বলেছেন–

কিন্তু হায়

Dhaka University Institutional Repository

তা’রা তো বলে না

উৎসের কেন্দ্র থেকে

উপচে উপচে

উচ্ছল-ধারায় সাগর-সঙ্গমে ছুটে চলা নদীকে বাঁধে

সে কোন্ নিয়ম?

তা’রা তো বলে না

কঠিন শ্রমের প্রতিদানে

চাষীর ঘরে ঘরে হাসি

ফোটাবার জন্য

খামার উপুড় করে শস্য দেওয়ার সাধ যে জমির

তা’কে প্রতিহত করে

সে কোন্ বিধান? (আলাউদ্দিন ২০০৬ : ৮৯/১)

উদ্ধৃতাংশে জমির ‘চাষীর ঘরে ঘরে হাসি ফোটাবার জন্য খামার উপুড় করে শস্য দেওয়ার সাধ’ আর কবির তাঁর জনগোষ্ঠীর পক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত কবিতা রচনার সাধ সমার্থক হয়ে উঠেছে। এবং কবিকে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে বাধা দেয় এমন শক্তি নেই বলে কবি ঘোষণা দিয়েছেন। যদিও প্রবঞ্চনা-প্রলোভনের শেষ ছিল না স্বৈরশাসকের পক্ষ থেকে। স্বৈরশাসকের বিভ্রান্তিকর প্রলোভনের চিত্র কবি যথার্থই চিত্রিত করেছেন–

প্রবঞ্চকের

অনেক যুক্তি,

তর্কের ধাপে

অনেক শাসন

তারও চেয়ে বড়ো

রক্ত নাচানো নানা প্রলোভন।

ক্লীব সান্ত্বনা :

কোনো এক দূর অনধিগম্য

সোনাফলা দেশ

খুশীর বাসর

অনন্ত কাল;

বিভ্রান্তির পথ দেখাবার

ছলনা-চতুর কত আয়োজন

প্রতিটি পদক্ষেপে। (সিকান্দার ২০১৭ : ১৩০)

Dhaka University Institutional Repository

এসব প্রলোভন-প্রবঞ্চনায় সমকালীন অনেকে আত্মবিক্রয়ের পথ বেছে নিয়েছিলেন। আর অলীক দেশের সম্মোহন-স্বপ্ন অনেককেই মোহিত ও স্বপ্নাতুর করেছিল। কিন্তু পূর্ব বাংলার অনেক কবি-সাহিত্যিকই এসব থেকে মুক্ত থেকে ন্যায্যতা আর জাতীয়তার প্রশ্নে ছিলেন অবিচল-অনমনীয়। সেই অবিচলতা-অনমনীয়তার জায়গা থেকেই তাঁরা লিখেছেন–

তবুও তা এড়িয়ে
যা কিছু প্রাপ্য
যদি কিছু নিতে হয়
সব নিতে হবে
এখানে দাঁড়িয়ে
দিনের আলোয়
দ্বিধার দ্বন্দ্ব
অথবা সব সঙ্কোচ জয় ক'রে।
অন্ধকারের
অনির্দেশ্য
মর্মবাণীর মত,
রাত নেমে এলে
কি হবে তা নিয়ে
চিন্তার চাষে ফসল ফলানো
থাক না অনিশ্চিত। (সিকান্দার ২০১৭ : ১৩০)

এভাবে ষাটের দশকে কবিরা নানা সংকটের মধ্যে জাগ্রত রেখেছেন তাঁদের অনমনীয় সত্তা। অনমনীয়তার উদাহরণ আরো লক্ষ করা যায় নিম্নোক্ত কবিতায়–

গায় গায় লেগে, গলাগলি
দাঁড়াবো আমরা
এবং তাইতো
পাতাল ফুঁড়ে আসছি
আমরা, পাতাল ফেঁড়ে
আসছি
নিবিড় রোদনে কাঁপতে কাঁপতে
পাতাল ফুঁড়ে আসছি। (আলাউদ্দিন ২০০৬ : ১২৮/১)

এই কবিতাটি লেখা ১৯৬১ সালের শেষ দিকে। এর ওপরও ছাত্র আন্দোলনের প্রভাব পড়ে থাকতে পারে। অথবা তখন কবি জেলখানায় থাকায় একটা সম্মিলিত প্রতিরোধের প্রয়োজন অনুভব করেছেন–

Dhaka University Institutional Repository

যত বাঁধ দাও, পারবে না
তবু পারবে না আমায় ঠেকোতে :
আমি নদী সমুদ্রের বীজ
মিশে যাব মিশে সমুদ্রের সাথে। (আলাউদ্দিন ২০০৬ : ৯২/১)

কবির এই অনমনীয় চেতনা এত প্রখর আর সুস্পষ্ট যে, মেজাজগত দিক থেকে এই কবিতাকে ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের বলেই মনে হয়।

কবিতায় পুরাতনকে বিদায় এবং নতুন ও যৌবনের আবাহন

ষাটের প্রথমার্ধকে বলা যায় দ্বিতীয়ার্ধের প্রস্তুতিকাল। অন্যকথায় বলা যায় এটি একটি ঘোরতর আলোড়নের কাল। নতুন আগুনের জ্বলে উঠবার জন্য ধূমায়িত হয়ে উঠবার কাল। এটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন সত্য তেমনি সত্য সাংস্কৃতিক ও কাব্যকলার দিক থেকেও। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ধূমায়নের পরিচয় পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। কাব্যকলার দিক থেকে ষাটের প্রথমার্ধ বাংলাদেশের কবিতায় এক নতুন জাগরণের কাল। এর সূচনা অবশ্য পঞ্চাশের দশকের কবিকুলের মাধ্যমে শুরু হয়। কবিতায় একটা ঘোরতর আলোড়নের ক্ষেত্রে তখন বিরাট ভূমিকা পালন করেছে ভাষা আন্দোলন। পঞ্চাশের মধ্যভাগে কাব্যকলার জগতে আলোড়নের যে ভিত্তি তৈরি হয় ষাটের দশকের প্রজন্মের হাতে তা আরো বেগবান হয়, যৌবনপ্রাপ্ত হয়। ষাটের দশকে এসে পঞ্চাশের দশকের কবিদের চেতনায়ও দেখা দিয়েছে এক ধরনের পরিবর্তন। তাঁরাও আর পঞ্চাশের মতো রইলেন না, পরিবর্তনে শামিল হয়ে সময়ের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছেন। সব মিলিয়ে ষাটের প্রথমার্ধে এসে কাব্যকলার সঙ্গে সম্পৃক্তদের মধ্যে দেখা যায় পুরাতনকে, প্রথাগতকে অস্বীকারের প্রবণতা। নতুন কিছু করার তীব্র বেদনা ব্যাকুলতা, অস্থিরতা। ষাটের কবিতা একারণে অস্থির উন্মাতাল; একটু যেন বেসামাল। এই অস্থিরতা পুনর্জাত হবার ব্যাকুলতাজাত। এই ব্যাকুলতা নতুন-পুরাতন সবার মধ্যেই কমবেশি দেখা গিয়েছে। ফলে ষাটের দশকে রচিত কবিতার মধ্যকার অস্থিরতাকে অরাজনৈতিকভাবে দেখার সুযোগ নেই। ষাটের রাজনীতিই সবাইকে বদলে দিয়েছে। রাজনৈতিক প্রকাশের পথ যেখানে অবরুদ্ধ, সেখানে অবরুদ্ধ চৈতন্য কোনো না কোনোভাবে প্রকাশ পাবেই। ষাটের কাব্যকলার অভিনবত্ব সেই অর্থে নতুন রাজনৈতিক জাগরণেরই নামান্তর। ষাটের দশকের মাঝামাঝিতে পঞ্চাশের কবি শামসুর রাহমান যখন বলেন, 'পিকাসোর গার্নিকা ম্যুরাল মনে পড়ে—/ক্রুদ্ধ সেই ঘোড়াটার আর্তনাদ যেন/ আমাদের কাল'; অথবা যখন বলেন, 'আমরা নতুন শব্দ ছুঁড়ে দিই সময়ের মুখে'; অথবা যখন বলেন, 'সামনে তাকিয়ে দেখি পরিবর্তনের/টগবগ ঘোড়া' তখন সেই কথা আর শুধু কাব্যকলার অভিনবত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এটি রাজনৈতিক নতুন জাগরণের আড়ালী শিল্পভাষ্য হয়ে ওঠে। আর এই শামসুর রাহমান আর পঞ্চাশের শামসুর রাহমান থাকেন না। পুরাতনকে অস্বীকার আর নতুনকে অঙ্গীকারের প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে এমন একটি উদ্ধৃতি লক্ষ করা যাক—

সময়ের স্বগতকথনে বার বার
কান পাতি, প্রাজ্ঞ পদাবলি, প্রতীকের উচ্চারণ, রূপাভাস,

গাঁথি মগজের কত শাণিত ফলকে।

সাধারণ হলেও অন্তত

অতিশয় লঘুমতি যুবা নই, অলৌকিক মন্ত্রের মায়ায়

কবরের ধূলিকে বানাই

নক্ষত্রের ফেনা, যত পারি দূরে রাখি

অনুশোচনার মলময়

কীটের স্বৈরিতা। অমরত্ব কাকে বলে জানি না তা,

সে-জ্ঞানেউৎসাহ কম, বাছা-বাছা ভাষ্যকার তার

দিয়েছেন যে-ব্যাখ্যা তাতেও

কখনো ওঠেনি মন। পিতৃপুরুষেরা

ধারণার যে ক'বিঘে জমিতে লাঙল চষে কিছু

শাক-সবজি, সাধের আনাজ

তুলেছেন ঘরে, সেগুলো রোচেনি মুখে। (শামসুর ২০১২ : ১৮৬-১৮৭/১)

উদ্ধৃতাংশের বক্তব্যকে কেবল কাব্যকলা বিষয়ক বক্তব্য বলে গ্রহণ করা মুশকিল। কবির প্রজন্মের কবিদের ভাবনার স্বরূপ বলতে গিয়ে কবি সময়ের জনভাবনার প্রতীকী উচ্চারণও করে ফেলেছেন। কারণ কবির চৈতন্যের শেকড় প্রোথিত থাকে তাঁর সমকালের জনমানুষের মর্মমূলে। ঠিক উদ্ধৃতাংশের শুরুতে কবি যেমন বলেছেন, 'সময়ের স্বগতকথনে বার বার/কান পাতি, প্রাজ্ঞ পদাবলি, প্রতীকের উচ্চারণ, রূপাভাস,/গাঁথি মগজের কত শাণিত ফলকে।' ষাটের দশকের আরেক কবি শহীদ কাদরীও বারবার কবিতা এবং চৈতন্যের এই পালাবদলের কথা বলেছেন তাঁর কবিতায়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'বাংলা কবিতার ধারা' কবিতাটি। কবিতাটিতে তিনি বলেছেন, এক সময় কবিতা ছিল 'গোলাপ, নীলিমা, নিসর্গ, নারী'-এর উচ্চারণে অধীর। এসবের চিৎকারে কবিদের ঠোঁট থেকে গড়িয়ে পড়ত 'মসৃণ লালা'। কবিতার মধ্যে তিনি 'প্রেম প্রেম বলে চশমা-পরা চিকণ যুবক'-এর অস্তিত্ব দেখেছেন। আর বর্তমানের কবি দেখেন 'স্বপ্নের অভ্যন্তরে কবিদের নিঃসঙ্গ করুণ গণ্ডদেশে/মহিলার মতো ছদ্মবেশে জাঁদরেল নপুংসক এক/ছুঁড়ে মারলো সুতীক্ষ্ণ চুম্বন।' এই যে পুরাতনকে বাদ দিয়ে নতুনকে দেখার, মোকাবিলা করার বাসনা, এর সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা এবং নতুন ও প্রচণ্ড বর্তমানের প্রতি আগ্রহের যোগ গভীর বলেই মনে হয়। নতুন প্রজন্মের কবিদের এই নতুনের প্রতি তীব্র টানের গভীর মনস্তত্ত্ব স্বকাল ও স্বদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে খোঁজ করাটা অমূলক নয়।

ষাটের দশকে যৌবনের বন্দনা ও আহ্বান বিষয়ক বেশ কবিতা লেখা হয়েছে। সাধারণত যৌবনের বন্দনা কবিরা করে থাকেন নতুন কিছু সৃজনের প্রয়োজন-ব্যাকুলতা থেকে। ষাটের দশকের জাতীয়তাবাদী জাগরণের দিকে লক্ষ করলে আমরা দেখব যে, যৌবন-তারুণ্যই এই জাগরণকে মূলত সম্ভব করে তুলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

একারণে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময় কবিরা তারুণ্যের উদ্‌বোধনের আশাবাদ ব্যক্ত করে জাতীয়তাবাদী জাগরণকেই প্রত্যাশা করেছেন–

নিষ্ফল, সোনার সময় হয়েছে ঢের
এইবার ওড়াও নিশান যৌবনের

ঘর-ঘর পথ-প্রান্তর হাটবাজার
বন্দর দ্বীপ ও নগর হ্রদ পাহাড়

সব ঠাঁই দাও হে উঁচিয়ে অঙ্গীকার
উজ্জ্বল প্রেম, বর্ণালী স্বাধীনতার। (আলাউদ্দিন ২০০৬ : ১৩৫/১)

এভাবে ষাটের কবিতা পুরাতনকে, জীর্ণতাকে, প্রথাগতকে বারণ আর নতুন ও যৌবনকে বরণের মধ্য দিয়ে সময়ের জনকণ্ঠকে কবিতার শোণিতে ধারণ করেছে।

কবিতায় বাঙালি সংস্কৃতির শোণিত ধারা

ষাটের দশকের বাংলাদেশের কবিতায় বাঙালি সংস্কৃতির নানা উপাদানের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যায়। আমরা পূর্বের অধ্যায়ে লক্ষ করেছি ষাটের দশকে এসে বাঙালির উদ্‌যাপনে নববর্ষ, রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষসহ নানা সাংস্কৃতিক চর্চা নতুন করে দেখা দিয়েছে। কবিতায়ও বাঙালি সংস্কৃতির যা বিশেষ, যা বাঙালিকে পাকিস্তান শুধু নয়, পৃথিবীর অপরাপর জাতি থেকে আলাদা হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়, তার স্মরণ ও উল্লেখ বেড়ে গিয়েছে। নিজস্ব সংস্কৃতির এই স্মরণ ও শরণ দুই-ই জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ। কারণ, এসব উপাদানের কার্যকর উপলব্ধির মধ্য দিয়ে একটি জাতি আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে শক্তির রসদ নিয়ে থাকে। একারণে শামসুর রাহমানের কবিতায় কবি যখন উচ্চারণ করেন ‘হে রাখাল, হে দোতারা তোমাদের কাছ থেকে দূরে/কখনো যেতে পারিনি’ (শামসুর ২০১২ : ৩৬৩/১) তখন বোঝা যায় কবি কী পরম মমতায় আর অহংকারে তাঁর সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরেছেন। একই ধরনের অহংকার আর তৃপ্তি লক্ষ করি আমরা ওমর আলী (১৯৩৮-২০১৫)-এর কবিতায়। তবে ওমর আলীর কবিতায় বাঙালি সংস্কৃতি উল্লেখ আকারে হাজির হয়নি। বাঙালি সংস্কৃতির সার শোণিত প্রবাহের মতো কবিতার অভ্যন্তরে গভীরভাবে ক্রিয়াশীল থেকেছে। ওমর আলীর কবিতার বিষয়, নারীকে দেখার ভঙ্গি, নারীর সৌন্দর্য চিহ্নিতকরণে ক্রিয়াশীল রুচি, নারীর সঙ্গে পুরুষের সম্পর্কের কাঠামো, সংসার ও চারপাশের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক ইত্যাদির প্রশ্নে তাঁর কবিতা বাঙালি সংস্কৃতির একেবারে ঘরের কবিতা হয়ে উঠেছে। ওইসব কবিতায় আদিম শ্যামাঙ্গী স্বাস্থ্যবতী নারী যখনই কীর্তিত হয় তখনই খাঁটি বাঙালি রুচি আর জাতি-পরিচয় কবিতার মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারে। উদাহরণ লক্ষ করা যেতে পারে–

এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি
আইভি লতার মতো সে নাকি সরল, হাসি মাখা;

Dhaka University Institutional Repository

সে নাকি স্নানের পরে ভিজে চুল শুকায় রোদ্দুরে,
রূপ তার এদেশের মাটি দিয়ে যেন পটে আঁকা।

সে শুধু অবাক হয়ে চেয়ে তাকে হরিণীর মতো
মায়াবী উজ্জ্বল দুটি চোখে, তার সমস্ত শরীরে
এদেশেরই কোন এক নদীর জোয়ার বাঁধভাঙা;
হালকা লতার মতো শাড়ী তার দেহ থাকে ঘিরে।

সে চায় ভালবাসার উপহার সন্তানের মুখ,
এক হাতে আঁতুরে শিশু, অন্য হাতে রান্নার উনুন,
সে তার সংসার খুবই মনে প্রাণে পছন্দ করেছে;
ঘরের লোকের মন্দ আশংকায় সে বড় করুণ।

সাজানো গোছানো আর সারল্যের ছবি রাশি রাশি
ফোটে তার যত্নে গড়া সংসারের আনাচে-কানাচে,
এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর এ ব্যাপারে খ্যাতি;
কর্মঠ পুরুষ সেই সংসারের চতুষ্পার্শ্বে আছে। (ওমর ২০০২ : ১৭)

ষাটের দশকের পরিপ্রেক্ষিতে এই কবিতা হাজার-হাজার মানুষের একটি মিছিলের চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই কবিতা ষাটের দশকের পাকিস্তানি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের প্রচেষ্টার গালে এক তীব্র চপেটাঘাতের কাজ করেছে এবং একই সঙ্গে বাঙালিকে তার সংস্কৃতি আর রুচির প্রশ্নে আত্মবিশ্বাসী করেছে। একই কথা খাটে আল মাহমুদের †mvbvwj Kvweb কাব্যের অধিকাংশ কবিতার সম্পর্কে। আল মাহমুদ তাঁর কবিতার প্রতি ছত্রে ছত্রে বাঙালি সংস্কৃতির খাঁটি রূপের যে-পরিচয় বিধৃত করেছেন, তা ষাটের দশকের শেষাংশে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের হাতিয়ারের কাজই করেছে বৈ কি। এই ধারায় আসাদ চৌধুরীও নিশ্চয় ষাটের আরেক গুরুত্বপূর্ণ কবি বলে কীর্তিত হবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধের কবিতায় জাতীয়তাবাদী চিন্তার স্বরূপ

গণমানুষ ও কবিচৈতন্যের জাতীয়তাবাদী রূপান্তর

একটি উপনিবেশিত জাতির মধ্যে যখন জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ হতে থাকে হয় তখন দিনকে দিন সেই জাতির জাতীয় চরিত্রে পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। এই পরিবর্তন মনোদৈহিক পরিবর্তন। মনোগতভাবে তারা বদলে যায় এই অর্থে যে, দেশমাতৃকার জন্যে তারা আরো টান অনুভব করতে থাকে। স্বজাতির প্রতি তারা কিছু করার দায় অনুভব করতে থাকে। আর দৈহিকভাবে পরিবর্তন এই অর্থে যে, তারা শারীরিকভাবেও প্রতিরোধের জন্যে প্রস্তুত থাকে। ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে এসে পূর্ব বাংলার গণমানুষের মধ্যে এই

দ্বিমাত্রিক ব্যাপকভিত্তিক পরিবর্তন আসে। বিচ্ছিন্নতা থেকে তারা ক্রমাগত সমাগত হতে থাকে। ঘুম থেকে যেতে থাকে নির্ঘুমতার দিকে। তারা যেতে থাকে গুঞ্জরিত স্বপ্ন থেকে বাস্তবের দিকে। অথবা বলা যায়, ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে এসে দুঃস্বপ্ন থেকে স্বপ্নের দিকে বাঙালির অভিযাত্রা শুরু হয়। এই রূপান্তরের সাক্ষ্য ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম। এই আন্দোলন-সংগ্রামের প্রকৃতি ছিল এমন যে, এটি তার পরিধি ক্রমাগত বাড়িয়েছে। সচেতন থেকে শুরু করে ক্রমাগত অচেতন, অর্ধচেতন সবাইকে জাগিয়ে এবং শাণিয়ে তুলেছে। কবিদের চৈতন্যকেও নাড়া দিয়েছে। রূপান্তর এসেছে কবিচৈতন্যেও। ফলে কবি ঘোষণা করেছেন, 'এখন যৌবন যার, মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়/এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।' (হেলাল ২০১৭ : ৯) ১৯৬৬-এর ছয় দফার পথরেখা ধরে ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানের তীব্রতা কবি চৈতন্যে এমন করাঘাত করেছে যে কবি যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই ঘোষণা উচ্চারণ করে উঠেছেন। কবি প্রথাগত দুঃখবোধকে বলেছেন, 'হে আমার দুঃখগুলি তোমার জন্যে অমল রোদনে/মালা গাঁথার সময় তো নেই,/অশ্রু দিয়ে তোমার জন্যে কিভাবে উজ্জ্বল ঘর বানাবো/বলো, হে আমার দুঃখগুলি/জীবনের দায় আজ হৃদয়ের চেয়ে ঢের বড়ো!' (মহাদেব ২০১১ : ৪০/১) এই রূপান্তরের কারণও কবি খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন। 'যুদ্ধের কঠিন মুখ কিংবা কোনো বিপ্লবের বলিষ্ঠ/চেহারা আমাকে আঁকতে হয়, শাণিত শপথ নিয়ে/জ্বলন্ত মিছিলে নামি, প্রতিশোধ চাই/অবৈধ রক্তের জন্যে, বিশাল হিংসাটা/আমি হাতে নিয়ে ছুটি,/আমার ক্রোধেরা তাই জন্ম দেয় এক-একটা/বিখ্যাত আগুন, রক্তাক্ত পতাকা আমি কাঁধে নিয়ে/ফিরে আসি আহত পাড়ায়...।' (মহাদেব ২০১১ : ৪১/১) এই যে রূপান্তরের সত্য, এই যে জাগরণের সত্য, এই সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন সূক্ষ্ম অনুভূতির কবিরা। সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৭-২০১৭) তাঁর 'কিন্তু আসে একদিন' নামক এক কবিতায় এই রূপান্তরটি দেখিয়েছেন দারুণভাবে। সেখানে সৈয়দ হক দেখিয়েছেন, সাংসারিক অভাব অনটনের শিকার অতি সাধারণ ও নিরীহ এক বাঙালি একদিন কিভাবে জেগে উঠছে, শামিল হচ্ছে বহু মানুষের সঙ্গে; আর সাংসারিক অনটন নিয়ে হাহাকার করা মানুষটির কাছে তার সংসার আর স্বদেশ হয়ে উঠছে অভিন্ন। কবিতাটি ষাটের প্রথমার্ধের বাঙালির ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে যে রূপান্তর ঘটেছে সেই রূপান্তরের বাস্তবতা তুলে ধরেছে। কবিতাটির প্রথমাংশে ব্যক্তিটির চিন্তা-চেতনার ধরন ছিল এমন–

> বউটা অসুখে ভোগে, তার জন্য দায়ী সরকার–
> এরকম বলে থাকি;
> বলি, এভাবে চলে না রুজি, চলে যাবো ইরান-তুরান;
> ভাতে-ভাত একবেলা রাতে
> মেয়েটার পড়ার টেবিলে বসে সেরে নি আহার;
> কিছুতে আসে না স্বস্তি; বারান্দায় ডাকে বাঁধা পাখি;
> কোনো কোনো রাতে ঘুম যায় ছিঁড়ে খুঁড়ে, জেগে উঠে
> হতভম্ব চোখটাতে ভুলে যাই পানি দিতে ঠাণ্ডা কুঁজো থেকে।
> একথা নতুন নয়, মেয়েটার বাড়ছে বয়স,
> ছেলেটা বখাটে হতে আর দেরী নেই,

Dhaka University Institutional Repository

আমার সঞ্চয় চাই, আত্ম ছাড়া চিনি না অপর। (সৈয়দ শামসুল ২০১২ : ৯৪/১)

দেশ ও দশের ঘোরতর পরিবর্তনে ওই ব্যক্তিই পরিবর্তিত হয়ে যায়। বলে ওঠে–

কিন্তু আসে একদিন, বস্তুরা বৃহৎ হয় আকৃতির থেকে;
ছিঁড়ে যায় দৃশ্যপট; কণ্ঠ শুনি ধুলিতে নদীতে;
নীল রং লাল হয়ে আসে;
রক্তে ফেটে পড়ে কণ্ঠস্বর;
অগ্নির উত্তাপে যেন পুড়ে যায় যা কিছু নশ্বর,
ক্ষুদ্র; তুচ্ছ হয় প্রজনন, ঘুম, মৃত্যু, স্বাস্থ্য ও সঞ্চয়;
ঘটে ইন্দ্রজাল– আমার হৃদয় থেকে
আশ্চর্য নদীর মতো কি যেন বেরোয়,
অবিরল প্রবাহিত হয়–
শুভ্র, তীব্র, বিস্ময়, বিস্ময়। (সৈয়দ শামসুল ২০১২ : ৯৪/১)

কবিতাংশের এই 'একদিন' যে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান বিরোধী কোনো ব্যাপক আন্দোলন; জাতীয়তাবাদী জাগরণ– এতে কোনো সন্দেহ নেই। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী জাগরণই ব্যক্তিকে সমষ্টির সঙ্গে যুক্ত করেছে। রূপান্তর ঘটেছে ব্যক্তির আর কবিরও। ফলে সামষ্টিক জাগরণ, যা কিনা ব্যক্তি ও কবিকে রূপান্তরিত করেছে, সেই জাগরণ সম্পর্কে কবি বা ব্যক্তি বলে উঠেছে–

বলি, কে তুমি আমাকে করো অপার, অচেনা, ভাঙো রেখা,
আমাকেও কবি করো, টেনে আনো বৃত্তের বাহিরে?
সংকটে স্বদেশ তুমি দেখাও, অবাক আমি দেখি–
আমিও মিলিত নদী করেছি ধারণ,
স্রোতে যার ডুবে যায় ছোটোখাটো চিত্রলেখা। দেখি,
আমাতেও নির্গত হয় সে প্রবল–ধবল দৃপ্ত সারাৎসার,
বিশাল স্বদেশ হয় আমারই সংসার। (সৈয়দ শামসুল ২০১২ : ৯৫/১)

এভাবে ব্যক্তি এবং কবি ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে স্বদেশের জাতীয়তাবাদী জাগরণের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে। আর কবিতা ধারণ করেছে সেই পালাবদলের চিহ্ন। কোন ধরনের পরিবর্তন পূর্ব বাংলায় হচ্ছিল তা স্পষ্ট করে না বললেও যথেষ্ট অর্থবহ কবির এই দৃষ্টি–

পাল্টে যাচ্ছে দেশ দেশের চরিত্র নেতা
শাসন শোষণ ইত্যাদির বিধির প্রণেতা
রমণীর শাড়ি আর শরীর ভঙ্গিমা
লজ্জা নির্লজ্জতা শ্রদ্ধা ও অশ্রদ্ধা ভদ্রতার সীমা
বন্ধু ও স্বজন শত্রু মিত্র

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীর ছিন্নভিন্ন মানচিত্র

জীবন যৌবন

পাল্টে যাচ্ছে অনুক্ষণ

পাল্টাচ্ছে একান্ত সংগীত গান

এবং শ্লোগান। (ফজল ২০১২ : ২০৪/১)

পরিবর্তনের অভিমুখ স্পষ্ট না হলেও কবি যখন তাঁর পরিবর্তনের তালিকায় ‘নেতা’, ‘শাসন শোষণ’, ‘বিধির প্রণেতা’, ‘পৃথিবীর ছিন্নভিন্ন মানচিত্র’, ‘যৌবন’, ‘শ্লোগান’-কে অন্তর্ভুক্ত করেন তখন জাতীয়তাবাদের ঘোরতর আলোড়নের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদী চেতনার চাপে পূর্বতন আইন পৃথিবীর মানচিত্রের যে-পরিবর্তনের কথা কবি বলেছেন তাতে জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা আর অব্যক্ত থাকেনি।

জাতীয়তাবাদী জাগরণ যখন চারদিককে তুমুল পরিবর্তিত করে দিচ্ছিল, তখন কবিরও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। কবি তখন আর শুধু কবি থাকেন না। তিনি হয়ে ওঠেন কবি এবং কর্মী। কবি স্পষ্ট করে বলেছেনও, ‘মানব জন্মের নামে হবে কলঙ্ক হবে/এরকম দুঃসময়ে আমি যদি মিছিলে না যাই,/উত্তর পুরুষে ভীরু কাপুরুষের উপমা হবো/আমার যৌবন দিয়ে এমন দুর্দিনে আজ/শুধু যদি নারীকে সাজাই।’ (হেলাল ২০১৭ : ১১) আরেক কবি বলেছেন, ‘তোমার জন্য বন্দুকের নল আজ আমারো হাতের বাঁশি’। (নির্মলেন্দু ২০১১ : ৫৭/১) নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় ধরা পড়েছে কবি কিভাবে এ্যাক্টিভিস্ট হয়ে ওঠেন সেই সত্য–

বহুদিন আসক্তিকে আরাধনা ভেবে

নীলিমার সারা দেহ সাজায়েছি মাধবীর স্তনে,

আর ঠিক সেইক্ষণে, বাইরে যখন

মানুষ এগিয়ে গেলো মানুষের দিকে–

(মানুষ এগিয়ে যাবে চিরকাল মানুষের দিকে?)

বন্দুক শোনালো তার অন্তিমের গান,

আগুন জানালো তার সর্বগ্রাসী ধ্বংসের আহ্বান

এ্যাম্বুলেন্সের নীল হাসপাতাল

চলে এলো মৃত্যুর প্রতিরোধে, পথের বালক

যখন মৃত্যু-চিৎকারে আকাশে চৌচির হলো ফেটে,

কাঁদানে গ্যাসের সাথে থেকে-থেকে

মানুষের শান্ত চোখগুলো

যখন টকটকে লাল হলো ফুলের মতন

– আমি তো তখন মৃত্যু, আলিঙ্গন তুচ্ছ মনে করে

ডিমের খোলশ ভেঙে পাখির মতন

Dhaka University Institutional Repository

রাজপথে বেরিয়ে এসেছি, যেখানে মানুষ তার
জীবনের সব প্রাপ্য এসেছে মেটাতে। (নির্মলেন্দু ২০১১ : ৩৫/১)

ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের জাতীয়তাবাদী জাগরণ কিভাবে তার পরিধি বিস্তৃত করছিল, একজন কিশোর কিভাবে বদলে যাচ্ছিল তার অনন্য সাধারণ এক উদাহরণ নিচের এই কবিতাংশটি–

প্রথম কলেজে গেছে খোকা; আজ শুভ সোমবার।
এইতো সেদিনও তাকে মনে হতো জীবন্ত পুতুল
স্বপ্নের সহস্র ডালে ফুটে থাকা একমাত্র ফুল;
দুষ্টু পাখি খুঁটে খুঁটে খায় রোদে স্নেহের ভাণ্ডার।
এখন কেমন যেন, মাথাভর্তি রুখু লম্বা চুল;
কি করে, কোথায় থাকে, সারাদিন বড় ব্যস্ত তার;
হঠাৎ ফিরলে ঘরে অন্য কেউ বলে হয় ভুল;
সর্বাঙ্গে ধারণ করে যেন কারো নিষ্ঠুর প্রহার। (সৈয়দ শামসুল ২০১২ : ১৪৮/১)

একই ধরনের রূপান্তর-সত্য ধরা পড়েছে আল মাহমুদের কবিতায়। তাঁর কবিতায় দেখা যায়, একজনের প্রতি পাকিস্তানি আঘাতে প্রতিবাদী হয়ে উঠছে আরেকজন বা আরো অনেকে। অথবা ব্যক্তি রূপান্তরিত হচ্ছে সমষ্টিতে; যেমন, এক কাক আক্রান্ত হলে পাড়া কাঁপিয়ে তোলে অনেক কাক। †mvbwj Kweb (১৯৭৩) কাব্যের 'পালক ভাঙার প্রতিবাদে' কবিতা থেকে দেখা যেতে পারে–

আমি যেন সেই পাখি, স্বজন পীড়নে যারা
কালো পতাকার মতো হাহাকার করে ওঠে, কা-কা
আর্তনাদে ভরে দেয় ঘরবাড়ি, পালক ভাঙার
উপায়হীন প্রতিবাদে
আকাশ কাঁপিয়ে কাঁদে।
ছত্রখান হয়ে উড়ে
ঘুরে ঘুরে পাখসাটে
পিষ্ট প্রায় সঙ্গীর দশায়।
এমন রোদন ধ্বনি কেন আজ বেজে ওঠে?
এইতো সেদিনও
বোস্তামির পুকুরের ঘোলা-ময়লা জলের কাছিম
হওয়ার সাধনা ছিলো, টকটকে লাল
মাংসের মণ্ডের মতো লোভ এসে ছিটকে পড়তো
থকথকে সিঁড়িতে সারাদিন।

আজ যেন ভেঙে গেলো দারুণ খোলস, খুলে গেল যেন

Dhaka University Institutional Repository

আমার কঠিন প্রাণ। (আল মাহমুদ ২০০০ : ৯৪)

অন্য এক কবি লক্ষ করেছেন ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে তাঁর প্রেমিকাটিরও। প্রেমিকার মধ্যকার 'ব্যক্তিগত প্রেম' দেশ-কালের সংগ্রামমুখর সময়ে তাকে 'নিয়ে যায় তীব্র আকর্ষণে বহু জীবনের কল্লোলিত মোহনায়।' তাই সে 'উর্মিল আবেগে' ছুটে যায় ভাসমান গ্রামে এবং শহরে মানুষের ভীড়ে। শ্রেণিযুক্ত একটি মেয়ে হয়ে ওঠে 'শ্রেণীহীনা'। কবির বর্ণনা লক্ষ করা যাক–

এ রৌদ্রে কেমন করে দাঁড়াও অটল? দেখলাম, অতীতের
মুখের ওপর ঝাঁপ বন্ধ করে কেমন সহজে
এলে তুমি সাম্প্রতিক সদর রাস্তায়।...
কখনো চকিতে মঞ্চে ওঠো জ্বলজ্বলে
পদক্ষেপে, শিরদাঁড়া ঋজু থরো থরো
ফ্ল্যাগ বয়ে নিয়ে যাও পল্টনের মাঠে, কখনো-বা
এভেন্যুর মোড়ে। কলেজের প্রাঙ্গণ, বস্তি, পথঘাট অলংকৃত তোমারই ছায়ায়।
(শামসুর ২০১২ : ২৮০-২৮১/১)

জাতীয়তাবাদী চেতনা ষাটের দশকের শেষের দিকে গণমানসে কী পরিমাণ জাগরণ তুলেছিল তা এই নারীর রূপকল্প দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়। এই রূপকল্প জাতীয়তাবাদী জাগরণের পরিধির ব্যাপ্তির স্মারকও বটে। শামসুর রাহমানের wbR evmf‡g কাব্যের 'মা' শিরোনামের কবিতাটি এদিক থেকে আরো তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। একবিতায় তিনি এঁকেছেন এক মায়ের জীবন-যাপনের চিত্র। এই জীবন-যাপনের বয়ানের মধ্যে যে-মাকে আবিষ্কার করা হয়, তিনি গৃহস্থিতা। স্বামী, সংসার আর সন্তানই তার পৃথিবী। বাড়ির গণ্ডি ছাড়া তার পায়ের পাতার ছাপ কোথাও পড়েনি বললেই চলে। প্রকৃতপক্ষে এই মায়ের চিত্র দিয়ে কবি গ্রামীণ সকল মায়ের ছবি আঁকতে চেয়েছেন। কিন্তু এই গ্রামীণ মা-ই রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলেন আন্দোলনের তীব্রতায়। বিশেষত, মায়ের সন্তান যখন আক্রান্ত হয়েছে তখন মা-ও সেই আন্দোলনের সক্রিয় অংশ হয়ে উঠেছেন। গ্রামের নিরীহ মা কেমন রূপান্তরিত হয়ে গেলেন দেশের সংকটে, প্রতিরোধের প্রয়োজনে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে– তা কবিতার একটি অংশে লক্ষ করা যাক–

এ বাড়ির গণ্ডি ছাড়া কোথাও পড়ে না তাঁর পায়ের পাতার
কালো ছাপ, সারাক্ষণ থাকেন আড়ালে আর খসে না মাথার
কাপড় ভুলেও কারো সম্মুখে কখনো। বেঁচে নেই বাপজান
আম্মাও ওপারে আজ, তবু মাঝে-মাঝে প্রাণ করে আনচান।

ক্রুদ্ধ দেবতার মতো তোলে মাথা সারা দেশ
কত যে খবর আসে, কত আত্মদান
রাঙায় দেশের মাটি; সন্তানের রক্তমাখা জামার আহ্বান
টানে গ্রাম্য জননীকে। অনেক পেছনে রইল প'ড়ে

Dhaka University Institutional Repository

লাউয়ের সবুজ মাচা, নদী, মাঠ,

কলাইয়ের ক্ষেত আর পুকুরের ঘাট।

পড়ছে পায়ের ছাপ আজ তাঁর জনপথে, আনাচে-কানাচে, সবখানে

মেলালেন পুত্রহীন হৃদয়ের দীপ্ত কান্না স্লোগানে, স্লোগানে। (শামসুর ২০১২ : ৩১৮/১)

কবি তাঁর কবিতার দৃশ্য আর বাস্তবতা তৈরি করেন চারপাশ থেকে। চারপাশে মানুষ যখন ঘোরতর রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যায়, কবি তখন আবশ্যিকভাবে আঁকেন সেই রূপান্তরের বাস্তবতা। আর এই রূপান্তর যদি হয় অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে স্বজাতির রূপান্তর, তাহলে তা আরো বড় প্রভাব ফেলে কবিচৈতন্যে। কবি লক্ষ করেছেন–

যারা গান গাইতো বাঁশিতে আঙুল রেখে,

যারা কবিতা লিখতো মধ্যরাতে, সেইসব চাষী,

সেইসব কারখানার শ্রমিক, যারা ইস্পাতের

আসল নির্মাতা, যারা তৈরি করতো স্লো-বিস্কিট,

আমার জন্য শার্ট, নীলিমার জন্য শাড়ি, তারা এখন

অন্য মানুষ, তাদের বাড়ি এখন প্রতিরোধের দুর্গ। (নির্মলেন্দু ২০১১ : ৫৬/১)

শামসুর রাহমান তাঁর e›'x wkwei †_‡K কাব্যের 'উদ্ধার' কবিতায় নিজের আর চারপাশের সাধারণ মানুষদের রূপান্তরের সত্য উদ্ঘাটন করেছেন। কবিতায় তিনি বলেছেন, তিনি যুদ্ধ পছন্দ করেন না বলেই জানতেন। নিজে গান্ধীবাদী না হলেও হিংসাকে ডরাতেন চিরকাল। কবি খুব স্পষ্ট করে বলেছেন, 'আজন্ম যুদ্ধকে করি ঘৃণা'। কারণ 'মারী ও মন্বন্তর লোকশ্রুত ঘোড়সওয়ারের/মতোই যুদ্ধের অনুগামী। আবালবৃদ্ধবনিতা/মৃত্যুর কন্দরে পড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে/অবিরাম। মূল্যবোধ নামক বৃক্ষের/প্রাচীন শিকড় যায় ছিঁড়ে/ধ্বংস/চতুর্দিকে বাজায় দুন্দভি।' (শামসুর ২০১২ : ৩৩৬/১) কিন্তু জাতির বিপর্যয়ে ন্যায্যতা আর স্বাধিকারের প্রশ্নে শুধু কবি নন, সবাই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। যুদ্ধকে ঘৃণা করা মানুষরা যুদ্ধকেই মুক্তির হাতিয়ার করেছে। এই রূপান্তরের দ্বিজমন্ত্র জাতীয়তাবাদী চেতনার জাগরণ। কবিতাংশ দেখা যাক–

বিষম দখলিকৃত এ ছিন্ন শহরে

পুত্রহীন বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞেস করুন,

সৈনিক ধর্ষিতা তরুণীকে

জিজ্ঞেস করুন,

বাঙালি শবের স্তূপ দেখে দেখে যিনি

বিড়বিড় করছেন সারাক্ষণ, কখনো হাসিতে

কখনো কান্নায় পড়ছেন ভেঙে– তাকে

জিজ্ঞেস করুন,

দগ্ধ, স্তব্ধ পাড়ার নিঃসঙ্গ যে ছেলেটা

বুলেটের ঝড়ে

Dhaka University Institutional Repository

জননীকে হারিয়ে সম্প্রতি খাপছাড়া

ঘোরে ইতস্তত, তাকে জিজ্ঞেস করুন,

হায়, শান্তিপ্রিয় ভদ্রজন,

এখন বলবে তারা সমস্বরে, যুদ্ধই উদ্ধার। (শামসুর ২০১২ : ৩৩৬/১)

জাতীয়তাবাদী চেতনা তো এক অর্থে উন্মাদনাই বটে। এই উন্মাদনা মুক্তির উন্মাদনা, অধিকার লাভের উন্মাদনা, নিজ জাতির সত্তা অক্ষুণ্ন রাখার উন্মাদনা। ষাটের উপান্তে এই উন্মাদনা গ্রাস করেছিল পূর্ব বাংলার সিংহভাগ মানুষকে। তাই তারা আর আগের মতো থাকেনি। পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। কবিদের কবিতায় ব্যক্তির এই রূপান্তর যখন চিত্রিত হয়েছে তখন দেখা যায় যে, খুব সামান্য আকাঙ্ক্ষায় কখনো কখনো ব্যক্তির পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে; ব্যক্তি সমষ্টির সাথে মিলিত হয়েছে। কিন্তু একটু গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, ব্যক্তির পরিবর্তিত হওয়ার কারণটি ঠিক সাধারণ বা সামান্য নয়। তার ব্যঞ্জনা অত্যন্ত গভীর। শামসুর রাহমানের e›`x wkwei †_‡K কাব্যের ‘গ্রামীণ’ কবিতাটিতে কবি গ্রামের এক সাধারণ মানুষের পরিবর্তনের চিত্র এঁকেছেন ১৯৭১ সালে। সেখানে দেখা যাচ্ছে এক ব্যক্তি বলছে, ‘আমি তো ছিলাম দূরে অতিশয় শান্ত গ্রামে তাল-/তমালের ভিড়ে, মাঠে নিসর্গের উদার ডেরায়।/কখনো দেখেছি আর্ত চোখে, হায়, ঘরের বেড়ায়/বেজায় ধরেছে ঘুণ, খুঁটি নড়বড়ে।... হে রাখাল হে দোতারা তোমাদের কাছ থেকে দূরে/কখনো পারিনি যেতে। আলুথালু পরাণ বধূরে/ফেলে রেখে গৃহকোণে বিরান কোথাও দরবেশী/আস্তানায় কম্বলে ঢাকিনি দেহ কিংবা পরদেশী/হইনি কড়ির লোভে।’ (শামসুর ২০১২ : ৩৬৩/১) এই সুখী গৃহকোণী গোবেচারা মানুষটি নিজেই একটু পরেই নিজের কাছে প্রশ্ন তুলেছে নিজের বিবর্তন নিয়ে। সে প্রশ্ন তুলেছে, ‘কেন তবে সহস্র বাসুকি/তুলল ফণা আমার তরুণ রক্তে? কেন ঠোকাঠুকি/অস্ত্রেশস্ত্রেও মগজের কোষে কোষে? আমিও হঠাৎ/কেন গণ্ডগ্রামের অস্ত্রাগারে ক্ষিপ্র বাড়ালাম হাত?’ (শামসুর ২০১২ : ৩৬৩/১) এর কারণ অবশ্য গণ্ডগ্রামের ওই তরুণ নিজেই বলেছে। হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়ার কারণ হিসেবে তরুণ বলেছে, ‘যাকে ভালোবাসি সে যেন পুকুরে ঘাটে ঘড়া রোজ/নিঃশঙ্ক ভাসাতে পারে, যেন এই দুরন্ত ফিরোজ,/আমার সোদর, যেতে পারে হাটে হাওয়ায় হাওয়ায়,/বাজান টানতে পারে হুঁকো নিশ্চিন্তে দাওয়ায়,...।’ (শামসুর ২০১২ : ৩৬৪/১) এর নামই তো স্বাধীনতা; জাতীয়তাবাদী চেতনার চূড়ান্ত স্বপ্ন। এই স্বপ্ন পূরণের বাসনায়, স্বাধীনতার বাসনায় বিনীত ব্যক্তি দুর্বিনীত হয়ে উঠেছে।

কবিতায় মিছিল আর গণজাগরণের অনুরণন

ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের কবিতা সমকালের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামের চিত্রকে বাণীরূপ দিয়ে জাতীয়তাবাদী চেতনার অসামান্য শিল্পরূপ হয়ে উঠেছে। কবিতায় মিছিল, মিছিলের মধ্যকার গণ অনুভূতি, মিছিলের শক্তি, মিছিলের মানুষের মুখের স্বপ্ন-সম্ভাবনা আর স্বদেশের ছবি উদ্ভাসিত হয়েছে। ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানের মিছিল দেখে হেলাল হাফিজ যেমন আবিষ্কার করেছেন মিছিলের মানুষের মনস্তত্ত্ব, ‘মিছিলের সব হাত/কণ্ঠ/পা এক নয়।/সেখানে সংসারী থাকে, সংসার বিরাগী থাকে,/কেউ আসে রাজপথে সাজাতে সংসার/কেউ আসে জ্বালিয়ে বা জ্বালাতে সংসার।’ (হেলাল ২০১৭ : ৯) এমনকি কবি তাঁর ভালোবাসার প্রকাশ হিসেবে মিছিলকে দেখেছেন, ‘তোমার আমার ভালোবাসাবাসি চুক্তি/স্বাক্ষরে সারা শহর

Dhaka University Institutional Repository

উঠলো ফুঁসে।' (নির্মলেন্দু ২০১১ : ৩০/১) অর্থাৎ মিছিল আর গণজাগরণ স্বাভাবিকভাবেই কবির মনোজগতে হানা দিয়ে তার জায়গা ও গুরুত্ব আদায় করে নিয়েছে। জাতীয়তাবাদী জাগরণের এই-ই স্বভাব যে, সে অজান্তেই জনগোষ্ঠীর চৈতন্য আর সময়কে দখল দিয়ে ফেলে। আহসান হাবীবের Avkvq emZ কাব্যের 'মিছিলে অনেক মুখ' কবিতায় যেমনটি লক্ষ করা যায়–

মিছিলের মুখ দেখো

দেখো তার সারা মুখে দেখো

দেশের আত্মার আভা;

দেখো লক্ষ জনতার প্রাণ

অমর দীপ্তিতে জ্বলে মিছিলের সারা মুখে দেখো।

মিছিলে অনেক মুখ

আর সেই মুখের আভায়

পথের ধুলোয় দেখো আলো জ্বলে,

জানালার মুখ উদ্ভাসিত এবং চঞ্চল। (আহসান হাবীব ১৯৯৫ : ১৭০/১)

কবিতাংশে জাতীয়তাবাদী চেতনা কিভাবে মিছিলে ঝলসিত সেই চিত্র আঁকার পাশাপাশি কবি সেই চেতনা কিভাবে চারপাশে সঞ্চরণশীল হয়েছে তার এক নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন। আসলে ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয়তাবাদী চেতনার রূপটি তো এমনই ছিল যে, একই চেতনার, একই আকাঙ্ক্ষার পক্ষে সারা পূর্ব বাংলা দ্রুত এক হয়েছে। এর পক্ষে মিছিল হয়েছে। এক মিছিল থেকে জন্ম নিয়েছে অসংখ্য মিছিল, মিছিল ক্রমে ঢুকে পড়েছে বাঙালির ঘরে ঘরে। আহসান হাবীবের ভাষায়–

মা বলে আমার দোয়া।

বোন বলে আছি অপেক্ষায়

ফুলের সম্ভার নিয়ে,

প্রিয়ার দু'হাত

প্রার্থনায় উত্তোলিত

পথের জনতা

ছড়ায় অসংখ্য ফুল উচ্চকণ্ঠে বলে জয় হোক। (আহসান হাবীব ১৯৯৫ : ১৭০/১)

ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের পূর্ব বাংলার অধিকাংশ সময় কেটেছে মিছিলে-মিটিংয়ে-শপথে-সংগ্রামে। যত দিন ঘনিয়েছে তত মিছিলে মিছিলে মুখরিত হয়েছে পূর্ব বাংলার আকাশ-বাতাস। জাতীয়তাবাদী চেতনার আওতা দিন দিন এত বেশি বাড়ছিল যে, মিছিলে ডাকার মতো লোক আর যেন অবশিষ্ট ছিল না। জাতীয়তাবাদ কিভাবে তার আওতা বাড়াচ্ছিল আর মিছিলে প্রকম্পিত হচ্ছিল পূর্ব বাংলা তা রূপ পেয়েছে নিম্নোক্ত কবিতায়–

কড়ির ওপরে কড়ি সাজাবার শখ ছিল যার

এখন মিছিলে।

Dhaka University Institutional Repository

কালো অন্ধকার গর্তে ছিলো যার রুপোর কারখানা
এখন মিছিলে।
শেষ রজনীর ক্লান্ত নূপুরের বুকে যারা মুখ থুবড়ে পড়েছিলো
এখন মিছিলে।
এখন মিছিলে দেখো মুখের সমাবেশ
সব মুখে একই আভা।
চিত্রিত দেশের
চূর্ণ আভা জ্বলে দেখো
মিছিলের সব মুখে মুখে।
সব মুখে দেশের আত্মার
আরশি যেন। সব মুখ দেশের আরশিতে আঁকা যেন।
সারা দেশ সবাই মিছিলে। (আহসান হাবীব ১৯৯৫ : ১৭৮-১৭৯/১)

উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের সময়কার জাতীয়তাবাদী চেতনার সর্বাত্মক রূপ লক্ষ করা যায় সানাউল হক (১৯২৪-১৯৯৩)-এর GK\U B"Qv mn¯ c¨‡j (১৯৭৩) কাব্যের 'গণ-অভ্যুত্থান, ঊনসত্তর' কবিতার নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে–

অতঃপর প্রাণ এলো, প্রাণের উচ্চার আহা!
মিছিলের মুখ হলো নৌকোপাল ধলেশ্বরী

পাল ও পতাকা ফেস্টুন স্লোগান
কেউ এপাড়ার বেশি ওপাড়ার
গিজগিজ মালিবাগে, তেজগাঁয়
বাঘাচোখ জ্বলজ্বল মশালের

নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঢাকার শহর যেন এক
বু'টিদার জামদানি শাড়ি, চিতার শরীর।

কিছু নিজ, জীবনের থেকে কিছু ধার করা
সংগ্রামী সময়ের প্রক্ষিপ্ত নায়ক ওরা–

বখাটে বাঙ্গাল ভীরু উজবুক
গলিঘুঁজি নাগরিক, ছাত্র ও শ্রমিক
রেস্তোঁরার বয়, বেচারা হকার–

এখন ঢাকায় বুঝি ঢাকাই ঘুমের শেষ
ঢাকার শহর যেন এক মিছিলের মুখ। (সানাউল ১৯৯৮ : ১৯৭/১)

ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের কবিতাকে রাজপথের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম এমন তীব্রতায় নাড়া দিয়েছিল যে, ষাটের দশকে শুধু নয়, যেসব কবি বরাবরই তুলনামূলকভাবে বেশি রাজনীতি বিমুখ, যাঁদের কবিতা মূলত প্রেম, প্রকৃতি, ব্যক্তিগত রোমান্টিক আবেগ অনুভূতিতে ঠাঁসা, তাঁদের কবিতাও ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে এসে মিছিল আর যূথবদ্ধতাকে কবিতায় তুলে এনেছেন; কখনো চকিতে কখনো অবিরলভাবে। যেমন, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। তাঁর মানসের মূল প্রবণতা রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন। কিন্তু ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে cZb cZ¨vkv (১৯৭৩) কাব্যের বিশেষত ১৯৬৯-৭০ সালে রচিত 'সুখ অসুখের সংশয়' অংশে মিছিল এবং যূথবদ্ধতাকে রূপ দিয়েছেন অবলীলায়। যদিও উচ্চস্বরের কবিতা রচনা তাঁর মূল কবি-স্বভাবের অঙ্গ নয়। যেমন–

> কবিদের কথা শোনো
>
> সভ্যতার অলীক মুখোশ ছিঁড়ে
>
> ময়দানে মিছিলে চলে এসো,
>
> পরস্পরের দেহে হাত রাখো;
>
> দেখো : ধুক পুক করে কিনা প্রাণ। (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৯৮ : ১৩৭)

একই চেতনার কিন্তু আরো স্পষ্ট রাজনৈতিক ভাষ্য, গণজাগরণের প্রত্যাশা ও প্রতীতি লক্ষ করা যায় হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩)-এর hLb D‘¨Z m½xb (১৯৭২) কাব্যের 'অস্ত্র আমার' কবিতায়–

> মোহাচ্ছন্ন চোখে তোমার পড়ে না কিছুই।
> দ্যাখো না লক্ষ কোটি তীব্র চোখ ভিন্ন আলো ফেলে,
> কণ্ঠ তাদের আকাশ বাতাস চেরে?
> অস্ত্র আমার তাদের চোখ,
> অস্ত্র আমার কোটি কণ্ঠের ভাষা। (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ১৪৫/১)

ষাটের দশকে রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম যাঁর কবিতাকে সমূল কাঁপিয়ে দিয়েছে তিনি নির্মলেন্দু গুণ। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ †cgvsïi i³ PvB-কে বলা যায় ষাটের রাজনীতির ছায়ায় বেড়ে ওঠা পরিপূর্ণ কাব্য। এই কাব্যের প্রেমে-অপ্রেমে, বিষণ্নতা-প্রসন্নতায়, দ্রোহে-প্রত্যয়ে সর্বত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামের ঝাঁজ। এই কাব্যের 'হুলিয়া', 'সবুজ কাক', 'জনাকীর্ণ মাঠে জিন্দাবাদ', 'চুক্তি', 'ভালোবাসার টাকা', 'জলের সংসার', 'যানবাহন নেই', 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই', 'জালনোট', 'উন্নত হাত', 'অসমাপ্ত কবিতা', 'ভালোবাসার পুরনো বর্গায়', 'নির্জন হীরা জ্বাললে', 'স্বদেশের মুখ শেফালি পাতায়' 'কলম', 'হিমাংশুর স্ত্রীকে', 'লজ্জা', 'যুদ্ধ', 'পুনরুদ্ধার' কবিতাগুলোর প্রত্যেকটি কোনো না কোনোভাবে ষাটের রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত। এসব কবিতায় পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী চেতনা, এর চাপ, তাপ রূপময় হয়ে উঠেছে। প্রথম কাব্যে জাতির সংকট-সম্ভাবনা, অহংকার, প্রতিরোধী চেতনা, আত্মত্যাগ এত প্রবলভাবে চিত্রিত হয়েছে যে, নির্মলেন্দু গুণকে খুব সহজেই ষাটের দশকের জাতীয়তাবাদী চেতনার গর্ভজাত কবিসত্তা বললে অত্যুক্তি হয় না। একারণে সমালোচক তাঁর †cgvsïi i³ PvB কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো সম্পর্কে বলেছেন, 'উত্তাল ঊনসত্তর এবং সে-সময়ের আন্দোলন সংগ্রাম উঠে এসেছে তাঁর কবিতাগুলোতে।' (সৌমিত্র ২০১১ : ৫৬)

Dhaka University Institutional Repository

কবিতায় ইতিহাস-ঐতিহ্যের স্পর্ধিত প্রকাশ

ষাটের প্রথমার্ধের কবিতায় ইতিহাস-ঐতিহ্যের রূপায়ণ আছে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে এসে এই ইতিহাস-ঐতিহ্যের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কবিরা আরো সচেতন এবং স্পষ্ট হয়ে উঠেছেন। এপর্বে কবিরা খোলাসা করে প্রকাশ করেছেন পূর্ব বাংলার মানুষের শেকড়ের কথা, মূলের কথা। যেমন–

দর্পের স্তম্ভিত অতীত সম্ভার পিঠে ঝুলিয়ে
স্বদেশের পরিব্রাজক আমি, দক্ষিণ থেকে উত্তরে
সমুদ্র থেকে পাহাড়ে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে
সজল থেকে উষরে– আমার স্বদেশের
একাকারে আমার যাত্রার শেষ নেই। (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ১২৩/১)

ষাটের প্রথমার্ধের কবিতায় কবিরা রবীন্দ্রনাথকেই মূলত তাঁদের প্রেরণা আর সাহিত্যিক ঐতিহ্য হিসেবে রূপায়ণ করেছেন। কিন্তু ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে এসে এই প্রেরণা আর ঐতিহ্যের বোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আরো অনেকে। যেমন–

পলিরঙ হাত দিয়ে অঙ্গার কালো শ্লেটের ওপর
যখনই প্রথম লিখলে আদ্যাক্ষর 'অ',
লিখলে একটি সভ্যতার নাম।
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস আলাওলের হাতে তুলে দিলে কুন্দকুসুম,
প্রীতি উপহার বিনিময়ে পেলে ছাড়পত্র হাতে
নজরুল-রবীন্দ্রের মহতী সভার। (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ১৩৯/১)

ষাটের দশকে 'বিদ্যাপতি' 'চণ্ডীদাস' 'রবীন্দ্রনাথ'-এর স্মরণ এবং শরণ কোনোটিই সহজ-স্বাভাবিক ছিল না। কারণ পাকিস্তান রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের তা সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। অথচ জাতীয়তাবাদী চেতনার ভিন্নতার কারণে পূর্ব বাংলার কবিরা হামেশাই সেই কাজটিই করেছেন সচেতনভাবে।[১০] ফলে এসব সাহিত্যিক-ঐতিহ্যের উল্লেখ শুধু উল্লেখ নয়। এর সঙ্গে জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্যের রয়েছে এক গভীর রাজনৈতিক যোগ।

জাতীয়তাবাদী চেতনার অন্যতম বিষয় হচ্ছে, এই চেতনা অতীত ইতিহাসকে স্মরণ করে। জনগোষ্ঠীর অতীত অভিন্ন দুঃখভোগের ইতিহাস স্মরণ করে জাতীয়তাবাদী চেতনা শাণিত এবং আকরিত হয়ে ওঠে। দুঃখের দুঃসহ দিনে তাই কবি স্মরণ করেছেন অতীতের দুঃখময় ইতিহাস। আর এর মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন বর্তমানের দৃঢ় প্রত্যয়–

ক্রুর (sic) পদাতিক যত যুগে যুগে
উদ্ধত পায়ের দাগ রেখে গেছে কোমল পলির ত্বকে,
বিভিন্ন মুখের কোটি অশ্বারোহী এসে
খুরে খুরে ক্ষতময় করে গেছে সহনীয়া মাটি,

Dhaka University Institutional Repository

লালসার লালামাখা ক্রোধে বন্দুক কামান কতো

অসুর গর্জনে চিরেছে আকাশ পরিপাটি,

বিদীর্ণ বুক নীল বর্ণ হয়ে গেছ তুমি, বাংলাভূমি

নত হয়ে গেছে মুখ ক্ষোভে ও লজ্জায়।

এবার মোছাব সেই মুখ শোকাক্রান্ত, তোমার আপন পতাকায়। (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ১৪৬/১)

অথবা

ইবনে বতুতার চোখে কি স্বপ্ন উঠেছিল ফুটে

নীল নদ মিছে হল তার কাছে

বাংলার নদী জলে;

বার্নিয়ের ভুলে গেল স্বদেশের যশোগাথা,

পলিমাটি-পদাবলী তার দৃষ্টি দিল ভরে। (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ১২৩/১)

অথবা

কিংখাবে-মোড়া প্রাচীন পুঁথি সরবে মুখর

বাংলার গরিমাতে, এখনো গানে ভেসে আসে

বাউলের সুর। যোদ্ধাদের বর্ম আছে, বল্লম, বর্শা,

খাপ থেকে তলোয়ার টেনে নিলে এখনো আওয়াজ ওঠে,

স্মৃতি হানে

মোহময় সুদূরের, ক্ষুরধার হয়তো-বা নয় তবুও

বিদ্যুৎ ঝলক কিছু আছে লেগে...। (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ১২৩/১)

এত উচ্চকণ্ঠ আর স্পষ্ট কবিতা ব্যতিক্রম ছাড়া ষাটের দশকের প্রথমার্ধে দেখা-ই যায় না। এর কারণ বোধ করি ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের নানা আন্দোলন-সংগ্রাম। বাঙালির একত্র হওয়ার আভাসই কবির চৈতন্যে আরো দ্বিগুণ বেগে আবেগের আর আশাবাদের সঞ্চার করেছে। একারণে কবি খুব উচ্চকণ্ঠে আর গর্বের সঙ্গে বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্যকে স্মরণ ও প্রকাশ করেছেন।

ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম যত মারমুখী হয়েছে, পাকিস্তানের অখণ্ডতার ব্যাপারটি পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে যত শিথিল হয়েছে, তত পূর্ব বাংলা আর এর জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতি-গৌরব, অহং স্পষ্টতা লাভ করেছে। বাঙালিত্বের বিষয়টি, বাঙালির গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্যের বিষয়টি ঘোষণার মতো হয়ে উঠেছে–

আমিও বাংলার লোক, স্বভাবত বাংলার মতই

সমতল, সংগীতের শস্যভারে নত, দূরগামী

পদ্মার মতই ধীর, পলিমাটি আত্মায় সঞ্চিত।

কিন্তু তাই বলে আমি নই যেন আয়ুধ বঞ্চিত।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ষায় কোমল কাদা, পোড়ামাটি চৈত্রে সেই আমি।

লালনের দেশে জন্ম নিয়েছিল সিংহল বিজয়ী

এবং গোপাল বাবু, পরিহাসে নির্মল বিশ্বাসী।

মনে আছে? এত দুঃখ বাংলাদেশে, তবু আমি হাসি।[১১] (সৈয়দ শামসুল ২০১২ : ১৪৭/১)

কবিতায় এমন শাসানি আর নির্ভার নিরলংকার জাতীয়তাবাদী অহংকার ষাটের শেষেই শুধু সম্ভব ছিল এবং হয়েছে।

নিজের ইতিহাস আর জন্ম নিয়ে অহংকার করা, আর অন্যের থেকে নিজেকে আলাদা ভাবা, জাতীয়তাবাদী চেতনার কেন্দ্রীয় স্বভাব। এই স্বভাবই একটি জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনের সময় অর্থাৎ স্বাধীনতা-স্বাধিকারের আন্দোলন-সংগ্রামের সময় আধিপত্যবাদীদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয় বারবার। যেমন, আল মাহমুদের কবিতায় ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে উচ্চারিত হয়েছে অহংকারী, আঙুল-উঁচানো এই কথা–

যে বংশের ধারা বেয়ে শ্যাম শোভা ধরেছো, মানিনী

একদা তারাই জেনো গড়েছিলো পুণ্ড্রের নগর

মাটির আহার হয়ে গেছে সব, অথচ জানিনি

কাজল জাতির রক্ত পান করে বটের শিকড়।

আমারও নিবাস যেনো লোহিতাভ মৃত্তিকার দেশে

পূর্ব পুরুষেরা ছিলো পাট্টিকেরা পুরীর গৌরব...। (আল মাহমুদ ২০০০ : ১০৩)

ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে কবিতায় এই উচ্চারণকে কবিতা বলার চেয়ে শাসানি বা ঘোষণা বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই ঘোষণার উৎস জাতীয়তাবাদী চেতনার মর্মমূলে নিহিত তাতে সন্দেহ কী!

আগের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ষাটের প্রথমার্ধে কিভাবে নববর্ষের মতো বাঙালি সংস্কৃতির উপাদানগুলো ঐতিহ্য হিসেবে নতুন মাত্রায় জেগে উঠতে শুরু করে। ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে এই প্রবণতা আরো বেড়েছে। এইসব উৎসব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে দিনদিন। নববর্ষের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির উৎসব-অনুষ্ঠানাদিতে যুক্ত হয়েছে নবান্ন। নবান্ন আগেও পালিত হতো। কিন্তু ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে নবান্নের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাঙালির সাংস্কৃতিক অহংকারের মতো জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চেতনা। একারণে কবি বলেছেন, 'এখন ফসল নেই বাংলাদেশে অথচ সবাই/কী ক'রে মেতেছো বলো,/প্রাচীন বিশাল সেই নবান্নের মাতাল উৎসবে।' (ফজল ২০১২ : ১৪৮/১) বলাই বাহুল্য এই উৎসবে সংস্কৃতির চেয়ে রাজনীতিই মুখ্য।

কবিতায় গ্রাম বাংলার রাজনৈতিক রূপায়ণ

পূর্বের পরিচ্ছেদে আমরা লক্ষ করেছি, ষাটের দশকে কবিরা জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রকাশের অংশ হিসেবে নিজেদের জ্ঞাতে অথবা অজ্ঞাতে গ্রাম-বাংলা ও এর প্রকৃতিকে মুখ্য করে প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, পাকিস্তানি শোষণ-পীড়নের বিপরীতে কবিরা স্বদেশের মাটি আর মানুষের কাছে ফিরে গিয়েছেন গভীর মমতায়। কিন্তু ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে এসে কবিদের কাছে গ্রাম-বাংলা নতুন তাৎপর্যে ধরা দিয়েছে। শুধু কবিরা নন, প্রবন্ধসাহিত্যেও প্রাবন্ধিকরা গ্রামের তাৎপর্যকে বারবার তুলে ধরেছেন। গ্রামকে

Dhaka University Institutional Repository

ওপরে তুলে ধরতে ১৯৬৯ সালে প্রাবন্ধিক লিখেছেন, 'গ্রামীণ সমাজকাঠামো পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতির নক্‌শার যে প্রতিবেশ তৈরী করেছে, সেই প্রতিবেশ আশ্রয় করেই যন্ত্রনির্ভর সমাজের দিকে বর্তমানে উত্তরণের প্রয়াস চলছে।' (বোরহানউদ্দিন ১৯৯৩ : ২) একারণে শহুরে মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক আন্দোলন-সংগ্রাম, যা এতকাল ধরে চলে এসেছিল, তা একটা সর্বব্যাপ্ত রূপ লাভ করে, যখন তার সঙ্গে গ্রাম আর গ্রামের মানুষ যুক্ত হয়। এই বিষয়টি লক্ষ করা যায়, মূলত ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন এবং উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের সময় থেকে। এর পরের যাবতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামের সঙ্গে কিভাবে গ্রাম একীভূত হয়ে গিয়েছে তার বিবরণ আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের আলোচনার মধ্যে দেখেছি। কবিতায়ও গ্রাম আর গ্রামীণ জীবন ষাটের প্রথমার্ধের মতো আর নিরীহ স্বদেশানুরাগ বা গ্রামীণ প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ প্রকাশের মতো গোপন জাতীয়তাবাদী চেতনার আশ্রয় হিসেবে প্রকাশিত হয়নি। ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে গ্রামই বরং কবিদের কাছে বড় আশ্রয় আর প্রেরণা হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ গ্রাম আর নিষ্ক্রিয় রইল না। জাতীয়তাবাদী সক্রিয়তায় গ্রামই মুখ্য রাজনৈতিক কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় গ্রাম সক্রিয়তা পেয়েছে কবিদের কবিতায়। গ্রাম হয়ে উঠেছে আশা ভরসার অন্যতম আশ্রয়স্থল। এই বিষয়টি মুক্তিযুদ্ধের সময় আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই যে বিজয়কে নিশ্চিত করেছে এ ইতিহাস এখন প্রমাণিত। একারণে আমরা দেখতে পাই ষাটের প্রথমার্ধের গ্রামীণ জীবনকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত জাতীয়তাবাদী চেতনা আর দ্বিতীয়ার্ধের গ্রামীণ জীবনকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত জাতীয়তাবাদী চেতনা মধ্যে একটি মাত্রাগত ভিন্নতা রয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধের গ্রাম অধিকতর রাজনৈতিক। কবিতায় গ্রামের রাজনৈতিক রূপায়ণের উদাহরণ দেখা যেতে পারে–

> শহরের আদিঅন্ত সাজানো চত্বরে আজকাল
> কোটি কণ্ঠ একটি আওয়াজ হয়ে যায়,
> অযুত মানুষ একটি মানুষের মতো দ'লে ওঠে।
> স্বদেশের সযত্ন বহির্বাটি ক'রে তছনছ
> এপাড় ওপাড় করে বুঝি এই ঢল। মেঘনার মতোই
> খলখল শব্দ তোলে, মুহূর্তে বদলায় রঙ, ভীষণ অনিশ্চিত
> এই কি পরম বাংলা বেড়ি ভেঙে আগলায় মহানদ,
> তুড়িতে ফোটায় ফুল, উচ্চকিত পতাকায় নতুন জন্মের সংবাদ!
>
> এই কি পরম বাংলা, যাকে দেখি নাই কোনোদিন আগে
> শহরের নিপাট নিভাজ গোছানো অন্তর্বাসে?
> স্বয়ং মেঘনার ঢলে রুদ্ধদ্বার শহরও কি মিশে যাবে অবশেষে বাংলার
> অবলীলা খাপে? (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ১৪১-১৪২/১)

ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামকে আটষট্টি হাজার গ্রামের শিরা উপশিরার মধ্যে সঞ্চারিত করা ছিল অত্যন্ত জরুরি। একারণে শহুরে জীবনের পাশাপাশি,

Dhaka University Institutional Repository

কখনো বা শহুরে জীবনের বিপরীতে গ্রাম এবং গ্রামীণ জীবনের প্রতি আগ্রহের কথা কবিরা তাদের কবিতায় বাঙ্ময় করে তুলেছেন—

ফিরিয়ে মুখ যত দূরে চাও, সেইতো রয়েছে আজো
আবহমান পল্লিসর্বস্ব গোশালায়
গোধূলির রাণী, আম জাম কাঁঠলের স্নেহার্দ্রতায়
সরস শ্যামাঙ্গী। আমি যেন ভিন্ন একজন,
খাড়া কলারের বড়াইয়ে মদির, কড়া ফুটপাতচারী।
যেন মায়াবলে পাথরে ঘেরাও ক'রে
আদিঅন্ত পলিমাটির কিছু অংশ মোহকরী
কংক্রিটে কংক্রিটে শক্ত ক'রে ফেলেছি হঠাৎ।
পারি না হাঁটতে আর খট্‌খট্‌ আওয়াজ না তুলে,
গাছের ছায়ারা আদিম মনে ক'রে সরিয়েছি দু'হাতে ঠেলে।

তবুও কি ভুলে গেছি চাঁদ-আঁকা রাতকে চন্দ্রাবলি বলা,
ভুলে গেছি ভালোবাসা ফুটফুটে আকাশ-বাসর?
আজো যদি চোখের তারারা নাচে
সহজাত ফূর্তির তাড়ায়
সাঁঝ ভুরভুর কাঁঠালি চাঁপার সহজাত মাতাল ঘ্রাণে,
এমনকি গোঁয়ার গ্রামীণতা ঢুকে পড়ে নগরে আমার?
নিশিডাকে ছোটে কি সম্মোহিত
শহুরে মরাল
নাগরিক পাথুরে অলিন্দ ছেড়ে অজান্তে পায়ে পায়ে? (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ১৩৯/১)

কবি উদ্ধৃতাংশে গ্রামকে প্রধান্য দিতে গিয়ে, শহরের পরিচয়কে গ্রাম দিয়ে চিহ্নিত করেছেন। কবির ভাষায় 'যেন মায়াবলে পাথরে ঘেরাও ক'রে/আদিঅন্ত পলিমাটির কিছু অংশ মোহকরী/কংক্রিটে কংক্রিটে শক্ত ক'রে ফেলেছি হঠাৎ।' শহরকে কবি গ্রামেরই বিকৃতি হিসেবে দেখার বা গ্রামেরই এক প্রকার অংশ করে তোলার পক্ষপাতী। গ্রামের এই প্রাধান্য দিয়ে গ্রামকে শহরের সঙ্গে যুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল তখন। কারণ গ্রাম জাগলে বাঙালির জাগরণ পূর্ণতা পাবে, নচেৎ নয়— এই বোধ রাজনীতি-সচেতন কবি মাত্রই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। হাসান হাফিজুর রহমানের এই গ্রাম-অন্বেষা সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন— নাগরিক জীবনে বাঁধা পড়বার ফলে তিনি স্বদেশকে চিনতে পারেননি বলে প্রথমে অনুভব করেছেন। এরপর তিনি কবিতায় শেকড়ের সন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছেন, আবিষ্কার করেছেন গ্রামকে এবং পৌঁছেছেন অস্তিত্ববোধে। (মাসুদুজ্জামান ১৯৯৩ : ২৮৫, বায়তুল্লাহ্‌ ২০০৯ : ৩১) একইভাবে একই কারণে সৈয়দ শামসুল হককে দেখি বাংলা তথা মা তথা গ্রামের প্রশংসাকীর্তন করতে—

Dhaka University Institutional Repository

তোমার প্রশংসা-গাথা রচনায় আমি আজ আগ্রহী আবার।

একদা শৈশবে কিসের সুগন্ধে ঘুম ভেঙে জেগে উঠে কোলে
খুঁজতাম যুঁইফুল শরীরে তোমার, মাগো, আজ সেই ঘ্রাণ ফিরে আসে,
আমাকে ফেরায় পথে, নিয়ে যায় গ্রাম থেকে গ্রামে,
ফিরে আসি মেঘে রৌদ্রে মেঠো পথ হেঁটে;
শব্দ-ছন্দ-অলংকার ঝুম ঝুম করে চলে পেছনে আমার
যেমন মেলার দিকে দুপুরের রোদ ছিঁড়ে যায় বাজীকর,
তার সঙ্গে পোষাজন্তু লাল জামা পরে! (সৈয়দ শামসুল ২০১২ : ৯৫/১)

এভাবে কবিতায় গ্রামকে রাজনৈতিকভাবে দেখে এবং উপস্থাপন করে ষাটের দশকে কবিরা যেন জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মাঠের কর্মীর দায়িত্ব পালন করেছেন।

কবিতায় গ্রাম বাংলার রূপ

ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ মূলত আন্দোলন-সংগ্রামে মুখর এক সময়। এই আন্দোলন-সংগ্রাম মূলত পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ছিল। নিজেদের জানান দেয়ার বহিঃপ্রকাশই এই আন্দোলন-সংগ্রাম। রাজপথে আন্দোলন-সংগ্রাম যত বেড়েছে, পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে দেশাত্মবোধ ততো জাগ্রত মূর্তি ধারণ করেছে। এরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে পূর্ব বাংলার মানুষ তাদের উৎসে ফেরার ব্যাকুলতা দেখিয়েছেন। পূর্ব বাংলা যেহেতু গ্রামপ্রধান ভূখণ্ড সেহেতু মানুষ তার স্বদেশ বলতে উৎস বলতে সবসময় বুঝিয়েছে গ্রাম-বাংলাকে। তাই ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে পূর্ব বাংলার কবিদের মধ্যে গ্রাম-বাংলা নিয়ে বেশ পরিমাণে কবিতা রচনার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। কবিতায় কবিরা গ্রামকে তাঁদের চৈতন্যের প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যেমন–

গভীর চেতনায় যে ঘণ্টাধ্বনি বাজছে
তাকে আমি কেমন করে ভুলবো।
সবুজ আস্তরণটায় যে প্রশান্তি
নির্জন বটমূলে যে বাউল
গানের দ্বিধায় যে বাঁশি
তার ছায়া
তার ধ্যান
তার গমক
আমার ব্যাকুলতার প্রিয়চর।
বকুল যেমন কুলের নারীকে ব্যাকুল করে
তেমনি আমের বোলের স্বপ্নে সারি সারি পিঁপড়ে
অপেক্ষমান চাঁপা ও করবী ধারাস্থানে। (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৯৮ : ৮৯)

Dhaka University Institutional Repository

এই একই চেতনার উৎস থেকে কবিরা গ্রামের প্রকৃতির প্রতি দেখিয়েছেন তীব্র টান। বাংলার সবুজ প্রকৃতি যেন পাকিস্তানের প্রকৃতির বিপরীতে এক নিরীহ অথচ অব্যর্থ জাতীয়তাবাদী চেতনারই প্রকাশ—

নিরন্তর আমার চৈতন্যে এই গান :
স্বপ্নের মুকুল– মাঠ নদী ফুল
নিসর্গের চেনাচেনা চিরচেনা-কবির বাউল–
প্রিয়স্বর; প্রথম ফাল্গুন দিনে হঠাৎ পলাশ
নতুন পাতার শোভা অশত্থের; ঝিরিঝিরি
শাখায় একাকী ডাকা ব্যাকুল কোকিল
মধ্যাহ্নে এবং চকিত বর্ষণস্নাত
দেওদার শিরে পত্ররেখা : স্ফীত তটিনীর তনু,
মন্দ মন্দ দোলানো দখিনা– বিরল বিশ্রামে
এই গান নিরন্তর চৈতন্যে আমার

শস্যভার নত এই চিরশ্যাম তরুণ হরিণী
ক্ষিপ্রশোভা : মারী বন্যা উপবাস ফুঁড়ে বেড়ে ওঠা
বলিষ্ঠ উন্নত ঋজু বিশাল বিপুল
অপার আনন্দধারা, উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত
উন্মথিত প্রত্যাশার তীক্ষ্ণ স্রোতোমুখ। (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৯৮ : ৮৯)

আল মাহমুদের কবিতায় গ্রামীণ জীবন আর প্রকৃতির একই ধরনের রূপায়ণ লক্ষ করা যায়। তাঁর কবিতায় গ্রামলগ্নতার বিষয়টি এসেছে আরো তাৎপর্যপূর্ণভাবে। আল মাহমুদের পঞ্চাশের দশকের শেষের আর ষাটের দশকের শুরুর কাব্য-কবিতার দিকে যদি লক্ষ করা যায়, তবে দেখা যায়, সেখানে গ্রামীণ জীবন আর প্রকৃতির প্রতি কবির একটা টান থেকেথেকে মাঝে-মধ্যে উঁকি দিয়েছে। কিন্তু এরচেয়ে সেখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে, আধুনিক মানুষের বহুমাত্রিক সংকট। কিন্তু ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে এসে, অর্থাৎ †mvbwj Kwweb (১৯৭৩) থেকে কবি পুরোপুরিভাবে যেন পূর্ব বাংলার মূল প্রাকৃতিক আর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ঢুকে গিয়েছেন। আল মাহমুদের কবিতার ভাব থেকে শুরু করে ভাষা অব্দি প্রবলভাবে গ্রামীণ জীবনের একেবারে মর্মমূলে ঢুকে গিয়েছে। লক্ষণীয় যে, †mvbwj Kwweb কাব্যের কবিতাগুলোর রচনাকাল শুরু হয়েছে ১৯৬৯ সাল থেকে। ১৯৬৯ সাল পূর্ব বাংলার বাঙালির পাকিস্তানের প্রশ্নে দ্বিধামুক্তির শুরুর সাল। এসময় থেকেই পূর্ব বাংলার মানুষ পরিপূর্ণভাবে, দ্বিধাহীনভাবে পূর্ব বাংলার দিকে অর্থাৎ স্বদেশের দিকে নিবিড় আর একক মনোযোগে তাকিয়েছে। ফলে সংগত কারণেই কবির পক্ষেও সহজ হয়েছে পূর্ব বাংলার মর্মমূল গ্রাম আর এর প্রকৃতির মধ্যে ফেরা। আল মাহমুদে আমরা সেই বিষয়টি প্রবলভাবে লক্ষ করি। †mvbwj Kwweb-এর প্রথম কবিতার উচ্চারণ লক্ষ করা যাক–

চতুর্দিকে খনার মন্ত্রের মতো টিপ টিপ শব্দে সারাদিন
জলধারা ঝরে! জমির কিনার ঘেঁষে পলাতক মাছের পেছনে

Dhaka University Institutional Repository

জলডোরা সাপের চলন নিঃশব্দে দেখছি চেয়ে।

বাহুতে আমার

আতঙ্কে লাফিয়ে উঠছে ফড়িং।

বুঝিবা স্বপ্নের ঘোরে বাঁধা জমিনের ছক

বৃষ্টির কুয়াশা লেগে অবিশ্বাস্য জাদুমন্ত্রবলে

অকস্মাৎ পাল্টে গেলো। ত্রিকোণ আকারে যেন

ফাঁক হয়ে রয়েছে মৃন্ময়ী।

আর সে জ্যামিতি থেকে

ক্রমাগত উঠে এসে মাছ পাখি পশু আর মানুষের ঝাঁক

আমার চেতনা জুড়ে খুঁটে খায় পরস্পর বিরোধী আহার। (আল মাহমুদ ২০০০ : ৮৪)

উদ্ধৃতাংশের কবি-চৈতন্য একান্তই পূর্ব বাংলার জল-জঙ্গলে সমর্পিত। 'মানুষের ঝাঁক' আর প্রকৃতির এমন মাখামাখিতে কবিতাটি কেবল গ্রামীণ জীবন আর প্রকৃতির শিল্পভাষ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং তা কবিকে একটি জনগোষ্ঠীর চৈতন্যের ধারকে পরিণত করেছে। একই ধরনের প্রকাশ লক্ষ করা যায় ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে লেখা আরেক কবির এই কবিতায়–

বাঙলার প্রধান শত্রু নিসর্গাবলি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে রেহানা আকন্দ

সবাই নিসর্গ খায় চোখ বুজে

চুলে গুজে রাখে পাতা ফুল বড়োবড়ো গাছ

উদ্যান অরণ্য মাঠ শতশত নদী

চৈত্র বৈশাখ মাঘ শ্রাবণ ফাল্গুনে

সারা বাঙলা জ্ব'লে যায়

লাল নীল বিভিন্ন আগুনে

মোমবাতির মতো গ'লে গাছ

জোনাকির মতো ঢেউয়ের ভেতর দিয়ে উড়ে যায় মাছ

কলসি কাঁখে বঙ্গদেশ থমকে দাঁড়ায় মেঠোপথে

গাছতলে নদীতীরে...। (হুমায়ুন ২০০৮ : ২৬-২৭)

কবি এই কবিতায় পূর্ব বাংলাকে আবিষ্কারই করেছেন এর প্রকৃতি বা এর নিজস্ব রূপের আলোকে। যে রূপ একেবারেই গ্রামনির্ভর। হুমায়ুন আজাদের মতো একজন আদ্যন্ত আধুনিকতাবাদী কবি গ্রাম-বাংলার প্রকৃতির রূপচিত্র অংকনের মধ্য দিয়ে ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের আর্থ-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যে-স্বদেশানুরাগের প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাকে জাতীয়তাবাদী চেতনা ছাড়া আর কী-ই-বা বলা যায়!

Dhaka University Institutional Repository

একুশে ফেব্রুয়ারি বিষয়ক কবিতা

একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে কবিতা লেখা হয়েছে পর্যাপ্ত। কারণ সেই ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে অদ্যাবধি ভাষা আন্দোলন বিষয়ক কবিতা লেখা চলছে। কিন্তু ভাষা আন্দোলন বিষয়ক সব সময়ের কবিতার মেজাজ, ধরন-ধারণ, কবিতার ভেতরকার রূপ-রং, কবিচৈতন্য এক নয়। ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধের ভাষা আন্দোলন বিষয়ক কবিতা কোনোভাবেই পঞ্চাশের দশকের শেষ দিক অথবা ষাটের দশকের প্রথমার্ধের কবিতার মতো নয়।[১২] এর কারণ সময়ভেদে দেশ-কালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যকার জাতীয়তাবাদী চেতনার মাত্রার বদল ঘটেছে। আমরা পূর্বের অধ্যায়ে দেখেছি ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয়তাবাদী চেতনা ক্রমে সর্বব্যাপী রূপ নিয়েছে। জাতীয়তাবাদী চেতনা ও এই চেতনাকেন্দ্রিক আন্দোলন-সংগ্রাম যত তুঙ্গে উঠেছে, ভাষা আন্দোলন বিষয়ক কবিতার স্বরগ্রামও তত উপরে উঠেছে। কবিদের কবিতার ভাষার মধ্যে স্পষ্টতা এসেছে। কবিতা প্রত্যক্ষত জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে–

একুশে ফেব্রুয়ারি এলে
বাঙালীর কণ্ঠ চিরে
বেজে ওঠে আবহমান বাংলার গান।

একুশে ফেব্রুয়ারি এলে...
বাংলাদেশ নতুন পুরোনো নতুন
কথা বলে। (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৯৮ : ১৪১)

অথবা অন্য কবিতায়–

বাংলার কি শক্তি, বাংলা ভাষায়
কি যাদু, ইতিহাসের ধারায়
কত সহস্র কবি
মুগ্ধতায়, মমতায়, আবেগে, আনন্দে
সে কথা বলেছেন
সেই সব কবিতা গান শব্দ বর্ণমালা
চিত্রল বর্ণিল উন্মিল উন্নত সম্ভার
তার তুল্য নয় কোন কিছু :
যখন বাংলার বুকে দুঃশাসন পদভার কেঁপে ওঠে
রুদ্ধ করে দিতে চায় কণ্ঠময় সর্বজয়ী ভাষা
তখন সমস্ত দেশ কেমন দুর্জয় হয়
কেমন সংকল্পবদ্ধ ঋজু হয়–
কোনো উপমায়, কোনো তুলনায়

Dhaka University Institutional Repository

তাকে যায় না ধরা;

কেবল রক্তে রক্তে, শোণিত প্রবাহে ধ্বনিময়

তার দুর্মর আলোড়ন। (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৯৮ : ১৩৯)

উদ্ধৃতাংশের ভাষা আর চেতনার তেজ সহজেই চোখে পড়ে। ভাষা আন্দোলন বিষয়ক যেকোনো কবিতার চেয়ে এর মধ্যে কাব্যিকতা কম। এর বক্তব্য সরাসরি। কারণ বোধ করি কবিতাটির রচনাকালের মধ্যে নিহিত। কবিতাটি ষাটের দশকের উপান্তে রচিত, যখন জাতীয়তাবাদী চেতনা চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। তখন উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের সফলতা পেরিয়ে ১৯৭০-এর নির্বাচনে বাঙালির জয় মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। এই কবিতা যে জাতীয়তাবাদী চেতনার অহংকারকে ধারণ করে আছে তা নিঃসন্দেহে দেশব্যাপী জাগরিত জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রবলতা থেকে জাত। প্রায় একই সময়ে রচিত সিকান্দার আবু জাফরের কবিতায় কবি একুশকে প্রকাশ করেছেন আরো স্পষ্টভাবে। এমনকি কবি তাঁর কবিতায় প্রকাশ করেছেন ক্ষিপ্ত জনরোষকেও। কবি উপলব্ধি করেছেন, জাতীয়তাবাদী জাগরণ এখন আর সাধারণ জাগরণের মধ্যে নেই, তা রোষে পরিণত হয়েছে। একারণে কবি এই জনরোষকে বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। শুধু হুশিয়ারি নয়, কবি প্রতিপক্ষকে নিয়ে ব্যঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছেন–

যা যা যা দূর হয়ে যা চোরের কুকুর

মালিকের নাগরা চেটে বল্‌গে হেসে হুজুর হুজুর।

এখানে মাসের ভাষা গাওনা হবে

মায়ের হাসি সব ছেলেদের পাওনা হবে,

গায়েন্‌রা তাই আসন ঘুরে

সাধছে গলা নতুন সুরে;

এখানে ঘেন্নাভরা

গা-ঘিন্‌ঘিন গন্ধঝরা

ভেউ ভেউ ডাক ডাকিস যদি

পাড়ার লোকে হানবে মুগুর। (সিকান্‌দার ২০১৭ : ৪২৮-৪২৯)

এভাবে ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধের ভাষা আন্দোলন বিষয়ক কবিতা ভাবে ভাষায় প্রকাশভঙ্গিতে প্রথমার্ধের কবিতা থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে।

কবিতায় ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি

ষাটের প্রথমার্ধে যেমন ভাষা আন্দোলন-ভিত্তিক কবিতা রচিত হয়েছে, ষাটের দ্বিতীয়ার্ধেও হয়েছে। কিন্তু এই দুই পর্বের কবিতার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। প্রথম পর্বের কবিতার মধ্যে মূলত ভাষাকে মহিমান্বিত করা হয়েছে। আর এর সঙ্গে যুক্ত ছিল ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের বেদনাময় মাহাত্ম্য ও

Dhaka University Institutional Repository

স্মৃতি। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই কবিরা ভাষা আন্দোলনকে জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রকাশের অনুষঙ্গ করেছিলেন। কিন্তু ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে এসে অপরাপর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম তীব্র রূপ লাভ করায়, পাকিস্তান রাষ্ট্রের বন্ধন বেশ কিছুটা শিথিল হওয়ায় এবং পূর্ব বাংলার জনমনে জাতিরাষ্ট্রের স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়ায় ভাষা আন্দোলনভিত্তিক কবিতার মেজাজে একটা মৌলিক পরিবর্তন আসে। এই পর্বের ভাষা আন্দোলনভিত্তিক কবিতার মধ্যে ভাষা আন্দোলনকে দেখা হয়েছে বাঙালির একটি বিজয়ের গর্বিত ইতিহাস হিসেবে। ভাষা আন্দোলনের আত্মত্যাগকে বর্তমানে আত্মত্যাগের প্রেরণা হিসেবে ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানের সময় একারণে কবি উচ্চারণ করেছেন–

বুঝি তাই উনিশশো ঊনসত্তরেও
আবার সালাম নামে রাজপথে, শূন্যে তোলে ফ্ল্যাগ,
বরকত বুক পাতে ঘাতকের থাবার সম্মুখে।
সালামের বুক আজ উন্মথিত মেঘনা,
সালামের মুখ আজ তরুণ শ্যামল পূর্ব বাংলা।

দেখলাম রাজপথে, দেখলাম আমরা সবাই
জনসাধারণ
দেখলাম সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো
ঝরে অবিনাশী বর্ণমালা
আর বরকত বলে গাঢ় উচ্চারণে
এখনও বীরের রক্তে দুখিনী মাতার অশ্রুজলে
ফোটে ফুল বাস্তবের বিশাল চত্বরে
হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায়। সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ,
শিহরিত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের রৌদ্রে আর দুঃখের ছায়ায়। (শামসুর ২০১২ : ২৭৩/১)

ভাষা আন্দোলন বা একুশে ফেব্রুয়ারি যে পরবর্তী জাতীয়তাবাদী জাগরণের সঙ্গে সেতুবন্ধ রচনা করেছিল, গতকাল আর আগামী কালের মধ্যে যে একটা পার্থক্য সূচিত করে দিয়েছিল, পরবর্তী আন্দোলন-সংগ্রামকে প্রভাবিত করেছিল, বোঝা যায় সিকান্দার আবু জাফরের এক কবিতা থেকে। evsjv Qv‡ov কাব্যে তিনি বলেছেন–

বাইশের ভোরে যখন গতকাল
একুশে ফেব্রুয়ারী :
প্রসন্ন সুঘ্রাণে, সেই গতকালে ফোটা যত ফুল,
সবুজ ভাষায় কলকণ্ঠ গতকালে
ঘুমভাঙ্গা নতুন ধানের চারা,
আর গতকাল উচ্চারিত কঠিন শপথে
স্বাক্ষরিত লোকালয়ে কোটি কোটি

Dhaka University Institutional Repository

মানব-প্রত্যয়।

জীবনের শবাধারে মৃত্যুর সম্পন্ন সমাধি
বাইশের ভোরে বিষণ্ন পঞ্জিকা জেনেছিল :
একটিমাত্র গতকাল কালের অভিজ্ঞানে
নিজেই নিজের ইতিহাস
এবং কালান্তরে আগামীকালের
অক্ষয়-স্বর্ণসেতু। (সিকান্দার ২০১৭ : ৪৭১-৪৭২)

শুধু তাই নয়, ভাষা আন্দোলনের সংগ্রাম আর যুথবদ্ধতার অংশকে এই পর্বের কবিতার মধ্যে অধিক গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। মোট কথা, ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে ভাষা আন্দোলন বিষয়ক কবিতায় কবিরা যেন পূর্বের চেয়ে চেতনা ও তার প্রকাশের প্রশ্নে আরো বেশি স্পষ্ট, প্রতিবাদী, অহংকৃত, দ্বিধা আর ভয়শূন্য। উদ্ধৃতি লক্ষ করা যাক–

আমি একদিন দেখলাম হাজার হাজার তরুণ
উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গের মতো পথে পথে নেমে এসেছে
দুপুরের রৌদ্রজ্বলা পীচঢালা পথে সেই তারুণ্যের সমুদ্রে
আমিও মিশে গেলাম সেদিন
আমরা সবাই মিশে গেলাম
মাগো, সেই সমুদ্রের তরঙ্গে
তোমার মুখের ভাষাকে বাঁচাবো বলে
রমনার কৃষ্ণচূড়ার লাল পথ
প্রথম ফাল্গুনের উষ্ণ বাতাসে ছাওয়া আকাশ
তোমার জয়ধ্বনিতে মুখর হলো
বরকত সালাম রফিক জব্বার নিজের তাজা রক্তে তোমার ঋণ
শোধ ক'রে গেল

হে আমার বাংলা ভাষা, মা আমার
তুমি চিরকাল এমনি ক'রে বেঁচে থাকবে মৃত্যুঞ্জয়ী ধ্বনিতে
জীবনের মতো চিরকালের কবিতায়
আমরা তোমাকে যুগে যুগে রক্ষা করবো
বরকতের মতো, সালামের মতো তাজা রক্তের প্লাবনে। (ফজল ২০১২ : ১১২-১১৩/১)

দীর্ঘ উদ্ধৃতির শেষ দিকে ১৯৫২-এর মতো প্রয়োজনে আরো 'তাজা রক্তের প্লাবন' ঘটানোর যে-প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে, তা কবিতাটিকে ষাটের প্রথমার্ধের কবিতা থেকে আলাদা করেছে। অথবা কবি যখন বলেন, 'রাইফেলধারী বেয়োনেটধারী শেনো/তোমাকে চিনেছি তুমি খুনী পুরাতন/আমার মায়ের কণ্ঠে চালাতে

Dhaka University Institutional Repository

ছুরি/তুমি এসেছিলে সেই কবে ফাল্গুনে' (ফজল ২০১২ : ১৪৬/১) তখন বুঝতে আর বাকি থাকে না যে, কবি বাহান্নোর স্মৃতিকে একাত্তরে এসে ব্যবহার করছেন জাতীয়তাবাদী চেতনাকে শাণিত করার অভিপ্রায়ে। দুই কবিতাংশে আরো লক্ষণীয় যে, এখানে কবির প্রকাশের মধ্যে রাখঢাক কম। কবির উচ্চারণ অতি স্পষ্ট এবং ঋজু। কবিতাংশ দুটিতেই সুস্পষ্টভাবে ৫২-এর আত্মত্যাগকে প্রয়োজনে বর্তমানে আত্মত্যাগের আদর্শ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদী চেতনার এই তীব্রতা আর স্পষ্টতার সঙ্গে সময়ের একটি গভীর যোগ যে আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। ১৯৫২-এর স্মৃতি ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে এসে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে জাতীয়তাবাদী চেতনার অংশ হিসেবে। লক্ষণীয় যে, বাহান্নোর স্মৃতি যেখানেই ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে সরলভাবে শুধু স্মৃতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। বাহান্নর স্মৃতির এই ব্যবহারের মধ্যে একটি প্রতিরোধী দ্রোহী ভাব কাজ করেছে। অর্থাৎ কবিদের এই ব্যবহার শুধু স্মরণে সমর্পিত নয়, প্রতিরোধে জাগ্রত। আবার ষাটের দশকে এসে কখনো কখনো কবিরা ভাষা শহিদদের আত্মাহুতিকে বাংলার গর্বিত বিদ্রোহ-প্রতিবাদের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। ভাষা আন্দোলনকে বাংলার মানুষের বিদ্রোহের ধারাবাহিক ইতিহাসের সঙ্গে লগ্ন করে দিয়ে বর্তমানের বিদ্রোহকে জাগাতে চেয়েছেন–

প্রভাতফেরীর মিছিল যাবে
ছড়াও ফুলের বন্যা
বিষাদগীতি গাইছে পথে
তিতুমীরের কন্যা।

চিনতে না কি সোনার ছেলে
ক্ষুদিরামকে চিনতে?
রুদ্ধশ্বাসে প্রাণ দিলো যে
মুক্ত বাতাস কিনতে?

পাহাড়তলীর মরণ চূড়ায়
ঝাঁপ দিল যে অগ্নি,
ফেব্রুয়ারীর শোকের বসন
পরলো তারই ভগ্নী।

প্রভাতফেরী, প্রভাতফেরী
আমায় নেবে সঙ্গে,
বাংলা আমার বচন, আমি
জন্মেছি এই বঙ্গে। (আল মাহমুদ ২০০০ : ৩৫৩)

একারণেই বোধ করি নির্মলেন্দু গুণ স্বদেশের উদ্দেশে বলেছেন, 'তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে, কী আশ্চর্য,/সমস্ত যৌবন জুড়ে তর্ক ওঠে, আকাশে আগুন জ্বলে,/আন্দোলন বায়ান্নর পাঁচিল টপকায়।' (নির্মলেন্দু ২০১১ :

Dhaka University Institutional Repository

৪৪/১) আবার যেমন, wbR evmf‡g (১৯৭০) কাব্যে কবি তাঁর আত্মপ্রকাশের পরমানন্দের বাংলা ভাষা তথা ভাষার বর্ণমালার প্রতি উদ্দেশ্য করে বলেছেন–

হে আমার আঁখি তারা তুমি উন্মীলিত সর্বক্ষণ জাগরণে।

তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো তবে, কী থাকে আমার?
উনিশশো' বাহান্নোর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি
বুকে নিয়ে আছ সগৌরবে মহীয়সী।
সে-ফুলের একটি পাপড়িও ছিন্ন হলে আমার সত্তার দিকে
কত নোংরা হাতের হিংস্রতা ধেয়ে আসে। (শামসুর ২০১২ : ২৭০/১)

লক্ষণীয় যে, কবি এখানে 'উপড়ে নেয়া', 'পাপড়ি ছিন্ন' করার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। কবির উল্লিখিত এই শক্তি প্রয়োগের উল্লেখের সঙ্গে নিশ্চয় ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের জাতীয়তাবাদী জাগরণের স্পষ্ট প্রভাব পড়েছে।

ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিকে কবিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্তমানের প্রেরণার, বিশেষত আত্মাহুতির প্রেরণার উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছেনে তাঁদের কবিতায়। যেমন ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারির গণ অভ্যুত্থানের সময় কবি একুশ এবং একুশের আত্মাহুতির ইতিহাসকে দেখেছেন–

আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরেথরে শহরের পথে
কেমন নিবিড় হয়ে। কখনো মিছিলে কখনো-বা
একা হেঁটে যেতে যেতে মনে হয়– ফুল নয়, ওরা
শহীদের ঝলকিত রক্তের বুদ্বুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর।
একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রঙ। (শামসুর ২০১২ : ২৭২/১)

একই ধরনের প্রকাশ লক্ষ করা যায় ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে লেখা সিকান্দার আবু জাফরের eўðK-jM (১৯৭১) কাব্যের 'ইতিহাসের নীলাম' কবিতার কিছু চরণে। কবিতায় কবি স্বৈর শাসক আইয়ুব খানের উদ্দেশে বলেছেন–

জানলে মহারাজ,
সেই একুশের চুলোর যারা
পুড়িয়ে ফেলে ব্যর্থ প্রাণের লাজ
রক্ত দিয়েছে রক্তজবা কৃষ্ণচূড়ার ঠোঁটে
আজও যাদের নামের আজান
আকাশ আগল ঠেলে
কালবোশেখীর ঝঞ্ঝা হয়ে ওঠে!
লাখো তাদের ভাইবোনেরা
পথে পথে মুখোশ দিচ্ছে ছিঁড়ে,

Dhaka University Institutional Repository

মুখ লুকোবে?

জায়গা কোথা
এত চোখের ভীড়ে?
ইতিহাসের সর্বনাশ নীলাম ডাকে আজ
ধুলোর দামে বিকিয়ে যাচ্ছে
নকল সোনার তাজ। (সিকান্দার ২০১৭ : ৪২৩)

আবার কোনো কোনো কবি ভাষা আন্দোলনকে চৈতন্যের এত গভীরে নিয়ে গিয়েছেন যে, তাঁর কাছে ভাষা আন্দোলন, শহিদ মিনার ইত্যাদির চেতনা বাতাসের মতো পরিচিত আর আপন হয়ে উঠেছে। আসাদ চৌধুরীর ZeK †'Iqv cvb (১৯৭৫) কাব্যের 'বাতাস যেমন পরিচিত' কবিতার একটি অংশ লক্ষ করা যাক–

আছেন বটে এমন মানুষ হয় নি দেখাই
দেখি নি যার যত্নে রাখা ঝাপসা ছবি
কুটুম্ব নন, আত্মীয় নন, শত্রুও নন,
পিতৃবন্ধু... এসব কিছুর ধার ধারে না,
অথচ তার আনাগোনা সকল ঘরে,
সবাই চেনেন, বাতাস যেমন পরিচিত।

লাল সবুজে ঝিলিক মারে কৃষ্ণচূড়া
পাগলা হ'য়ে ডাকতে থাকে কালো কোকিল
বাড়তে থাকে গাছের মতো শহীদ মিনার
বুকের ভিতর শেকড়গুলো আলাপ করে। (আসাদ ২০০৮ : ৩৮)

ষাটের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম থেকে এসব কবিতা যেমন রসদ সংগ্রহ করেছে, তেমনি এসব কবিতাও ষাটের শেষার্ধের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামকে জ্বালানি জুগিয়েছে।

কবিতায় সম্মিলিত প্রতিরোধ ও মুক্তির বাসনা

১৯৭০-এর নির্বাচনে বাঙালির চূড়ান্ত বিজয় হয়। এরপর ক্ষমতা হস্তান্তরের তালবাহানা পূর্ব বাংলার মানুষকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ক্রমাগত আলাদা করেছে এবং নিজেদের পারস্পরিক একাত্মতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে কবিতা ক্রমাগত হয়ে উঠেছে প্রতিরোধের হাতিয়ার। কবিতার মধ্যে সশস্ত্র মনোভঙ্গি ঢুকে পড়েছে। বিশেষত ২৫শে মার্চ যত সমাগত হয়েছে কবিতায় এবং বাস্তবে সশস্ত্র মনোভঙ্গি তত বেড়েছে। কবিতার এই মেজাজের শুরু অবশ্য উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান থেকেই হয়েছিল। '...বিশেষ

Dhaka University Institutional Repository

করে উনসত্তরে সৃষ্ট স্বাদেশিকতার উত্তাপ অভাবিত মাত্রায় প্রখর হয়ে ওঠে সমাজ ও রাজনীতিকে ঘিরে; জাতীয়তার চেতনা বাঙালি জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ মানুষকে সহজেই ঐক্যবদ্ধ করে নেয়। ঐ উত্তাপ সর্বজনীন চরিত্র নিয়ে কবিতাকেও গভীরভাবে স্পর্শ করে সত্তর থেকে একাত্তরে পৌঁছেও।' (আহমদ রফিক ২০০১ : ১৯৮) একারণে অন্য এক সামলোচক বলেছেন, 'মুক্তিযুদ্ধের আগে পূর্ববাংলার কবিতায় স্পষ্টত বুর্জোয়া মানবতাবাদী এবং মার্কসবাদী এই দুই ধারা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের অবরুদ্ধ নয় মাসে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল কবিরা তখন স্বভূমির মানুষের এবং স্বভূমির মুক্তির লক্ষ্যে তাদের চেতনাকে শাণিত করেন।' (আমিনুর ১৯৯৮ : ৯১) ষাটের উপান্তে কবিদের এবং জনসাধারণের চেতনার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে দেশ স্বাধীন করার, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার, দেশকে শত্রু মুক্ত করার, দেশকে সাম্রাজবাদ ও আধিপত্যবাদ মুক্ত করার প্রত্যয় দেখা যায়। ফলে কবিদের কবিতার মধ্যে ফুটে ওঠে প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ-সংগ্রামী চেতনা, সশস্ত্র মনোভঙ্গি। এসব কবিতায় জাতীয়তাবাদী চেতনার যে-রূপটি প্রকাশিত হয়েছে, তাকে বলা যায় জাতীয়তাবাদের যুদ্ধংদেহী রূপ। লক্ষ করা যাক পঞ্চাশের দশকের মৃদুভাষী কবির ষাটের উপান্তে লেখা কবিতা–

বাংলার বুকে উদ্যত বেয়োনেট
ঘরে ঘরে তাই প্রস্তুত প্রতিরোধ
চির দুর্মর সাতকোটি বেরিকেড
রক্তের ঋণ রক্তেই হবে শোধ।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নাড়া দেয় জনতাকে,
জাগে প্রত্যয় প্রতিটি শহরে গ্রামে;
সব সংশয় উত্তরণের ডাকে
বাঙালী শোণিত প্রস্তুত সংগ্রামে।

কোনোখানে কেউ বিমর্ষ নয় শোকে
মৃত্যুর ভয়ে বিচলিত কেউ নয়,
জনতার জয় সে কার সাধ্য রোখে
মৃত্যু পেরিয়ে হাসে মৃত্যুঞ্জয়। (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৯৮ : ১৪৪)

অথবা,

অন্ধকার তো ঘোচে না অন্ধকারে
সূর্য প্রখর দীপ্তির প্রয়োজন,
তাইতো মশাল জ্বেলেছি প্রাণের দ্বারে
শ্লোগানে দীর্ণ কারফিউ তর্জন;

ব্যর্থ সকল সন্ত্রাসী গর্জন,

Dhaka University Institutional Repository

কাঁপায় না আর জনতার চিত্তকে;
করবেই জানি শোষিতেরা অর্জন
মুক্তি-প্রতীম রক্তিম বৃত্তকে। (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৯৮ : ১৪৫)

পাকিস্তানি আগ্রাসনের প্রতিবাদে বাঙালি যে অকুতোভয় এবং বাঙালির তথা বাংলার বিজয় যে সুনিশ্চিত তা কবির ভাষায় রূপময় হয়ে উঠেছে এভাবে–

কি জাদু জানো যে তুমি ওগো মায়াবিনী
চুপি চুপি পোষো সকল জখম, যার
মাঝে জন্মে রক্তবীজ : তা'দের বাহিনী
পাহাড়ে জঙ্গলে ঝোপে ক্রমশ দুর্বার :
ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ো মেঘবজ্রশাখা
প্রতিভোর সূর্য তোমার জয়পতাকা। (আলাউদ্দিন ২০০৬ : ১৭৩/১)

উদ্ধৃতাংশে বাংলার প্রতি তথা বাঙালির ওপর পাকিস্তানের দীর্ঘ শোষণ-নির্যাতনের ইতিহাস (চুপি চুপি পোষো সকল জখম) যেমন আছে, তেমনি এর বিরুদ্ধে বাঙালির জাতীয়তাবাদী জাগরণের ওপর আস্থার প্রকাশও আছে।

পূর্ব বাংলার মানুষ দীর্ঘ শাসন আর শোষণের পর জাতীয়তাবাদী চেতনায় জাগ্রত হয়েছে। এই জাগরণ বিস্ময় উৎপাদন করেছে পাকিস্তানি শাসকচক্রের মধ্যে। কবির ভাষায় এই দীর্ঘ শোষণ আর বাঙালির জাগরণ রূপময় হয়েছে এভাবে–

গ্রাম গঞ্জ জনপদ
দু'দশকে বড় বেশী বাকিও ছিল না।
যতদূর চোখ যেত দেখতাম শুধু
ফুটিফাটা বাংলাদেশ সমুদ্রের লোনা
জলে আক্রান্ত দ্বীপের মতো করে ধূ ধূ;
আর কিছু নয়। কোথাও প্রাণের সাড়া
যেন নেই, মৃত্যুময় নিস্তব্ধ, গুমোট।
হঠাৎ কি হলো কিসে জেগে ওঠে পাড়া
যেন মন্ত্রবলে। লক্ষ পায়ের দাপট।
কপাল তৃতীয় চোখ, হাতে রক্ত হেনা–
বুঝি এই বাংলাদেশ মরেও মরে না। (সৈয়দ শামসুল ২০১২ : ১৪৬/১)

Dhaka University Institutional Repository

কবিতা যে প্রতিরোধের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে তা ষাটের শেষার্ধের এসব কবিতা সেই সাক্ষ্যই বহন করে।

ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিককার কবিতায় প্রথমার্ধের হতাশার ছাপ দুর্লক্ষ নয়। কিন্তু নানা আন্দোলন-সংগ্রাম যখন ক্রমে দানাদার হয়ে উঠেছে তখন গণমানুষের মতো কবির চেতনায়ও জেগে ওঠার এক ধরনের বাসনা শিল্পমূর্তি লাভ করেছে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম যখন ক্রমে বিকিশিত হয় তখন প্রয়োজনে স্বদেশ ও স্বাধীনতার সাধ মানুষকে আত্মাহুতির প্রণোদনা দেয়। ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে পূর্ব বাংলার মানুষের নির্দ্বিধ আত্মাহুতি জাতীয়তাবাদী আবেগের এই সূত্রেই গাঁথা। ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের কবিতায় জেগে উঠে মুক্তির বাসনা এবং প্রয়োজনে আত্মাহুতির জন্য প্রস্তুত থাকার দৃপ্ত শপথ–

আশা নাই, ভাষা নাই
প্রতিবাদ করবার। নাই সর্বনাশা
বহ্নি বিদ্রোহীর।
আছে শুধু দাহ।

কেন এই নিষ্প্রাণ হতাশা?
একই অন্ধ বন্ধ কূপে ফিরে আসা বারবার।
জাল ছাড়া আর
হারাবার আছে কি এখনও?
আর কোন পিছুটান, আর কোন ভয়?

এবার হয়েছি নিঃসংশয়
মৃত্যুই মৃত্যুকে করে ক্ষয়। (আবুল হোসেন ১৯৯৭ : ৬২)

একই ধরনের প্রকাশ, অর্থাৎ মৃত্যুকে উপেক্ষা করে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে ওঠা, প্রতিকূলতাকে জয় করার দৃঢ় প্রত্যয় লক্ষ করা যায় আল মাহমুদের †mvbvwj Kvweb কাব্যে। কবিতায় পূর্ব বাংলাকে কবি তাঁর নারীর রূপকে তুলে ধরে বলেছেন–

অঘোর ঘুমের মধ্যে ছুঁয়ে গেছে মনসার কাল
লোহার বাসরে সতী কোন ফাঁকে ঢুকেছে নাগিনী,
আর কোনদিন বলো দেখবো কি নতুন সকাল?
উষ্ণতার অধীশ্বর যে গোলক ওঠে প্রতিদিনই।
বিষের আতপে নীল প্রাণাধার করে থরো থরো
আমারে উঠিয়ে নাও হে বেহুলা, শরীরে তোমার,
প্রবল বাহুতে বেঁধে এ-গতর ধরো, সতী ধরো,

Dhaka University Institutional Repository

তোমার ভাসানে শোবে দেবদ্রোহী ভাটির কুমার।

কুটিল কালের বিষে প্রাণ যদি শেষ হয়ে আসে,

কুন্তল এলিয়ে কন্যা শুরু করো রোদন পরম।

মৃত্যুর পিঞ্জর ভেঙে প্রাণপাখি ফিরুক তরাসে

জীবনের স্পর্ধা দেখে নত হোক প্রাণাহারী যম,

বসন বিদার করে নেচে ওঠো মরণের পাশে

নিটোল তোমার মুদ্রা পাল্টে দিক বাঁচার নিয়ম। (আল মাহমুদ ২০০০ : ১০৩)

পাকিস্তানি আঘাতের প্রত্যুত্তরের প্রেরণা এসময়ের বেশ কিছু কবিতাকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। যেমন–

হিংস্র ঝড়ের থাবা তোমাদের নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে গেছে

অথচ কী আশ্চর্য কী মর্মান্তিক

তোমাদের মধ্যে কোনো ঝড় উঠলো না

পঙ্গু বিকলাঙ্গ ক্ষুধার্ত তোমরা

বাংলাদেশের লুণ্ঠিত শস্যভাণ্ডারের ছিন্নভিন্ন মাটিতে দাঁড়িয়ে

আর কতোকাল ছুটে বেড়াবে সাহায্যের জন্যে

কেন তোমরা নিজেরাই একটা ঝড় হয়ে ওঠো না? (ফজল ২০১২ : ২০৬)

ঝড় হয়ে মুক্ত হওয়ার বাসনা কবিতাংশটিকে ষাটের সঙ্গে বিশেষভাবে সেঁটে দিয়েছে।

কবিতায় আত্মত্যাগের প্রেরণার নির্মাণ

জাতীয়তাবাদী চেতনা যখন দানা বাঁধতে থাকে তখন এর পক্ষের মানুষেরা তৈরি করতে চায় বিভিন্ন আইকন বা আদর্শ। এই আদর্শ তখন জনগোষ্ঠীর চৈতন্যে কাজ করে অনুপ্রেরণা হিসেবে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা জাগরণ যেমন জনগোষ্ঠীর পূর্বতন আত্মত্যাগ বা যেকোনো বড় সম্মিলিত দুঃখকে ইতিহাসের মর্যাদা দিয়ে তাকে ব্যবহার করে, তেমনি বর্তমানের নানা ত্যাগ বা দুঃখের ঘটনাকে প্রেরণা হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। যেমন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নিহত কোনো ব্যক্তিকে কেন্দ্রে স্থাপন করে তাকে প্রতিরোধের হাতিয়ার করে তোলে এবং অন্য অনেককে একত্র হতে উদ্বুদ্ধ করে।[১৩] এই কাজটি ঘটে থাকে দুইভাবে। একটি সরাসরি আন্দোলনের মাঠে রাজনৈতিককর্মীরা করে থাকে। এই একই কাজটি অন্যভাবে করে থাকেন কবিরা। তাঁরা আত্মত্যাগীকে নিয়ে তাৎক্ষণিক কবিতা রচনা করেন। যখন কবিতাটি ছড়িয়ে পড়ে তখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামও নতুন প্রাণ পায়। এভাবে কবিতায় নির্মিত হয় জাতীয়তাবাদী চেতনা ছড়িয়ে পড়ার প্রেরণা। পূর্ব বাংলায় এই ধারার জাতীয়তাবাদী জাগরণধর্মী কবিতার শুরু প্রকৃতপক্ষে ১৯৫২ সাল থেকে। এটি নিয়মিত বিষয়ে পরিণত হয় ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানের পর থেকে। গণ অভ্যুত্থানে নাম না জানা এক কিশোরের আত্মাহুতি এবং সেই আত্মাহুতিকে পরম্পরায় যুক্ত করে দিয়ে কবি রচনা করেছেন wbR evm f‡g কাব্যের 'আমরা প্রার্থী তারই' কবিতাটি। কবি বলেছেন–

বলেছিলে আরও, যে-জীবন কারো
প্রাণকে করে না আলোয় প্রগাঢ়,
সে-জীবন নিষ্ফল।

বুঝি তাই প্রেমে বড় উৎসুক
তুলে ধরেছিলে স্বদেশের মুখ
নিবিড় অঞ্জলিতে।

খোলা রাস্তায় মিছিলে মিছিলে
চকিতে প্রহরে ছড়িয়ে কী দিলে?
চৌদিক থরথর।

তোমার আমার কাঙ্ক্ষিত ভোর
আসার আগেই স্বপ্ন-বিভোর
তোমাকে হানল ওরা।

এই আলো আরো পবিত্র হবে
তোমার রক্ত-রাঙা বৈভবে,–
বলল ব্যাকুল পাখি।

যে-আলো তোমার চোখে নেচেছিল,
যে-আলো তোমার বুকে বেঁচেছিল
আমরা প্রার্থী তারই। (শামসুর ২০১২ : ২৭৯-২৮০/১)

এটা আসলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামের স্বভাব। এই স্বভাবগুণে একের আত্মত্যাগ অনেকের প্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে। একজন চেতনাগতভাবে ঢুকে পড়ে সবার মধ্যে। কবিরা তাঁদের কাব্য-কবিতায় এই কাজটিকে শিল্পিত করে তোলেন এবং আন্দোলনকে আরো বেগবান করে তোলেন। যেমন–

এ লাশ আমরা রাখব কোথায়?
তেমন যোগ্য সমাধি কই?
মৃত্তিকা বলো পর্বত বলো
অথবা সুনীল সাগর-জল–
সব কিছু ছেঁদো, তুচ্ছ শুধুই।
তাই তো রাখি না এ লাশ আজ
মাটিতে পাহাড়ে কিংবা সাগরে,

Dhaka University Institutional Repository

হৃদয়ে হৃদয়ে দিয়েছি ঠাঁই। (শামসুর ২০১২ : ৩০৪/১)

শহিদ আসাদ, মতিউরকে নিয়ে তাৎক্ষণিক লেখা হয়েছে প্রচুর কবিতা। এসব কবিতা তাৎক্ষণিকভাবে পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে আরো বেগবান করেছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই। যেমন, শামসুর রাহমানের 'আসাদের শার্ট' অথবা আল মাহমুদের 'উনসত্তরের ছড়া-১'। 'আসাদের শার্ট' কবিতায় শামসুর রাহমান আসাদের শার্টকে জাতীয়তাবাদ উস্কে দেওয়ার কাজে ব্যবহার করেছেন। তিনি কবিতায় আসাদের শার্টকে রূপান্তরিত করেছেন পতাকায়–

ডালিম গাছের মৃদু ছায়া আর রোদ্দুর-শোভিত
মায়ের উঠোন ছেড়ে এখন সে-শার্ট
শহরের প্রধান সড়কে
কারখানার চিমনি-চূড়োয়
গমগমে এভেন্যুর আনাচে-কানাচে
উড়ছে, উড়ছে অবিরাম
আমাদের হৃদয়ের রৌদ্র-ঝলসিত প্রতিধ্বনিময় মাঠে,
চৈতন্যের প্রতিটি মোর্চায়।

আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা। (শামসুর ২০১২ : ২৮০/১)

কবি আসাদের আত্মত্যাগ আর রক্তকে পতাকায় রূপান্তরিত করেছেন। একইভাবে **১৯৬৯** সালের পরে ব্যাপকভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামের সময় যারা আত্মাহুতি দিয়েছে, তাদের নিয়ে তাৎক্ষণিক রচিত হয়েছে অসংখ্য কবিতা। এসব কবিতা প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে সন্দেহ নেই। যেমন–

আর সে আসবে না। সাত মাস ফেরে না ঘরে।
মা কি জানেন, তার ঘর এখন ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত ঘরে?
আর যত্নে সাজানো আহার্যের বদলে সে এখন গ্রহণ করছে
মানুষের বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা, যা কেবল তার ক্ষুধাকেই নয়,
তার মৃত্যুকেও পরাহত করবে। মায়ের সমস্ত সুঘ্রাণ নিয়ে যে-কিশোর পড়ে থাকত
নিবিষ্ট সব বইয়ের পাতায়, তুমি কি জানো
বারুদের চড়চড়ে গন্ধে সে এখন পাঠ নয়, রচনা করছে ইতিহাস? (সৈয়দ শামসুল ২০১২ : ১৪৯/১)

এই আত্মত্যাগের ইতিহাসকে স্মরণ করে আরো অনেককে এগিয়ে আসার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে কোনো কোনো কবির কবিতায়। যেমন, আল মাহমুদের কবিতায় আসাদ আর মতিউরকে অনুসরণের আহ্বান লক্ষ করা যায় সরাসরি– 'ট্রাক! ট্রাক! ট্রাক!/ট্রাকের মুখে আগুন দিতে মতিয়ুরকে ডাক।/কোথায় পাবো

Dhaka University Institutional Repository

মতিয়ুরকে/ঘুমিয়ে আছে সে!/তোরাই তবে সোনামাণিক/আগুন জ্বেলে দে।' আত্মত্যাগের বাস্তবতাকে কোনো কোনো কবি অসাধারণ উপমা আর চিত্রকল্পে ধরে রেখেছেন। আত্মত্যাগকে মহিমান্বিত করে স্থায়ী রূপ দিতে এবং অনুসরণীয় করে রাখতে কবি লিখেছেন–

ডাকটিকিটের মতো শহীদেরর রক্ত-কণা
লেগে থাকা স্ট্রীটে
একটি উজ্জ্বল খাম হয়ে পড়ে আছে,
বিপ্লবের কোকিল কংক্রিটে। (নির্মলেন্দু ২০১১ : ৪৪/১)

এভাবে পাকিস্তান আমলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামে আত্মাহুতি দেওয়া পূর্ব বাংলার শহিদদেরকে নিয়ে অসংখ্য কবিতা কালের স্মারক আর সংকটে প্রতিরোধী হয়ে ওঠার ঐতিহাসিক দলিলে পরিণত হয়েছে।

বহু মানুষ সম্মিলিত হবার আহ্বান ও সম্মিলিত হবার চিত্র

ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে যখন নানা আন্দোলন-সংগ্রামে ফুঁসে উঠছিল পূর্ব বাংলা, তখন কবিরা রচনা করেছেন এমন কিছু কবিতা যেখানে কবি তাঁর জনগোষ্ঠীকে সম্মিলিত হবার আহ্বান করেছেন। কবি এক্ষেত্রে নেতার কাজে অবতীর্ণ হয়েছেন। অথবা বলা যায়, নেতৃত্বের মধ্যে আহ্বানের পৌনঃপুনিকতা কবির মধ্যে জন্ম দিয়েছে আহ্বানের প্রেরণা। একারণে কবি এক হবার, জেগে উঠবার আহ্বান করেছেন–

তাই এসো আমরা জন্মগ্রহণ করি
এবং প্রতি মৃত্যুকে আমরা ধারণ করি
যেমন আনন্দিত আতংকে বালক একটা তারাবাতি
জ্বলজ্বলে
    গনগনে
        সহাস্য
            সচকিত
একটি শর্করা-শুভ্র অগ্নির
অবিরাম বিকিরণ। (সৈয়দ শামসুল ২০১২ : ১৫৩/১)

অনেকের মধ্যে লক্ষ করা যায় বিপ্লবী আহ্বান। সেই আহ্বানের প্রশ্নে কবি অবশ্য বাছবিচারহীন নন। বিপ্লবের নেশা যাদের মধ্যে কবি তাদের একত্র হবার আহ্বান করেছেন। কবির ভাষা লক্ষ করা যাক–

আমার দু-বাহু শীর্ণ তবু কারো কারো কাছে সোনালি সুন্দর
    তারা আসে আসবেই
    তারা গলে গলবেই
ছড়িয়ে দিয়েছি দুই শীর্ণ জীর্ণ লাল বাহু
    রাজপথ কানাগলি ভাঙাচোরা রাস্তায়

Dhaka University Institutional Repository

ধরা দাও ধরা দাও যাদের বুকের মধ্যে

গাঢ় লাল পতাকা উড়ছে। (হুমায়ুন ২০০৮ : ৪৫-৪৬)

কবিদের কবিতায় মিছিলে, সংগ্রামে, প্রতিরোধে শামিল হওয়ার আহ্বান নিশ্চয় সমকালে রাজনৈতিক নেতৃত্বের আহ্বানের মতোই শিক্ষত মধ্যবিত্তশ্রেণির একটা বড় অংশকে প্রভাবিত করেছিল। কবিতায় কবিদের সেই আহ্বান কালের ঐতিহাসিক চিহ্ন বহন করে অনন্য হয়ে আছে।

রাজনৈতিক নেতৃত্বের আহ্বানে আর কবি-সংস্কৃতিকর্মীদের আহ্বানে মানুষ ক্রমাগত সমাগত হয়েছে; সম্মিলিত হয়েছে। ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে দিন যত গড়াচ্ছিল তত বহু মানুষ জেগে উঠছিল। বহু মানুষ একত্র হচ্ছিল। বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামকে কেন্দ্র করে, বিশেষত শহরের আন্দোলন-সংগ্রামকে কেন্দ্র করে ক্রমাগত জেগে উঠছিল গ্রাম। একত্র হচ্ছিল মানুষ। অনেক ক্ষেত্রে গ্রামের মানুষ প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ধাবমান হচ্ছিল শহর অভিমুখে। বহু মানুষের সম্মিলিত হবার আহ্বানের মতো বহু মানুষের একত্র হবার চিত্র, সম্মিলিত হবার চিত্র, জাতীয়তাবাদী চেতনার বিস্তারের চিত্র, জমাট বাধার চিত্র কবিদের কবিতায় ব্যাপকভাবে চিত্রিত হয়েছে ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে। যেমন–

দ্যাখো, আমি শৃংখলিত। কিন্তু

কী আমার শৃঙ্খল, আমার এই বাহু,

আমার কোটি কোটি বাহু।

এই শৃঙ্খলে আমরা পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ। (সৈয়দ শামসুল ২০১২ : ১৫৪/১)

অথবা আল মাহমুদের কবিতায় দেখা যায় গ্রামের মানুষের শহর অভিমুখী অভিযাত্রা–

কাতারে কে ডাকে নাম ধরে? আদেশের গম্ভীর নিনাদে

আমার নামের ধ্বনি আমারই শরীর ঘিরে ঘিরে

ঝিঁঝির শব্দের মতো ঢুকে গেলো গ্রামের ভিতর।

মনে হলো, ডাক দিলে জড়ো হয়ে যাবে সব নদীর মানুষ

অসংখ্য নাওয়ের বাদাম, মুহূর্তে গুটিয়ে ফেলে রেখে

জমা হয়ে যাবে এই চরের ওপর।

খেতের আড়াল থেকে কালো

মানুষেরা এসে বলে দেবে সরোষে আমাকে

কী ভাবে এগোবে তারা দুর্ভেদ্য নগরের তোরণে প্রথম। (আল মাহমুদ ২০০০ : ৯৫)

জাতীয়তাবাদী চেতনা হচ্ছে কস্তুরী মৃগের মতো। সুবাসেই এর সার্থকতা। এই সুবাসকে কেন্দ্র করে শিকারীর মতো এর দিকে ধাবমান হয় শ্রেণি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র জাতি। এই চেতনা একবার জমাট বাঁধলে বিচিত্র প্রান্ত থেকে মৌমাছির মতো ছুটে আসে মানুষ, আর তৈরি করে তোলে অপূর্ব মধুচক্র। এরকম দৃষ্টান্ত পূর্ব বাংলায় সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। বিচিত্র প্রান্ত থেকে বিচিত্র শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ

Dhaka University Institutional Repository

নিয়েছিল জাতীয়তাবাদী চেতনার সেই মৌতাত রচনায়। ফুসে উঠেছিল অধিকার আদায়ের সংগ্রামে। সম্মিলিত হয়েছিল এক কণ্ঠে। জাতীয়তাবাদী চেতনার জাগরণের সেই মাহেন্দ্র ক্ষণ চিত্রিত হয়েছে কবির ভাষায় এভাবে–

আমি দূর পলাশতলীর
হাড্ডিসার ক্লান্ত এক ফতুর কৃষক,
মধ্যযুগী বিবর্ণ পটের মতো ধু-ধু,
আমি মেঘনার মাঝি, ঝড়বাদলের
নিত্য-সহচর
আমি চটকলের শ্রমিক,
আমি মৃত রমাকান্ত কামারের নয়ন পুত্তলি,
আমি মাটিলেপা উঠোনের
উদাস কুমোর, প্রায় ক্ষ্যাপা, গ্রাম উজাড়ের সাক্ষী,
আমি তাঁতি সঙ্গীহীন, কখনো পড়িনি ফার্সি, বুনেছি কাপড় মোটা-মিহি
মিশিয়ে মৈত্রীর ধ্যান তাঁতে,
আমি
রাজস্ব দপ্তরের করুণ কেরানি, মাছি-মারা তাড়া-খাওয়া,
আমি ছাত্র, উজ্জ্বল তরুণ,
আমি নব্য কালের লেখক,
আমার হৃদয়ে চর্যাপদের হরিণী
নিত্য করে আসা-যাওয়া, আমার মননে
রাবীন্দ্রিক ধ্যান জাগে নতুন বিন্যাসে
এবং মেলাই তাকে বাস্তবের তুমুল রোদ্দুরে
আর চৈতন্যের নীলে কতো স্বপ্ন-হাঁস ভাসে নাক্ষত্রিক স্পন্দনে সর্বদা।

আমরা সবাই
এখানে এসেছি কেন? এখানে কী কাজ আমাদের?
কোন সে জোয়ার
করেছে নিক্ষেপ আমাদের এখন এখানে এই
ফাল্গুনের রোদে? বুঝি জীবনেরই ডাকে
বাহিরকে আমরা করেছি ঘর, ঘরকে বাহির। (শামসুর ২০১২ : ২৭০-২৭১/১)

একই ধরনের প্রকাশ লক্ষ করা যায় নিচের কবিতাংশে–

মিছিলে মিছিলে দেখি কতো মুখ কতো যে হাত
অধির বধির শপথে কঠিন শহরে গ্রামে
বুকের রুধির দিয়েছে যে ঢেলে দেশের নামে–
তবুও কেন যে বাংলাদেশের কাটেনা রাত!
বাজারে গঞ্জে নদীতে পাহাড়ে উঠেছে ঝড়
বাংলা আমার স্বপ্ন আমার আমার গান

Dhaka University Institutional Repository

মায়ের ভাষায় মূর্ত পৃথিবী আমার প্রাণ

তবু কেন যে পায়নাকো ভাষা অযুত স্বর!

হাওয়ায় হাওয়ায় মুখরিত কার কি যে শুধায়

বাংলাদেশের মানুষেরা সব গেলো কোথায়? (ফজল শাহাবুদ্দীন ২০১২ : ১০১/১)

জাতীয়তবাদী জাগরণের এই চিত্র কবির কল্পনা নয়। বরং বলা যায়, ষাটের উপান্তে জাগরণের ঝাঁঝ কবিতায় উত্তাপ ছড়িয়েছে; ছড়িয়েছে আশাবাদ। শামসুর রাহমানের e›'x wkwei †_‡K কাব্যের 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় কবি জাতীয়তাবাদী চেতনায় শামিল হওয়া পূর্ব বাংলার মানুষের এক তালিকা হাজির করেছেন। এই তালিকা থেকে জাতীয়তাবাদী জাগরণের ব্যাপ্তি সহজেই অনুমান করা যায়। স্বাধীনতাকে পাওয়ার জন্যে কারা আশাবাদী এবং আত্মত্যাগে শামিল হয়েছে তার তালিকায় উঠে এসেছে 'মোল্লাবাড়ির এক বিধবা', 'হাড্ডিসার এক অনাথ কিশোরী', 'সগীর আলী', 'শাহবাজপুরের সেই জোয়ান কৃষক,' 'কেষ্ট দাস', 'জেলেপাড়ার সবচেয়ে সাহসী লোকটা', 'মতলব মিয়া, মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি', 'রুস্তম শেখ, ঢাকার রিক্‌শাওয়ালা', 'রাইফেল কাঁধে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো সেই তেজী তরুণ', এমনকি 'অবুঝ শিশু'। একইভাবে কবি তাঁর 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় স্বাধীনতার স্বপ্ন, সাধ আর স্বাদকে সঞ্চারিত করেছেন রবিঠাকুর থেকে মাঠের কৃষক পর্যন্ত। অন্য কবির চেতনার মধ্যেও বিচিত্র ধরনের মানুষের সম্মিলিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চিত্র পাওয়া যায়–

যারা গান গাইতো বাঁশিতে আঙুল রেখে,

যারা ছাত্র ছিল পাঠশালার, বিশ্বের, সভ্যতার

কিংবা প্রকৃতির, সেইসব ছাত্র-শিক্ষক-শ্রমিক

একত্রে মিলিত হয়ে ওরা এখন অন্যরকম;

ওরা এখন গান গায় না, ওরা এখন অন্য মানুষ। (নির্মলেন্দু ২০১১ : ৫৬/১)

এভাবে, ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের কবিতা বহু মানুষের সম্মিলিত হবার আহ্বান জানিয়ে, বহু মানুষের সম্মিলিত হবার চিত্র রূপময় করে জাতীয়তাবাদী সাহিত্যের ভূমিকা পালন করেছে।

নতুন দিনের স্বপ্ন যখন কবিতার কবিতার বিষয়

একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে যখন জাগরণের সূত্রপাত হয়, একটি জনগোষ্ঠী যখন আত্ম-আবিষ্কারের পথে দ্বিধাহীন হয়ে ওঠে, তখন সেই জনগোষ্ঠীকে গ্রাস করে নতুন দিনের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা। তখন সেই জাতির ভাবনা, ভাষা, যাপন, আন্দোলন-সংগ্রাম কাঁপতে থাকে সুদিন আর সম্ভাবনার হাতছানিতে। কবিতার ভাবে-ভাষায় লাগে নতুনের দোলা; আশাবাদের হিল্লোল। শুধু তাই নয়, জনগোষ্ঠীর মতো কবিতায়ও লক্ষ করা যায় নতুন অভিযাত্রা, সামনে এগোনোর বাসনা-কাতরতা। এসময় ন্যায্য হিস্যা বুঝে নেওয়ার মানুষেরা কবিতার মধ্যে ভীড় করতে শুরু করে। কারণ, কবি তো জনগোষ্ঠীর ভাষা আর তার স্বপ্নকেই শিল্পিত করেন কবিতার মর্মে। ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষত উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের পর থেকে বাংলাদেশের কবিতায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রায়শই এই বিষয়টি লক্ষ করা যায়। কবিদের কবিতার চোখে স্বপ্নের মায়াঞ্জন দেখা দিতে শুরু করে। কবিতায় ভিড় করতে থাকে প্রত্যয়ী মানুষ, স্বপ্নবান মানুষ। উদাহরণ দেখা যাক–

আনন্দে আপ্লুত হয়ে আমরা স্বপ্নের দিকে
রওনা দিয়েছি। দুঃখ
আমাদের ক্লান্ত করে না।
দুর্যোগের রাতে আমরা এক উজ্জ্বল দিনের দিকে
মুখ ফিরিয়েছি। বিঘ্ন
আমাদের বিবশ করেনি।
চিৎকার, কান্না ও হতাশার গোলকধাঁধা ছেড়ে
আমরা বেরিয়ে যাব। মৃত্যু
আমাদের স্পর্শ না করুক। (আল মাহমুদ ২০০০ : ৯১)

–অথবা আল মাহমুদেরই অপর এক কবিতায় লক্ষ করি, ন্যায্য হিস্যা বুঝে নিতে চাওয়া এবং নতুন দিনের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষায় বুদ হয়ে যাওয়া এক মানুষকে, যে কিনা ভদ্রতা বা প্রাতিষ্ঠানিকতাকে খুব একটা পাত্তা দিচ্ছে না–

ধানের স্বপ্ন দু'চোখে আমার, এই নগণ্য–
দাবি তুলতেই কারা বলে ওঠে বন্য বন্য।
ধান তোলবার অস্ত্র নিলাম বিপুল শব্দে।
হঠাৎ তখন মনীষীরা বলে এ-ও জঘন্য।

তবু তো সূর্য উঠে আসে দেখি নতুন অব্দে।

স্বপ্নে আমায় ডেকে ওঠে এক সুখের পক্ষী
ঘুম ভেঙে আজ চলেছি তাহার কূজন লক্ষ্যি
কতদূর গেলে পাওয়া যাবে সেই নীল বিহঙ্গ
আমি হতে চাই দিনমান তার শরীর রক্ষী। (আল মাহমুদ ২০০০ : ৯৩)

কবিতায় রূপায়িত এই যে ব্যক্তি 'বিপুল শব্দে' 'ধান তোলবার অস্ত্র' হাতে তুলে নিয়েছে, যাকে স্বপ্ন নামক সুখের পাখি ডেকে উঠিয়েছে এবং যে সেই স্বপ্ন-পাখির 'কূজন' লক্ষ করে যাত্রা শুরু করেছে– সে তো বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যক্তি নয়। কবিতার রচনাকাল বলে দেয়, সে গণ অভ্যুত্থানের সন্তান; সে নতুন জাগ্রত বাঙালি চৈতন্যের প্রতিনিধি।

কবিতায় বাঙালিত্ব

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে পূর্ব বাংলার মানুষ সায় দিয়েছিল মূলত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য। এছাড়া এই অংশের মানুষ মনে করেছিল, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলে 'দুর্বল' কোনো জনগোষ্ঠী আর বৈষম্যের শিকার হবে না। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে দেখা গেল, এ দুটির কোনোটাই বাস্তবে রূপ লাভ করেনি। বরং পূর্ব বাংলা পূর্বের মতোই অবহেলার শিকার হয়েছে। এই অবহেলা ছিল বহুমাত্রিক। পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যে আর আধিপত্যের শিকার হয়েছে বরাবরই। এসব

Dhaka University Institutional Repository

বৈষম্যসহ পূর্ব বাংলার মানুষ দীর্ঘদিন পাকিস্তানের আবেগ লালন করেছে। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি বিষয় পূর্ব বাংলার সচেতন মহলের কাছে খটকা সৃষ্টি করে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের মুখের ভাষা কেন রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃত হবে না! এর মূলে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিষয়টি স্পষ্ট ছিল। কিন্তু অনেকের মধ্যে এই ভাবনাও উঁকি দিয়েছিল যে, এর মধ্য দিয়ে হয়ত জাতিগতভাবে বাঙালিকে হেয় জ্ঞান করা হয়েছে। এই জাতিগতভাবে পূর্ব বাংলার বাঙালিদের হেয় জ্ঞান করার বিষয়টি যত দিন গিয়েছে ততই স্পষ্ট হয়েছে। এটি প্রথম গণগ্রাহ্যতা লাভ করে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। পাক-ভারত যুদ্ধে বাঙালি সৈন্যবাহিনী যে বীরত্বের স্বাক্ষর রাখে, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র থেকে শুরু করে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাকর্মকর্তা কেউই তার স্বীকৃতি দেয়নি। এমন কি বাঙালি সেনাদের এই কৃতিত্ব ছিনিয়ে নিয়ে যায় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র। পাক-ভারত যুদ্ধের পরে বীরত্বের প্রশংসা করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যদের। সেখানে এও বলা হয় যে, বাঙালি শারীরিকভাবে খর্বাকৃতি, তাদের পক্ষে যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখানো অসম্ভব। এধরনের কথা আইয়ুব খানও বলতেন এবং অন্তরে পোষণ করতেন। এই ধরনের জাতি-বিদ্বেষমূলক চিন্তা আইয়ুব খানের আত্মজীবনীতেও আছে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর পূর্ব বাংলার বাঙালি জাতি-বিদ্বেষমূলক চিন্তার আরো স্পষ্ট প্রমাণ ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল মেনে না নেওয়া। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নিয়ম অনুযায়ী শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা। আর তাঁর দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংবিধান প্রণয়ন করার কথা। নির্বাচনের পূর্বে কথাও ছিল তাই যে, নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াবেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের বিজয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকশ্রেণি থেকে শুরু করে অভিজাত শ্রেণির সবাই হতবাক হয়ে যায়। তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি যে, বাঙালি একজন প্রধানমন্ত্রী পশ্চিম পাকিস্তানিদের শাসন করবে; কর্তৃত্ব করবে। এজন্য অত্যন্ত অন্যায্যভাবে টালবাহানা করে ক্ষমতা হস্তান্তর তো করেইনি, বরং অস্ত্রের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে চির স্তব্ধ করতে চেয়েছিল। পাকিস্তানি শাসকচক্রের এই জাতি-বিদ্বেষের বিষয়টি পূর্ব বাংলার বাঙালি মেনে নিতে পারেনি। এর প্রমাণ ১৯৬৯-এর পর থেকে বাঙালি জাতি ধারাবাহিকভাবে দিয়েছে। বাঙালি জাতির সর্বৈব জাগরণ ঘটে ষাটের দশকে, বিশেষত ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে। জাতিগত অহংকারের ঢেউ এখানকার কাব্য-কবিতায়ও লেগেছে। কবিরা তাঁদের কবিতায় বাঙালি জাতির ইতিহাস নিয়ে গর্বিত হয়ে কবিতা রচনা করেছেন। এই বাঙালি জাতি বলতে কবিরা যে-জাতির বয়ান-বর্ণনা হাজির করেছেন, তা নিঃসন্দেহে হাজার বছরের বাঙালি। এই বাঙালিত্বের অহংকারের মধ্যে 'অনার্য' জাতির বৈশিষ্ট্য প্রধান হয়ে উঠেছে। অথবা বলা যায়, বাঙালির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। কারণ পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর এবং 'অভিজাত' শ্রেণির জাতিগত অহংকার ছিল যে, তারা আর্য বংশসম্ভূত। বাঙালি 'অনার্য' বংশসম্ভূত বলে তাদের এক ধরনের অবজ্ঞাও ক্রিয়াশীল ছিল। ষাটের দশকে এসে বাঙালি তার যে-বাঙালিত্ব নিয়ে অহংকার করেছে, তার মধ্যে 'অনার্য' বৈশিষ্ট্যই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে।[১৪] পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আত্মপরিচয়মূলক কথাবার্তা বিষয়ে অধিকাংশ কবি এখানকার মানুষদের অন্ত্যজ পরিচয়টি কখনো আড়াল করেননি।[১৫] এই একই বিষয়ের অভিক্ষেপ ষাটের দশকের কোনো কোনো ঔপন্যাসিকের মধ্যেও দেখা যায়। যেমন, সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১)-এর উপন্যাস। তিনি তাঁর একাধিক উপন্যাসে 'অনার্য'-

Dhaka University Institutional Repository

জাগরণ দেখিয়েছেন। যেমন, ৠe‡'Vn¨ ^KeZ (১৩৭৬)। তাঁর ci¤ú‡ga (১৯৬৯) উপন্যাসটি তো রীতিমত আর্য-অনার্য দ্বন্দ্বের তথা দুটি সভ্যতার দ্বন্দ্বের উপন্যাস। এমন কি 'আর্যদের' কথিত যে 'অনার্য' জাতি তার সত্যতা এবং 'আর্যদের' সভ্যতার প্রচলিত পাঠ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ci¤ú‡ga উপন্যাস থেকে উদাহরণ দেখা যাক–

> অনার্য জাতি বলে কোনো জাতি নাই। ওই মিথ্যা নামটি আপনারা আর্যরাই সৃষ্টি করেছেন, তারপর সেটাকে জোর করে আমাদের উপর ('অনার্যদের' উপর) চাপিয়ে দিয়েছেন। ... শান্তির দেশ শান্তিতেই ছিল। কিন্তু হঠাৎ এক সময় ঈশান কোণ থেকে ঝড়ের মত নেমে এল দুরন্ত দস্যুর দল (আর্যরা)। ক্ষুধিত বৃকের মত পালের পর পাল ওরা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। ... প্রাচীর, অট্টালিকা, উদ্যান, স্নানাগার সবকিছু ভেঙে চুরমার করল ওরা। আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করল। (সত্যেন ২০০৩ : ২০০)

ষাটের দশকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর 'আর্যতার' অহংকারের বিপরীতে এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে সমকালীন জাতীয়তাবাদী চেতনার এক বিপ্লবী প্রকাশ।

বাংলাদেশের ষাটের দশকে রচিত কবিতায় জাতি-গর্বের বিষয়টি সত্যেন সেনের মতো এত বিপ্লবাত্মক রূপে হাজির না হলেও, বাঙালিত্বের স্বাতন্ত্র্য আর এর অহংকারের রূপায়ণ করতে কবিরা পিছপা হননি। ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে অনেক কবির মধ্যে বাঙালিত্বের অহংকারের বিষয়টি, তার তেজী আর বিদ্রোহী রূপটি ফুটে উঠেছে। কবিরা তাঁদের কবিতায় প্রায়শ স্মরণ করেছেন তাঁর 'আদিম' পূর্বপুরুষকে, আর প্রেরণা নিয়ে বর্তমানের বাঙালিকে শানিয়ে নিতে চেয়েছেন। এরকম প্রয়াস প্রায়শ লক্ষ করা যায় কবি দিলওয়ারের কবিতায়। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত ও রচিত দিলওয়ারের Dw™b Dj øvm কাব্যগ্রন্থে কবি স্মরণ করেছেন তাঁর 'আদিম' পূর্বপুরুষকে, যারা কিনা নানা প্রতিকূলতাকে জয় করে সামনে এগিয়েছে। পূর্বপুরুষের সেই দুঃসাহসী অভিযাত্রার বর্ণনা লক্ষ করা যাক–

> পথে যেতে যেতে সহসা তাকাই ফিরে
> দূর অতীতের বিজিত অন্ধকারে,
> বিজ্‌লীর মতো আসে ঐ চিরে চিরে
> আদিম স্বজন : আদিম অহংকারে!
>
> চোখে ভাসমান লোমশ সবল বাহু
> হান্‌ছে আঘাত ম্যামথ-ক্রোধের বুকে
> মহা অরণ্যে কাঁপে জান্তব রাহু,
> আদিম পুরুষ চলছে কদম ঠুকে।
>
> আগ্নেয়গিরি : লাভানিঃস্রাবী আর
> কঠিন মৃত্যু ছড়ায় তুষার ঝড়,
> তবু অফুরান প্রাণশক্তির ধার :
> হৃৎপিণ্ডের শোণিত বৈশ্বানর!
>
> মানবেনা তারা নিসর্গ-সন্ত্রাস,
> অদম্য চোখ বিষুবরেখার দিকে,
> তাদের কাম্য : বিজয়ীর ইতিহাস

তারা থাক্‌বেই পৃথিবীর বুকে টিকে। (দিলওয়ার ১৯৯৮ : ১৫১/১)

উদ্ধৃতাংশে কবি তাঁর পূর্ব পুরুষের অদম্য অভিযাত্রার যে-বর্ণনা দিয়েছেন তা 'অনার্যতার' রঙে রাঙানো। বাঙালির এই 'অনার্য' অদম্য পূর্বপুরুষের শক্তিকে শুষে নিয়ে কবি বর্তমানের গর্বিত ইতিহাস নির্মাণ করতে চেয়েছেন। একারণে কবি ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানের সময় বললেন–

তাহলে আমার মিথ্যে শ্বাপদ-ভীতি,
পূর্বস্বজন ফসিলের গোর টুটে
আমাকে বিলায় দানবমারণ গীতি,
মরুক হতাশা তমশায় মাথা কুটে। (দিলওয়ার ১৯৯৮ : ১৫১/১)

১৯৬৯ সালে পূর্ব বাংলার কবিতায় বাঙালিত্বের এই অহংকারের মূলে কাজ করেছে তীব্র জাতীয়তাবাদী চেতনা এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই কবিতা নিঃসন্দেহে সমকালীন আন্দোলন-সংগ্রামের আগুনে ঘি ঢেলেছিল।

আল মাহমুদের †mvbwj Kwweb গ্রন্থের নামকবিতা 'সোনালি কাবিন'-এর পুরোটাই মূলত বাঙালি জাতির বিশিষ্ট নির্মাণে অনন্য হয়ে উঠেছে। পুরো কবিতায় তিনি 'বাঙালি কৌমের' স্বাতন্ত্র্য আর তার ধরন-ধারণ প্রকাশে তৎপর হয়ে উঠেছেন। উদাহরণ লক্ষ করা যাক–

শরমিন্দা হলে তুমি ক্ষান্তিহীন সজল চুম্বনে
মুছে দেবো আদ্যাক্ষর রক্তবর্ণ অনার্য প্রাচীন।
বাঙালি কৌমের কেলি কল্লোলিত কর কলাবতী
জানতো না যা বাৎসায়ন, আর যত আর্যের যুবতী। (আল মাহমুদ ২০০০ : ১০০)

কবিতাংশে সুস্পষ্টভাবে কবি যৌনতার রকমের প্রশ্নে 'বাঙালি কৌম'-কে 'বাৎসায়ন' এবং 'আর্য'-দের থেকে আলাদা করতে চেয়েছেন। একটি জাতি কেবল পোশাক-আশাক, ধর্ম-বিশ্বাস, খাদ্যাভাস আর বাহ্য-সাংস্কৃতিক চিহ্নের দিক থেকে আলাদা থাকে না, বরং যৌনতার উদ্‌যাপনের দিক থেকেও স্বতন্ত্র থাকে। একারণে এই কবি তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "আমি 'সোনালি কাবিনে' অন্য এক বাংলার চিত্র যা সুদূর অতীতের হয়েও সমকালেও দৃষ্টিগোচর, বয়ন করার চেষ্টা করেছি।" (আল মাহমুদ ২০০৩ : ১৬) আল মাহমুদ অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এই গভীর অথচ অপ্রকাশ্য বিষয়টির অবতারণা করে বাঙালিকে সমকালীন নাক-উঁচু আর ধর্মীয় পরিচয়নিষ্ঠ পাকিস্তানি জাতিত্বের ধারণা থেকে আলাদা করে দেখেছেন। খেয়াল করার বিষয়, কবি তাঁর নারীকে কী কী নামে সম্বোধন করেছেন। কবিতায় তিনি তাঁর নারীকে 'হরিণী', 'পানোখী', 'হংসিনী', 'বন্য বালিকা', 'প্রাণের শবরী', 'শ্যামাঙ্গী', 'কপোতী' ইত্যাদি নামে সম্বোধন করেছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি 'বাঙালি কৌমের' নারী সম্পর্কিত ধারণার প্রতিষ্ঠা করেছেন কবিতায়। শুধু নারী সম্পর্কিত ধারণার সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে নয়, বাঙালি জাতির ভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নির্মাণের প্রচেষ্টায় আল মাহমুদ তাঁর কবিতায় বলেছেন, 'মুকুন্দরামের রক্ত মিশে আছে এ-মাটির গায়'। আরো বলেছেন, 'আমার তো কপিলে বিশ্বাস'। উল্লেখ করেছেন, 'খনা', 'চর্যাপদ', 'মনসা', 'লোহার

Dhaka University Institutional Repository

বাসর', 'পুণ্ড্র নগর', 'শ্রীজ্ঞান', 'শীলভদ্র', 'আলাওল', 'তরুণ লালন' 'দরিদ্র বাউল'-এর প্রসঙ্গ। এর প্রত্যেকটি প্রসঙ্গ নিয়ে কবিতায় কবির দারুণ অহংকারের প্রকাশ ঘটেছে। এই অহংকার এবং ইতিহাসের উত্তরাধিকারের নির্মাণ-প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সমকালীন জাতীয়তাবাদী চেতনার মর্মমূলকে ধারণ করে অনন্য মাত্রা লাভ করেছে।[১৬] শুধু তাই নয়, তিনি কবিতায় বাঙালির অর্থনৈতিক বণ্টননীতি আর ধর্মনীতির– যেটি সমকালে সবচেয়ে বেশি আলোচিত– ধারণারও প্রকাশ ঘটিয়েছেন কবিতায়। কবির ভাষায়–

আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুষম বণ্টন,

পরম স্বস্তির মন্ত্রে গেয়ে ওঠো শ্রেণীর উচ্ছেদ,

এমন প্রেমের বাক্য সহাসিনী করো উচ্চারণ

যেন না ঢুকতে পারে লোকধর্মে আর ভেদাভেদ। (আল মাহমুদ ২০০০ : ১০৪)

ষাটের কবিতার মতো বাঙলিত্ব নিয়ে অহংকার বোধ করি বাংলাদেশের কবিতা আর কখনো এতটা মেতে ওঠেনি। ষাটে কবিদের এভাবে বাঙালিত্ব নিয়ে, এর সংজ্ঞায়ন নিয়ে ঋজু অবস্থান নেওয়ার মূল কারণটি ষাটের জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রবল প্রতাপের মধ্যেই সন্ধান করতে হবে।

অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী অবস্থান

পূর্ব বাংলা যে পাকিস্তানি শাসন-ত্রাশন আর শোষণে ক্রমাগত দীনতর হচ্ছিল, এটি ষাটের দশকে এসে কবিরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন খুব স্পষ্ট করে। একারণে হাসান হাফিজুর রহমান কবিতায় চকিতে বলেছেন, 'বংশপরম্পরায়/ কলোনি স্বদেশ আমার'। (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ১০৯/১) বিশেষত ষাটের শুরুতেই অর্থনৈতিক শোষণের বিষয়টি যতই স্পষ্ট হচ্ছিল, ততই কবিরা আরো স্পষ্টভাবে অনুভব করছিলেন পূর্ব বাংলার দীনা পরিস্থিতি। তাই ষাটের প্রথমার্ধে কবিদের কবিতায় কখনো চকিতে, কখনো একটু-আধটু পরিসর নিয়ে পূর্ব বাংলার দুঃখিনী, দীনা রূপটি ফুটে উঠেছে। পূর্ব বাংলার এই দীনা-দুখিনী রূপাঙ্কনের পেছনে কবিচৈতন্যে ক্রিয়াশীল থেকেছে এর প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের অবহেলা আর এর ওপর অব্যাহত অর্থনৈতিক শোষণ। যেমন, আল মাহমুদের এক কবিতায় লক্ষ করা যায় পূর্ব বাংলার এক দীনা রূপ–

দেয়ালের ফ্রেমে রাখা কে দুঃখিনী জলের জুলুস

পাথর ফাটানো ধারা সান্ত্বনার শব্দের মতন

তুমি কি জননী সেই, অভাবের শব্দের আভায় দলিত

বাংলার মানচিত্র এ ঘরের পেরেকে রয়েছো? (আল মাহমুদ ২০০০ : ৫৮)

বাংলাদেশের কবিতা বরাবরই রাজনীতিনিষ্ঠ। কিন্তু ষাটের দশকে গিয়ে বাংলাদেশের কবিতার চৈতন্যে অর্থনৈতিক সচেতনতার বিষয়টি ঢুকে পড়েছে। এটি বাংলাদেশের কবিতায় নতুন। চল্লিশের দশক থেকেই এই কবিতা রাজনীতি তথা জাতীয়তাবাদী চেতনার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলেছে। বাংলাদেশের কবিতা মূলত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার তীব্র আবেগে কম্পমান ছিল। এর পাশাপাশি ক্ষীণধারা হিসেবে ছিল আধুনিক জীবনবাদী একটি ধারা। পঞ্চাশের দশকে এসে বাংলাদেশের কবিতা নতুন প্রজন্মের হাতে

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিকতাবাদকে পরিপূর্ণভাবে আলিঙ্গন করে এগিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের কবিতার চরিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এনে দেয়। কবিতা রাজনীতিকে আলিঙ্গন করে অধিকতর উষ্ণ হতে থাকে। কিন্তু ষাটের দশকে এসে কবিতা পূর্ব বাংলার সার্বিক মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে ব্যাপকভাবে যুক্ত হতে থাকে। কবিতা রাজনীতি, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রনীতির পাশাপাশি অর্থনীতিকেও আত্মস্থ করে। বিশেষত ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে। কারণ এসময় পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রনৈতিক যাবতীয় সংঘাত-সংঘর্ষের মূলে আবিষ্কৃত হয় অর্থনীতি। বিশেষত ছয়দফা আন্দোলনের পর থেকে অর্থনৈতিক বিষয়টি সারা পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে প্রধান বিষয় হিসেবে দেখা দেয়। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যই পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এ বিষয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে। অর্থনৈতিক বঞ্চনা-বৈষম্য এবং তজ্জনিত ক্ষোভ-বিক্ষোভ, ন্যায্যহিস্যা বুঝে নেওয়ার জাতীয়তাবাদী চৈতন্য ষাটের কবিতাকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। অর্থাৎ কবিতা রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণকারী অর্থনীতির মধ্যে প্রবেশ করেছে। তবে স্মরণ রাখা জরুরি যে, এটি ষাটের কবিতার খালি চোখে দেখার মতো কোনো প্রবণতা নয়। এই প্রবণতাটি ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে ক্রিয়াশীল দেশ-কাল সচেতন অনেক কবির মধ্যে কখনো চকিতে কখনো পরিকল্পিতভাবে দেখা দিয়েছে। যেমন পূর্বোল্লেখিত হাসান হাফিজুর রহমানের ওই চরণ– ‘বংশপরম্পরায়/ কলোনি স্বদেশ আমার’– যখন কবি তাঁর কবিতায় চকিতে বলে ওঠেন, তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না যে, এই কবিচৈতন্যের মর্মে ক্রিয়াশীল রয়েছে অর্থনৈতিক বৈষম্যজাত জাতীয়তাবাদী চেতনা। আবার কবি যখন পূর্ব বাংলাকে ‘লুণ্ঠিত মজুরের’ বাংলা বা ‘শোষিতের বাঙলা’ বলেন, তখন কবির অর্থনৈতিক সচেতনতার কথাই প্রকাশিত হয়। একই সঙ্গে পক্ষ-বিপক্ষের বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উদাহরণ লক্ষ করা যাক–

> কুণ্ঠিত কৃষকের লুণ্ঠিত মজুরের
>
> লাঞ্ছিত শ্রমিকের বাঙলা
>
> জরামারীজীর্ণ ভাগ্য-বিদীর্ণ
>
> জেলে তাঁতি মাঝিদের বাঙলা।
>
> শোষিতের বাঙলা পতিতের বাঙলা
>
> পীড়িতের জননী বাঙলা
>
> ভিখারীর বাঙলা ভুখারীর বাঙলা
>
> অনাথের জননী বাঙলা। (সিকান্‌দার ২০১৭ : ৪৫৮)

এই কবিতার শোণিতে কবির অর্থনৈতিক শ্রেণিচেতনা আর বৈষম্য ও শোষণ প্রক্রিয়ার চেতনা বেশ স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে। আবার কোনো কোনো কবির কবিতার দিকে নজর দিলে দেখা যাবে, অর্থনৈতিক বৈষম্যের বোধ এত তীব্র যে, এই বোধ কবির ভাষাকে পর্যন্ত অসহিষ্ণু করে তুলেছে–

> হারিয়ে কানের সোনা এ-বিপাকে কাঁদো কি কাতরা?
>
> বাইরে দারুণ ঝড়ে নুয়ে পড়ে আনাজের ডাল,
>
> তস্করের হাত থেকে জেয়র কি পাওয়া যায় ত্বরা–

Dhaka University Institutional Repository

সে কানেট পরে আছে হয়তো বা চোরের ছিনাল! (আল মাহমুদ ২০০০ : ১০২)

উদ্ধৃতাংশের শেষ চরণে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ লুণ্ঠন আর পশ্চিম পাকিস্তানের সমৃদ্ধি অর্জনের বাস্তবতা যেভাবে ফুটে উঠেছে তা বিস্ময়কর বৈ কি। অথবা কবি যখন বলেন, 'তোমার দুধের বাটি খেয়ে যাবে সোনার মেকুর/না দেখার ভান করে কতকাল দেখবে চঞ্চলা?' (আল মাহমুদ ২০০০ : ১০২) তখন স্পষ্টই বোঝা যায়, অর্থনৈতিক লুণ্ঠন কবিচৈতন্যকে কিভাবে আঘাত করেছে, যার প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নিয়েছে এরকম দ্রোহী চরণ। একই ধরনের অর্থনৈতিক শোষণের প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে এসেছে আরো অনেক কবির কবিতায়। অনেক জায়গায় কবির মধ্যে শোষণের বোধের পাশাপাশি সেই শোষণের শোধ নেওয়া শপথও ব্যঞ্জিত হয়েছে–

আমার দেশের ফসল নিয়েছো তুমি
আমাকে দিয়েছো সমূহ সর্বনাশ
তোমার ওখানে মরুতে ফসল এলো
ধু ধু অনাহারে কেটেছে আমার দিন

তোমার পাপের তালিকা আমার কাছে
যত্নে রেখেছি আমারি রক্তে লিখে
শোধ নেবো শোনো একটি একটি ক'রে
আজকে তোমার মুক্তির পথ নেই। (ফজল ২১০২ : ১৪৭/১)

আবার কোনো কোনো কবির মধ্যে অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনার বিষয়টি এসেছে একটু ভিন্ন ভঙ্গি ও ভাষায়; অনেকটা যেন মার্কসবাদী চেতনার রঙে রঙিন হয়ে। মহাদেব সাহার GB Mn GB mb¨vm কাব্যগ্রন্থের 'আমার দুঃখগুলি' কবিতার এক পর্যায়ে কবি তাঁর সাধারণ দুঃখকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন–

হে আমার দুঃখগুলি, তোমার জন্যে কখন
বলো স্মরণের রম্য দীপ জ্বালাই,
কেননা আমাকে পুড়তে হয় প্রখর ভাদ্রের রৌদ্রে, যখন
লোকালয়ে সেতু বাঁধি, আর বাঁধ দিই প্রবল বন্যার
মুখে, কিংবা মে'র প্রত্যুষে শ্লোগানে প্রতিষ্ঠা
করি প্রাণের একান্ত কাছে সাহসের সুতীব্র
সূর্যটা এনে, তবুও ক্ষুধায় দুর্বল শিশুটা দেখো
ভেঙে পড়ে অবাধ্য রোদনে। (মহাদেব ২০১১ : ৪১/১)

জনমনে অর্থনৈতিক শোষণের বিষয়টি একদিনে খোলাসা হয়নি। ক্রমে ক্রমে অথনৈতিক বঞ্চনার বিষয়টি পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। বিশেষত ছয়দফা আন্দোলন বিষয়টিকে গণ পর্যায়ে নিয়ে এসেছিল। ছয়দফা গণভিত্তি পেয়ে গেলে সেই গণচৈতন্য ছায়া ফেলেছে কবিদের চেতনায় এবং অর্থনৈতিক শোষণ আর তা থেকে মুক্তির বিষয় কবিতায় বাঙ্ময় হয়েছে। কোনো কোনো কবি শোষকের বিরুদ্ধে সবাইকে সোচ্চার হতে বলেছেন একটু ব্যঙ্গাত্মকভাবে। কবি অনুভব করেছেন 'ত্রাণকর্তা' হিসেবে আগত

Dhaka University Institutional Repository

কালো পোশাকধারী ‘বিরাণ’ অঞ্চলের অধিবাসী মূলত শোষক আর প্রবঞ্চক। তাই সবাইকে কবি আহ্বান করেছেন ‘মানুষখেকো’ শোষক খেদাবার জন্য–

ভাবতে ভাবতে যখন চোখে
কাটলো ধুলোর ধাঁধা
চিনলো সবাই, বন্ধু বেশে
কালকেউটের দাদা
কিংবা বিকট হালুম-দেঁতো
মানুষ খেকোর খুড়ো
ঠাঁই নিয়েছে কাঁধে যেমন
সিন্দাবাদের বুড়ো।

জিন-খ্যাদাবার মন্ত্রপড়া
এমন মরিচ-গুড়ো
হাজার হাজার ভাঙা কুলোয়
উড়ো সবাই উড়ো। (সিকান্দার ২০১৭ : ৪২৪)

ষাটের কবিতার অর্থনৈতিক সচেতনতার যে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে, তাকে কেউ মার্কসবাদী চিন্তার জায়গা থেকে দেখতে পারেন। এও বলতে পারেন বাংলাদেশের কবিতায় এই প্রবণতা নতুন নয়। সেক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যে, ষাটের দশকের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণকারী অনুষঙ্গ ছিল পাকিস্তানিদের অর্থনৈতিক শোষণ। এই বিষয়টি তখন গ্রামের কৃষক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। আর তাছাড়া কবিতার প্রকাশভঙ্গির মধ্যে যে আক্রমণাত্মক রূপ লক্ষ করা যায়, তাতে এটি খুব সহজেই বোঝা যায় যে, এই কবিতা সমকালের বাস্তবতার গর্ভজাত। আল মাহমুদ বা সিকান্দার আবু জাফরের কবিতায় পশ্চিম ব্যবহৃত বিশেষণগুলোর মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের পরিচয়টি একেবারেই অস্পষ্ট থাকেনি। এই কবিতাকে মার্কসবাদী শাশ্বত শ্রেণিদ্বন্দ্ব বা শ্রেণিশোষণের জায়গা থেকে দেখার কোনো সুযোগ নেই।

কবিতায় আত্মত্যাগের দর্প

ষাটের দ্বিতীয়ার্ধ পূর্ব বাংলার মানুষের পাকিস্তানের প্রশ্নে দ্বিধামুক্তির কাল– একথা আগেও বলা হয়েছে। এসময় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে ক্রমে উত্তীর্ণ হচ্ছিল। যেকোনো জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে যেকোনো জাতির জনচৈতন্যে দেখা দেয় দেশ-মাতৃকার প্রয়োজনে আত্মাহুতির উন্মাদনা। যেকোনো আত্মত্যাগের প্রস্তুতি নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার বিষয়টি জাতীয়তাবাদী আবেগের স্বভাবের অংশ। উনসত্তর থেকে শুরু করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সময়ে জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের জন্যে বাঙালির মধ্যে দেখা দেয় আত্মত্যাগের মহিমায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ-সংগ্রাম গড়ে তোলার প্রবণতা। এই প্রবণতার চিহ্ন পড়েছে সমকালের কবিতার মধ্যে। ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামে যেসব মানুষ আত্মত্যাগ করেছিল, বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল, তাদের রক্তের পথ ধরে যে একদিন আরো মানুষ জেগে উঠবে, আরো মানুষ আত্মত্যাগ করবে, তাদের রক্ত যে ‘ব্লাডব্যাংকে’ জমা হচ্ছে– একথাও কবিতায় এসেছে। অর্থাৎ কবিদের কবিতায় আত্মত্যাগ যেন এক

Dhaka University Institutional Repository

প্রকার বিনিয়োগ হয়ে উঠেছে, এক প্রকার দর্পের মনোভঙ্গিও কবিদের কবিতায় অলক্ষ থাকেনি। উদাহরণ দেখা যাক–

বাঙলার মাটিতে কেমন রক্তপাত হচ্ছে প্রতিদিন
প্রতিটি পথিক কিছু রক্ত রেখে যায় ব্লাডব্যাংকে : বাংলার মাটিতে
জমা রাখে ভবিষ্যৎ ভেবে

প্রতিটি শ্রমিক তার চলার কুটিল পথে রাখে রক্তসূর্যবীজ
ইস্কুলের শিশুছাত্র যুবতীযুবক
গ্রামবাসী চাষী রিকশাঅলা বুড়ো ক্যানভাসর
জীর্ণ মাঝি পদ্মার চিরকাল দণ্ডিত ধীবর
সবাই রক্ত রাখে ব্লাডব্যাংকে : বাঙলার মাটিতে
বাংলার সব রক্ত তীব্রভাবে মাটি অভিমুখি

শুকোতে পারেও পদ্মা উবে যেতে পারেও সাগর
বাঙলার নিসর্গমালা একদিন ঝ'রে যেতে পারে
তবু এই রক্ত থেকে একদিন
পাবোই নতুন পদ্মা নিসর্গমালা উঠে যাওয়া সেই গ্রামটারে...

বাংলার মাটির মতো ব্লাডব্যাংক আর নেই
একবিন্দু লাল রক্ত
দশ বিন্দু হয়ে যায় সেই ব্যাংকে রাখার সাথেই...। (হুমায়ুন ২০০৮ : ২৮-২৯)

মৃত্যু অবধারিত জেনে মিছিলে যাওয়া, মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া, শপথের আগুনে ঝাঁপ দেওয়া, ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও হুশিয়ারি উচ্চারণ করা– এই বিষয়গুলো ষাটের শেষের দিকের কবিতাকে আলাদা তাৎপর্য দান করেছে। এপর্বেই কবি উচ্চারণ করেছেন, 'জীবনটাকে কাড়তে হলে/নির্বিচারে মানতে হবে/লক্ষ মরার দাবী।' (সিকান্দার ২০১৭ : ৪৩০) ষাটের কবিতার উপর্যুক্ত তাপ লক্ষ করা যায় কবির নিম্নোক্ত উচ্চারণে–

আর আসবো না বলে মিছিলের প্রথম পতাকা
　　　　তুলে নিই হাতে।
আর আসবো না বলে
সংগঠিত করে তুলি মানুষের ভিতরে মানুষ।
কথার ভেতরে কথা গেঁথে দেওয়া, কেন?
আসবো না বলেই। (আল মাহমুদ ২০০০ : ১২১)

এই আর না আসার জন্যে মিছিলে যাওয়া বা আত্মোৎসর্গ করার মূল কারণ তীব্র জাতীয়তাবোধ আর স্বদেশপ্রেম। 'যদি লুটিয়ে দেবার তাগিদ আসে/জীবনটাকে/যে-জীবন ঝরুক তোমার নিজের দায়ে/' (সিকান্দার ২০১৭ : ৪৩১)– একথা ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের অসংখ্য কবিতায় বাণীরূপ লাভ করেছে। আরো উদাহরণ দেখা যাক–

Dhaka University Institutional Repository

আমরা সবাই প্রাণের চেয়েও বাসি যে ভালো
বাংলাদেশের নদী প্রান্তর আকাশ নীল
দোয়েল কোয়েল ফিঙে হরিয়াল পাহাড় ঝিল–
সবখানে যেথা একই ধ্বনি শুনি 'রক্ত ঢালো'। (ফজল ২০১২ : ১০২/১)

একই কবি 'মুক্তিযোদ্ধাকে' যেন আদেশ করছেন 'রক্তস্রোতে ভেলা ভাসাতে।' কবির ভাষায়–

অপার স্নেহের শিখা প্রসারিত এই মাতৃভূমি
রক্তমাখা অন্ধকারে ঢাকা
রক্ত ঝ'রে বাংলাদেশে মৃত্যু থেকে জন্ম নিলে তুমি
হাতে নাও তোমার পতাকা

সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের মতো ভয়ঙ্কর দুরন্ত দুর্বার
এ আঁধার করো ছিন্নভিন্ন
ভাসাও তোমার ভেলা রক্তস্রোতে, মৃত্যু নেই আর–
জল্লাদের নিঃশেষ নিশ্চিহ্ন। (ফজল ২০১২ : ১৫০/১)

সিকান্দার আবু জাফর তাঁর কবিতায় সরাসরি বাংলার জনগণকে রীতিমতো নির্দেশ দিয়েছেন 'প্রলয় ঝড়' তুলতে। কারণ কবি অনুভব করেছেন অনেক আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি এখন অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। এখনই সময় শোষকের দুর্গ ভেঙে দেয়ার এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার। প্রতিরোধ গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়ে কবি বলেছেন, 'বাঘ-ভালুকের বন পেরিয়ে/ফাঁকায় যখন পৌঁছে গেছো এসে/ক্লান্তি ঝড়ো উপহাসের শার্সিভাঙা/কাচের হাসি হেসে।/ওই তো সামনে ঘর/ফটক ভাঙতে এখন সবাই/তোলো প্রলয় ঝড়।' (সিকান্দার ২০১৭ : ৪৩৬-৪৩৭) অন্য এক কবি কবিতায় অহংকৃত হয়েছেন আত্মাহুতি দানকারীদের নিয়ে। কারণ বাহান্ন থেকে একাত্তর পর্যন্ত তাঁদের আত্মাহুতির দৃষ্টান্তেই আত্মোৎসর্গের জন্য নিঃসংকোচে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সাত কোটি মানুষ। মুক্তিযুদ্ধকালীন যে চূড়ান্ত জাতীয়তাবাদী জাগরণ সে তো ওই আত্মত্যাগেরই ধারাবাহিকতা; সেই তো পরবর্তী বাংলাদেশ। কবি বলেছেন–

আমি কোন শহীদের স্মরণে লিখব?
বায়ান্ন, বাষট্টি, উনসত্তর, একাত্তর;
বাংলার লক্ষ লক্ষ আসাদ মতিউর আজ
বুকের শোণিতে উর্বর করেছে এই
প্রগাঢ় শ্যামল।

শহীদের পুণ্য রক্তে সাতকোটি
বাঙালীর প্রাণের আবেগ আজ
পুষ্পিত সৌরভ। বাংলার নগর বন্দর
গঞ্জ বাষট্টি হাজার গ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

ধ্বংসস্তূপের থেকে সাত কোটি ফুল
হয়ে ফোটে। প্রাণময় মহৎ কবিতা
আর কোথাও দেখি না এর চেয়ে। (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৯৮ : ১৫০-১৫১)

আবার কখনো কখনো কবিরা শহিদদের আত্মোৎসর্গের বিষয়কে মহিমান্বিত করে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামকে আরো বেশি প্রাণিত ও বেগবান করেছেন। একজনের আত্মত্যাগকে স্বাধীনতার স্বপ্নপূরণের একটি সিঁড়ি হিসেবে দেখেছেন।[১৭]

স্বাধীনতার শপথ ও প্রতিরোধ

ষাটের দশকের উপান্তে, বা বলা যায় ৭০-এর পরে বাঙালির মধ্যে স্বাধীনতার স্বপ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বাধীনতার বাসনায় আন্দোলিত হতে থাকে সমগ্র পূর্ব বাংলা। নির্বাচনে জয়লাভের পরও ক্ষমতা হস্তান্তরের বিচিত্র তালবাহানা বাঙালিকে ক্রমাগত সন্দিহান আর উত্তেজিত করে তোলে। ১৯৭১ সালের শুরু থেকেই পূর্ব বাংলায় চলতে থাকে ক্রমাগত হরতাল অবরোধ আর বিপরীতে চলতে থাকে পাকিস্তানি সেনা-পুলিশের দমন-নির্যাতন। ইথারে ভাসতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব বাংলা আক্রমণের খবর। দিন যত গড়িয়েছে পূর্ব বাংলা তত দ্বিধাহীন ফুঁসে উঠেছে; পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে স্বাধীনতার বিষয়টি অনিবার্য হয়ে উঠেছে। কবিদের লেখনীতেও বাণীবদ্ধ হতে শুরু করেছে যেন কবিতা নয় ঘোষণা–

রক্তচোখের আগুন মেখে ঝলসে-যাওয়া
আমার বছরগুলো
আজকে যখন হাতের মুঠোয়
কণ্ঠনালীর খুনপিয়াসী ছুরি,
কাজ কি তবে আগলে রেখে বুকের কাছে
কেউটে সাপের ঝাঁপি!
আমার হাতেই নিলাম আমার
নির্ভরতার চাবি;
তুমি আমার আকাশ থেকে
সরাও তোমার ছায়া,
তুমি বাংলা ছাড়ো। (সিকান্দার ২০১৭ : ৪৭২)

এই কবিতার ঘোষণার মর্মমূলে রয়েছে প্রবল গণজাগরণ। এই রাজনৈতিক গণজাগরণের বাস্তবতার মধ্যে কবিদের কবিতায় রচিত হতে শুরু করেছে স্বাধীনতার কবিতা; পাকিস্তানি আক্রমণ-নির্যাতনের কথা। এসব কবিতায় পাকিস্তানি আক্রমণ, নিরীহ বাঙালি নিধনের পরিস্থিতি যেমন সরাসরি ভান-ভণিতা ছাড়া উঠে এসেছে, তেমনি উঠে এসেছে বাঙালির প্রতিরোধ আর স্বাধীনতার প্রশ্নে দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা–

রৌদ্র যার বন্ধু ছিল, বৃষ্টি যার গোপন-প্রেমিকা,

Dhaka University Institutional Repository

অগ্নি যার বুকের উল্লাস, বাংলার মাটি ছুঁয়ে
সে এখন প্রতিবাদী মুখোমুখি দুরন্ত যুবক।
তাড়াতে তাড়াতে তুমি কতদূর নেবে তাকে?
এই তো আবার আমি ফিরে দাঁড়িয়েছি।

আশৈশব স্বাধীনতা লোভে যে যুবক
হিংসাহীন প্রেমের বিক্ষোভে বলেছিল :
'যুদ্ধ নয়, ভালোবেসে জিতে নেবো তারে'
মানুষের মৃত হাড়ে সে এখন মৃত সশস্ত্র সন্ত্রাস।
তাড়াতে তাড়াতে তুমি কতদূর নেবে তাকে?
এই তো আবার আমি ফিরে দাঁড়িয়েছি। (নির্মলেন্দু ২০১১ : ৭২/১)

অন্য কবির কবিতায় ফুটে উঠেছে নিধন আর প্রতিরোধী চেতনা–

নদীর ওপরে ঢেউ নেই শান্ত বিশাল বিকেল
যাচ্ছে ভেসে ছিন্ন ভিন্ন মৃতদেহগুলি
আর কতোকাল আর কতোদূরে স্বাধীনতা তুমি
অস্ত্র দাও অস্ত্র চায় মৃতের অঙ্গুলি। (ফজল ২০১২ : ১৪৫/১)

কবিতাংশে একই সঙ্গে পূর্ব বাংলার বাঙালির অসহায়তা আবার স্বাধীনতার দীপ্ত বাসনার কথা রূপময় হয়ে উঠেছে। এসব কবিতাকে জাতিরাষ্ট্র গঠনের মন্ত্রবলে উদ্বুদ্ধ জনগণ যেমন প্রেরণা জুগিয়েছে, তেমনি এসব কবিতাও সমকালে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে আরো শাণিত ও শক্তিশালী করে তুলেছে। কবি যখন বলেন, 'বাংলাদেশ রক্তে ভেজা মৌন এক অন্ধকার/বাংলাদেশ শপথ নেয় তীক্ষ্ণ এক স্বাধীনতার/ বাংলাদেশ বিশাল এক অগ্নিব্যূহ প্রজ্বলিত/ বাংলাদেশ মিছিল কাঁপা শ্লোগান দেয়া আন্দোলিত' (ফজল ২০১২ : ১৪৪/১) তখন পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানি বর্বরতায় আক্রান্ত বাঙালির অসহায়তাকে যেমন প্রকাশ করে, তেমনি তা একই সঙ্গে প্রকাশ করে বাঙালির স্বাধীনতার লড়াই-সংগ্রামের দৃপ্ত শপথকে। অসহায়তা আর শপথ এদুয়ের মিশ্রণই জাতীয়তাবাদী চেতনাকে দারুণভাবে উস্কে দিয়েছে। এ যেন শোক আর শক্তির যুগলবন্দি।[১৮] এক অর্থে দুটিই আসলে সমকালে শক্তিজাগানিয়া উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। এভাবে ১৯৭০-সংলগ্ন অসংখ্য কবিতা জাতীয়তাবাদী চেতনার উৎসভূমি হয়ে উঠেছে। আবার কিছু কবিতায় অতীতকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে কবি বর্তমানের প্রতিরোধ আর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকেই মুখ্য করে তুলেছেন–

বাংলাদেশে শস্যশ্যাম মাঠ
একদা ছিলো এখন আর নেই
বাংলাদেশে অনেক ধান পাট
কখনো ছিলো এখন আর নেই

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে খ'য়ের খাঁর দল

একদা ছিলো এখন আর নেই

বাংলাদেশ শপথে চঞ্চল

স্বাধিকার সে ফিরিয়ে আনবেই। (ফজল ২০১২ : ১৮৬)

শামসুর রাহমান তাঁর e›'x wkwei †_‡K কাব্যে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন স্বাধীনতার প্রশ্নে। তিনি বলেছেন, স্বৈরশাসন তাঁর বাক-স্বাধীনতা হরণ করেছে। বিশেষত, স্বাধীনতা নামক শব্দটি কবি লিখতেই পারেন না। কারণ তাঁকে লিখতে দেওয়া হয় না। কিন্তু ষাটের দশকের একেবারে উপান্তে পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যকার জাতীয়তাবাদী জাগরণ কবিকে দৃঢ় প্রত্যয়ী করেছে। কবি মনে করেন স্বাধীনতার বিষয়টি এখন আর কেবল কবি এবং কবির কবিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটি এখন স্বপ্নাঞ্জন মেখে দিয়েছে কোটি বাঙালির চোখে। কবির ভাষায়–

অথচ জানে না ওরা কেউ

গাছের পাতায়, ফুটপাতে

পাখির পালকে কিংবা নারীর দু'চোখে

পথের ধুলায়

বস্তির দুরন্ত ছেলেটার

হাতের মুঠোয়

সর্বদাই দেখি জ্বলে স্বাধীনতা নামক শব্দটি। (শামসুর ২০১২ : ৩২৬/১)

একই ধরনের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে কবি যখন বলেছেন, 'পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত জ্বলন্ত/ঘোষণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে,/নতুন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক/এই বাংলায়/তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা।' (শামসুর ২০১২ : ৩২৮/১)

অপশাসন আর স্বৈরাচার বিরোধিতা

জাতীয়তাবাদী চেতনার অন্যতম চরিত্র হচ্ছে, সে বিদ্যমান শাসক আর শাসনব্যবস্থাকে জুলুমবাজ আর স্বৈরাচারী মনে করে। কারণ জাতীয়তাবাদ মূলত শক্তি সঞ্চার করে বিদ্যমান শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করে। সমগ্র ষাটের দশকের জাতীয়তাবাদী যাবতীয় আন্দোলন-সংগ্রামের চরিত্র আর ভাষা লক্ষ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই চরিত্র আর ভাষা সমকালীন কবিতাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। একারণে কবিতার ভাষা আর চৈতন্যে বিদ্যমান শাসক আর শাসনব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা, বিদ্রূপ, বিরোধিতা আর প্রতিবাদ একটি সাধারণ লক্ষণ হয়ে উঠেছিল। ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানের সময় আইয়ুব খানকে তীব্র আক্রমণ করে লেখা একটি কবিতা দেখলেই বোঝা যাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম বাঙালি জাতি তথা কবিদের কতটা দ্রোহী আর ভয়শূন্য করে তুলেছিল–

Dhaka University Institutional Repository

যতই মুখোস নাও না মহারাজ
ধুলোর দামে বিকিয়ে যাচ্ছে তাজ।
সঙ্গী সাঙাৎ যাকেই ডাকো পাশে
কিলবিলিয়ে শ্মশানপাড়ার
বাসিন্দারাই আসে।

মানুষ কোথা?
মানুষ তো সব তোমার পোষা
মানুষখেকোর পেটে
অমনি ভয়ে দুয়োরে খিল এঁটে
গন্ধগোকুল– ঢাকতে কটুগন্ধ যতই
মাখছো মৃগনাভি
চেয়ে দেখছো অপর হাতে
তোমার প্রাণের চাবি।

তোমার ছোঁয়ার খরায় পুড়ে
গোটা দেশ যে-মাঠ হয়েছে আজ
সেই মাঠেতেই নিলাম হচ্ছে
তোমার মাথার তাজ। (সিকান্‌দার ২০১৭ : ৪২২)

যেমন শামসুর রাহমানের wbR evm f‡g কাব্যের ‘পক্ষপাত’ কবিতায় কবি বলেছেন–

আমি কালো অরণ্যের সুকান্ত বাঘকে ভালোবাসি,
কেননা সে একনায়কের
মতো কোনো সুপরিকল্পিত
সর্বগ্রাসী শত্রুতা জানে না। (শামসুর ২০১২ : ৩০৮/১)

জাতীয়তাবাদী জাগরণকে সমর্থন আর স্বৈরশাসনের ধ্বংসকামনায় কবি বলেছেন, ‘জনতার মুঠো ভরে প্রতিবাদে পোড়া বুক থেকে/রক্তনালিতে রক্ত আসে মাটি থেকে/কেবল আসেই নিঃশেষ হয় না/জান্টার রাইফেল সহজেই তেতে ওঠে/ব্যবহার উপযোগিতা হারিয়ে ফেলে কামান মর্টার/দুদিনেই ফৌত হয় বুলেট বারুদ গোলাগুলি।’ (হুমায়ুন ২০০৮ : ৫৫) আবার নিচের কবিতাংশেও কবি স্বকালের শাসক আর শাসনব্যবস্থার নীরব অথচ তুমুল সমালোচনায় মুখর হয়েছেন–

কোকিল, কুকুর, হাঁস, টিকটিকি ইত্যাদি ইত্যাদি
আটক করে না জেলে তোমাদের কেউ কিংবা
গোয়েন্দা নেয় না পিছু, তোমাদের অলিতে গলিতে
কারফ্যু হয়না জারি অতর্কিতে। তোমাদের কেউ

Dhaka University Institutional Repository

করে না শোষণ কোনো দিন; কেননা তোমরা নও

ঈর্ষণীয় সেই জাতি বস্তুত মানব যার নাম। (শামসুর ২০১২ : ৩০৯/১)

স্বৈরশাসনের ছায়াতলে কবি কথা বলতে গিয়ে অনুভব করেছেন এখানে বাক-স্বাধীনতা নেই। কবি তাঁর কহতব্যকে মনের মতো ভাষায় প্রকাশ করতে পারছেন না। একারণে শামসুর রাহমান তাঁর ।bR evmf‡g কাব্যের 'দুঃস্বপ্নের একদিন' কবিতায় ঘরের আসবাবপত্র, গাছ, কাঠবেড়ালি, গাছের পাতা, প্রতিটি ফুল, শিশিরের প্রতিটি বিন্দু, আকাশের যত নক্ষত্র সবাইকে বাক্-স্বাধীনতা দিতে চেয়েছেন। কবি বলেছেন, 'ওরা কথা বলুক যে যার কথা, যেমন ইচ্ছা, যেমন ইচ্ছা বলুক।/সত্যাগ্রহের আগেই/ওদের সবাইকে আমি বাক-স্বাধীনতা দিতে চাই।' (শামসুর ২০১২ : ৩২২/১) এই অবরুদ্ধতা, বাক্-স্বাধীনতার অনুপস্থিতি শামসুর রাহমান তাঁর e›`x wkwei †_‡K (১৯৭২) কাব্যের নামকবিতা 'বন্দী শিবির থেকে'-তেও অনুভব করেছেন। সেখানে কবি অবশ্য স্বাধীনতা বলতে বলার-লেখার স্বাধীনতার কথা বলেই একটি গুরুতর শব্দের উচ্চারণ করেছেন। শব্দটি 'স্বাধীনতা'। এই শব্দই তো জাতীয়তাবাদী চেতনার চূড়ান্ত স্তর। কবিতাটির একটি অংশ দেখা যাক—

অথচ এ দেশে আমি আজ দমবন্ধ
এ বন্দী শিবিরে,
মাথা খুঁড়ে মরলেও পারিনা করতে উচ্চারণ
মনের মতন শব্দ কোনো।
মনের মতন সব কবিতা লেখার
অধিকার ওরা
করেছে হরণ।

প্রকাশ্য রাস্তায় যদি তারস্বরে চাঁদ ফুল পাখি
এমনকি নারী শব্দাবলি
করি উচ্চারণ, কেউ করবে না বারণ কখনো।
কিন্তু, কিছু কিছু শব্দকে করেছে
বেআইনি ওরা
ভয়ানক বিস্ফোরক ভেবে।
স্বাধীনতা নামক শব্দটি
ভরাট গলায় দীপ্ত উচ্চারণ করে বার বার
তৃপ্তি পেতে চাই। শহরের আনাচে-কানাচে
প্রতিটি রাস্তায়
অলিতে গলিতে
রঙিন সাইনবোর্ডে, প্রত্যেক বাড়িতে

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা নামক শব্দটি

লিখে দিতে চাই

বিশাল অক্ষরে।

স্বাধীনতা শব্দ এত প্রিয় যে আমার

কখনো জানিনি আগে। উঁচিয়ে বন্দুক

স্বাধীনতা, বাংলাদেশ– এই মতো শব্দ থেকে ওরা

আমাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখছে সর্বদা। (শামসুর ২০১২ : ৩২৫-৩২৬/১)

নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় খুব স্পষ্ট করে বলা হয়েছে পাকিস্তানি শোষণ আর শাসনের কথা। কবি কোনো প্রকার ভান-ভণিতা না করেই বলেছেন স্বৈর শাসক আবদুল গণি রোডে হত্যা করেছে নিষ্পাপ কিশোরকে। তাই কবি স্বৈর শাসন থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে রাজপথকেই বেছে নিয়েছেন। স্বৈর শাসন আর অপশাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী জাগরণের ধরন প্রকাশ করতে গিয়ে কবি তাঁর †cgvsïi i³ PvB (১৯৭০) কাব্যে বলেছেন–

তুমি বললে তাই আমরা এগিয়ে গেলাম,

নিষ্পাপ কিশোর মরলো আবদুল গণি রোডে।

তুমি বললে রাজপথ মুক্তি এনে দেবে,

আমরা ভীষণ দুঃখী, নিপীড়িত শত-অত্যাচারে

‘গীতাঞ্জলি’ অকর্মণ্য হবে।

আমরা তাই রঙিন-প্ল্যাকার্ড

সাজিয়েছি মাও সে তুং, গোর্কি, নজরুলে। (নির্মলেন্দু ২০১১ : ৩০/১)

প্রথাগত জীবনে অস্বীকৃতি

একটি জাতির জীবনে যখন জাতীয়তাবাদী জাগরণ সর্বব্যাপী হয়ে ওঠে, তখন প্রথাগত জীবন আর তার যাপন-প্রণালী পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়। গৃহী, সংসারী, কাব্যময় পেলব জীবন থেকে ওই জনগোষ্ঠী বেরিয়ে আসে। শুরু হয় তাদের সংগ্রামী জীবন। এই জীবনের সম্মোহন কেউই এড়াতে পারে না। জাতীয় জীবন যেখানে সংগ্রামমুখর, তীব্র প্রশ্নের সম্মুখীন, কঠোর কঠিন গদ্যের মুখোমুখি, সেখানে কে প্রেম-ভালোবাসা আর ফুলের মধ্যে থাকতে চায়! কে বসে বসে সৌন্দর্যের জাল বোনে! এইসব মুহূর্তেই কবিরা বলেন, ‘প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য’। এইসব মহূর্তেই ‘রাইফেল কাঁধে বনে জঙ্গলে যুবক’ ঘোরে। অথবা যে-কিশোরের শুধুই স্কুলে যাওয়া-আসা করার কথা থাকে সে যায় মিছিলে। আর কবি এইসব মুহূর্তেই কিশোরের মধ্যে আবিষ্কার করেন এক ভিন্ন মানুষকে, যে-কিনা প্রথাগত জীবনাচারকে অস্বীকার করে মুষ্টিবদ্ধ হাত তোলে রাজপথে। আর তার গতিবিধির মধ্যে খুঁজে পায় অস্বাভাবিকতা। কবির মনে তখন প্রশ্ন জাগে–

একহারা শরীর দোহারা জামা, দু’হাত যেনো দগ্ধ তামা’

Dhaka University Institutional Repository

অভিমানে বাড়ি ফেরোনা, রক্ত চক্ষু শক্ত চোয়াল

সূর্য ঘেরা সকল দেয়াল ভেঙে তুমি কোথায় যে যাও...

অভিমানে বাড়ি ফেরো না বাড়ি ফেরোনা!

উত্তোলিত হাতের মুষ্ঠি, কী তুমি চাও?

সর্বনাশ? না সুহৃদ আকাশ? ফিরে তাকাওনা, রাস্তা চলো? (আবুল হাসান ২০১২ : ৫৩)

জাতীয় জীবনে যখন সংকট চলে, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে, তখন প্রেমের আলাপের ভাষা আর অনুষঙ্গেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। প্রেমিক-প্রেমিকার অভ্যস্ত গতানুগতিক প্রথাগত সম্পর্কের মাঝখানে এসে নীরবে জায়গা করে নেয় দেশ-জাতি। একারণে দেখি প্রেমিকাই বলে দিচ্ছে দেশের ক্রান্তিকালে নির্জন প্রেম অপ্রাসঙ্গিক–

তুমি বোললে পাপ, ক্রান্তিকালে নির্জনতা,

ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতা খোঁজা,

আমি তাই আলোড়িত সশব্দ মিছিলে

পল্টনের জনাকীর্ণ মাঠে জিন্দাবাদ। (নির্মলেন্দু ২০১১ : ৩০/১)

এই ধরনের চেতনা আমরা লক্ষ করি ষাটের দশকের উপান্তের কবিতায়। যেমন, শামসুর রাহমান তাঁর e›`x wkwei †_‡K কাব্যের ‘প্রতিশ্রুতি’ কবিতায় বলেছেন–

আমাদের বুকে জ্বলে টকটকে ক্ষত,

অনেকে নিহত আর বিষম আহত

অনেকেই। প্রেমালাপ সাজে না বাগানে

বর্তমানে আমাদের। ভ্রমরের গানে

কান পেতে থাকাও ভীষণ বেমানান

আজকাল। সৈন্যদল অদূরেই দাগছে কামান। (শামসুর ২০১২ : ৩৩২/১)

বাংলাদেশের কবিতা এই ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে দুইবার। একবার প্রাক্-পাকিস্তান পর্বে, আরেকবার ষাটের দশকে। দুই পর্বের কবিতা জাতীয়তাবাদের দুই ভিন্ন মূর্তিকে রূপায়িত করে বিশেষ হয়ে উঠেছে।

বিকল্পের অনুসন্ধান অথবা এস্টাবলিশমেন্ট বিরোধিতা

বিদ্যমানে অসন্তোষ মানুষের মধ্যে বিকল্পের বোধ জাগায়। অনেক মানুষের বিকল্পের ভাবনা যুক্ত হলে তখন তা এক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। সময় এবং সুযোগ মতো তখন সেই বিচিত্র-বিকল্প একীভূত হয়ে সম্ভব করে তোলে নতুনের উদ্বোধন; জাগরণ। ষাটের প্রথমার্ধ স্বৈরশাসনের দাপটে অস্থির এক সময় ছিলো পূর্ব বাংলায়। পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে বিকল্পের বোধ এই সময় থেকে দানাদার হয়ে উঠতে থাকে। একারণে দেখা যায় ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর দিকের কবিতায় অনেক কবির মধ্যে প্রচলকে অস্বীকার করে বিকল্পের

Dhaka University Institutional Repository

জন্যে অস্থিরতা প্রকাশিত হয়েছে। একে এক ধরনের এস্টাবলিশমেন্ট বিরোধিতাও বলা যায়। স্টাবলিশমেন্টের মধ্যে ব্যক্তি বা কোনো গোষ্ঠী যখন নিজের কাঙ্ক্ষিত স্থানটি পায় না অথবা মুক্তির সংকট বোধ করে, তখন ব্যক্তি এস্টাবলিশমেন্ট-বিরোধী হয়ে ওঠে; বিকল্পবান্ধব হয়ে ওঠে। ষাটের দশকের যেকোনো পর্বের একজন কবির বিকল্পের অনুসন্ধানী বা এন্টি-এস্টাবলিশমেন্ট হয়ে ওঠা কোনো নিরীহ বিষয় ছিল না। এর সঙ্গে রাজনৈতিকতার একটা সম্পর্ক সহজেই আবিষ্কার করা যায়। এটি এক প্রকার বিকল্প রাষ্ট্রের, বিকল্প জাতির, বিকল্প স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশই বটে। ষাটের কবিদের কবিতায় বিকল্প বোধের একটা সুলুক সন্ধান করলেই বিষয়টি স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। হুমায়ুন আজাদ যখন তাঁর কবিতায় বলেন, 'পিতামহদের পাজামাপাঞ্জাবি ভ'রে প'চে গ'লে/লেগে আছে নোংরা মূল্যবোধ/আব্বার আস্তিনে শুধু শয়তানি/তার ট্রাউজারের প্রতিটি বোতাম প্রতিক্রিয়াশীল' (হুমায়ুন ২০০৮ : ৪৭) তখন সহজেই বোঝা যায় কবি প্রচলকে অস্বীকার করে বিকল্পের সন্ধানী হতে চাচ্ছেন। আবার আবুল হাসান তাঁর কবিতায় অস্বীকার করেছেন বর্তমানের শহরকে। ডুব দিতে চেয়েছেন, অভিযাত্রা করতে চেয়েছেন বিকল্প শহরে–

আমি সভ্যতার পরোয়া করি না; সমস্যায় শূন্যতায় এ শহর যদি ফের
শত্রু কবলিত হয়,– হলে হোক– মহামারী বাড়ুক পাঁজরে আর
মাংসের ভিতরে তার অন্ধকার আগ্রাসী আভায়
ঝরে যায় যদি সব, পুড়ে যায় যদি প্রেম, থোকা থোকা
আমাদের সে উদ্ধত অভিজ্ঞান, ধন্য সব আশা কুহকিনী,
আমি তবু পরোয়া করিনা আমি যে শহরে যাব,

সে তো শিল্প, সে তো 'সারাদিন'– পুনর্বার বাংলাভাষার
সে তো ভোর, রঙ্গীন জলের আয়না, মধ্যরাত, সোনালি সুদিন। (আবুল হাসান ২০১২ : ৪৬)

বর্তমানকে পাশ কাটিয়ে বা অস্বীকার করে বিকল্প জীবন, বিকল্প যাপন, বিকল্প স্বপ্ন, বিকল্প রাষ্ট্র, বিকল্প রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি ব্যাকুলতা কখনো প্রত্যক্ষভাবে কখনো পরোক্ষভাবে যাঁর কবিতায় সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায় তিনি শহীদ কাদরী (১৯৪২-২০১৬)। রফিক আজাদ একারণেই বোধ করি শহীদ কাদরীকে উদ্দেশ্য করে যে-কবিতা লিখেছেন তার নাম দিয়েছেন 'বাতাসের উল্টোদিকে যাত্রা'। শহীদ কাদরী সম্পর্কে ওই কবিতায় রফিক আজাদ ঠিকই বলেছেন, 'জলের রেখার মতো লেন-বাইলেন ধ'রে/সারি সারি মুণ্ডিত বৃক্ষের নিচে/শুঁড়ির চাতাল ঘেঁষে/রূপকথার রাজপুত্রের মতো বাতাসের উল্টোদিকে/বিরতিহীন হাঁটছি।' (রফিক ২০১৩ : ২৩) আপাতদৃষ্টিতে শহীদ কাদরীর কবিতা অরাজনৈতিক মনে হয়; ব্যক্তিগত হাহাকারের শব্দভাষ্য মনে হয়।[১৯] কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যায়, তাঁর কবিতায় বিকল্পের অনুসন্ধান চোখে পড়ার মতো। শহীদ কাদরীর কবিতা যতই ষাটের দশকের গভীরে বা উপান্তের দিকে এগিয়েছে ততই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর কবিতার মেজাজও বদলে গিয়েছে। প্রথমদিকে যা ছিল আড়াল-আবডালের, তা ক্রমশ প্রকাশ্য হয়ে উঠেছে। শহীদ কাদরীর কাব্য-কবিতার উপর্যুক্ত বিকল্প অধিকাংশ সময় প্রচল রাষ্ট্র ও এর চরিত্রবিরোধী। DËiwaKvi (১৯৬৭) কাব্যের 'বৃষ্টি, বৃষ্টি' কবিতাটির ভেতরবাড়িতে নজর

Dhaka University Institutional Repository

দিলে দেখা যাবে, কবি সেখানে কিভাবে রাষ্ট্র, এর শক্তি, বিধি ইত্যাদি মুখ্য বলে প্রতিষ্ঠিত সবকিছুকে খারিজ করে দিচ্ছেন। প্রতিষ্ঠা করছেন গৌণকে। দেখা যাক শহরে বৃষ্টিতে কবির চোখে কী ধরা পড়েছে–

রাজত্ব, রাজত্ব শুধু আজ রাতে, রাজপথে-পথে
বাউণ্ডুলে আর লক্ষ্মীছাড়াদের, উন্মূল, উদ্বাস্তু
বালকের, আজীবন ভিক্ষুকের, চোর আর অর্ধ-উন্মাদের
রাজত্ব আজ। রাজস্ব আদায় করে যারা,
চিরকাল গুণে নিয়ে যায়, তারা সব অসহায়
পালিয়েছে ভয়ে। (শহীদ ২০০০ : ১২)

উদ্ধৃতাংশে এএস্টাবলিশমেন্টকে হটিয়ে দিয়ে কবি প্রতিষ্ঠা করেছেন 'বাউণ্ডুলে', 'লক্ষ্মীছাড়া', 'উন্মূল', 'উদ্বাস্তু' আর 'ভিক্ষুক'দের। এর মধ্যে কবির অবস্থানটিও লক্ষ করার মতো–

এইক্ষণে আঁধার শহরে প্রভু, বর্ষায়, বিদ্যুতে
নগ্নপায়ে ছেড়া পাৎলুনে একাকী
হাওয়ায় পালের মতো শার্টের ভেতরে
ঝকঝকে, সদ্য, নতুন নৌকোর মতো একমাত্র আমি,
আমার নিঃসঙ্গে তথা বিপর্যস্ত রক্তেমাংসে
নূহের উদ্দাম রাগী গরগরে লাল আত্মা জ্বলে
কিন্তু নেই সাড়া জনপ্রাণীর অথচ
জলোচ্ছ্বাসে নিঃশ্বাসের স্বর, বাতাসে চিৎকার,
কোন আগ্রহে সম্পন্ন হয়ে, কোন শহরের দিকে
জলের আহ্লাদে আমি একা ভেসে যাব? (শহীদ ২০০০ : ১৩)

আশা-নিরাশা, স্বাধীনতা-পরাধীনতার মিশ্র অনুভূতির মধ্য দিয়ে ব্যক্তির মুক্তির যে-বাসনা বৃষ্টির পটভূমিতে কবি ব্যক্ত করলেন, তা নিছক বৃষ্টির প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি– সমষ্টির মুক্তির আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এর গভীর যোগ সহজেই চোখে পড়ে।

বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থা যখন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মুক্তি আর স্বাধিকারকে অস্বীকার করে, তখন সেই রাষ্ট্রের সমালোচনায় মুখর হয় ব্যক্তি এবং সমষ্টি। ষাটের দশকের পাকিস্তান রাষ্ট্রে পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি ছিল ঠিক এই রকমই। একারণে কবিতায় লক্ষ করি, রাষ্ট্রের স্বরূপের সমালোচনা; বিদ্যমান ব্যবস্থাকে অস্বীকারের প্রবণতা। রাষ্ট্রের অনাকাঙ্ক্ষিত সামরিক স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে কবি বলেছেন–

কাঁটা-তারে ঘেরা পার্ক, তাঁবু, কুচকাওয়াজ সারিবদ্ধ
সৈনিকের। হিরণ্ময় রৌদ্রে শুধু জ্বলজ্বলে গম্ভীর কামান,
ভোরবেলা সচকিত পদশব্দে ঝোড়ো বিউগুলে
গাছ-পালা, হঠাৎ বদলে গেছে রাঙা রণাঙ্গনে।

Dhaka University Institutional Repository

শৃংখলিত, বিদেশীর পতাকার নীচে আমরা শীতে জড়োসড়

নিঃশব্দে দেখেছি প্রেমিকের দীপ্ত মুখ থেকে জ্যোতি ঝরে গেছে... (শহীদ ২০০০ : ২২)

রাষ্ট্রের যে-রূপটি কবি এখানে আবিষ্কার করেছেন, তা যে তাঁর কাঙ্ক্ষিত নয় তা বলাই বাহুল্য। শহীদ কাদরীর কবিতায় সামরিক রাষ্ট্রের সমালোচনা পরেও বিভিন্ন কাব্য-কবিতায় আমরা লক্ষ করেছি। যেমন, †Zvgv‡K Awfev‘b wcqZgv (১৯৭৪) কাব্যের 'রাষ্ট্র মানেই লেফ্‌ট রাইট লেফ্‌ট', 'তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা', 'রাষ্ট্রপ্রধান কি মেনে নেবেন?' কবিতায় সামরিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে চরমভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। কবি এই রাষ্ট্র চাননি। এর বিকল্পই কবির অন্বিষ্ট হয়ে উঠেছে। বিকল্পের এই মনোভঙ্গি অরাজনৈতিক কোনো বিষয় নয়। কারণ রাষ্ট্র বিষয়টিই একটি রাজনৈতিক বিষয়। বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত শহীদ কাদরীর অপরাপর কবিতায়। উদ্ধৃতি লক্ষ করা যাক–

কুচকাওয়াজ, কামান কিংবা সামরিক সালাম নয়

বাগানগুলো শুধু আমার

মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, আন্তর্জাতিক সাহায্য তহবিল নয়

মিল-অমিলের স্বরবর্ণগুলো শুধু আমার

রাষ্ট্রপ্রধান কি মেনে নেবেন আমার প্রস্তাবগুলো

পররাষ্ট্রনীতির বদলে প্রেম, মন্ত্রীর বদলে কবি

মাইক্রোফোনের বদলে বিহ্বল বকুলের ঘ্রাণ? (শহীদ ২০০০ : ৯০)

চেতনার একই ধরনের অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায় শহীদ কাদরীর প্রায় সম সময়ে রচিত নির্মলেন্দু গুণের †cgvsïi i³ PvB কাব্যের 'অসমাপ্ত কবিতা' নামক কবিতাটিতে। এই কবিতার পুরো অংশ জুড়ে শোনা যায় প্রথাগত বর্তমানের ভেঙে পড়ার শব্দ। সেখানে কবি সবকিছুকে অস্বীকার করেছেন শুধু প্রেম আর তাঁর প্রেমিকার জন্যে। কবির ভাষায়–

স্মরণকালের বৃহত্তম সভায় আজ আমি

সদর্পে ঘোষণা করছি, হে বোকা জমায়েত,

পল্টনের মাঠে আর কোনোদিন সভাই হবে না,

আজকেই শেষ সভা, শেষ সমাবেশে শেষ বক্তা আমি।

এখনো বিনয় করে বলছি, সাইরেন বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে

আপনারা এই মাঠ খালি করে দেবেন।

এই পল্টনের মাঠে আমার প্রেমিকা ছাড়া

আর যেন কাউকে দেখি না কোনোদিন।

এই সারা মাঠে আমি একা,

একজন আমার প্রেমিকা......। (নির্মলেন্দু ২০১১ : ৪৪/১)

Dhaka University Institutional Repository

আর ষাটের অপর কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০)-এর RbŸÜ KweZv¸"Q (১৯৬৭) প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁকে তো বলাই হতো 'এন্টি-স্টাবলিমমেন্ট চেতনা'র কবি। সমালোচোকের ভাষায়, 'RbŸÜ KweZv¸‡"Q সার্বিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে এন্টি-স্টাবলিমমেন্ট চেতনা।' (সৌমিত্র ২০১১ : ৩২) বলা বাহুল্য ষাটের দশকে পাকিস্তানি সামরিক স্বৈর শাসনের প্রবল প্রতাপই এই সবকিছু অস্বীকার করার, বিকল্প-অনুসন্ধানী হয়ে ওঠার, এন্টি এএস্টাবলিশমেন্ট চৈতন্যকে ধারণ করার সূতিকাগার। পাকিস্তান রাষ্ট্রে স্বৈর সামরিক সরকার দেখেই কবির মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে–

রাষ্ট্র বললেই মনে পড়ে স্বাধীনতা দিবসের
সাঁজোয়া বাহিনী,
রাষ্ট্র বললেই মনে পড়ে রেডকোর্সের কাঁটাতার,
কারফিউ, ১৪৪ ধারা,
রাষ্ট্র বললেই মনে পড়ে ধাবমান খাকি
জিপের পেছনে মন্ত্রীর কালো গাড়ি,
কাঠগড়া, গরাদের সারি সারি খোপ
কাতারে কাতারে রাজবন্দী;
রাষ্ট্র বললেই মনে হয় মিছিল থেকে না-ফেরা
কনিষ্ঠ সহোদরের মুখ...। (শহীদ ২০০০ : ৬৫)

এই বিকল্পের বোধই ষাটের উপান্তে জাতীয়তাবাদী জাগরণকে সম্ভবপর করে তুলেছে। বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র তো পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিকল্পই বটে। ষাটের পাকিস্তানের বিকল্প মানেই তো একাত্তরের বাংলাদেশ।

টীকা

১. eŠK jM কাব্যের অধিকাংশ কবিতা ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে রচিত। এই কাব্যগ্রন্থের প্রায় সবকটি কবিতাই ব্যঙ্গ কবিতা। এসব কবিতায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি, প্রশাসন ইত্যাদির বিধ্বংসী সমালোচনা অধিকাংশ সময় রূপকের আড়ালে প্রকাশিত হয়েছে। এসব কবিতায় যেন শুধু চারপাশের ভেঙে পড়ার শব্দ শোনা যায়। সমালোচক বলেছেন–

> এ গন্থে তৎকালীন পাকিস্তান এবং পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-শাসন এবং চরিত্রই মুখ্য বিষয়বস্তু...। এ কাব্যগ্রন্থের 'অবাক দেশের নামসঙ্গীত', 'অবাক দেশের বিলাপ-সঙ্গীত', 'অবাক দেশের প্রেম সঙ্গীত', 'অবাক দেশের সাধন সঙ্গীত' প্রভৃতি কবিতাগুলোতে পাকিস্তানী শোষণ-শাসন ও নিয়ম নীতিকেই কবি বিদ্রূপ করেছেন। এ অবাক দেশটি হল তৎকালীন পাকিস্তান। (মাহবুবা ১৯৯৩ : ১২২)

২. এই রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক অবরুদ্ধতার মধ্যে ষাটের দশকের তরুণ কবিরা ১৯৬৫ সাল থেকে বের করা শুরুর করেন KÉ¯i নামে পত্রিকা। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যার ঘোষণাপত্রে যা বলা হয়েছিল তা ছিল সমকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের আদর্শের সঙ্গে চূড়ান্তভাবে সাংঘর্ষিক। ঘোষণাপত্রটির একাংশ দেখা যেতে পারে–

যারা সাহিত্যের সনিষ্ঠ প্রেমিক, যারা শিল্পে উন্মোচিত, সৎ, অকপট, রক্তাক্ত, শব্দতাড়িত, যন্ত্রণাকাতর; যারা উন্মাদ, অপচয়ী, বিকারগ্রস্ত, অসন্তুষ্ট, বিবরবাসী; যারা তরুণ, প্রতিভাবান, অপ্রতিষ্ঠিত, শ্রদ্ধাশীল, অনুপ্রাণিত; যারা পঙ্গু, অহঙ্কারী, যৌনতাস্পৃষ্ট 'কণ্ঠস্বর' তাদেরই পত্রিকা। প্রবীণ মোড়ল, নবীন অধ্যাপক, পেশাদার লেখক, মূর্খ সাংবাদিক, 'পবিত্র' সাহিত্যিক এবং গৃহপালিত সমালোচক এই পত্রিকায় অনাহুত। (আবদুল মান্নান ২০০০ : ৩৬)

ষাটের দশকের মধ্যভাগে পূর্ব বাংলা থেকে প্রকাশিত এই রকম একটি পত্রিকা ছিল প্রায় অকল্পনীয়। এই পত্রিকাকে অনেকে সমকালে অভিহিত করেছিলেন, 'সবচেয়ে রুচিশীল যৌনপত্রিকা' বলে। কথিত আছে এই পত্রিকার এক সংখ্যা পড়ে পূর্ব বাংলার এক কবি 'ছি! ছি! করতে করতে দোকানের বাইরে গিয়ে হাত ধুয়ে ফেলেছিলেন'। (আবদুল মান্নান ২০০০ : ৫৭) তখনকার দিনের পাকিস্তান রাষ্ট্রে– যা কিনা অখণ্ডতার জন্যে ইসলামকেই পৌনঃপুনিকভাবে ব্যবহার করে চলেছিল– এই চেতনা এবং এই চেতনাস্পৃষ্ট একটি পত্রিকাকে কিছুতেই অরাজনৈতিক বলা যায় বলে মনে হয় না। তাছাড়া অনেক তাত্ত্বিক আধুনিক সাহিত্যের নৈরাশ্য, হতাশা আর যৌনতাকে বুর্জোয়া সমাজ ও রাষ্ট্র উপজাত বলে মনে করেন। এগুলোকে 'বুর্জোয়া অবক্ষয়ী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যক্তিসত্তার বিদ্রোহ' বলেও মনে করেন। (রণেশ ২০১৪ : ১১৩/২)

৩. ২০১৮ সালের ২৪ জানুয়ারি ˆ`wbK hMvš—i পত্রিকার সাহিত্য সাময়িকীতে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে দেখা যাচ্ছে রফিক

আজাদ ষাটের দশকের কবিতার নাস্তি-নৈরাশ্যের কারণ সম্পর্কে বলেছেন, 'সব কিছুরই একটা কারণ থাকে। তখন রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা তেমন ভালো ছিল না। খুব খারাপ একটা সময় পার করতে হয়েছে।'

৪. মোহাম্মদ আজম wbewPZ KweZv ˆmq` Avjx Avnmvb (২০১৬) গ্রন্থের ভূমিকায় বাংলাদেশের চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের

দশকের কবিতায় পশ্চিমা নেতিবাচক জীবনচেতনার প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, এসব কবি সরাসরি পশ্চিমাবিশ্ব থেকে নেতিধর্ম পাননি। তারা পেয়েছেন কলকাতা থেকে। কলকাতার কবিদের নেতিধর্মে দীক্ষিত হওয়ার তা-ও কিছুটা কারণ আছে। কারণ তখন কলকাতার মধ্যবিত্ত 'যথেষ্ট বয়সী আর ক্ষয়িষ্ণু'। কিন্তু, 'যেটা বোঝা বেশ কঠিন তা হল, পঞ্চাশ-ষাটের ঢাকাই কবিরা নিজেদের মধ্যবিত্ত ইতিহাসের সবচেয়ে জোয়ান বয়সে নেতিধর্মে এতটা ইমান আনলেন কী ভাবে। উপনিবেশিত মানসিকতার বরাত ছাড়া একে ব্যাখ্যা করা খুব সহজ নয়।' (মোহাম্মদ আজম ২০১৬ : এগারো)

কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, দেশকালের অবরুদ্ধ বাস্তবতাই বাংলাদেশের পঞ্চাশ এবং ষাটের কবিতাকে জীবনচেতনায় নেতিধর্মী করেছে। তবে হ্যাঁ, পঞ্চাশের শুরুর কবিকুলের ওপর ত্রিশের কলকাতার কবিতার একটা স্বল্পকালীন প্রভাব ছিল। কারণ ঢাকা তখনো সর্বার্থে একটি উঠতি নগর। কলকাতার আছর তখনো ঢাকার ওপর থেকে কাটেনি। কিন্তু এই আছর অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং দীর্ঘ ১০ বছরের স্বৈরশাসন বাংলাদেশের কবিতার মেজাজ-চরিত্র ধরে দারুণভাবে ঝাঁকানি দিয়েছিল। কবিতা দ্রুত রাজনীতিশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছিল। কবিদের নেতিধর্মের সঙ্গে দেশকালের যোগ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঢাকার কবিতা ঢাকাতেই থিতু হয়েছে।

৫. এমন কি পঞ্চাশের দশকের একটা বড় অংশ কবি পূর্ব বাংলার কবিতার ওপর ত্রিশের কবিতার প্রভাব এড়ানোর ব্যাপারে

সচেতন ছিলেন। পঞ্চাশের দশকের গুরুত্বপূর্ণ কবি আল মাহমুদ তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'বাংলাদেশের পঞ্চাশের দশকের কবি শহীদ কাদরী ও আমার ওপর ত্রিশের কবিতার কোনো প্রভাব আমি স্বীকার করি না।' (আল মাহমুদ ২০০৩ : ১৪) পঞ্চাশের দশকের এক আড্ডার স্মৃতিচারণ সূত্রে কবি সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্‌র বক্তব্য শোনা যাক সৈয়দ শামসুল হকের বয়ানে– '...কবিতায় আমরা যেন তিরিশের কবিতার সম্প্রসারণ না ঘটাই, তিরিশ থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে...।' (সৈয়দ শামসুল ২০১৪ : ২১) কোনো কোনো সমালোচক পঞ্চাশের দশকের কবিদের ওপর ত্রিশের দশকের প্রভাবের কথা মানতে চান না। তাঁদের ভাষ্য, 'নতুন কবিদের নাম জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর। লক্ষণীয়-যে এই আগন্তুক কবিকুল

Dhaka University Institutional Repository

যেমন সমকালীন প্রধান কবি ফররুখ আহমদের আদর্শ থেকে দূরে, তেমনি তিরিশের নাগরিক বিষাদ ও একাকিত্ব থেকেও বিচ্ছিন্ন। কেবল শামসুর রাহমানের বাক্‌ভঙ্গিতে ছিলো জীবনানন্দের প্রতিধ্বনি কিন্তু তাও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।' (আবু হেনা ২০০১ : ৪০৫/১) এই সমালোচকের ভাষায় শামসুর রাহমানের ওপর তিরিশের প্রভাব 'দীর্ঘস্থায়ী হয়নি'। অন্য সমালোচক বলেছেন তিরিশের জীবনানন্দ ও বুদ্ধদেব বসুতে রাহমান 'কিঞ্চিত প্রলুব্ধ হয়েছিলেন'। (আবিদ ২০১৫ : ৪২) আরেক সমালোচক বলেছেন, দ্বিতীয় গ্রন্থেই শামসুর রাহমান 'দেশ-কাল-সমাজের সমকালীন কালপুরুষের দিকে যাত্রা করেছেন'। (আবদুল মান্নান ১৯৮৮ : ২১) একারণে শামসুর রাহমানের সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে সমালোচকরা বলেন, 'শামসুর রাহমান বিপ্লবী বা বিদ্রোহী নন, কিন্তু বিপ্লব-বিদ্রোহ-সংগ্রামের ভেতরের যে গভীর বাণী, তার নিবিড় অভিঘাত তিনি ধারণ করেছেন নিজের ভেতর। ফলে তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে আমাদের জাতিরই অন্তর্গত স্বর...।' (সৈকত ২০১৩ : ৩৮) পশ্চিমবঙ্গের আরেক সমালোচক বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতার তুলনা করতে গিয়ে বাংলাদেশের তথা পূর্ব বাংলার পঞ্চাশের দশকের কবিতা সম্পর্কে বলেছেন, '...পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চাশের দশকের কবিরা যখন রাজনীতির প্রতি বিমুখ হয়েছিলেন, কবিতার শুদ্ধাচারকেই অভিপ্রেত মনে করছিলেন, সেইসময় পূর্ববঙ্গের কবিরা বুঝেছিলেন রাজনীতি তাঁদের নিয়তি'। (অশ্রুকুমার ২০১৪ : ৪৬) অর্থাৎ বাংলাদেশের কবিতা পঞ্চাশের দশক থেকেই দ্রুত তার নিজস্ব দেশকালের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে নিজস্ব সুর ও স্বর আবিষ্কার করেছিল বলে সমালোচক বলতে চেয়েছেন। তবে আবু হেনা মোস্তফা কামালের পূর্বোল্লেখিত মন্তব্যের মধ্যে হয়ত একটু সাধারণীকরণ থেকে থাকবে। কারণ তাঁর উল্লেখিত কবিদের মধ্যে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী চল্লিশের দশকের পাকিস্তানবাদী কাব্যধারা দ্বারা অর্থাৎ এই ধারার প্রধান কবি ফররুখ আহমদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমকালে বেশ কিছু কবিতা রচনা করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি পরিবর্তিত হয়েছেন নতুন জীবচেতনায়।

৬. wbR evmf‡g কাব্যের 'একপাল জেব্রা' কবিতার কিছু অংশ লক্ষ করলে দেখা যাবে শামসুর রাহমান– যিনি ষাটের দশকের

তরুণ কবিদের আগের প্রজন্মের কবি– বলছেন তাঁর কবিতা অন্যদের মতো নয়। তাঁর নিজেরই মতো। উদ্ধৃতি লক্ষ করা যাক–

নিপুণ গার্ডের মতো হুইসিল বাজাতে বাজাতে সবুজ ফ্ল্যাগ
ওড়াতে ওড়াতে একটি কবিতার শাঁ শাঁ ট্রেনকে অন্তিম স্টেশনে পৌঁছে দিতে না দিতেই
কিছু পঙ্‌ক্তি পেয়ে বসে আমাকে আবার। দুর্দান্ত
এক পাল জেব্রার মতো ওরা আমার বুকে ধুলো উড়িয়ে বারংবার
ছুটে যায়, ফিরে আসে।

ক্ষমা করুন রবীন্দ্রনাথ, আপনার মহান মায়াবী শৈলাবাস থেকে,
ভুল বুঝবেন না নজরুল, আপনার হারমোনিয়ামের আওয়াজে
মধুর মজলিশ আর হাসির হুল্লোড় থেকে,
কিছু মনে করবেন না জীবনানন্দ, আপনার সুররিয়ালিস্ট হরিণেরা
যেখানে দৌড়ে যায়, সেখান থেকে,
মাফ করবেন বিষ্ণু দে, আপনার স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ থেকে
অনেক দূরে যেতে চায় সেই দামাল জেব্রাগুলো। (শামসুর ২০১২ : ৩০৭/১)

Dhaka University Institutional Repository

৭. সামরিক স্বৈর শাসন চালু হওয়ার পর পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তাৎক্ষণিক এর কী প্রভাব পড়েছিল, কেমন অবরুদ্ধতা তৈরি করেছিল তার বর্ণনা পাওয়া যায় সমকালের অনেক কবি-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মীর আত্মজীবনীতে। পঞ্চাশের দশকের এক কবি তাঁর আত্মজীবনীতে ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের পরের বর্ণনা দিয়েছে এভাবে–

> আটান্নর অক্টোবরে পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি আইয়ুব খান জারি করলেন মার্শাল ল, ন্যূনতম নাগরিক অধিকারও হলো উধাও, আতঙ্কের কৃষ্ণ মেঘে ছেয়ে গেল মানুষের আকাশ, কলকাতার সঙ্গে আমাদের সাহিত্যিক যোগাযোগ একমুহূর্তে ছিন্ন হয়ে গেল, সে যোগাযোগ রাখাটাই ছিল সেদিনের শাসকদের কাছে রাষ্ট্রদ্রোহ অর্থাৎ পাকিস্তান-বিরোধিতা। বিউটি বোর্ডিয়ে আমাদের আড্ডার ওপরেও এর ছায়াপাত হলো, হিন্দুর পরিচালিত বোর্ডিং, কে এখানে আসে, কারা এখানে কামরা ভাড়া নেয়– পেছনে লেগে গেল সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিউটিতে এসে স্থায়ী কামরা ভাড়া নিয়ে জাঁকিয়ে বসল তখনকার কুখ্যাত ছাত্রনেতা আখতার আহাদ...। (সৈয়দ শামসুল ২০১৪ : ১৭০)

পরবর্তীতে এই অবরুদ্ধতা প্রায় প্রতিষ্ঠানিক রূপ পায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়। ষাটের প্রথমার্ধে এই সাংস্কৃতিক অবরুদ্ধতা চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছিল।

৮. একারণে দেখা যায়, কবিদের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের গানের অনুষঙ্গ বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের

গানের মধ্যে কবি নিজের আবেগের মুক্তি খুঁজে পেয়েছেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তাঁদের আবেগের রুচির উৎস হয়ে উঠেছে। শামসুর রাহমান wbR evmf‡g কাব্যের 'ঋণী' কবিতায় এরকম একটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। কবিতায় কবি বর্ণনা করেছেন একটি রাত্রের ঘটনাকে। সে রাতে তিনি আড্ডার লোভে হাঁফিয়ে ওঠা জীবন থেকে মুক্তি পেতে যান আজিমপুরের এক তেতলার ফ্ল্যাটে। সেখানে সারারাত গান গায় জনৈক 'ফাহ্‌মিদা'। বলা বাহুল্য ওই শিল্পী রবীন্দ্র সংগীত গান। বিভিন্ন ধরনের রবীন্দ্র সংগীত কবির মধ্যে বিভিন্ন ধারার ভালোলাগা সৃষ্টি করে। এজন্য কবি 'ফাহ্‌মিদা'-এর কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানে তাঁর মুগ্ধতার বিস্তার কবিতাটিতে এত বেশি যে, কবিতায় গায়ককে ছাড়িয়ে গিয়েছে রবীন্দ্রনাথ। আর রবীন্দ্রনাথ কবিতার শেষে আবিষ্কৃত হয়েছেন বাংলার সঙ্গে একাত্ম হয়ে। উদ্ধৃতি লক্ষ করা যাক–

> ফাহ্‌মিদা সুর ভাঁজে– এ-ও এক বৃষ্টি অপরূপ,
> অস্তিত্ব ডুবিয়ে নামে। গীতবিতানের কিছু নিভৃত নিশ্চুপ
> পাতা ওড়ে অলৌকিক কলরবে, গাংচিলের মতো ওড়ে, ঘোরে সারা ঘরে
> প্রাণের ঊর্মিল জল ছুঁয়ে যায় কতো ছলভরে।
> ফাহ্‌মিদা কণ্ঠে সুর তুলতেই ঘরে রৌদ্র ওঠে, মেঘে মেঘে
> বাজে বাঁশি, ভাসে ভেলা, শ্রাবণের ধারা ঝরে, গাছ হয়; হাট-
> ফেরা লোক মিলায় সোনার মেঘে এবং চোখের দ্বারে ধ্যানের আবেগে
> নদীর সুদূর পাড়ে যায় দেখা ঘাট।
> কখন যে রাত্রি বাড়ে আলো-আঁধারিতে তেতলায়,
> কিছুই পাইনা টের সুরে ভেসে, ফ্ল্যাটে ফাহ্‌মিদার গলায়
> আমার সোনার বাংলা ঝলমল করে ওঠে। (শামসুর ২০১২ : ২৯১/১)

Dhaka University Institutional Repository

এই হচ্ছে ষাটের দশকে রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ব বাংলার একজন কবির আন্তঃসম্পর্ক। এই সম্পর্ক নানা কবির কবিতায় নানাভাবে উঠে এসেছে।

৯. সিকান্দার আবু জাফর তাঁর কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে মূলত সমালোচনা করেছেন, গরিব মানুষদের রবীন্দ্রনাথ দেখেননি এই দৃষ্টিকোণ থেকে। কবির বক্তব্য লক্ষ করা যাক–

আকাশের মত তুমি,
কোটি কোটি সৌর-জগতের
আনন্দ সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে
তাই তো শোনোনি,
সমস্ত ঝিল্লীর ক্লান্ত সুর।

অসংখ্য মানুষ তবু আছে
সমস্ত ঝিল্লীর সুরে রাত জেগে
জীবনের কান্না যারা শোনে
এই সব প্রতিবেশীদের
নিমন্ত্রণ পেয়ে
যখনি গিয়েছি,
দেখেছি তোমার চিহ্ন পড়েনি সেখানে। (সিকান্দার ২০১৭ : ১৩৭)

বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সুরের এই অপূর্ণতার কথা' বলেছেন তাঁর Rb¥'‡b (১৯৪১) কাব্যগ্রন্থের 'ঐকতান' কবিতায়।

১০. যেমন হুমায়ুন আজাদ তাঁর A‡jŠKK ¤÷gvi কাব্যের 'তার করতল' কবিতায় করতলকে বৈষ্ণব পদাবলির বইয়ের সঙ্গে

তুলনা করে বলেছেন 'করতল হয় তার বৈষ্ণব পদাবলির কবিতার বই।' (হুমায়ুন ২০০৮ : ৪৬)

১১. শুধু রাজনৈতিক ইতিহাস-ঐতিহ্য নয়, সাহিত্যিক ঐতিহ্যের উল্লেখও এই সময়ের কবিতার মধ্যে লক্ষ করা যায়। যা কিছু পূর্ব বাংলার নিজস্ব তাই নিয়েই ষাটের কবিতা অহংকার করেছে। যেমন, gqgb¤msn MxwZKv। কবিতার মধ্যে পূর্ব বাংলার এই সাহিত্যিক ঐতিহ্যের দারুণ উল্লেখ ষাটের কোনো কোনো কবির কবিতাকে ভিন্ন রাজনৈতিক তাৎপর্য দান করেছে। বিশেষত gqgb¤msn MxwZKv-এর স্মৃতিবাহী কবিতা যখন হোমরা বেদের উল্লেখের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় তখন তা আরো তাৎপর্যবাহী হয়ে ওঠে। উদাহরণ দেখা যেতে পারে ওমর আলীর b'x (১৯৬৯) কাব্যগ্রন্থের 'পালং' কবিতা থেকে–

গভীর রাত্রে গজারী গাছের তলে
হোমরা বেদের প্রেতাত্মা বুঝি কাঁদে,
আকাশের চোখ সমবেদনায় বুঝি গলে,
শিশিরের ফোটা গড়ায় আর্তনাদে।

মাটির দরজা মুক্ত অন্ধকারে,
দুজনে তখন নির্জন নদী পাড়ে,

Dhaka University Institutional Repository

নদের কণ্ঠ উজ্জ্বল ফুলভারে,
পেলব কান্তি মহুয়ার সাদা হাড়ে।

রাত্রে রূপসী যৌবন পায় ফিরে,
আলেয়ার মতো হয়ত বা জ্বলে ওঠে,
জোনাকীরা চলে তাকে ও নদেকে ঘিরে,
সুজনের ঘোড়া সেদিকে দাপটে ছোটে। (ওমর ২০০২ : ৩১০-৩১১)

১২. ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের একুশের রূপায়ণের ধরন ধরা পড়েছে সিকান্দার আবু জাফরের gvje‡KšikK (১৯৬৬) গানের বইয়ের ২০৩ সংখ্যক গানে। সেখানে কবি খুব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, একুশে ফেব্রুয়ারি কিভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে জাগ্রত করে বাঙালিকে একটি সূতায় গেঁথে দিয়েছে। স্পষ্টীকরণের জন্য পুরো গানটি তুলে দেয়া হল–

একুশে ফেব্রুয়ারী,
মৃত্যুর শীষে যারা রেখে গেলো
প্রাণ-ফসলের দান
তুমি ইতিহাস বহো তারি।

শাসন-ত্রাসের প্রহার-পিষ্ট জাতি
বিস্ময়ে দেখে, সহসা ভেঙেছে রাতি,
বক্ষ-রুধির রক্ত-আলোকে
আনলো যারা প্রভাত,
তুমি গৌরব বহো তারি।
ভাষাহীন বুকে প্রাণস্পন্দন
আনে না দৃপ্ত জীবন-ছন্দ,
প্রাণপণে তাই ভাষার যাহারা
অধিকার দিয়ে গেলো
তুমি সম্মান বহো তারি।

জোয়ার এসেছে আমাদের মরা
জীবনের সৈকতে
যাদের পরম আত্মত্যাগের পথে
আমরা ধন্য তারা আমাদের ভাই
আমরা ধন্য এমন পুণ্য
কারো ইতিহাসে নাই।
প্রাণ দিয়ে যারা বাঙালীর প্রাণ বেঁধে গেলো এক সুরে
মৃত্যু-বিহীন পরশ তাদের

Dhaka University Institutional Repository

চিত্তে নিয়েছি পুরে।

এ-যুগের লিপি মুছে যাবে তবু

এ-জাতি তাদের ভুলবে না কভু,

এ-প্রভাতে জেগে দেশবাসী নাও

নতুন শপথ তারি,

এসেছে আবার অশ্রু-ঝরানো

রক্ত-ক্ষরানো স্মরণ জড়ানো

একুশে ফেব্রুয়ারী।

সংশয়াহত নিথর চিত্তে

বন্যা-অবাধ শক্তি জাগানো

একুশে ফেব্রুয়ারী।। (সিকান্দার ২০১৭ : ৩১৮)

১৩. কখনো কখনো কবিরা তাঁদের কবিতায় জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামে যুক্ত হয়ে আত্মত্যাগের জন্যে উদ্বুদ্ধও করেছেন। জাতির মুক্তির জন্যে যখন রক্তের প্রয়োজন হয় তখন জাতীয় নেতৃত্বের মতো কবিরাও জাতিকে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন। জাতীয়তাবাদী জাগরণের এ এক সাধারণ লক্ষণ। ষাটের দশকের অনেক কবির কবিতায় এই বিষয়টি লক্ষ করা যায়। উদাহরণ লক্ষ করা যাক–

কোনো কোনো প্রেম আছে প্রেমিককে খুন হতে হয়।

যদি কেউ ভালোবেসে খুনী হতে চান

তাই হয়ে যান

উৎকৃষ্ট সময় কিন্তু আজ বয়ে যায়। (হেলাল ২০১৭ : ৯)

১৪. বাঙালি কবির অনার্যত্বের অহংকার স্বাধীনতার পরের কবিতার মধ্যেও লক্ষ করা গিয়েছে। এমনকি এই অহংকার থেকে মুহম্মদ নূরুল হুদা (জ. ১৯৪৯) একটি কাব্যের নামকরণ করেছেন Avgiv Zvgv‡U RwZ (১৯৮১)। সেখানে কবি বিভিন্ন কবিতায় বাঙালি জাতির উৎসের যে সন্ধান করেছেন তাতে অনার্যের অহংকারই মূর্ত হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় এই কাব্যের 'শিকড়গুলো' কবিতার কথা। একটি উদ্ধৃতি লক্ষ করা যাক–

অনার্য এই শিকড়গুলো

অনাদ্যন্ত শিকড়গুলো

বুনতে বুনতে বুনতে বুনতে

শিকড়-কথা চারিয়ে দিলাম

তামাটে এক দ্রাবিড় গ্রিয়ট

গল্পগুলো চারিয়ে দিলাম।

বৃক্ষ তুমি জমজ ভ্রাতা

পাখি তুমি বোন

মা গঙ্গা ভগীরথী

Dhaka University Institutional Repository

শিকড়-কথা চারিয়ে দিলাম

তামাটে এক দ্রাবিড় গ্রিয়ট

গল্পগুলো চারিয়ে দিলাম। (মুহম্মদ নূরুল ২০১৬ : ১৬৬/১)

১৫. এ প্রসঙ্গে অনেক কবিতা উল্লেখ করা যাবে। সিকান্দার আবু জাফরের evsjv Qv‡ড়া (১৯৭১) কাব্যের ‘ইতিহাসচারিণী বাঙলা’ কবিতার নিম্নোক্ত অংশে বিষয়টি একেবারে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে–

কুণ্ঠিত কৃষকের লুণ্ঠিত মজুরের

লাঞ্ছিত শ্রমিকের বাঙলা

জরামারীজীর্ণ ভাগ্য-বিদীর্ণ

জেলে তাঁতি মাঝিদের বাঙলা।

শোষিতের বাঙলা পতিতের বাঙলা

পীড়িতের জননী বাঙলা

ভিখারীর বাঙলা ভুখারীর বাঙলা

অনাথের জননী বাঙলা। (সিকান্দার ২০১৭ : ৪৫৮)

তবে একথা বলা বাহুল্য যে, ষাটের দশকের পূর্ব বাংলার সব কবিই বাঙালির এই পরিচয় নিয়ে অহংকার বোধ করেছেন। বাঙালি কবিরা বাঙালি জাতির এই ‘অনার্য’সুলভ পরিচয় দেয়ার পাশাপাশি এই জাতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে ভোলেননি যে, এই জাতি বরাবরই অন্যায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার। একই কবি একই কাব্যের ‘গরবিনী মা-জননী’ কবিতায় এজন্য বলেছেন–

কামার কুমোর জেলে চাষী

বাউল মাঝি ঘর-উদাসী,

কার ছেলেরা নিত্য হাজার

মরণ-মারের দণ্ড গোনে,

ছেলের বুকের খুন ছোপানো

কোন্ জননীর আঁচল-কোণে

দুর্ভাগিনী কার মেয়েরা

কান্নাফুলের নকশা বোনে।

সেই মাকে যার হাজার হাজার

মা-নাম-ডাকা পাগল ছেলে

মায়ের নামে ঝাঁপিয়ে পড়ে

ভয়ঙ্করের দুর্বিপাকে।

কার ছেলে মা উপড়ে ফ্যালে

বুলেট ফাঁসির শাসন-কারা

দুখের ধূপে সুখ পুড়িয়ে

Dhaka University Institutional Repository

কার ছেলে মুখ উজল রাখে। (সিকান্দার ২০১৭ : ৪৬০-৪৬১)

১৬. বাঙালির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রসঙ্গ কবিতায় এনে এর মাধ্যমে ঐতিহ্য নির্মাণের জাতীয়তাবাদী চেতনার পরিচয় ষাটের দশকে অন্য অনেক কবির মধ্যেই লক্ষ করা যায়। যেমন, শামসুর রাহমান তাঁর †iŠ' K‡iwU‡Z I weaŸ¯Í bxwjgv কাব্যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একাধিক কবিতা রচনা তো করেছেনই, এমন কি wbR evmf‡g কাব্যে নিকট অতীতে মৃত্যুবরণ করা বাঙালির অহংকার করার মতো মনীষী ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯), কাজী নজরুল ইসলাম (জ. ১৮৯৯) এবং কবিয়াল রমেশ শীল (১৮৭৭-১৯৬৭)-কে নিয়ে রচনা করেছেন যথাক্রমে 'গ্রন্থে আছেন শহীদুল্লাহ্', 'কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি' এবং 'কবিয়াল রমেশ শীল' নামক কবিতা। এসব কবিতায় কবি বাঙালির নিকট-অতীতের– নজরুল জীবিত হলেও সৃজনশীলতায় অতীত– গুরুত্বপূর্ণ এসব ব্যক্তিদের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী আবেগকে ঘনীভূত করতে চেয়েছেন। একই সঙ্গে এঁদের চেতনার জাগরণ চেয়েছেন বাংলায়। যেমন, নজরুল সম্পর্কে বলেছেন, 'এখন আপনি সেই যাত্রী আত্মভোলা, হঠাৎ যে নেমে পড়ে/ভুল ইস্টিশানে অবেলায়।/তবু আপনার মতো কারুকেই চাই, চাই আজও নজরুল ইসলাম।' (শামসুর ২০১২ : ২৮৪/১) একইভাবে রমেশ শীলের সেই চেতনাকে কবি অঙ্কন করেছেন যে-চেতনা দিয়ে রমেশ শীল কবিগানের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। রমেশ শীলের যে-মূর্তি এঁকেছেন তা সমকালের জাতীয়তাবাদী চেতনার উৎসারণের জন্যে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ–

স্বদেশকে প্রিয়ার একান্ত নাম ধরে ডেকে ডেকে
অগ্নিবলয়ের মধ্যে গড়েছিলে প্রেমের প্রতিমা
নিজে পুড়ে পুড়ে।
তোমার প্রেমার্ত স্বর ছাপ্পান্ন হাজার
একশো ছাব্বিশ বর্গমাইলে আনাচে-কানাচে
পৌঁছে গেছে। বাউলের গেরুয়া বস্ত্রের মতো মাটি, মাছ আর আকাশের কাছে
নদীর বাঁকের কাছে, মজুরের ক্ষিপ্র, পেশি অত্যাচারী শাসক-দপুরে
কৃষকের হাল-ধরা মুঠোর কাছেই তুমি শিখেছিলে ভাষা। (শামসুর ২০১২ : ১৮৫-১৮৬/১)

একই ধরনের প্রয়াস লক্ষ করা যায়, আসাদ চৌধুরীর ZeK †'lqv cvb কাব্যের 'নতুন সবক চাই' কবিতায়। এই কবিতায় কবি বলেছেন–

সব শব্দ কালো হ'য়ে গেছে একালের অভিধানে!
দীপ্তিহীন, রক্তহীন, ফ্যাকাসে, পাণ্ডুর হ'য়ে
ক্ষয়ে ক্ষয়ে লীন হচ্ছেণ্ঢ
পদাবলী, হায় শব্দাবলী,
তোমার বিশাল বুকে, হে সর্দার, মাথা রেখে আমি
কিছুকাল একাকী কাটাবো। নতুন সবক নেবো।
কম্পিত আঙুল দিয়ে তুমি মোরে লিখন লেখাবে? (আসাদ ২০০৮ : ৪৪)

নজরুলকে দ্রোহের প্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করে সিকান্দার আবু জাফর লিখেছেন–

শ্রান্তিহারা প্রাণের ডালায় অগ্নিজ্বালা
কুড়িয়ে নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

ত্রস্তপায়ের ধুলোয় যত ভয়ের বাধা

উড়িয়ে দিয়ে

আচম্বিতে মূর্চ্ছাভাঙার কলধ্বনি

এনেছে সে

তার দেওয়া সেই হৃদয়-উজার দানের দলিল

ছিঁড়বে কে? (সিকান্‌দার ২০১৭ : ৪৪৫-৪৪৬)

১৭. শামসুর রাহমান তাঁর e›`x wkwei †_‡K কাব্যের 'তার উক্তি' কবিতায় রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে নিহত একজন শহিদ

বুদ্ধিজীবীর বরাতে বলেছেন–

...আর এই শূন্য জায়গাটায়

স্পন্দিত হৃৎপিণ্ড ছিল, যা ওরা নিয়েছে উপড়ে পাশব আক্রোশে

আর এই মাত্র যেটা লোভাতুর কুকুর শেয়াল

পালাল সাবাড় করে, একেই তো জানতাম আমার নিজস্ব

কণ্ঠ বলে, যে-কণ্ঠে ধ্বনিত হত বারংবার অসত্য অন্যায়

ইত্যাদির বিরুদ্ধে ঝাঁঝালো প্রতিবাদ, যে-কণ্ঠে ধ্বনিত হত

কল্যাণের, প্রগতির কী সজীব জিন্দাবাদ আর স্বাধীনতা, স্বাধীনতা।

এ জন্যেই জীবনের বৈমাত্রের দ্বিপ্রহরে হলাম কংকাল। (শামসুর ২০১২ : ৩৫৬/১)

১৮. জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের মধ্যে যে এই দ্বৈরথ ক্রিয়াশীল থাকে এবিষয়ে শামসুর রাহামানের কবিতা রয়েছে। সেখানে কবি

দেখিয়েছেন ধ্বংসে বিচলিত হওয়া সমীচীন নয়। কারণ জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের চূড়ান্ত যে-স্বাধীনতা, তা বরাবরই ধ্বংস আর সৃষ্টির দ্বৈরথের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। e›`x wkwei †_‡K কাব্যের 'যে-পথে আমার পদধ্বনি' কবিতায় কবি স্বাধীনতার বয়ানে বলেছেন–

অথচ আমারই প্রতীক্ষায়

তোমরা বিছিয়ে রাখো দৃষ্টি

গ্রাম ও শহরে। পথে পথে

সাজাও তোরণ, করো নিবিড় বন্দনা।

যখনই প্রবল আমি আসি

আমার দু-চোখে জ্বলজ্বল

ধ্বংস আর সৃষ্টি

কাঁপে পাশাপাশি;

আমি স্বাধীনতা। (শামসুর ২০১২ : ৩৩৫/১)

একই ধরনের প্রকাশ লক্ষ করা যায় শহীদ কাদরীর 'নিষিদ্ধ জার্নাল' কবিতায়। সেখানে পাকিস্তানি তাণ্ডবের মধ্যে কবি আবিষ্কার করেছেন স্বাধীনতাকে। উদাহরণ দেখা যাক–

মধ্য-দুপুরে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে, একটা তন্ময় বালক
কাঁচ, লোহা, টুকরো ইট, বিদীর্ণ কড়ি-কাঠ, একফালি টিন
ছেঁড়া চট, জং ধরা পেরেক জড়ো করলো এক নিপুণ
ঐন্দ্রজালিকের মতো যত্নে
এবং অসতর্ক হাতে কারফিউ শুরু হওয়ার আগেই
প্রায় অন্যমনস্কভাবে তৈরি করলো কয়েকটা অক্ষর : 'স্বা-ধী-ন-তা।' (শহীদ ২০০০ : ৮৩)

১৯. অনেক সমালোচকও মনে করেন শহীদ কাদরীর কবিতা একান্ত ব্যক্তিগত অনুভবের কবিতা। সমালোচকের ভাষায়, 'কেবল শহীদ কাদরীই পূর্বাপর থেকে গেছেন অন্তর্মুখিনতা, আত্মজৈবনিকতা ও নান্দনিকতায় নিবিষ্ট'। (আবিদ ২০১৫ : ১২৯) অবশ্য এই সমালোচক উল্লেখ করতে ভোলেননি যে, শহীদ কাদরী স্বৈরশাসনের অনুষঙ্গ আর মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গ নিয়ে 'দু'চারটি' কবিতা লিখে অল্প সময়ের জন্য জনসম্পৃক্তির পরিচয় দিয়েছেন। (আবিদ ২০১৫ : ১২৮-১২৯) কিন্তু একটু গভীরভাবে দেখলে দেখা যাবে শহীদ কাদরীর কবিতা বরাবরই অন্তর্মুখিনতার মোড়কে বহির্মুখিনতাকে ধারণ করেছে। এই বহির্মমুখিনতাকেই আমরা বলেছি রাজনীতি সচেতনতা। এই রাজনীতি সচেতনতা বিচ্ছুরিত হয়েছে কখনো একটি সমগ্র কবিতায়, কখনো একটি উপমায়, কখনো চকিতে একটি পঙ্‌ক্তিতে। তবে একথা স্বীকার্য যে, সাধারণ পাঠে শহীদ কাদরীর কবিতাকে আত্মকথন বলে মনে হয়।

সহায়কপঞ্জি

অশ্রুকুমার সিকদার (২০১৪), †Pv‡Li 'wU Zviv : 'B evsjvi KweZv, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা।

আবদুর রাজ্জাক (১৯৮৭), 'বাঙলাদেশ : জাতির অবস্থা', RvZxqZvev'-weZK (সম্পা. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর), দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৯৪), we‡ePbv-cbwe‡ePbv, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(১৯৮৮), evsjv‡'‡ki mwnZ¨, (সঙ্কলন উপবিভাগ কর্তৃক সঙ্কলিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০০০) ¯§wZi †bvUeK, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ (২০০৬), fv‡jvevmvi mv¤úvb, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আবিদ আনোয়ার (২০১৫), Avgv‡'i AvawbK KweZvi 'B 'kK : e‡iY¨ Kwe‡'i wbgvYKjv, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

আবুল হাসান (২০১২), iPbv mgM, পঞ্চম প্রকাশ, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা।

আবুল হোসেন (১৯৯৭), Avej †nv‡m‡bi wbewPZ KweZv, ব্যতিক্রম প্রকাশনী, ঢাকা।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল (২০০১), Ave †nbv †gv¯Ídv Kvgvj iPbvejx, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আমিনুর রহমান সুলতান (১৯৯৮), ivR‰bwZK †PZbv : evsjv‡'‡ki KweZv, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আল মাহমুদ (১৯৯৫), GK‡ki wbewPZ ceÜ : 1963-1976 (সম্পা. মোবারক হোসেন), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০০০), KweZvmgM, দ্বিতীয় প্রকাশ, অনন্যা, ঢাকা।

(২০০৩), mvÿvrKvi : Avj gvng' (সম্পা. সাজ্জাদ বিপ্লব), ঐতিহ্য, ঢাকা।

আলাউদ্দিন আল আজাদ (২০০৬), KweZvmgM 1, গতিধারা, ঢাকা।

আহমদ রফিক (১৯৯৩), fvlv Av‡›'vj‡bi ¯§wZ I wKQ wRÁvmv, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০০১), KweZv AvawbKZv I evsjv‡'‡ki KweZv, অনন্যা, ঢাকা।

আহসান হাবীব (১৯৯৫), Avnmvb nvexe iPbvejx, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

ওমর আলী (২০০২), †kô KweZv, বইপত্র, ঢাকা।

দিলওয়ার (১৯৯৮), w'j I qvi iPbvmgM, প্রথম খণ্ড, কবি দিলওয়ার পরিষদ, সিলেট।

নির্মলেন্দু গুণ (২০১১), Kve¨mgM-1, চতুর্থ সংস্করণ, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা।

ফজল শাহাবুদ্দীন (২০১২), Kve¨ mgM-1, অনন্যা, ঢাকা।

বায়তুল্লাহ্ কাদরী (২০০৯), evsjv‡'‡ki Iv‡Ui 'k‡Ki KweZv : welq I cKiY, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (১৯৯৩), ¯‡'k I mwnZ¨, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মহাদেব সাহা (২০১১), Kve¨mgM-1, চতুর্থ প্রকাশ, অনন্যা, ঢাকা।

মাসুদুজ্জামান (১৯৯৩), evsjv‡'k I cwðg evsjvi KweZv : ZjbvgjK avi v, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মাহবুবা সিদ্দিকী (১৯৯৩), wmKvb'vi Ave Rvdi : Kwe I bvU¨Kvi, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মোহাম্মদ রফিক (২০১১), KweZvmgM, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা।

মুহম্মদ নূরুল হুদা (২০১৬), KweZvmgM-1, অনন্যা, ঢাকা।

মোহাম্মদ আজম [সম্পা.] (২০১৬), wbewPZ KweZv : ˆmq' Avjx Avnmvb, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৬৯), Avgv‡'i mwnZ¨ (সম্পা. সরদার ফজলুল করিম), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(১৯৯৮), †gvnv¤§' gwbiæ¾vgvb Kve¨msMn, প্রতীতি প্রকাশনী, ঢাকা।

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ (১৯৮৯), mgKvjxb evsjv mwnZ¨ (সম্পা. খান সারওয়ার মুরশিদ), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

রণেশ দাশগুপ্ত (২০১৪), i‡Yk 'vk¸ß iPbvmgM, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

রফিক আজাদ (২০১৩), Am¤‡ei cv‡q, দ্বিতীয় সংস্করণ, বিভাস, ঢাকা।

শহীদ ইকবাল (২০১৩), evsjv‡'‡ki KweZvi BwZnvm : 1947-2000, রোদেলা, ঢাকা।

শহীদ কাদরী (২০০০), knx' Kv'ixi KweZv, দ্বিতীয় মুদ্রণ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

শহীদুল্লাহ্ মৃধা (১৯৯৯), gxRvbi ingv‡bi ˆÎgwmK cwÎKv (সম্পা. মীজানুর রহমান), নদী সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ৯৯, ৫৮ তম খণ্ড, পঞ্চদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ঢাকা।

শামসুর রাহমান (২০১৭) 'সাহিত্য সাধনার পঁচিশ বছর', c_g Av‡jv ঈদসংখ্যা ২০১৭, ঢাকা।

(২০১২), KweZvmgM-1, তৃতীয় মুদ্রণ, অনন্যা, ঢাকা।

শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৯৫), GK‡ki wbewPZ ceÜ : 1963-1976 (সম্পা. মোবারক হোসেন), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সত্যেন সেন (২০০৩), KgviRxe, খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ঢাকা।

সানাউল হক (১৯৯৮), mvbvDj nK iPbvejx, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সিকান্দার আবু জাফর (২০১৭), KweZvmgM, বিভাস, ঢাকা।

সৈকত হাবিব (২০১৩), Kwe KweZv I K_v, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা।

সৈয়দ আকরম হোসেন (১৯৮৫), evsjv‡'‡ki mwnZ¨ I Ab¨vb¨ cÖm½, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সৈয়দ আলী আহসান (১৯৬৯), Avgv‡'i mwnZ¨ (সম্পা. সরদার ফজলুল করিম), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(১৯৮৩), mZZ ¯^vMZ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

(২০০৯), KwеZv mgM, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা।

সৈয়দ শামসুল হক (২০১০), cYxZ Rxeb, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা।

(২০১২), KwеZvmgM 1, প্রথম মুদ্রণ, চারুলিপি, ঢাকা।

(২০১৪), wZb cqmvi †R¨vQbv, দ্বিতীয় মুদ্রণ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

সৌমিত্র শেখর (২০১১), Iv‡Ui KwеZv : fv‡jvevmvi kiwe× KweKj, বিভাস, ঢাকা।

হায়াৎ মামুদ (২০১৫), evsjv‡`k : mvs¯‹…wZK AvZ¥cwiPq, চন্দ্রাবতী একাডেমি, ঢাকা।

হায়াৎ সাইফ (১৯৮৯), mgKvjxb evsjv mvwnZ¨ (সম্পা. খান সারওয়ার মুরশিদ), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৯৪), nvmvb nwdRi ingvb iPbvejx, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ (২০০৮), Kve¨mgM, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

হেলাল হাফিজ (২০১৭), †h R‡j Av¸b R‡j, অষ্টাবিংশ মুদ্রণ, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা।

পঞ্চম অধ্যায়

ষাটের দশকের কবিতায় জাতীয়তাবাদী চিন্তার শিল্পরূপ

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

ষাটের দশকের কবিতায় জাতীয়তাবাদী চিন্তার শিল্পরূপ

বিষয় যে শিল্পিতায় উপস্থাপিত হয় তাই-ই ওই বিষয়ের শিল্পরূপ। আসলে বিষয়ের গতিপ্রকৃতি ঠিক করে দেয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিল্পমূর্তিটা কী দাঁড়াবে। ষাটের দশকে কবিতায় ধারিত জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার একটি সুস্পষ্ট পালাবদল আমরা আগের অধ্যায়ে খেয়াল করেছি। ফলে এই দশকের কবিতার শিল্পরূপেরও একটা পালাবদল লক্ষ করা যায়। এই পালাবদলের সম্পর্কসূত্র রেখেই ষাটের দশকের কবিতায় জাতীয়তাবাদী চিন্তার শিল্পরূপের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

ষাটের দশকের কবিতার ভাষা ও জাতীয়তাবাদী চেতনা

চল্লিশের দশকের বাংলাদেশের কবিতার ভাব-ভাষা-ঐতিহ্য ছিল মূলত পাকিস্তান আন্দোলনের জ্বরে কাঁপা। তখনকার সাহিত্যিক আলোচনার একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল নব গঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানের সাহিত্যের ভাষা কেমন হবে এই বিষয়টি। এক্ষত্রে তিনটি ধারা লক্ষ করা গিয়েছিল। একটি ধারা আরবি-ফারসিবহুল ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। অন্য ধারাটি বাংলা কবিতার পূর্বতন ভাষিক ধারার অনুবর্তী থাকতে চেয়েছে। অর্থাৎ এই ধারাটি বাংলা কবিতার আবহমান ভাষাকাঠামোটিকেই মান্য করার পক্ষপাতী ছিল। এই দুয়ের মধ্যবর্তী আরেকটি ধারা ছিল। এই ধারার সমর্থকরা মধ্যপন্থী ছিলেন। তারা আরবি-ফারসি এবং সংস্কৃতবহুলতা কোনো দিকেই পক্ষপাতমূলকভাবে ঝুঁকে না গিয়ে বরং পূর্ব বাংলার নিজস্ব একটি ভাষাভঙ্গিতে সাহিত্য রচনার পক্ষপাতী ছিলেন, যে ভাষাকাঠামোটি পূর্ব বাংলার জীবন আর সংস্কৃতির যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করবে। এই ধারার অনুবর্তীরা পূর্ব বাংলার সাহিত্যের ভাষাকে কারো দাসত্ব করানোর পক্ষপাতী ছিলেন না। তারা চেয়েছিলেন দুই ধারার সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে। নতুন রাষ্ট্রের নতুন ভাষা। এর সঙ্গে মুসলমানিত্বের যেমন সম্পর্ক থাকবে, তেমনি থাকবে সংস্কৃতেরও সম্পর্ক। কিন্তু বাংলাদেশের কবিতা ভাষার প্রশ্নে এর কোনোদিকেই যায়নি। এর ভাষা গিয়েছে উদার, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, আধুনিক ধারায়। এই প্রবণতাটি মূলত বাংলা কবিতার দীর্ঘ পথযাত্রার সঙ্গে যুক্ত হয়েও বেশ খানিকটা নিজস্ব সুর আর স্বরের সাধক। কবিতায় এই সাধনার সূত্রপাত ঘটেছে মূলত পঞ্চাশের দশকের তরুণ প্রজন্মের কবিদের হাতে। আর এর ধারাবাহিক অগ্রযাত্রাকে সম্ভব করে তুলেছে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। মূলত, 'ভাষা সম্পর্কে গৌরববোধ, তার মর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতা, তার ব্যবহারের ক্ষেত্রের বিস্তৃতি– এসবই ঘটেছে ভাষা-আন্দোলনের ফল-স্বরূপ।' (আনিসুজ্জামান ১৯৮৯ : ২৫২)

ষাটের দশকের বাংলাদেশের কবিতার যে কয়টি বড় দান আছে তার মধ্যে পূর্ব বাংলার কবিতার একটি বিশেষ ভাষাকাঠামো দাঁড় করোনো অন্যতম। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ঘটনা বাংলাদেশের কবিতার ভাষাকে পরিস্রুত করেছে। আর ষাটের দশকে গিয়ে এই ভাষার ব্যবহার একটি বিশেষ ধরনপ্রাপ্ত হয়েছে। এই ধরনটি হচ্ছে, এসময়ের কবিতার ভাষা কোনোপ্রকার পূর্ব ধারণার বশবর্তী হয়নি। কোনোপ্রকার সংস্কারের কাছে সে ধরা দেয়নি। নিজস্ব গতিতে, প্রাণস্ফূর্তিতে সে বিচিত্র শব্দসম্ভার নিজের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে ধারণ করেছে। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের অন্যতম চেতনা ছিল কাউকে খাটো না করার চেতনা, আবার কাউকে অধিক গুরুত্ব না দেওয়ার চেতনা। স্বাভাবিকতাকে অঙ্গীভুত করে নেওয়াই ভাষা আন্দোলনের চেতনার অন্যতম প্রবণতা। অর্থাৎ ভাষার প্রশ্নে এবং ভাষার সঙ্গে জড়িত শ্রেণির প্রশ্নে একটা গণতন্ত্র ও সাম্যের চেতনার প্রকাশই ভাষা আন্দোলনের চেতনার একটি প্রধান দিক ছিল। এই চেতনাই ভাষা আন্দোলন পরবর্তী পূর্ব বাংলার শুধু কবিতা নয় পুরো সাহিত্যিক ভাষাচেতনাকে শাসন করেছে। এই চেতনাই ভাষা আন্দোলন-পরবর্তী– বিশেষত ষাটের দশকের– কবিতার ভাষা কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। একারণে দেশবিভাগ পরবর্তী বাংলাদেশের কবিতার ভাষার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন–

> সার্বিক অর্থে, পাকিস্তানি উপনিবেশ পর্যায়ে কবিতার ভাষা হয়েছে দীপ্র সংগ্রাম ও সংরাগময়। আত্মবিস্তারকামী মধ্যবিত্তের যুগপৎ স্বপ্ন ও ব্যর্থতায়, বেদনায় ও আত্মরতিতে সে ভাষা আবার কুণ্ডলায়িত রূপও গ্রহণ করেছে। সেই রূপে জড়িয়ে থেকেছে নিজস্ব ভূগোল ও সংস্কৃতির প্রতীকায়ন– যদিও মূল কাঠামোটি তিরিশের শব্দজগৎ দিয়েই গঠিত। তিরিশ প্রবর্তিত দৃষ্টিকোণ ও রূপকল্পের সম্প্রসারণই পরবর্তী বঙ্গীয় কবিতার প্রধান গতিপথ। তবু, আবহমান বাংলার ভাষা পরম্পরায় বিবর্তিত এ কবিতাবলি সময়ান্তরে যেমন আধুনিকতার এ-দেশীয় মডেলকে রূপান্তর করেছে আত্মবর্ণে, তেমনি বর্জন করেছে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি-সংস্কার, শব্দমোহ ও দ্যোতনা, ধর্মজ অনুষঙ্গ, ইতিহাস বিভ্রান্তি; পরিবর্তে গ্রহণ করেছে গণতান্ত্রিক চেতনা, মানবিক মূল্যাদর্শ ও ঐতিহ্যিক ভাষা-পরম্পরা। (বেগম আকতার ২০১৩ : ২৬১)

উদ্ধৃতাংশে কথিত 'গণতান্ত্রিক চেতনা, মানবিক মূল্যাদর্শ ও ঐতিহ্যিক ভাষা-পরম্পরা'র যে কথা পূর্ব বাংলার কবিতার ভাষা সম্পর্কে বলা হয়েছে সেটিই আসলে ষাটের দশকের কবিতার ভাষার মূল অর্জন ও প্রবণতা। অর্থাৎ ভাষার আদর্শ আর জাতীয়তাবাদী চেতনার আদর্শ ষাটের দশকের কবিতায় হাত ধরাধরি করে চলেছে। জাতীয়তাবাদী চেতনা যেমন ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-নির্বিশেষে সবাইকে এক পাত্রে ঢেলে সাজানোর মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে, তেমনি কবিতার ভাষাও সব ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণিকে ধারণ করে, সবার কণ্ঠস্বরকে ধারণ করেই বিশেষ হয়ে উঠেছে। ভাষা বিষয়ক এই চেতনাটি ধরা পড়েছে সমকালীন চিন্তাবিদের নিম্নোক্ত বক্তব্যে–

> আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অতি উৎসাহের সঙ্গে সাহিত্যে মুসলমানী ভাবধারা এবং মুসলমানী পরিবেশ আমদানী করতে চান। তার জন্য তাঁরা তথাকথিত 'মুসলমানী' শব্দ এবং চিত্র-প্রতীক ব্যবহার করতে চান। মুসলমানী ভাবধারা আনুন ভালো কথা। ... কিন্তু তার সার্থক রূপায়ণ চাই। কতকগুলি বাঁধা বুলি বা গৎ আওড়ালেই তা সাহিত্য হয় না– তা সে বুলি যত উচ্চাঙ্গেরই হোক। আপন হৃদয়ভাব থেকে যা স্বতঃউৎসারিত, কবি সাহিত্যিকের যে বাণী অন্তরের স্পর্শে সঞ্জীবিত, তাই শুধু সাহিত্যের রূপ গ্রহণ করতে পারে। ... আমাদের অনেক কিছুই ধর্মীয় মনোভাবের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে– তাই সাহিত্যেও ইসলামী ভাব ও আদর্শ খুঁজি, আর একটু অন-ইস্‌লামী কিছুর গন্ধ পেলেই অমনি রুখে দাঁড়াই। কিন্তু সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য ধর্ম প্রচার নয়। ... ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আমাদের সাহিত্যিকদের মধ্যে যেন কোনো বাড়াবাড়ি না দেখা যায়। ফার্সি-উর্দু শব্দের প্রাবল্যে ভাষাকে তারা যেন আড়ষ্ট ও অর্থহীন করে ফেলেন– এটা যেমন আমরা চাইনে, তারা আবার মুসলমানী (যেমন ছিল এককালে হিন্দুয়ানী) শুচিতা রক্ষা করতে গিয়ে সমাজ ও সাহিত্যকে বিশ্বপৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ-বিহীন ও গতিশূন্য করে ফেলেন– এটাও পূর্ব বঙ্গের সাহিত্যের উন্নতিকামী কেউ চাইতে পারেন না। কেবলি নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে আমরা যেন হীনমন্যতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচয় না দিই। পরন্তু নিজেদের রক্তের সঙ্গে যা ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত, কোনো মিথ্যা অভিমান এবং গোঁড়ামী বশতঃ সেই সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিলে আমরা ভয়ানক ভুল করব। (মোফাজ্জল ১৯৬৯ : ২০-২২)

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য বা কবিতার ভাষা বিষয়ক এই বক্তব্যে উদার গণতান্ত্রিক চেতনা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, প্রগতিশীলতার ধারণা, নিজস্ব সংস্কৃতির মর্যাদার ধারণার যে-চেতনা ফুটে উঠেছে, সেই চেতনাই তো ষাটের দশকের জাতীয়তাবাদী চেতনা। এই চেতনারই স্মারক হয়ে উঠেছে ষাটের দশকের কবিতার ভাষার ভুবন। উদাহরণ ষাটের প্রায় সব কবির কবিতাই। দুএকটি উদাহরণ দেখা যেতে পারে–

> লাল গোলাপের ঝল্‌মলে বাল্‌ব, নারী,
> একটা ফুঁতেই নিভিয়ে দিতে পারি।
> দিন-রজনীর চোখ-মারা রোড়্‌, রাগাও যদি
> এক নিমেষে হ'য়ে যাবে
> কুমীর বোঝাই গহিন নদী।
> যদি আমি চটি,
> ডিপের কাছে বুড়ো বট-ই
> সবুজ শাড়ি ছুঁড়ে দিয়ে দেখাবে সে তোবড়ানো বুক
> দেখবে তখন গাছ-গাছালির হাজার রকম অসুখ-বিসুখ।
> সবগুলো রঙ এক চুমুকে খেতে পারি
> এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া ভাবতে পারো?
> কালো-আলোর বোর্‌কা-ঢাকা আদিম নারীর
> চর্বি ও নুন অই তনুতে থাকবে আরো? (আসাদ ২০০৮ : ৩৭)

কবিতাংশের ভাষায় কি নেই! সবই আছে। পূর্ব বাংলার ভাষার নিজস্ব স্বর, সংস্কৃত শব্দ, আরবি-ফারসি শব্দ– এসব কিছুরই এক অনবদ্য সমাবেশ ঘটেছে। এছাড়া কবির প্রকাশে কোনো আড়ষ্টতা নেই; ভাষা আর ভাবের এক সহজিয়া উদার প্রকাশ। পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠীর যাপিত জীবন থেকে জন্ম নেওয়া জাতীয়তাবাদী চেতনার মতোই এই ভাষা স্থিতিস্থাপক। ষাটের দশকে ভাষার এই স্থিতিস্থাপকতার বিষয়টি সমালোচকদের দৃষ্টি এড়ায়নি। এই স্থিতিস্থাপকতাকে একেক সমালোচক একেক কবির মধ্যে একেকভাবে শণাক্ত করেছেন। যেমন, এক সমালোচক মনে করেন, শামসুর রাহমান তাঁর ‖bi‡j‡K ‖‘e¨i_ (১৯৬৮) কাব্যগ্রন্থ থেকে সামগ্রিকভাবে এবং প্রয়োজন অনুসারে ভাষার আটপৌরে পোশাকে সুসমৃদ্ধ হয়েছেন। (জিল্লুর ১৯৭৬ : ৯১) একই কবির ষাটের দশকে রচিত কাব্যগ্রন্থের ভাষার স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কে আরেক সমালোচক বলেছেন–

> তিনি শব্দ সংগ্রহ করেছেন যেকোন ভূভাগ থেকে– নাগরিক জীবন থেকে, গ্রামাঞ্চল থেকে, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য যেকোন ভূমণ্ডল থেকে। শব্দটি নির্বাচনে তাঁর কোন সংস্কার নেই– সাধু, সংস্কৃত, কথ্য, খেউড় স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেছেন। তাঁর রচিত বাক্যরাশিও অনুসরণ করেছে স্বাভাবিক উক্তি-প্রত্যুক্তির নিয়ম। কোন রকম জটিলতা ছাড়াই তাঁর ভাষা অর্জন করেছে স্বকালনিষ্ঠ সর্বগ্রাসিতা। (শেখ রজিকুল ২০০৭ : ৩৪১)

প্রকৃতপক্ষে ষাটের দশকে ক্রিয়াশীল মূলধারার অধিকাংশ কবি সম্পর্কেই বলা যায় যে, এই দশকে কবিরা তাঁদের কবিতার ভাষার প্রশ্নে সমকালীন বাঙালি জাতীয়তাবাদের মতোই উদার গণতান্ত্রিক ও সংস্কারমুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার প্রকাশের ধরনের একটা গভীর যোগ আছে। ব্যক্তি যখন নিজের মধ্যে নিজের নিরেট অস্তিত্ব অনুভব করে তখন তার নিজেকে সে বলিষ্ঠ ও নিজস্ব ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে। 'সংকোচের বিহ্বলতা' ব্যক্তির নিজস্ব প্রকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তিকে আড়াল খুঁজতে উদ্বুদ্ধ করে। আর ব্যক্তি যখন আত্মপ্রত্যয় অর্জন করে তখন তার মধ্যে জন্ম নেয় 'অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস'। এই 'অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহসের' সঙ্গে ব্যক্তির নিজস্ব আত্মবিশ্বাসের সম্পর্ক থাকলেও শেষ পর্যন্ত এটি জাতীয় চৈতন্যের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। একটি জাতি যখন আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে তখন তার মধ্যেকার ব্যক্তির নানামাত্রিক অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায়। ওই জাতির ব্যক্তি তখন নিজেকে বর্ণনা করার দ্বিধাহীন আত্মবিশ্বাস লাভ করে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগোষ্ঠী আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছিল। একারণে বাংলাদেশের পঞ্চাশের দশকের তরুণ কবিদের পক্ষে আধুনিক চৈতন্যকে ধারণ করে নিজেকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা সহজ হয়েছিল। কারণ জাতীয় আত্মবিশ্বাস ব্যক্তিকে ব্যক্তিত্ব অর্জনে সাহায্য করে। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার কবিতায় ব্যক্তি যখন নিজেকে বর্ণনা করতে গিয়েছে, তখন সে নানা বাধার সম্মুখীন হয়েছে। ফলে কবিদের নানা আড়ালের আশ্রয় নিতে হয়েছে। এই আড়ালের মধ্য দিয়ে তারা তাদের নিজেকে বর্ণনা করেছেন।

গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের ও ষাটের উপান্তের কবিতার ভাষা দেশবিভাগের পর থেকে ষাটের দশকের শুরু পর্যন্ত বাংলাদেশের কবিতার ভাষার তুলনায় অধিকতর উচ্ছল, প্রাণাবেগে কম্পিত, উচ্চকণ্ঠ, নির্ভার, ব্যক্তিত্বপূর্ণ, নিঃসংকোচ, মুক্ত, অনাবিল, স্বচ্ছ। কারণ, 'মানুষের অভিরুচি, স্বাধিকার, সাধ, মনস্কামনা, সামাজিক অবস্থান ও ভাবাদর্শে যদি থাকে নিষেধাজ্ঞা ও বিপ্রতীপ গতি, থাকে শাসনের উদ্যত মারণাস্ত্র তবে প্রতিরোধকামী জনতার উচ্চকোলাহল ও সমষ্টিলোকের ধ্বনিশক্তি হয়ে ওঠে উচ্চণ্ড।' (বেগম আকতার ২০১৩ : ২৬৪) অর্থাৎ ভাষার এই পূর্বকথিত রূপপ্রাপ্তির সঙ্গে জাতীয়তাবাদী জাগরণ ও জাতীয় চৈতন্যের আত্মবিশ্বাস অর্জনের একটি গভীর সম্পর্ক আছে। কারণ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামের সবচেয়ে বড় বড় অর্জন তো এই ষাটের দশকের উপান্তেই ঘটেছে। জাতীয় চৈতন্যের আত্মবিশ্বাস ব্যক্তিকবিকে 'অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস' দিয়েছে বলেই ভাষার এই মুক্তি সম্ভবপর হয়েছে। ষাটের উপান্তে রচিত যেকোনো কবির কবিতার ভাষার অভ্যন্তরীণ টোন লক্ষ করলেই বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যাবে। এমনকি ব্যক্তিগত অনুভব-অনুভূতির কবিতায়ও বিষয়টি বোঝা যায়। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত নির্মলেন্দু গুণের bv †c॥gK bv ॥ecøe॥ কাব্যের 'জীবনের প্রথম চুম্বন' কবিতার কয়েকটি চরণ লক্ষ করা যাক, যেখানে কবি নিজের সঙ্গেই নিজে কথা বলছেন–

> আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আজ রাতে ভালো করে দেখছি নিজেকে।
> মাথার ওপর থেকে যে চুল ঊর্ধ্ববাহু,
> ছাদ ভেঙে উঠে গেছে আকাশের দিকে তা থেকে পায়ের পাতা
> পুরোনো স্যাণ্ডেলে মোড়া অবিকল আমি যা তা-ই,
> হুবহু চোখের গর্ত, মাংস কম গালের দু'দিকে সতর্ক প্রহরারত
> নেমে আসা গোঁফ অবিকল সেই আমি যেন আজো রয়েছি দাঁড়িয়ে
> তোমার গন্তব্যপথে, আনন্দে, উল্লাসে কিংবা ব্যর্থ বিষণ্নতায়।

Dhaka University Institutional Repository

দেখে দেখে আমি একা হয়েছি দু'জন, এ-পাশে আমার আমি

অন্যপাশে খুঁতখুঁতে তোমার দুচোখ। (নির্মলেন্দু ২০১১ : ৫৭/১)

উদ্ধৃতাংশের ভাষা যেমন প্রকাশব্যাকুলতায় উদ্বাহু, তেমনি নিঃসংকোচ, স্পষ্ট ও গণমুখী। গণমুখী এজন্য যে, এই কবিতায় যে বাকভঙ্গিটি ব্যবহৃত হয়েছে তা অনেকটা মুখের ভাষার কাছাকাছি। বিশেষত 'ভালো করে দেখছি', 'আমি যা তা-ই', 'হুবহু চোখের গর্ত', 'মাংস কম গালের দু'দিকে', 'খুঁতখুঁতে তোমার দুচোখ' ইত্যাদি বাক্যাংশ ও শব্দবন্ধ কবিতাটিকে সাধারণের বাকভঙ্গির একেবারে কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছে। শুধু নির্মলেন্দু গুণ নয়, আরো উল্লেখ করা যায় ষাটের দশকের বাংলাদেশের আরেক আধুনিক কবির কবিতা, যিনি পূর্ব বাংলার ভাষা আর জাতীয় চৈতন্যে এতই আস্থাশীল যে, পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক ভাষার টোনে লিখছেন কবিতা–

ফুল ফুটেছে থোকা থোকা

তাঁতির পুতে বড়ই বোকা

জোলার ছাওয়াল জোলা রে

শাড়ি গামছা ঝোলা রে।

পান খাওয়ালি বিনা চুনে

তবুও তাঁতি লুঙ্গি বুনে

তাঁতির পুতগো করি মানা

লুঙ্গি থুইয়া শাড়ি বানা।

দেশ ভইরাছে মাইয়া লোকে

শাড়ি বানা থাকবি সুখে।

সোনার দেশ রে দুঃখে কই

লুঙ্গি পরার পুরুষ কই? (আসাদ ২০০৮ : ৫২)

স্বজাতির ভাষা, সংস্কৃতির ওপর গভীর আস্থা-ই কবিকে এই ভাষায় কবিতা লেখার সাহস জুগিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অথবা লক্ষ করা যাক আল মাহমুদের কবিতার ভাষাভঙ্গির কথা–

নদীর সিকস্তি কোনো গ্রামাঞ্চলে মধ্যরাতে কেউ

যেমন শুনতে পেলে অকস্মাৎ জলের জোয়ার,

হাতড়ে তালাশ করে সঙ্গিনীকে, আছে কিনা সেও

যে নারী উন্মুক্ত করে তার ধন-ধান্যের দুয়ার।

অন্ধ আতঙ্কের রাতে ধরো ভদ্রে, আমার এ-হাত

তোমার শরীরে যদি থেকে থাকে শস্যের সুবাস,

খোরাকির শত্রু আনে যত হিংস্র লোভের আঘাত

আমরা ফিরাবো সেই খাদ্যলোভী রাহুর তরাস। (আল মাহমুদ ২০০০ : ১০৫)

Dhaka University Institutional Repository

বলে রাখা ভালো আল মাহমুদ কবিতার এই ভাষাভঙ্গিটি গ্রহণ করেছেন তাঁর প্রথম দুটি কাব্যগ্রন্থ †jvK †jvKvšÍi (১৩৭০) ও Kv‡ji Kjm (১৩৭৩) প্রকাশিত হওয়ার পর ষাটের উপান্তে রচিত †mvbvwj Kvweb (১৯৭৩) কাব্যগ্রন্থ থেকে। এই কাব্যের কবিতাগুলোর অধিকাংশই ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে লেখা।[১]

ব্যক্তির নিজেকে প্রকাশের এই স্বনিষ্ঠ ভঙ্গি আর ভাষার মধ্যকার এই ব্যক্তিত্ব, স্বচ্ছতা, দেশজতার সঙ্গে ষাটের উপান্তে অর্জিত জাতীয় জীবনের আত্মবিশ্বাসের এক গভীর যোগ রয়েছে। একারণে সমালোচক একাত্তর অল্প পূর্ববর্তী বংলাদেশের কবিতার ভাষা সম্পর্কে বলেছেন– এ সময়ের কাব্যভাষা হয়ে উঠেছে অনেকখানি উন্মুক্ত ও বৃহত্তর গণচেতনাস্পর্শী। (বেগম আকতার ২০১৩ : ২৬৫)

আরবি-ফারসি বনাম সংস্কৃত

ষাটের দশকে বাংলাদেশের কবিতার ভাষারীতির প্রধান প্রবণতা তৎকালীন পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী চেতনার আদর্শানুগ উদার গণতান্ত্রিক হলেও ষাটের দশকের প্রথমার্ধে একটি দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল ছিল। এই দ্বন্দ্ব মূলত আরবি-ফারসি ও সংস্কৃতবহুলতার দ্বন্দ্ব। অর্থাৎ পূর্ব বাংলার কবিতা তথা সাহিত্যের ভাষা আরবি-ফারসি শব্দবহুল হবে নাকি সংস্কৃত শব্দবহুল হবে। আদতে পূর্ব বাংলার কবিতার ভাষা সংস্কৃতবহুল হবে এমন কোনো সচেতন প্রয়াস পূর্ব বাংলার কবিদের মধ্যে ছিল না। কিন্তু পাকিস্তানবাদী সাহিত্যিকমহল সরকারি প্রয়োজনায় যখন ভাষাকে ষাটের দশকে এসে আরবি-ফারসিবহুল করার ওপর জোর দেন, তখন এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে পূর্ব বাংলার কবিরা তাঁদের কবিতার ভাষার প্রশ্নে সংস্কৃতের দিকে ঝুঁকে পড়েন। এটি ছিল পূর্ব বাংলার কবিদের একটি গোঁ। তবে ষাটের দশকের বাংলাদেশের কবিতা দ্রুতই এই প্রতিক্রিয়াশীলতার ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে তার নিজস্ব স্বর ও সুর বেছে নিয়েছে, যেটি না আরবি-ফারসিবহুল, না সংস্কৃতবহুল।

চল্লিশ দশক থেকে শুরু করে পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলাদেশের কবিতার ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের বেশ উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল। বিশেষত পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে চেতনাগত ঐক্যই বাংলাদেশের কবিতার ভাষার এই রূপপ্রাপ্তির প্রধান কারণ। তবে এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, এই বিশিষ্ট ভাষারীতির বাইরেও কিছু কবি বাংলা কবিতার মূলধারার অর্থাৎ কলকাতায় বেড়ে ওঠা ভাষারীতির মধ্যে কাব্যচর্চা করেছেন। এক্ষেত্রে আহসান হাবীব ও আবুল হোসেনের নাম অগ্রগণ্য। আবার একথাও ঠিক যে, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর থেকে বাংলাদেশের কবিতার ভাষারীতি পরিবর্তিত হয়ে গেলেও এই আরবি-ফারসি শব্দবহুল ভাষারীতির প্রভাব পঞ্চাশের দশকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত বেশ সক্রিয় ছিল। এর প্রমাণ ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত ce evsjvi KwieZv নামক সংকলনটি। সংকলনটির নাম পূর্ব বাংলার কবিতা হলেও এর অন্তর্ভুক্ত কবিতার একটা বড় অংশ পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী আদর্শকে ধারণ করেছে এবং এসব কবিতার ভাষারীতিতে সংগত কারণেই আরবি-ফারসি বহুলতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু পঞ্চাশের দশকের পূর্ব বাংলার নতুন প্রজন্মের যেসব কবি প্রত্যক্ষভাবে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন অথবা এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন তাঁরা চেতনা এবং ভাষারীতির প্রশ্নে চল্লিশের দশকের

Dhaka University Institutional Repository

আরবি-ফারসি শব্দবহুল ভাষারীতির দিকে আর যাননি। প্রকৃতপক্ষে এটি ভাষারীতির পালাবদল নয়, এটি ছিল চেতনার পালাবদল; অন্যভাবে বলতে গেলে জাতীয়তাবাদী আদর্শের পালাবদল। একারণেই এই নতুন ভাষারীতির অন্যতম কবি 'শামসুর রাহমানের ... সাফল্যে ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদীরা ঈর্ষান্বিত হয়ে নানা প্রকার কুৎসার মেঘ সৃষ্টি করে আক্রমণে উদ্যত হয়েছিল।' এই আক্রমণের কারণ নিশ্চয় ভাষার বরাতে রাজনৈতিক চেতনার মধ্যে নিহিত। দুই প্রজন্মের দুই রাজনৈতিক চেতনার এই দ্বন্দ্বের কথা সৈয়দ আলী আহসানও অবশ্য বলেছেন। (সৈয়দ আলী ১৯৬৯ : ২২-২৪)[২] একারণেই সমকালীন আরেক কবি শামসুর রাহমানের 'রূপালী স্নান' কবিতার উদাহরণ দিয়ে বলেছেন–

> শামসুর রাহমান যখন এই কবিতাটি রচনা করেন তখনকার বিভাগপরবর্তী পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক আবহাওয়া সামাজিক অনাচার ও সাম্প্রদায়িক হানাহানির কথা চিন্তা করলে ভাবতে অবাক লাগে, কি করে তার মতো একজন তরুণ বাঙালি কবি এ ধরনের সুন্দর কাব্যস্তবকের কথা সে সময় হৃদয়ে পোষণ করার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। (আল মাহমুদ ১৯৯৫ : ৪০)

ভাষা আন্দোলনের পর থেকে পঞ্চাশের দশকের পুরোটা সময় বাংলাদেশের কবিতার ভাষাকে এবং চেতনাকে প্রধানত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাই নিয়ন্ত্রণ করলেও দ্বিধা দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু ষাটের দশকে কবিতার ভাষা উদার গণতান্ত্রিকতাকে আত্মস্থ করলেও কোনো কোনো কবির কবিতার ভাষায় কিছুকালের জন্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে এসেছে সংস্কৃতবহুল ভাষারীতি। শামসুর রাহমানের একটি ভাষ্য দেখা যেতে পারে–

> আমরা যখন লিখতে শুরু করি, তখন এক ধরনের, আমি কবিতার কথাই বলব– কবিতা ছিল, যেগুলোর মধ্যে পাকিস্তানি একটা উচ্ছ্বাস, জিন্দাবাদধর্মী একটি উচ্ছ্বাস প্রকট ছিল এবং আমার সে বয়সেই মনে হয়েছে তার মধ্যে এক ধরনের সারল্য নয়, তারল্য ছিল। আপনাদের নিশ্চয় বুঝিয়ে বলতে হবে না যে সারল্য এবং তারল্যের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। আর ওটা সত্যিকারের কবিতার পক্ষে একটা বাধাস্বরূপ ছিল এবং একটু পরে, আরও পরে– আমাদের ভাষাকে একটু ভিন্নধর্মী করার জন্যে কিছু কিছু প্রস্তাব কোনো কোনো বয়স্ক লেখক দিচ্ছিলেন সরকারি প্ররোচনায়। আমি বলব যা আমাদের ব্যথিত এবং ক্ষুব্ধ করেছিল এবং এখন আমি আমার লেখায় বেশ কিছু – যাকে বলে আরবি-ফারসি কিংবা উর্দু শব্দ ব্যবহার করি। কিন্তু আগে আমি একেবারেই করতাম না। প্রতিবাদ করেই করতাম না। কারণ, ওটি আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। আমি তৎসম শব্দ বেশি প্রয়োগ করতাম। আমি শুধু একা নই, আরও কেউ কেউ করতেন। সে যা-ই হোক, সেই পণ্যতার বিরুদ্ধে আমি দাঁড়াই। লিখতে শুরু করি। (শামসুর রাহমান ২০১৭ : ৩৬)

পাকিস্তানি শাসক এবং তার আদর্শগত অনুসারীদের ভাষা পুনর্গঠন প্রচেষ্টা আর বাংলা ভাষা আর রবীন্দ্রনাথের প্রতি আক্রমণই বাংলাদেশের কবিতার এই সংস্কৃত শব্দবহুল ভাষারীতির দিকে ঝুঁকে পড়ার অন্যতম কারণ। অর্থাৎ পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী চেতনা ষাটের দশকে এসে কলকাতার দিকে বেশ খানিকটা ঝুঁকে পড়েছে। এসময় পাকিস্তানি শাসক আর তার অনুসারীরাদের প্রায়শই বলতে শোনা যায় যে, ভাষার প্রশ্নে সংস্কৃতবহুলতা মূলত হিন্দুয়ানিরই অংশ। এর প্রতিক্রিয়ারও অংশ হয়ত এই সংস্কৃতবহুল ভাষার দিকে ঝুঁকে যাওয়া। শুধু কবিতা নয়, ষাটের গদ্যও অনেকাংশে একই লক্ষণাক্রান্ত ছিল। বিশেষত ষাটের দশকের পত্রিকা KÉ¯i-কে কেন্দ্র করে এমন একটি লেখকগোষ্ঠীও গড়ে ওঠে। কবিতায় সংস্কৃত শব্দের বহুলতা চোখে পড়ার মতো দেখা যায়। (হায়াৎ ১৯৮৯ : ৪) এমন কি সৈয়দ আলী আহসানের মধ্যেও। সৈয়দ আলী আহসানের কবিতার ভাষার মধ্যেকার এই প্রবণতাকে এক ধরনের রূপান্তরও বলা

Dhaka University Institutional Repository

চলে। সৈয়দ আলী আহসানের এই রূপান্তরকে কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন 'নিজবাসভূমে প্রত্যাবর্তন।' (হায়াৎ ১৯৮৯ : ১৬) কারণ তিনি চল্লিশের দশকের কবিতার ভাষায় যে, ব্যাপক আরবি-ফারসি শব্দের ঠাঁসবুনন দিয়েছিলেন সেখান থেকে তিনি সরে আসলেন সংস্কৃত শব্দবহুল ভাষারীতির মধ্যে। যদিও আহসানের কবিতায় প্রকৃতি আর সময়কে ভোগের যে-সমৃদ্ধ রূপ লক্ষ করা যায় তা হয়ত এই ভাষারীতিটিই নির্ধারণ করে নিয়েছে। অর্থাৎ জীবনচেতনাই আহসানের এই ক্লাসিক ভাষারীতিকে বেছে নিয়েছে। যেমন–

সব কিছু পাব এই আশ্বাসে
হৃদয় কেঁপেছে তরঙ্গে,
আকুলতা যেন সুধার সাগর
দেহ চঞ্চল আসঙ্গে;
সকল শরীর ধানের মতন
বাতাসে আবেশে কম্পিত;
অনেক রাত্রে অভিসারিণীর
দেহ-বল্লরী লজ্জিত। (সৈয়দ আলী আহসান ২০০৯ : ১১০)

কিন্তু ষাটের দশকের উপান্তে বাংলাদেশের কবিতা আরবি-ফারসির প্রতিক্রিয়া হিসেবে সংস্কৃতঘেঁষা হওয়ার প্রবণতা ঝেঁড়ে ফেলে নিজস্ব গতিতে চলেছে। কারণ তখন বাঙালি জাতীয়তাবাদ সব অর্থেই তার নিজস্ব রূপ-কাঠামো দাঁড় করিয়ে ফেলেছে।

প্রকরণ-পরিচর্যা-শব্দক্ষেপে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সমষ্টি

ষাটের দশকের প্রথমার্ধের রাজনীতি এসময়ের তরুণ কবিদের কবিতার প্রকরণে-পরিচর্যায়-শব্দচয়নে বিশেষত্ব এনে দিয়েছে। ষাটের দশকের প্রথমার্ধে তীব্র রাজনৈতিক চাপে কবিতা ব্যক্তির ব্যক্তিগত উচ্চারণ আর রুচির মধ্যে প্রবেশ করেছে। ষাটের দশকের কবিতাকে যে-যে কারণে অন্য সময়ের কবিতা থেকে আলাদা করা যায়, এর মধ্যে একটি হচ্ছে, এই দশকের কবিদের কবিতায় ব্যক্তি তার নিজস্ব অস্তিত্ব নিয়ে স্বপ্রকাশিত হয়েছে। পঞ্চাশের দশকেও ব্যক্তির প্রকাশ কবিতায় লক্ষ করা যায়। কিন্তু সেই ব্যক্তি ষাটের দশকের ব্যক্তির মতো এতটা বহুবিচিত্র, উদগ্র, উগ্র, তীব্র, সপ্রতিভ নয়; একটু যেন মগ্ন, ধ্যানস্থ, অনুভববেদ্য, নিম্নকণ্ঠ। কিন্তু ষাটের দশকের তরুণ ব্যক্তিকবির যৌনতার প্রকাশেও যেন বাড়াবাড়ি। তার হতাশা-নৈরাশ্যও তীক্ষ্ণ-সর্বব্যাপী। এ যেন রাজনৈতিক পরাধীনতার কাব্যিক মুক্তি। রাজনৈতিক পরাধীনতার মধ্যে ষাটের কবিতা, বিশেষত ষাটের প্রথমার্ধের কবিতা, ব্যক্তির রাজনৈতিক মুক্তি ছাড়া সব ধরনের মুক্তির স্বাদ নিয়েছে। রাজনৈতিক অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তির স্বাদ এবং বাসনা যেন কবিরা অপরাপর বিষয়ের ভেতর দিয়ে নিয়েছেন ও করেছেন। ব্যক্তি মুখ্য হয়ে ওঠায় ষাটের কবিতা হয়ে উঠেছে আত্মনির্ভর। এই আত্মনির্ভরতা ষাটের কবিতার প্রকরণ-প্রকৌশলকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক হওয়ায় ষাটের তরুণ কবিদের কবিতায় দেখা দিয়েছে অস্তিত্ববাদ, পরাবাস্তববাদ, অভিব্যক্তিবাদের প্রয়োগ। এই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার কারণেই এই দশকের কবিতায় দেখা দিয়েছে 'আত্ম-স্বীকরণ বিবৃতির ঢং, প্রচল-অপ্রচল ইংরেজি শব্দসহ বাক্যবন্ধ' এবং 'নানা বিদেশী শব্দের যথেচ্ছ প্রয়োগ'। (বায়তুল্লাহ্ ২০০৯ : ১৪৯) অর্থাৎ কবিতা যেন তার দুহাত দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করে দিয়েছে। কবিতা ত্যাগ

Dhaka University Institutional Repository

করেছে তার ছুঁৎমার্গতা। এর ফলে কবিতার ছন্দ, উপমা, চিত্রকল্প, বর্ণনভঙ্গিতে ব্যক্তিভেদে বৈচিত্র্য এসেছে। একারণেই বোধ করি সমালোচক বলেছেন, 'মূলত উপমা, শব্দচয়ন, অলঙ্কার সন্নিবেশে ষাটের কবিরা প্রথাবিরোধী'। (বায়তুল্লাহ্ ২০০৯ : ১৪৯)

কিন্তু ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম জারি থাকায়, পূর্ব বাংলায় জনজাগরণ ঘটায়, ব্যক্তিকবি পূর্বের মতো আর বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেননি। কবিকে যুক্ত হতে হয়েছে বহুমানুষের সঙ্গে। ফলে কবিতার প্রকরণ-পরিচর্যা-অলঙ্কার সন্নিবেশে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। ষাটের দশকের দুই পর্বের কবিতার প্রকরণস্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন–

> প্রথম ধারায় লক্ষণীয় মস্তিষ্ক নির্ভরতায়, বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিকোণে শব্দানুষঙ্গ ও চিত্রকল্প অন্বেষণ এবং শিল্প সর্বস্ববাদী নিরীক্ষাবশত ফর্মের ভাঙচুর করা। অবিকশিত বুর্জোয়া নাগরিকের অবক্ষয়রূপ ও আত্মমনোভূমিই এখানে প্রাধান্য পায়। দ্বিতীয় ধারাটি জাতীয় চেতনার চিহ্নক হয়ে কাব্যগতিকে দেয় স্বতঃস্ফূর্ত আবেগশক্তি, রোমান্টিক আর্তি, কিছু ক্ষেত্রে মরমিয়া-স্পর্শ। (বেগম আকতার ২০০৩ : ১৪)

প্রতীক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ষাটের তরুণ কবিকুল শুধু নয়, ষাটে ক্রিয়াশীল পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে এই দ্বিভাজন সহজেই চোখে পড়ে। যেমন, ষাটের প্রথম দিকে প্রতীকের মধ্যে ব্যক্তিতা প্রধান হয়ে উঠেছে আর ষাটের দ্বিতীয়াংশে সমষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতীক ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এটি ষাটের দশকে ক্রিয়াশীল যেকোনো কবির ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় প্রতীক ব্যবহারের এই কালিক দ্বৈততা লক্ষ করে গবেষক দেখিয়েছেন যে, 'প্রথমদিকে রোমান্টিক অনুধ্যানে 'রাত্রি', 'গণিকা', 'কবর', 'কুকুর' 'সাপ', 'আগুন' প্রভৃতি প্রতীক কবি ব্যবহার করলেও পরবর্তীকালে গুণ হয়েছেন গণ-সম্পৃক্ত। মিছিল, ফেস্টুন, মারণাস্ত্র, রাইফেল, গ্রেনেড, কমরেড, কার্ল মার্কস্ লেনিন প্রভৃতি শব্দ ও বিষয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন প্রত্যক্ষভাষী।' (বায়তুল্লাহ্ ২০০৯ : ১৫৭) ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে কবিতা মনোমুখী যতটা না তার চেয়ে বেশি বহির্মুখী। একারণে প্রতীকগুলো যতটা না অন্ধকার মনোলোককে উদ্ভাসিত করে তার চেয়ে বেশি কবির চারপাশের বাস্তবতাকে মেলে ধরে। ষাটের শেষের দিকে কবিতা যে বহির্মুখী বা গণমুখী হয়েছে তার প্রমাণ শামসুর রাহমানের weaŸ¯Í bw¤jgv আর e›'x wkwei †_‡K কাব্যগ্রন্থ দুটির মধ্যে তুলনা করলেই পাওয়া যাবে। ব্যক্তিমুখিতা আর গণমুখিতার দ্বৈততার কারণেই রাহমানের প্রথম দিককার কবিতায় পরাবাস্তববাদী উপাদান বেশি আর শেষের দিকের কবিতায় এই উপাদান কম। (আবিদ ২০১৫ : ৬৬) শুধু শামসুর রাহমান নয় ষাটের দশকে ক্রিয়াশীল যেকোনো কবির ক্ষেত্রে একথা বলা যাবে যে, ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামের কারণে কবিতা প্রকরণগত দিক থেকে বেশ বদলে গিয়েছে। হাসান হাফিজুর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক, শহীদ কাদরী, ফজল শাহাবুদ্দীন, নির্মলেন্দু গুণ, হুমায়ুন আজাদ– সবার কবিতা সম্পর্কেই একথা চোখ বুজে বলে দেয়া যাবে। এঁদের সবার কবিতাই অন্তর্মুখিনতা থেকে বহির্মুখিনতার দিকে গিয়েছে। ফলে এঁদের কবিতার প্রকরণে ব্যাপক পালাবদল ঘটেছে।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম যখন কবিতার উপমা

কবির বক্তব্যকে হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয় করে তোলার ক্ষেত্রে উপমা-রূপকের গুরুত্ব সীমাহীন। এই উপমা-রূপকের উপমান কবির চারপাশে প্রকৃতিগতভাবেই নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকে, আবার কখনো অভিজ্ঞতার মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

থাকে। কবি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তা শনাক্ত করে কবিতায় ব্যবহার করেন। কিন্তু কিছু কিছু উপমান কখনো কখনো এত জীবন্ত হয়ে ওঠে যে, সেসব উপমান কবির ওপর তীব্র চাপ তৈরি করে। সেসব উপমানের চয়ন সবসময় কবির ইচ্ছাধীন থাকে না। কবি তাঁর জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে বাধ্য হন সেসব উপমানকে ব্যবহার করতে। ইতিহাসের কিছু বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে এমন ঘটনার অবতারণা হয়। ষাটের দশক এমন একটি সময় যখন বাংলাদেশের অধিকাংশ বাঙালি কবির চৈতন্যকে শাসন করেছে সমকালীন জাতীয়তাবাদী রাজনীতির নানা ঘাত-প্রতিঘাত। সর্বক্ষণ অস্থির করে তুলেছে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ। এটি রাজনীতি-সচেতন এবং রাজনীতি-বিমুখ উভয় ঘরানার কবির ক্ষেত্রেই সত্য। একারণে দেখি ষাটের– বিশেষত শেষার্ধের– কবিতায় কবিরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নানা বিষয়কে হরহামেশাই উপমান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে কবিতার বিষয় কখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। প্রেম, প্রকৃতি, রাজনীতি, এমনকি একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশের ক্ষেত্রেও কবিরা উপমান হিসেবে জাতীয়তাবাদী জাগরণের বিষয়টিকে ব্যবহার করেছেন। রোদের তীব্রতা চারপাশে কী ধরনের প্রভাব তৈরি করেছে, তা বলতে গিয়ে কবি যখন বলেন, 'সবকিছুতেই যেন একালের রাজনীতির মতো/কেমন একটা ধ্বংসমাতাল বিভ্রান্তি...' (ফজল ২০১২ : ৯০/১) অথবা 'বাংলাদেশ মিছিলের মতো বারবার কেঁপে ওঠে' (ফজল ২০১২ : ১৯২/১) তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম পূর্ব বাংলার কবিচৈতন্যকে কতটা গ্রাস করেছিল। একই কবি 'আমার মৃত্যু হয়েছে' শিরোনামের কবিতায় দাবি করছেন তাঁর অনুভূতি আর আগের মতো নেই। স্পর্শকাতর অনেক কিছুই আর তাঁকে স্পর্শকাতর করে না। কোন কোন বিষয় তিনি আর কবি জনোচিত অনুভূতি দিয়ে গ্রহণ করতে পারছেন না, তার একটি তালিকা কবিতাটিতে দিয়েছেন। এই তালিকায় এক জায়গায় স্থান করে নিয়েছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম। কবির ভাষায়, 'বুঝতে পারি না কখন আন্দোলনের তীব্রতায়/হাজার হাজার মানুষ এক একটা পারমাণবিক অস্ত্রের মতো/ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে...।' (ফজল ২০১২ : ৯০/১) অথবা দারুণ মিছিলের সময় রাস্তার দুপাশের দোকানগুলোর পরিস্থিতি কী হয়, তার সঙ্গে কবি যখন উপমা দেন রৌদ্রের আগমনে আকাশের তারাগুলোর অদৃশ্য হয়ে যাওয়াকে, তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে কবির চৈতন্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম-মিছিল-বিক্ষোভের প্রবল প্রভাবের বিষয়টি। কবির ভাষায়, 'রৌদ্রের মিছিল এলে রোয়া-ওঠা তোয়ালের মতো/আকাশের মোড়ে মোড়ে নক্ষত্র-বিপনি/বন্ধ করে ঝাঁপ।' (শামসুর ২০১২ : ২৯৭/১) আরো সুনির্দিষ্ট উদাহরণ লক্ষ করা যাক, শহরে হঠাৎ আসা বৃষ্টি নিয়ে রচিত 'কে ভেবেছিল' কবিতার একটি অংশ–

> কে ভেবেছিলো
>
> আমার আশঙ্কা আর তোমার আকাঙ্ক্ষায়
>
> ঊনসত্তরের জানুয়ারীর আন্দোলনের মতো
>
> এ বৃষ্টি ক্রমশঃ তীব্র হতে থাকবে পূর্ণ হতে থাকবে
>
> জলের উচ্ছ্বসিত পুষ্পল শরীর

Dhaka University Institutional Repository

ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকবে রাস্তায় রাস্তায়

রাজপথ থেকে গলিতে। (ফজল ২০১২ : ১১৬/১)

এভাবে ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের কবিতার উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্পের জগৎকে দখল করেছিল জাতীয়তাবাদী নানা আন্দোলন-সংগ্রাম। এর ফলে কবিতাটি কোন বিষয় নিয়ে রচিত, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে কবিতাটি বাঙালি জাতির কোন সময়ে রচিত সেই বিষয়টি। কারণ কবিতাটি একটি অলংকারের তীব্র-তীক্ষ্ণ দ্যুতিতে উদ্ভাসিত করে তুলেছে একটি জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ইতিহাসকে।

উপমা-চিত্রকল্প-ইমেজে জাগরণী চৈতন্য ও জাগরণের আশাবাদ

একজন কবি তাঁর বক্তব্যকে প্রকাশের জন্য কোন ধরনের উপমা ব্যবহার করছেন তা কবির চৈতন্য এবং তাঁর চারপাশের বাস্তবতাকে বোঝার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কবির কবিতায় যখন একের পর এক আঁধারের উপমা-চিত্রকল্প এসে হাজির হয় বা ম্রিয়মান সব উপমামালা এসে জড়ো হয়, তখন সেই কবির চেতনায় ক্রিয়াশীল বাস্তবতা বুঝতে আর খুব একটা সমস্যা হয় না। কিন্তু কবিতায় যখন প্রাণস্ফুর্ত আর তীব্র-প্রখর উপমা-চিত্রকল্প বা অপরাপর অলংকার জড় হয় তখনও কবির চৈতন্য স্পষ্ট হয়ে যায়। ষাটের দশকের কবিতার উপমা-চিত্রকল্পের দিকে দৃষ্টি দিলে সময়কে যেমন বোঝা যায়, তেমনি কবির চেতনাজগতের হদিসও সহজে মিলে যায়। প্রকৃতপক্ষে, ষাটের দশকের– বিশেষত দ্বিতীয়ার্ধের– কবিতার প্রকরণে উপমা-চিত্রকল্প চয়নের তত্ত্ব-তালাশ করলে দেখা যায়, এসময় কবিদের কবিতায় যেসব উপমা-চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছে তার একটা বড় অংশ প্রচণ্ডতা, তীক্ষ্ণতা, প্রখরতা, তীব্রতা, বেগবানতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এসব উপমা-চিত্রকল্প যে সমকালীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম দ্বারা পরিপুষ্ট কবির জাতীয়তাবাদী চৈতন্য দ্বারা শাসিত তা সহজেই বলা যায়। অন্য যেকোনো সময়ের কবিদের ব্যবহৃত উপমা-চিত্রকল্প আর ষাটের শেষার্ধের উপমা-চিত্রকল্প দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে। পাকিস্তানি পুলিশ পূর্ব বাংলার বাঙালির জাগরণের ফলে সংঘটিত আন্দোলনের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে, 'ঘড়িতে গভীর রাত, ব্যারাক নিশ্চুপ। বারান্দায়/করি পায়চারি আর হঠাৎ কখনো কানে ভেসে আসে/সমুদ্রের গর্জন;/সুন্দরবনের সব বাঘ যেন আমার ওপর/পড়বে ঝাঁপিয়ে ক্ষমাহীন।' (শামসুর ২০১২ : ২৭৪/১) উপমার মোড়কে মোড়ানো এই চিত্রকল্প সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন, "চিত্রকল্পটিতে বাঘের উপমান চিত্রটি গ্রথিত হয়েছে সংগ্রামের প্রবলতা, স্বতঃস্ফূর্ততা ও সংঘবদ্ধতার সূত্রে।... গণঅভ্যুত্থানের কালে জনরোষের তুঙ্গ মাত্রা চিহ্নিত করতে উপমানচিত্র হিসেবে এসেছে 'সুন্দর বনের বাঘে'র ক্ষমাহীন ঝাঁপিয়ে পড়ার শৌর্য-সৌন্দর্য।" (সরকার ২০০৬ : ১২২) পুলিশের বরাতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বাস্তবতা প্রকাশ করতে গিয়ে কবি যেসব উপমা ব্যবহার করেছেন, সেইসব উপমাই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তীব্রতা আর গভীরতা বোঝার জন্য যথেষ্ট। আলাদা কোনো মাহাত্ম্য বর্ণনার প্রয়োজন পড়ে না। উপমাই এখানে বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে লেখা কবি দিলওয়ারের কবিতার উপমা-চিত্রকল্পে ফুটে উঠেছে জাতীয়তাবাদী জাগরণের আশাবাদ; 'অরুণিমা দিন আনো, কষিত সোনার মতো দিন/তিমিরার্ত পথেঘাটে অন্নহীন অলিতে গলিতে,/রূপাজীবা কল্পনায়, আততায়ী জুজুর গলিতে,/দীপ্তির সমুদ্রগর্ভে

Dhaka University Institutional Repository

নিশীথপিপাসা হোক লীন।' (দিলওয়ার ১৯৯৮ : ১৫৩/১) আরো কিছু উদাহরণ দেখলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। হাসান হাফিজুর রহমান যখন বলেন, 'লক্ষ কোটি তারা ফুলের নিচে /আমি যেন এক আগাম বিজয়ের সপ্রাণ ঘণ্টাধ্বনি হয়ে গেছি' (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ১৬৩/১) তখন খুব সহজেই বোঝা যায় উৎপ্রেক্ষাসূত্রে চয়িত এই চিত্রকল্পের যোগান দিয়েছে জাতীয়তাবাদী জাগরণ। আবার আহসান হাবীবের নিম্নোক্ত কবিতায় ইমেজের যে প্রতিভাস লক্ষ করা যায় তাও সজীব-সপ্রাণ হয়ে উঠেছে ষাটের জাতীয়তাবাদী জাগরণী চৈতন্য থেকে রূপ-রস গ্রহণ করে–

এসো
এসো তার মুখের সমস্ত কালি মুছে দিয়ে
এক সঙ্গে পার হই,
শুক্‌নো ঘাটে জোয়ারের ডাক
আসুক, দুলুক নৌকো আর মরা ঘাসে
দুলুক সমুদ্রপ্রাণ আশায় (আহসান হাবীব ১৯৯৫ : ১০৬/১)

কবিতায় কবির চেতনার গহন প্রদেশকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবি লুকিয়ে রাখতে পারেন না। কবির চৈতন্যের গভীর অনুভাবনা নানাভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। একটি ছোট্ট ইমেজ বা শব্দ, প্রকাশ করে দিতে পারে কবির মনোলোকের গভীর-গোপন বাস্তবতা। একারণে আমরা দেখব যে, বিশেষত ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের কবিতায়– প্রথমার্ধের কবিতায়ও রয়েছে, তবে তা কবির আশাবাদ দ্বারা চিহ্নিত, প্রত্যক্ষভাবে নয় অধিকাংশ সময়– দেশকালের বাস্তবতা কবির অলক্ষ্যেই কবিতায় কখনো টুকরো ইমেজে কখনো শব্দ নির্বাচনে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। চারপাশ কবির গভীর চৈতন্যকে অজান্তেই দখল করে নিয়েছে। ষাটের দশকের প্রথমার্ধের নিষ্ফলতার মধ্যেও কোনো কোনো কবি তাঁদের কবিতার ইমেজে জাগরণের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন আড়াল-আবডালে। সিকান্দার আবু জাফরের ˆei¯ eü‡Z কাব্যের 'নিস্তব্ধ' কবিতায় কবি গাছের পাতা আর সূর্যালোকের ইমেজে জাগরণী চৈতন্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন এভাবে–

এই গাছগুলো তাহলে কিসের জন্যে?

পাতা ফোটাবার
ফুল দেখা দিলে প্রমত্ত
মক্ষিকা জোটাবার
কিছু দায়িত্ব সত্যি কি নেই তার?
এই ডালগুলো শুধু কি শূন্যে
রিক্ততা জানাবার...

এই ডালগুলো ঘন বন হতে পারত
পুঞ্জ পুঞ্জ সবুজে শান্ত
নিরন্ধ্র মহারণ্য।
এই ডালগুলো ঘিরে
স্বপ্নবিহীন রাত শেষ হ'ত :

Dhaka University Institutional Repository

নতুন পাতার বিচিত্র সুরে
পাখীরা জাগত–
দিন রাত্রির পালা বদলের পথে
পাথরের মত
মূঢ় সময়ের অচল অশ্ব
নিমেষে নিমেষে
সঞ্চরমান মুহূর্ত হ'ত।

দু'চোখের ঘন তৃষ্ণা মিটিয়ে
চেয়ে দেখতাম
কচি পাতা নিয়ে কচি পাতা রং
টিয়াদের চাঞ্চল্য,
আর দেখতাম বাতাসে ত্রস্ত
ডালপালাদের ফাঁকে ফাঁকে ভীরু
সূর্যের আনাগোনা। (সিকান্দার ২০১৭ : ১২৫)

কবিতাংশে গাছের নতুন পাতার রূপকে আর সূর্যের ইমেজে কবিচৈতন্যের যে আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে, তা বহু মানুষের সদর্থকতায় জেগে ওঠার সত্যকে সহজেই প্রকাশ করেছে। একই কবির KlieZv 1372 (১৯৬৮) কাব্যের অধিকাংশ কবিতার মতো 'চেতনার উৎস' কবিতায় লক্ষ করি জাগরণী ইমেজ-চিত্রকল্প–

তবুও আমি অন্য মনে কখনো সহসা
মূর্ছার মতো স্বপ্ন ভেঙে
জেগে উঠি;
অভ্যাসের সহজ সঙ্কেতে
নিজেকে সন্ধান করি
সময়ের নিথর খামারে
মানুষের অস্থির কঙ্কালে
বাঁচার ভরসা খুঁজে ইতিহাস খামচাই
তৃষ্ণার বিকারে।
আকাশে যেখানে উল্কা
ত্রয়োদশী চাঁদ
অনিবার নক্ষত্রের ঝাঁক
যেখানে ইচ্ছার হাটে
রঙে রসে বিলাসিনী ঋতু,
নিজেকে সন্ধান করি।
হঠাৎ পাখীর গানে
মুক্তপক্ষ গতির আঘ্রাণে
নিজেকে সন্ধান করি
যেখানে ধানের ক্ষেতে
রৌদ্রের আনন্দে মুগ্ধ অবাধ বাতাস,

অবারণ ফড়িংয়ের ডানার প্রলাপ। (সিকান্দার ২০১৭ : ১৭২-১৭৩)

আহসান হাবীব Qvqv nwiY কাব্যে কবিতা লিখেছেন তাঁর কোনো এক 'পলাতক বন্ধু'-কে নিয়ে। কিন্তু এই কবিতার ছোট্ট ছোট্ট ইমেজে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ষাটের জাতীয়তাবাদী জাগরণের বাস্তবতা। 'জোয়ারের জল', 'আলোর মিছিল', 'প্রবল বাতাস', 'নতুন ঘাসের বুক', 'ক্রোধের শিখা', 'মধ্যাহ্ন সূর্যের শিখা', 'মাটির নতুন জন্মবেদনা', ইত্যাদি শব্দবন্ধ এবং ইমেজ ব্যবহার কবিতাটিকে আর ব্যক্তিগত বন্ধু-স্মরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে দেশের সমকালীন জাতীয়তাবাদী জাগরণের সঙ্গে গভীরভাবে সেঁটে দিয়েছে। উদাহরণ দেখা যেতে পারে 'পলাতক বন্ধু' কবিতা থেকে–

পরাস্ত ক্রোধের শব কাঁধে নিয়ে
যেও না যেও না ফিরে। দেখো চেয়ে
জোয়ারের জল ভাঙে দেয়াল টপকায় আর বাতাস প্রবল।
এখন ক্রোধের শিখা নিবিও না। ফিরে এসো, দেখো
নতুন ঘাসের বুকে অন্য এক স্বপ্ন টলমল।
আবার নতুন
স্বপ্নের বাগানে এসো। ঝড়ের হাওয়ায়
বুক রাখো। স্তিমিত ক্রোধের শিখায় লাগুক হাওয়া
জ্বলুক ছড়াক
ব্যাপ্ত হোক চরাচরে।... (আহসান ১৯৯৫ : ১৭৬/১)

অথবা দেখা যেতে পারে একই ধরনের উদাহরণ–

মনে পড়ে
আর জানে মন,
এই অবারিতদ্বার
প্রেক্ষাগারে
একদা অক্ষম কোনো নায়কের ভুল অভিনয়
নতুন জলের ঢেউয়ে মরা নদী জাগাবে;
এবং
আঁধার নির্জন ঘাটে আলো দেবে। (আহসান ১৯৯৫ : ১১১/১)

'মরা নদী'র জেগে ওঠা এবং আঁধার কেটে আলো দেখা দেয়া শুধু নয়, 'কুয়াশার যবনিকা' ছিঁড়ে যাওয়া, নতুন প্রাণের স্মারক ফাল্গুনের আবির্ভাব ইত্যাদি অনুষঙ্গের আড়ালে কবিরা প্রায়শই আন্দোলনরত বাঙালি জনগোষ্ঠীর নতুন আশাবাদের বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি যখন বলেন 'পিকাসোর গার্নিকা ম্যুরাল মনে পড়ে–/ক্রুদ্ধ সেই ঘোড়াটার আর্তনাদ যেন/ আমাদের কাল'; অথবা যখন বলেন, 'সামনে তাকিয়ে দেখি পরিবর্তনের/টগবগ ঘোড়া'; (শামসুর ২০১২ : ১৮৮/১) তখন স্বকাল আর স্বজাতির জাগরণের বাস্তবতা আড়ালে থাকে না। অন্য আরো কবির মধ্যেও সময়ের সারসত্যের একই অভিক্ষেপ লক্ষ করা যায়–

রঙীন মেঘের বিদ্যুৎ-লেখা আগুনে
নীরবে কখন খোলে দ্বার

Dhaka University Institutional Repository

উল্লাসে ছিঁড়ে যবনিকা কুয়াশার
ডানা মেলে দেয় প্রমত্ত গূঢ় ফাল্গুনে;

কী তূর্যনাদ বাজাবে বংশী হেলাতে
কোন সে কোরক মেলবে কোমল নয়নে
ভ্রমর-সঙ্গী পিয়াসা আকুল শয়নে
মধুমাস নয় সুদূর স্বপ্ন বেলাতে। (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৯৮ : ১৩৯)

আবার পশ্চিমা বিশ্বে নববর্ষের উদ্‌যাপনের বিপরীতে পূর্ব বাংলার আন্দোলনের এক চিত্র, নতুন দিনের আশাবাদের এক চিত্র, কবি ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে–

বারোটা বাজলো ষাট দশকের অবশেষে।
এবং ট্রাফালগার স্কোয়ারের আলোকিত ঝর্ণধারা
নেচে উঠল উল্লাস মুখরিত তরুণ সত্ত্বরে।

বরফের বল ছুঁড়ে, পরস্পরকে চুম্বনে আলিঙ্গনে
বেঁধে তুলকালাম উৎসাহে মত্ত
সমবেত যুবক যুবতী। রক্তের উত্তাপে
অতি তুচ্ছ তুষার বিগলিত।...
এই সব তুলকালাম ঘটবার আগের প্রহরে
নববর্ষের খোঁজে শহীদ মিনার ছুঁয়ে
রমনার রাজপথ আলো করে দিয়ে গেল
সূর্যের প্রত্যাশী এক
মশাল মিছিল। (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৯৮ : ১৩২)

পূর্ব বাংলার বাঙালিদের নতুন বছরের স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা নববর্ষের একটি মশাল মিছিলের চিত্রের বর্ণনার অন্তরালে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন অত্যন্ত শিল্পকুশলতায়।

এমন কি সন্ধ্যার আগমনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তের রোদের মধ্যে কবি গণ-জাগরণে উদ্বুদ্ধ বিশাল জনতার ইমেজকে কল্পনা করেছেন–

অথচ একটু আগে ছিলো রোদ, রৌদ্রের চীৎকারে স্পন্দিত
আকাশে ছিলো অনির্বাণ অজস্র জ্যোতিকণা
সমুদ্রের ঢেউ কিংবা আন্দোলিত বিশাল জনতা
যেমন বিস্তৃত থাকে দিগন্ত অবধি ঠিক তেমনি। (ফজল ২০১২ : ৯০)

নৈরাশ্য আর দীর্ঘশ্বাসে মেদুর কবির কবিতায় যখন নিচের ইমেজ দেখা যায়, তখন কবির অনুভবের গভীরে সফল যূথবদ্ধ সংগ্রামের অস্তিত্বের অনুসন্ধান যৌক্তিকই মনে হয়–

পুনর্বার স্রোতে ভাসছে হাঁস, ভাসতে দাও
কোমল জলের ঘ্রাণ মাখুক হাঁসেরা;
বহুদিন পর ওরা জলে নামছে, বহুদিন পর ওরা কাটছে সাঁতার

স্রোতে রাজহাঁস আসছে, আসতে দাও। (আবুল হাসান ২০১২ : ৫৩)

ষাটের দশকের উপান্তে এসে অর্থাৎ ১৯৭০-এর পরের কবিতায় লক্ষ করা যায়, অন্ধকার আর আলোর ইমেজের বিপরীত সন্নিবেশ। এই দুয়ের দ্বান্দ্বিক ইমেজ উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে আলোর ইমেজের উদ্ভাসনের মাধ্যমে কবিরা তাঁদের কবিতায় এই সময়ের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব এবং চূড়ান্ত জাতীয়তাবাদী জাগরণের সত্যকে ধারণ করেছেন। উদাহরণ দেখা যেতে পারে–

ঘুমিয়ে-থাকা দেশের মানুষগুলো
হঠাৎ যখন বন্ধ চোখের জান্‌লা দুয়ার খুলে
অনুভূতির আলোয় মোছে
অচেতনার ধুলো,
আঁধার ভেঙে এগিয়ে আসে
নতুন ভোরের চাকা
রাত্রি পড়ে ঢাকা। (সিকান্‌দার ২০১৭ : ৪৭৪)

কবিতায় মিছিল ও আন্দোলন-সংগ্রামের অনুষঙ্গ

জাতীয়তাবাদী চেতনার অন্যতম প্রকাশ ঘটে জনগোষ্ঠীর অধিকার সচেতনতায় এবং সেই অধিকার আদায়ের জন্য রাজপথে সংগ্রামী মিছিলে শামিল হওয়ার মধ্য দিয়ে। পূর্ব বাংলার মিছিলের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে যে, ১৯৪৭-এর দেশ ভাগের পর থেকে যখন যখন পাকিস্তানি শাসকচক্র পূর্ব বাংলার ওপর কোনো অবিচার করেছে, তখনই মিছিল-ধর্মঘটে পূর্ব বাংলার রাজপথ-গ্রামপথ মুখর হয়ে উঠেছে। অব্যাহত অন্যায়-বেইনসাফ যেকোনো জনগোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদী চেতনাকে আরো শানিত করে তোলে। পূর্ব বাংলার ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের অব্যাহত শোষণ-নির্যাতন পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে বঞ্চনার বোধকে ক্রমাগত তীব্র করে তুলেছে এবং পূর্ব বাংলা ক্রমাগত আন্দোলনমুখর, মিছিলমুখর হয়ে উঠেছে। এই মিছিল ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে পূর্ব বাংলার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা এবং দৃশ্যে পরিণত হয়। ফলে বাংলাদেশের কবিতার– বিশেষত ষাটের কবিতার– একটা বড় অংশ দখল করে আছে মিছিল, মিছিলের ইমেজ, মিছিলের উপমা-অনুষঙ্গ।[৩] রাজনৈতিক কবিতা তো বটেই এমন কি ষাটের অরাজনৈতিক কবিতাও মিছিলের রূপকল্পে ও অনুষঙ্গে সজ্জিত হয়েছে। কারণ কবির প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতার একটা বড় অংশই তো দখল করে আছে মিছিল। একারণে এমন কি প্রেমের কবিতাতেও অনায়াসে মিছিল এসে হানা দিয়েছে। আবুল হাসানের কবিতার কিছু পঙ্‌ক্তি লক্ষ করা যাক–

মনে আছে একবার বৃষ্টি নেমেছিল?

একবার ডাউন ট্রেনের মতো বৃষ্টি এসে থেমেছিল
আমাদের ইস্টিশনে সারাদিন জল ডাকাতের মতো
উৎপাত শুরু করে দিয়েছিল তারা;
ছোট-খাটো রাজনীতিকের মতো পাড়ায় পাড়ায়
জুড়ে দিয়েছিল অথই শ্লোগান।

Dhaka University Institutional Repository

তবু কেউ আমাদের কাদা ভেঙে যাইনি মিটিং-এ
থিয়েটার পণ্ড হলো, এ বৃষ্টিতে সভা আর
তাসের আড্ডার লোক ফিরে এলো ঘরে;
ব্যবসার হলো ক্ষতি দারুণ দুর্দশা,

সারাদিন অমুক নিপাত যাক, অমুক জিন্দাবাদ
অমুকের ধ্বংস চাই বলে আর হাবিজাবি হলো না পাড়াটা। (আবুল হাসান ২০১২ : ২৭)

মহাদেব সাহা (জ. ১৯৪৪)-এর GB Mn GB mb¨vm (১৯৭২) গ্রন্থের 'তার বুকে আছে' কবিতায় কবি তাঁর প্রেমাস্পদের বুকে আবিষ্কার করেছেন যাবতীয় শান্তি আর স্বস্তি। কবিতাটি কবির একান্ত প্রেমের অনুভূতিকে ধারণ করেছে। কিন্তু সেখানেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম– বিশেষত মিছিল-ধর্মঘট– তার ছায়া ফেলেছে। কবির ভাষায়, 'যখন শহরে বাধে গোলযোগ, ধর্মঘট হরতাল চলে/যানবাহন বন্ধ থাকে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়/ঝাঁপ-ফেলা দোকানপাট দেখে মনে হয় সমস্ত শহর যেন/মৃত রবিবার/তখনো দাঁড়িয়ে দেখি তার বুকে খোলা জুয়েলারী শপ,/ফুলের দোকান,...'। (মহাদেব ২০১১ : ২৬/১) আবু হেনা মোস্তফা কামালের Avcb †hŠeb ˆei x কাব্যের 'প্রার্থনা' একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক কবিতা। কিন্তু এই কবিতায় ঢাকা শহরের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবির চেতনাকে অনিবার্যভাবে দখল করে নিয়েছে মিছিল। কবির ভাষায়–

দশটা বাজলে ব্যস্ত শহর বুঝি উড্ডীন হেলিকপ্টারে
কাঁপে থরথর ক্লান্ত শহর ঘোরে পথে পথে
মিছিলে মিছিলে, কষ বেয়ে নামে দুপুরের ঘাম,
ছবিঘরে এসে থমকে দাঁড়ায় বিকেলের নারী
সযত্নে বাঁধা একরাশ চুল তাকে দেখলেই মনে পড়ে যায়
আমার একটি আকাঙ্ক্ষা আছে চুপি চুপি বলি শুধু তোমাকেই
ঈশ্বর, যেন আমার জন্যে তার চোখে কিছু স্বপ্ন থাকেই। (আবু হেনা ২০০১ : ৮/১)

উদ্ধৃতাংশে এটি স্পষ্ট যে, এটি কোনো রাজনৈতিক চেতনার কবিতা নয়। কিন্তু রাজনীতি রয়েছে কবিতার মর্মে। জাতীয়তাবাদী চেতনার সর্বগ্রাসী প্রভাব কবির একান্ত অন্তরালবর্তী প্রেমময় 'প্রার্থনা'-কেও স্পর্শ করেছে। অথবা একই কব্যের 'অরুন্ধতী' কবিতায় এক নারীর প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করতে গিয়ে কবি বলছেন–

তুমি রুদ্ধ দরজা কত সহজেই দিয়েছো খুলে
নিয়েছো আমার বিবর্ণ গান
তোমার গোলাপি ঠোঁটের পতায়, অরুন্ধতী

দ্যাখো দীপ্ত মিছিলে পতাকার মতো উঠেছে দুলে
ফুটেছে ফুলের হাজার পাপড়ি
গলায় গলায়, বুকের তলায় হীরের জ্যোতি। (আবু হেনা ২০০১ : ৮/১)

Dhaka University Institutional Repository

হুমায়ুন আজাদের একটি ব্যক্তিগত অনুভূতির কবিতার উপমা-অনুষঙ্গও হয়ে উঠেছে সমকালীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম-শ্লোগান। A‡jŠwKK ‡÷gvi (১৯৭৩) কাব্যের ‘বিরোধী দল’ কবিতাটি দেখা যাক–

আমার সমস্ত কিছু আজকাল আমারই বিরুদ্ধে দাঁড়ায়
ফেস্টুন প্ল্যাকার্ড কালো পতাকা উঁচিয়ে
দিকে দিকে শ্লোগান দেয় আমারই পুত্রপৌত্র সব
হেরে যাই নির্বাচনে
সভামঞ্চ ধ্বংস হয় আত্মজের প্রচণ্ড তাণ্ডবে
সদর রাস্তা চৌরাস্তা গলি উপগলি
গ্রামগঞ্জ নগর বা মফস্বল শহরে
দগ্ধ করে আমার নিজস্ব হাত আমারই ব্যঙ্গাত্মক কুশপুত্তলিকা

পালিত কুকুর বেড়াল শার্ট স্যুট চশমার কাচ
স্বরচিত গদ্যপদ্য একোরিয়ামে পোষা লাল মাছ
আলোলাগা ভালোলাগা একখণ্ড প্রিয়তমা নদী
সবাই মিছিল করে দরোজায়
বলে যায়, ‘আমরা সকলেই তোমার বিরোধী’। (হুমায়ুন ২০০৮ : ৩০-৩১)

মিছিল, আন্দোলন, বিরোধিতা, প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, কারফিউ ইত্যাদির মধ্য দিয়েই তো জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ-প্রকাশ ঘটেছিল! কবির ওপর এই বাস্তবতা এমন গভীর দাগ ফেলেছে যে, এসব কবির চেতনার মূলকে, একান্ত ব্যক্তিগত অনুভব-অনুভূতির নিভৃততম প্রদেশকে দখল করে ফেলেছে। একই ধরনের প্রকাশ লক্ষ করা যায় ফজল শাহাবুদ্দীন (১৯৩৬-২০১৪)-এর AvKvW•ÿZ Am›‘i (১৯৬৯) কাব্যের ‘আমার কলম’ কবিতায়। কবি এ কবিতায় তাঁর কলমের মধ্যে হঠাৎ থমকে যাওয়াকে, ঊষর হয়ে যাওয়াকে, অনুভূতিহীন হয়ে যাওয়াকে আবিষ্কার করে নিজস্ব হাহাকারের প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছেন। কিন্তু এই একান্ত অনুভবের প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে পারিপার্শ্বিক জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের চাপে কবির অজান্তেই হয়ত কবিতার মধ্যে ঢুকে পড়েছে আন্দোলন-সংগ্রামের অনুষঙ্গ ও শব্দসম্ভার। অর্থাৎ পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম কবিচৈতন্যের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছে। কবিতাটির একটি অংশ লক্ষ করা যাক–

আমার সকল গান আর এই অস্তিত্বের সব অনুভব–
প্রেমের অধীর নদী ধ্বনিময় ঘৃণার বিকৃতি,
শিখা সর্বগ্রাসী, কামের দহন আর ঊষালগ্ন,
বাতাসের ঠাণ্ডা স্পর্শের মতোন তোমার আভাস,
গলির মোড়ের সেই পুরাতন লণ্ঠনের আলো,
গাড়ি, হরতাল গুলি গ্যাস কিংবা শহীদের লাশ,
পোস্টারে পুষ্পিত দেহ, গানে গানে ধ্বনিত অশ্লীল,
মোয়াজ্জিন, আজানের সুর কিংবা ঘণ্টাধ্বনি দূর প্রাচীন মন্দিরে
রেকর্ডের গান, বেতার অথবা জ্যোতির্ময় টিভি,

Dhaka University Institutional Repository

রোগের করুণ ক্লান্তি, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মাংসের বৈভব
সব মিলে পরিচিত পৃথিবী আমার
শব্দের নিপুণ স্বরে একদিন হয়েছে ধ্বনিত
যাকে আমি লিখে গেছি দিনরাত ব্যাকুল তৃষ্ণায়
রক্তের প্রাচীন শ্লোকে অন্তরঙ্গ আমার কলমে
ইঁদুরের রক্তমাখা অন্ধকারে ছেঁড়া স্যান্ডেলের মতো নির্বিকার
এখন সে প'ড়ে আছে
আমার অস্তিত্বে তার অস্থিরতা কোনোদিন আসবে না। (ফজল ২০১২ : ৮৭-৮৮/১)

কবিতাংশ প্রত্যক্ষভাবে কোনো রাজনৈতিক চেতনাকে ধারণ করেনি। কিন্তু কবিতাংশটি একই সঙ্গে সমকালীন রাজনৈতিকতাকে গভীরভাবে ধারণ করে আছে। বিশেষত ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের কবিতায় এভাবে সমকালীন পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম কবিদের কবিতায় স্থান করে নিয়েছে। কারণ 'এ যুগের কোনো মানুষের পক্ষেই রাজনীতির ছোঁয়াচ এড়িয়ে সমাজে বাস করা সম্ভব নয়।' (আবুল হোসেন ২০১০ : ১৩) অধিকন্তু 'জীবনের সমগ্রতাকে স্পর্শ করতে হলে রাজনীতির ঢেউগুলোকে মূল্য দিতে হয়।' (তারেক ২০১৫ : ৭৩) এই মূল্য কখনো কবিরা প্রত্যক্ষভাবে দেন কখনো পরোক্ষভাবে। ষাটের কবিতায় দুইভাবেই জাতীয়তাবাদী রাজনীতি কবিতার শরীরে প্রভাব ফেলেছে। একারণে ষাটের কবিতা মানেই মিছিল, আন্দোলন, কারফিউ–

সবাই তোমাকে দেখলেই কাছে ডাকে, এই যে আসুন,
কাল থেকে আমাদের আন্দোলন, আপনি তো নিশ্চয়
যাচ্ছেন মিছিলে, ভালো, সেই ভালো, বিকেলের দিকে
ক্যাফেটেরিয়ায় বসে গল্পসল্প কিছু হতে পারে, আচমকা বাতাসে তুমি
তৎক্ষণাৎ এলোমেলো, গাঢ় স্বরে কী যে বলো
দূর থেকে কিছুই বুঝি না– শুধু সবুজ আগুনে
জ্বলে যায় জ্বলে যায় সবুজ শহর। (আবু হেনা ২০০১ : ১৪/১)

বলা বাহুল্য কবিতায় 'সবুজ শহর' বলতে সবুজ শাড়িতে মোড়ানো প্রিয়ার শরীরের প্রদেশকেই বোঝানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রেমের কবিতায় বা এধরনের একান্ত অনুভবের কবিতায় নায়িকাকে কবিরা মাঝেমধ্যেই আবিষ্কার করেছেন মিছিলে-আন্দোলনের পুরোভাগে–

...কতোবার মিছিলে তুমুল ভিড়ে
দেখি তুমিই প্রথমা, দীপ্ত গ্রীবাভঙ্গি করে
চলে যাচ্ছো ক্রমাগত আলোর ভেতরে। হায়,
আমি নই বিদ্রোহের জ্বলন্ত নিশেন। (আবু হেনা ২০০১ : ১৪/১)

নিটোল প্রেমের এই কবিতাটিতে প্রসঙ্গক্রমে যখন আন্দোলন আর মিছিলের প্রসঙ্গ উঠে আসে তখন কবিতাটির রচনাকাল আর এর মধ্যকার জাতীয়তাবাদী চেতনাকে শনাক্ত করতে একটুও অসুবিধা হয় না। আবার মৃত্যুশয্যায় পতিত প্রেমিকের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলছেন, 'প্রেমিক শয্যায় তার কাতর মৃত্যুর প্রতীক্ষায়,/প্রাণের প্রতিটি তন্তু উন্মুখর রৌদ্রের ভিক্ষায়/সর্বক্ষণ; বীজাণুর দামাল গেরিলাগুলি নিবিড়

Dhaka University Institutional Repository

দঙ্গলে/রয়েছে গা ঢাকা দিয়ে শিরা উপশিরার জঙ্গলে।’ (শামসুর ২০১২ : ২৯৭/১) নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় আন্দোলন-সংগ্রামের অনুষঙ্গ সবচেয়ে বেশি উঠে এসেছে। তাঁর সম্পর্কে আবুল হাসান যেকথা বলেছিলেন[৪] সেকথার বাস্তব উদাহরণ হয়ে আছে তাঁর ষাটের দশকের প্রায় প্রতিটি কবিতা। †cgvsïi i³ PvB (১৯৭০) কাব্যের ‘যানবাহন নেই’ কবিতাটি লক্ষ করা যাক–

> পালাবার পথ নেই, ব্যারিকেড চতুর্দিকেই,
> যেন আন্দোলন চলছে প্রত্যহ।
> যানবাহন চলবে না, আজকে অফিস নেই,
> ভালোবাসা, তোমাকেও নগ্নপদে হেঁটে যেতে হবে।
>
> হাতের তালুর দাগ, রৌদ্রে বালিশের মতো
> উল্টে দেবো সব রেলপথ, ইঞ্জিনেও লাগাবো আগুন,
> তোমাকে ও অজস্র যাত্রীকে। (নির্মলেন্দু ২০১১ : ৩৩/১)

প্রেমিকার উদ্দেশ্যে লিখিত এই কবিতার শব্দ ও অনুষঙ্গ খুব স্বাভাবিকভাবে ধারণ করেছে সমকালীন পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামের বাস্তবতা ও মনস্তত্ত্বকে। শব্দ ও অনুষঙ্গের এই বিশেষত্বের কারণে ষাটের কবিতার প্রকরণই হয়ে উঠেছে জাতীয়তাবাদী চেতনার দলিল।

ছত্রে ছত্রে ষাটের কবিতার প্রকরণ– তা সে প্রেমের কবিতাই হোক আর অপ্রেমের কবিতাই হোক– এভাবে জাতীয়তবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছে এবং স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হয়েছে।

কবিতায় রূপক-সাংকেতিকতার ব্যবহার

‘কবিতার শরীরে সঙ্কেত ও প্রতীকের যে-লীলা তা কখনোই দুর্বিশ্লেষ্য নয়। এইসব আপাত-জটিলতার নেপথ্যে কবিতার মর্মে কাজ করে সমাজ, দেশ, কাল।’ (আবু হেনা ২০০১ : ৪০৫/১) ষাটের দশকের সাহিত্য মাত্রই এক অর্থে প্রতীক, রূপক আর সাংকেতিকতার আকর। কারণ ষাটের দশকের প্রথমার্ধ শুধু নয়, প্রায় পুরো সময় ছিল রাজনীতি ও চিন্তা-চেতনা প্রকাশের দিক থেকে এক অবরুদ্ধ সময়– একথা আমরা পূর্বের অধ্যায়ে বলেছি। এই অবরুদ্ধতা, স্বাধীনতাহীনতা পূর্ব বাংলার কবি-সাহিত্যিকদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সন্দেহ নেই। এই অবস্থায় কোনো কোনো কবি-সাহিত্যিক সরাসরি প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন, কেউ কেউ সম্পূর্ণ আড়ালে চলে গিয়ে এমন বিষয়কে অবলম্বন করে সাহিত্যচর্চা করেছেন যার সঙ্গে দেশকালের আপাত প্রত্যক্ষ কোনো সংযোগ নেই। আবার অনেকে মাঝামাঝি অবস্থান নিয়ে রূপক-প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন। এসবই আসলে রাজনৈতিক সংকটের একেক প্রকার সাহিত্যিক অভিপ্রকাশ। ষাটের কবিতার বহুবিচিত্র প্রকাশরূপ সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন, “কেউ গাইলেন শ্যামল মাটির গান, কারো কণ্ঠে শোনা গেল প্রতিরোধের দৃপ্ত শপথ, স্বৈরাচারের স্বরূপকে রূপকে কাহিনীতে উন্মোচিত করলেন কেউ আর কেউ বা জনতার সাথে এক হয়ে ধারণ করলেন ‘হৃদয়ের মত এক আগ্নেয়াস্ত্র’।” (মোহাম্মদ হারুন ১৯৮৯ : ৩১) শুধু কবিতাই নয়, ষাটের উপন্যাস-ছোটগল্প-নাটকের একটি বড় অংশ রূপক-সাংকেতিকতার আশ্রয়ে রচিত হয়েছে।[৫] অর্থাৎ কবি-সাহিত্যিকরা এক প্রসঙ্গের ছদ্মাবরণে অন্য কিছুকে বোঝানোর কৌশল অবলম্বন করেছেন। ষাটের কবিতায় এই প্রকরণ-কৌশলটি হরহামেশাই

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহৃত হয়েছে। এই প্রকরণ-প্রকৌশল রাজনীতি উপজাত। যেমন, শামসুর রাহমানের wbi‡j‡K w`e¨i_ (১৯৬৮) কাব্যে প্রায়শ পাশ্চাত্য পুরাণের রূপকে একজন পিতার প্রতিকৃতি অংকিত হয়েছে। এই পিতা তাঁর পিতা সম্পর্কিত অন্যান্য কবিতার পিতার মতো পারিবারিক নন। এই পিতা অনেক সময় অসহায় পুত্রের সহায়। এই পিতা বীর্যবন্ত। আবার এই পিতা কখনো কখনো যদিও মৃত, কিন্তু পুত্রের দেশ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। পুত্রের স্বদেশ নিয়ে এই পিতা ভাবিত। wbi‡j‡K w`e¨i_ কাব্যের 'অধমর্ণের গান' কবিতায় পিতার যে মূর্তি পুত্রের দৃষ্টিতে অংকিত হয়েছে তাতে এই পিতাকে রাষ্ট্র-নামক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত বলেই মনে হয়–

> সেদিন দেখেছি স্বপ্নে আবার এলেন তিনি ম্লান
> জটিল পাঁচিল ঘেঁষে– এলেন আমার পিতা, মৃত
> ক্রুদ্ধ, অনুযোগে কম্পমান। তবে কি বেয়াড়া কিছু
> ঘটছে শহরে?
> তবে কি আমার কাছে চান কোনো প্রতিকার অশরীরী পিতা? (শামসুর ২০০৪ : ৩৫১/১)

ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত শামসুর রাহমানের কবিতার এই পিতা যে অরাজনৈতিক নন একথা সহজেই অনুমেয়। এই প্রত্যয় আরো স্পষ্ট হয় 'টেলেমেকাস' কবিতায়। সেখানে পিতা টেলেমেকাস হয়ে উঠেছেন যেন 'ত্রাণকর্তা ইউলিসিসের সমতুল্য, যাঁর অনুপস্থিতিতে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে স্বদেশ।' কবির ভাষায়, "তুমি নেই তাই বর্বরের দল করেছে দখল/বাসগৃহ আমাদের। কেই পদাঘাত করে, কেউ/নিমেষে হটিয়ে দেয় কনুই-এর গুঁতোয় আবার/'দুধ খাও গে খুকুমণি' ব'লে কেউ তালেবর/দাড়িতে বুলোয় হাত।" (শামসুর ২০০০ : ৬৭) কবিতাংশের এই 'বর্বরের দল', কথক পুত্র এবং এই 'তুমি' (পিতা টেলেমেকাস) যে সমকালীন দেশকালজাত এবং প্রতীকী তাৎপর্যে সমুজ্জ্বল তা বলাই অবান্তর। একারণে শামসুর রাহমানের কবিতার– বিশেষত wbi‡j‡K w`e¨i_ কাব্যের– পিতৃপ্রতিকৃতির সমকালীনতা আর রূপক-প্রতীকী তাৎপর্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন–

> ...শামসুর রাহমান যখন প্রতিবেশপৃথিবীর আক্রমণে অসহায়, তখনই তিনি খুঁজে ফেরেন হারানো শক্তিমান পিতাকে। তাঁর অসহায়ত্ব চরম রূপ পেয়েছে 'টেলেমেকাস'-এ : অসহায়ত্ব সর্বস্পর্শী হয়ে উঠেছে কবিতাটিতে, তাই বাঙলা রূপান্তরিত হয, 'ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা' ইথাকায়, যাকে দখল করে আছে বর্বরের দল, আর এটি যেনো ভূমিকা-কবিতা wbR evmf‡gর। 'টেলেমেকাস' ১৯৬৮-র বাঙলার মাটি থেকে জন্মলাভ করা কবিতা, যদিও তিনি পাশ্চাত্য পুরাণের শিল্পিত মুখোশ পরিয়ে দিয়েছেন স্বদেশের মুখে, সম্ভবত শিল্প ও আত্মরক্ষার্থে, তবু কবিতাটিতে প্রতিটি পংক্তিতে থমথম করছে বাঙলাদেশ। তৎকালীন বাঙলায় স্বদেশোজ্জ্বল কবিতা রচিত হয়েছে অনেক, কিন্তু এটির মতো ব্যাপক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কবিতা আর নেই। (হুমায়ুন ২০১৪ : ৭৯)

ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে শামসুর রাহমানের কবিতায় প্রতিফলিত জাতিসত্তার আবেগ আর এর প্রতীকী প্রকাশের বিষয়টি আরো অনেক সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। একারণে সমালোচক wbi‡j‡K w`e¨i_ কাব্যগ্রন্থ আর এর বিশেষ কবিতা 'টেলেমেকাস' সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন–

> আমাদের জাতিসত্তার প্রকাশ, ধারণ এবং লালনে, বিশেষ করে দুর্দিনে, শামসুর রাহমানের কাব্যিক অবদান অমূল্য। মানুষের ভাগ্য নিয়ে, জাতির ভাগ্য নিয়ে এ কবি খুব ভাবে, বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে থাকে, 'প্রতীক্ষায়...প্রতীক্ষায়...প্রতীক্ষায়...' কোনো ত্রাতা-নায়কের আবির্ভাবের জন্যে। টেলেমেকাস পিতার ফিরে আসার

Dhaka University Institutional Repository

পথ চেয়ে থাকে– ইথাকার আগাছা উৎপাটন করবেন তিনি। শামসুর রাহমান-এর নিরালোকে দিব্যরথের চালক যে মানুষ সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। (খান সারওয়ার ২০০১ : ২২৬)

একই ধরনের রূপক-প্রতীকী কবিতা অন্য কবিদের হাতেও রচিত হয়েছে, যেখানে কথা বলে উঠেছে সমকালীন দেশকাল আর জাতি। আরো উদাহরণ দেখা যেতে পারে–

আণবিক অস্ত্রধারী পৃথিবীর দৃপ্ত শাসকেরা
নিত্য নিত্য শানিয়ে তুলছে বোমা
না-পাম ফেলছে ভিয়েতনামে, খেলছে দাবা
মধ্যপ্রাচ্যে, আফ্রিকায়, এশিয়ার দারিদ্র্যে নিয়ত।
কতিপয় ধড়িবাজ পৃথিবীকে করেছে ভাগাড়
প্রেমহীন নিরুত্তাপ ক্রুর লোভাতুর হাতে
ঠেলে দিচ্ছে অনিবার্য স্রোতে। (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ১৯৯৮ : ১৩৯)

কবিতাংশটি আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের তুঙ্গ সময়ের রচনা। কবিতায় সরাসরি আইয়ুব খান সম্পর্কে কোনো কথা নেই, আন্দোলনরত বাঙালির পক্ষেও সরাসরি কোনো কথা নেই। কিন্তু কবিতার রূপকার্থ ওই বিশেষ দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে একবারেই অসুবিধা হয় না। ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানের সময় হিটলারের রূপকে কবি দিলওয়ার তুলে ধরেছেন আইয়ুব খানকে, তাঁর কর্মকাণ্ড ও পরিণতিকে। কবিতাটি লক্ষ করা যাক–

কাঁটাতার গোঁফে রেখে আংগুল
একদিন হিটলারও ভাবতেন :
নেই তার, নেই আর জার্মান জাতটার
পৃথিবীতে নেই কোনো তুলনা,
(ঈশ্বর তুমিও তা ভুলোনা!)...

তাই তিনি একদিন জাগ্‌লেন,
বিশ্বের সংহারে লাগ্‌লেন,
কোটি কোটি কুসুমের বৃন্তে
নিধনের কামানটা দাগ্‌লেন।
কী মহৎ ছিলো তার মনটা!
(নেপথ্যে মৃত্যুর ঘণ্টা।)
পৃথিবীর মৃত যতো সম্রাট
তার কথা শুনে শুধু হাস্‌তো
ধূমজাল বুনে শুধু হাস্‌তো,
বীভৎস মুখ খুলে হাস্‌তো,
দুলে দুলে ফুলে ফুলে হাস্‌তো :
হায়, ওরে নির্বোধ হিটলার! (দিলওয়ার ১৯৯৮ : ১৬২-১৬৩/১)

কবির বর্ণনায় স্পষ্ট যে, হিটলার এখানে সমকালীন স্বৈর শাসক আইয়ুব খানেরই রূপক। রূপকের বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়েছে তখন, যখন কবি কবিতার শেষে বলেছেন, ‘তারপর?/দেখা দিলে সূর্যের স্বাক্ষর/স্বখাত

সলিলে সেই দর্পী/অন্তিমে নিঃশেষে ডুব্লেন।/জনতার পৃথিবী যে চায়না/মাংসাশী শাসকের দম্ভ!' (দিলওয়ার ১৯৯৮ : ১৬৩/১) ঠিক যেন শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)-এর µxZ‘v‡mi nvwm (১৯৬২) উপন্যাসের মতো। তিনি উপন্যাসে বলেছেন, খলিফা হারুনুর রশিদের কথা আর বোঝালেন আইয়ুব খানকে!

আলাউদ্দিন আল আজাদের †fv‡ii b‘xi †gvnbvq RvMiY (১৯৬১) এবং mhRvjvi †mvcvb (১৯৬৫) কাব্যের একটা বড় অংশ কবিতা রূপকের ছদ্মাবরণে লেখা। প্রথমোক্ত কাব্যের 'মড়ক', 'ফাউস্টের সংলাপ', 'কাব্যতত্ত্ব', 'পদাবলী', 'জুলায়খা', 'ফুলের কবিতা', 'কথার কবিতা', 'ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ'– সুস্পষ্ট রূপক কবিতা। এসব কবিতায় কবি বিচিত্র ঘটনার বর্ণনার আড়ালে ব্যক্তি আর সমষ্টির অবরুদ্ধতা অংকনের পাশাপাশি জাগরণের মাধ্যমে তা থেকে মুক্তির কথা রূপায়িত করেছেন। লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই কাব্যের একাধিক কবিতায় কবি রাজা বা শাসককে নিষ্ঠুর বলেছেন আর তাকে হাজির করেছেন 'নমরুদ' এবং 'ফেরাউন'-এর ছদ্মাবরণে। যেমন, 'জুলায়খা' কবিতায় জুলায়খার জবানে কবি বলেছেন– 'জানি আমি যারা জন্ম-অত্যাচারী নির্মম পিশাচ/তারাই হয় রাষ্ট্রের কর্ণধার'। (আলাউদ্দিন ২০০৬ : ১০১/১) বলা বাহুল্য, কবির এই বর্ণনার মধ্যে স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের মূর্তি সহজেই আবিষ্কার করা যায়। আবার একই কবিতায় কবি যখন দাস ইউসুফের বয়ানে বলেন– 'স্বাধীনতা, স্বাধীনতা ছাড়া আমার নিকট অন্য/সব অর্থহীন; অর্থহীন বাঁচা জীবন যৌবন/অর্থহীন জগৎ, অর্থহীন প্রেম-অশ্রুজল' (আলাউদ্দিন ২০০৬ : ১১১/১) তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না যে, কবি স্বৈরশাসনের অবরুদ্ধতা আর পাকিস্তানি শোষণ থেকে মুক্তির বাসনা ব্যক্ত করেছেন। অথবা 'ফুলের কথা' কবিতার নিচের অংশটিও দেখা যেতে পারে–

> থোকা থোকা এই পরিপক্ব পুষ্পের স্তবক
> ছড়াবে অনেক বীজ
> আর সেগুলো থেকে গোপন প্রণয়ী ঋতুর দাক্ষিণ্যে
> মাটির নরম গর্ভকোষে
> জাগবে অগুণতি অঙ্কুর
> এবং ক্রমে ক্রমে সেই অঙ্কুর হবে চারা
> আর চারা পরিপূর্ণ গাছ
> গাছগুলো ঝাড় হবে, এবং ঝাড়ও
> হতে পারে বন উপবন,
> যার ডালে ডালে
> আরেক ফাল্গুনে ভারে ভারে কলি
> কলি থেকে ফুলের মরম। (আলাউদ্দিন ২০০৬ : ১১৪/১)

উদ্ধৃতাংশে বহুর জাগরণের যে রূপকচিত্র অংকন করা হয়েছে তার সঙ্গে জাতীয়তাবাদী জাগরণের আকাঙ্ক্ষার সম্পর্ক সহজেই অনুমান করা যায়। আবার কোথাও কোথাও কবি স্বৈরশাসকের রূপচিত্র রূপকের আড়ালে তৈরি করে কবিতায় স্বৈর শাসকের প্রতি ছুঁড়ে দিয়েছেন ধ্বংসের বার্তা। লক্ষ করা যাক শামসুর রাহমানের wbR evmf‡g (১৯৬৭) কাব্যের 'কোনো অশ্বারোহীকে' কবিতাটি, যেখানে রূপকের

Dhaka University Institutional Repository

ছদ্মাবরণে কবি যেন স্বৈর শাসক আইয়ুব খানেরই রূপচিত্র অংকন করেছেন। কবি অশ্বারোহীর উদ্দেশে যে কথা বলেছেন তাতে আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে–

তুমি কি বোঝো না ডুয়েলের দিন গত?
তবে কেন বৃথা উচিয়ে নগ্ন অসি
তেড়ে আসো আজও একালের পোড়ো মাঠে?
প্রাচীন জরিতে ছড়ায় কালের মসী।...

এযুগের আঁধি রুখবে কি দিয়ে বলো?
লুকাও বরং অতীতের কোনো গড়ে
বল্লম আর সাধের শিরোস্ত্রাণ
শোভা পাক আজ ঘুমন্ত জাদুঘরে। (শামসুর ২০১২ : ১৬৮/১)

কোনো কোনো কবির কবিতায় শিকারী, কুকুর ও মানুষের রূপকে উঠে এসেছে স্ব-কালের রাজনীতি আর পূর্ব বাংলার মানুষের দুর্গতি–

শিকারী তোমার কুকুরগুলোকে রোখো,
জঙ্গলে আজ জন্তুরা চিন্তিত।

জনপদ মাঠ নদী বন্দর
গ্রাম নগরের থেকে
কুকুর-ত্রস্ত মানুষের দল
জঙ্গলে আশ্রিত!
পশুদের তাই চরম দুর্ভাবনা :
এত ঠাঁই কোথা জন্তুর পৃথিবীতে

কুকুরের দাঁতে ক্ষত-বিক্ষত
হৃদয় চেতনা সাধ
ভাগাড়ে যখন শকুন-ভক্ষ্য
একাকার শবদেহ,
তখনি মানুষ ছেড়েছে নগর-গ্রাম
জঙ্গল তবু ভাগাড়ের চেয়ে ভালো। (সিকান্‌দার ২০১৭ : ১৪৩)

আবার কখনো কখনো প্রতীক বা সংকেত ব্যবহারের মাধ্যমে কবিরা নতুন আশাবাদের, নতুন জাগরণের কথা বলেছেন। যেমন– নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে হতাশার মাঝেও কবি আশাবাদের সংকেত সৃষ্টি করেছেন–

জীবন নিহত আমি জীবনের ঘণ্টারোলে,
জীবনের ঘণ্টারোলে
কে তোলে শঙ্খধ্বনি তবু, মসজিদে আজান? (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ১০১/১)

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম কবির মধ্যে জন্ম দিয়েছে এক দ্বিধাহীন চিত্ত। কবি জাতীয় জীবনেও দ্বিধামুক্তির প্রয়োজন অনুভব করেছেন। বলা বাহুল্য ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে কবির মধ্যে এই দ্বিধামুক্তির অনুভূতির জন্ম হয়েছে বিভিন্ন বিক্ষোভ-প্রতিবাদের আঘাতেই। কিন্তু বাস্তবে কবি এই দ্বিধামুক্তির বাসনাকে সরাসরি

প্রকাশে অক্ষম। তাই এই দ্বিধামুক্তির বিষয়টি কবি বলেছেন রূপক-সাংকেতিকতার মধ্য দিয়ে। উদাহরণ দেখা যাক–

দ্বিধাকে সরিয়ে দূরে ঘুটঘুটে অন্ধকার থেকে
এখন তোমারা তাকে রৌদ্রে নিয়ে যাও। বড় বেশি
অন্ধকারে ছিল এতদিন, দিনগুলি ছিল তার
পেঁচার কোটরাগত। বড় বেশি অন্ধকারে ওরা
রেখেছিল তাকে; অন্তর্জীবনের হল্‌দে পাতাগুলো
অন্ধকারে ডোবা আর তৃষিত শরীর তার পাকা
আনারের মতো ফেটে পড়তে চেয়েছে প্রতিদিন
রোদ্দুরের আকাঙ্ক্ষায়। (শামসুর ২০১২ : ২৯৫/১)

রূপকের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী চেতনা, অনমনীয় প্রতিবাদী চেতনা, বেয়াড়া মনোভাব প্রকাশের দারুণ এক উদাহরণ লক্ষ করা যায় ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত শহীদ কাদরীর 'সেলুনে যাওয়ার আগে' কবিতায়। এই কবিতায় কবি তাঁর অবাধ্য চুলকে নিজের অন্তর্গত বিদ্রোহী সত্তার প্রতিকল্প হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। কবির ভেতরকার যাবতীয় ক্রোধ আর প্রতিবাদের ভাষার আকর হয়ে উঠেছে এই চুল। চুলের মধ্যে কবি আবিষ্কার করেছেন অনমনীয় এক 'সাঁওতাল সর্দার'কে। চুলের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন বর্গীর ভয়ে একেবারেই ভীত নয় এমন এক বিপ্লবীকে, পাগলা ঘোড়াকে। চুলের মধ্যে কবি তাঁর আপন সত্তার, সমকালে চলমান জাতীয় সত্তার আবিষ্কার করেছেন। লক্ষ করা যাক নিজের চুল সম্পর্কে কবির পর্যবেক্ষণ–

আমার ক্ষুধার্ত চুল বাতাসে লাফাচ্ছে অবিরাম
শায়েস্তা হয়না সে সহজে, বহুবার
বহুবার আমি তাকে খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম
পাড়াতে চেয়েছি। 'বর্গীরা আসছে তেড়ে',
ঘুমাও ঘুমাও বাছা!' কিছুতেই হয় না যে তার
অনিদ্র সে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন সাঁওতাল সর্দার এক
চিকন সুঠাম দেহ আবরণহীন
সে যেন নিশ্চল নিষ্পলক কোনো বিপ্লবীর মতো বহুকাল,
বহুকাল ধ'রে তবু ঝড়েও কাতর নয়
অথবা বৃষ্টিতে নতজানু! (শহীদ ২০০০ : ৬৭)

কবিতার এই চুলের রূপকের আড়ালে খুব সহজেই স্বয়ং কবির তো বটেই এমনকি বাঙালি জাতির সমকালীন এবং চিরকালীন অনমনীয় চেতনাকে সহজেই আবিষ্কার করা যায়। 'সে যেন নিশ্চল নিষ্পলক কোনো বিপ্লবীর মতো বহুকাল,/বহুকাল ধ'রে তবু ঝড়েও কাতর নয়/অথবা বৃষ্টিতে নতজানু'– এই চরণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনায় জাগ্রত 'বেয়াড়া' বাঙালি চৈতন্যকে সহজেই চিনে নেওয়া যায়। আবার এই বেয়াড়া জাগরণ-উন্মুখ চুলের বিপরীতে তথা বাঙালির বিপরীতে কবি রূপকের মাধ্যমে শাসকের চৈতন্য আঁকতেও কসুর করেননি। কবির ভাষায় লক্ষ করা যাক–

চুলের চটুল অহঙ্কার সহনীয় নয় কোনো সুধীমণ্ডলীর কাছে
অতএব খাটো হতে হবে তাকে,

সমাজের দশটা মাথার মতো হ'তে হ'লে, দশটা মাথার মতো
অতএব বেঁটে হ'তে হবে তাকে,
এক মাপে ছাঁটা সুন্দর মসৃণ শান্ত শীতলপাটির মতো
নিঃশব্দে থাকতে হবে শুয়ে
মাথার মণ্ডপে। (শহীদ ২০০০ : ৬৮)

কিন্তু কাদরীর চেতনার মধ্যে তো এই নমনীয়তা নেই, নমনীয়তা তিনি দেখেননি ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের জেগে ওঠা বাঙালির মধ্যে। তাই এই রূপক কবিতার সমাপ্তি ঘটে এই বলে যে, 'তবু সে আমার চুল/অন্ধ/মূক ও বধির চুল মাস না যেতেই/আহত অশ্বের মতো আবার লাফিয়ে উঠছে অবিরাম।' (শহীদ ২০০০ : ৬৮) আবার ষাটের দশকের দ্বিতীয়ভাগে কোনো কোনো কবি ছড়ার ভঙ্গিতে, রূপকের আবরণে তুলে ধরেছেন পাকিস্তানি শোষণ-বঞ্চনার চিত্র। নিখুঁত রূপক কারুকাজের একটি কবিতাংশ লক্ষ করা যাক–

মিতে গো মিতে বলব কী যে
হঠাৎ দেখি দুপুর রাতে
বুলবুলিরা ধানের ক্ষেতে
জলসা করে পূর্ণিমাতে।

তাই না শুনে, বুঝলে মিতে
রসিক ঘুঘু গান শোনাতে
চাঁদের আলোয় রোদ পোহাতে
চরল এসে আমার ভিটে:

ভিটেয় ঘুঘু ডিম পেড়েছে
ধান খেয়েছে বুলবুলিতে। (আবু জাফর ২০১৪ : ৫২)

হতাশার শিল্পরূপ ও ষাটের জাতীয়তাবাদী রাজনীতি

হতাশার ভাষা আর শব্দচয়নের একটা প্রথাগত ধরন আছে। এই ধরন মোতাবেক আমরা জানি, হতাশা আর নৈরাশ্যের ভাষা হয় আতুর, মেদুর, সিক্ত, পেলব, নরম। বেদনার মতোই যেন স্নিগ্ধ। কিন্তু ষাটের দশকের তরুণ কবিদের হতাশা আর নৈরাশ্যের কবিতার ভাষা আর শব্দচয়ন লক্ষ করলে দেখা যায়, এর ভাষা আর শব্দচয়নের মধ্যে একটা যেন তাণ্ডব, সর্বগ্রাসী মনোভাব, চিৎকার, উচ্চৈঃস্বর ক্রিয়াশীল থেকেছে। কবিতার ভাষা আর শব্দচয়নের এই বিশেষ ধরনের সঙ্গে সমকালীন রাজনৈতিক অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তির বাসনা ক্রিয়াশীল রয়েছে। রাজনৈতিক মুক্তি যখন সম্ভব নয়, তখন কবিরা সেই মুক্তিটি বোধ করেছেন যৌনতা, নৈরাশ্য, হতাশা ইত্যাদি প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এই কারণে কবিরা যখন তাঁদের এসব অনুভূতি প্রকাশ করেছেন, তখন কবিতার শব্দসম্ভারের মধ্যে এক ধরনের মুক্তি, চিৎকৃতি, উদ্দামতা এসেছে। সমালোচকের ভাষায়, 'আত্মপ্রকাশের অনুকূল সংগঠনের অভাবে সমাজের অন্তস্তলে যে বেদনা দীর্ঘদিন ধরে সঞ্চিত হয়েছিলো, ক্রমশ সঙ্কেতে, শব্দে উল্লেখে তার উৎসারণ এইসব কবিতার স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য।' (আবু হেনা ২০০১ : ৪০৩/১) ষাটের দশকের কবিতার শিল্পপ্রকরণ ষাটের জনচৈতন্যেরই স্মারক। অন্যকথায় বলা যায়, ষাটের কবিতার শিল্পপ্রকরণই ষাটের দেশকালের রাজনৈতিক বাস্তবতার

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিনিধি। ষাটের অবরুদ্ধতা কবিদের মধ্যে যে হতাশার জন্ম দিয়েছিল, সেই হতাশার শিল্প প্রকরণের উদাহরণ দেখা যাক–

> নিদ্রা নেই আমার
> রাত্রি বাদুড়ের বিরামহীন পাখার নির্দয় কালো ঝাপটানো যেন'
> দিন এ্যাটমের ঝলসানো প্রতিচ্ছায়া। (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ১০১/১)

কবির হতাশার এই ভাষা আর উপমার মধ্যেকার এই দাহ ও তীব্রতা একান্তই ষাটের রাজনীতিউপজাত তাতে সন্দেহ কী! রফিক আজাদের Am¤‡ei c¦‡q (১৯৭৩) কাব্যগ্রন্থের ভাষা আর বক্তব্য প্রক্ষেপণের ভঙ্গিই বলে দেয় এই কাব্যের প্রত্যেকটি কবিতায় ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধের জাতীয়তাবাদী জাগরণের তীব্রতা পরোক্ষে ক্রিয়াশীল থেকেছে। একটি উদাহরণ লক্ষ করা যাক–

> কী দুঃসহ এই শব্দহীন রাত! এর প্রতিটি মুহূর্তে আমি দগ্ধ হ'তে
> থাকি। রাত্রি ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হ'তে চললে আমার দম
> আট্‌কে আসতে থাকে। চিৎকার ক'রে চারপাশের ঘুমকাতর
> নগরকে জানাতে ইচ্ছে জাগে : তিলে-তিলে দগ্ধ হচ্ছি, হে নিষ্ঠুর
> নগর, দ্যাখো, এক গোপন আগুনে জ্ব'লে-পুড়ে আমি ছাই হ'য়ে
> যাচ্ছি! প্রতিটি ম্যানশনের বন্ধ-দরজা ভেঙে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
> বলতে ইচ্ছে হয় : হে নরো, হে নারী, দ্যাখো, একটা মানুষের ঘুম
> নেই, রাত্রি কেড়ে নিয়েছে নিদ্রা তার– আর, তোমরা কী গভীর
> মজা লুটছো! (রফিক ২০১০ : ১২)

কবিতাংশের যন্ত্রণা প্রকাশের মধ্যে আছে নিঃসংকোচ মনোভঙ্গি। আর এর ভাষার মধ্যে আছে এক ধরনের সেন্সরহীনতা। কবির চেতনালোকের গভীরের এই সংকোচহীনতা আর সেন্সরহীনতার মূল নিহিত আছে সমকালীন দেশকালের গণচৈতন্যের মর্মের মধ্যে। কবিতায় গণচৈতন্যের এই প্রভাব ঠিক খালি চোখে দেখার নয়। এই প্রভাব তখন অলক্ষে কোটি চৈতন্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই প্রভাব গভীর মনোযোগে ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধের কবিতা পাঠ করলে সহজেই অনুমান করা যায়। জাতীয়তাবাদী জাগরণের এই অলক্ষিত প্রভাব খুব সহজে বোঝা যায় নির্মলেন্দু গুণের যেকোন কবিতায়।

কবিতার বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গি

কবির প্রকাশভঙ্গি তাঁর চৈতন্যের প্রতিনিধিত্ব করে। বিষয় সম্পর্কে কবির অবস্থান বদলে দেয় প্রকাশের ভঙ্গি; বক্তব্য প্রক্ষেপণের ধরন। পূর্ব বাংলায় জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ধারণ করে স্বদেশপ্রেমমূলক এবং অন্যান্য কবিতা ষাটের দশকের আগেও রচিত হয়েছে, ষাটের দশকেও রচিত হয়েছে। কিন্তু ষাটের পূর্বের বা এমনকি ষাটের প্রথম দিককার কবিতা থেকে ষাটের দশকের কবিতার– বিশেষত ষাটের দশকের শেষার্ধের– একটা পার্থক্য লক্ষ করা যায়। ষাটের পূর্বের বা ষাটের একেবারে প্রথম দিককার কবিতার প্রকাশভঙ্গির মধ্যে শিল্পের আড়াল বেশি। রহস্য আর একান্ত ব্যক্তিগত গোপন অনুভূতির প্রকাশ যেমন একটু পেলব হয়, এসব কবিতা তেমন। একটা কল্পিত পর্দার আড়াল যেন এসব কবিতাকে নরম আর অতিমাত্রায় কাব্যিক করেছে। রাজনৈতিক অবরুদ্ধতা আর জাতীয়তাবাদী চেতনার সুপ্ততা বোধ করি এসব

Dhaka University Institutional Repository

কবিতাকে মেনিমুখো করেছে। কিন্তু ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের কবিতার পায়ে এবং গায়-গতরে যেন দৈত্যের শক্তি। কবি এখানে যথেষ্ট নির্ভার আর স্পষ্ট। প্রকাশের ভঙ্গি তীরের ছিলার মতো টানটান। কথা আর অনুভূতি এখানে অনায়াস আর নির্মেদ। কারণ কবিরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম থেকে শক্তি, সাহস আর আত্মবিশ্বাস আয়ত্ত করেছেন। এটিই কবিতার প্রকাশভঙ্গিকে এক ভিন্নতা এনে দিয়েছে। কারণ, 'কবির প্রেরণা ও প্রকাশ অঙ্গাঙ্গী জড়িত'। (আবু হেনা ২০০১ : ৪০৬/১) প্রকাশের উপরোল্লেখিত বিশেষত্ব অন্যান্য কবিতায় বোঝা গেলেও স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতার ক্ষেত্রে বেশি সহজে বোঝা যায়। উদাহরণ দেখা যেতে পারে ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের একটি স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতা থেকে–

যাই যত দূরে রাত্রি থেকে দিনের প্রহরে
হই না বিলীন তাই সুখ কিংবা দুঃখের জঠরে।
যাই যতদূরে নগরে বন্দরে উদয়ে কি অস্তাচলে
ঘুরে ফিরে আসি বারবার তোমারি অক্লান্ত কোলে
ভয় দিয়ে ভয় নাশ, দুঃখ হেনে আমাকেই কর অবিনাশী,
সুখে তাই হারাই না আমি, দুঃখেও বিজিত নই;
আমার নিয়তি তুমি তোমাকেই ভালোবাসি। (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ১২২/১)

স্বদেশানুভূতির এমন অনায়াস অনাড়ম্বর প্রকাশ ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতাকে প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে পূর্বের যেকোনো সময়ের কবিতা থেকে আলাদা করেছে।

শুধু স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতাই নয়, জাতীয়তাবাদী জাগরণের আঁচ লেগেছে এমন যেকোনো কবিতার মধ্যে লক্ষ করা যায় এক ধরনের উন্মত্ততা, বন্যতা, স্পষ্টতা। সমালোচক বলেছেন, 'এইসব কবিতার বেশ কিছু বড়ো বেশি উঁচু গলার, বিবৃতি-প্রধান এবং নিতান্ত ঘটনাশ্রয়ী'। এর ফলে কবিতা সরল আর প্রত্যক্ষ আবেদনময় হয়েছে। (অশ্রুকুমার ২০১৪ : ৪৬) ধ্বংস আর হত্যাই যেখানে প্রধান, কবিতার প্রকাশভঙ্গি সেখানে হবে স্পষ্ট এটাই স্বাভাবিক। কারণ, 'রাজনৈতিক কবিতা কবিতাকে সরলীকরণ করে'। (সৈয়দ আলী ২০০১ : ১৫৩) জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চেতনার তীব্র ঝড় যখন কবিচৈতন্যকে দখল করে ফেলে, চিৎকারই তখন কবিতা হয়ে ওঠে। অথবা বলা যায় কবিতা তখন চিৎকারে পরিণত হয়। এটাই তখন কবিতার যথার্থ প্রকাশরীতি হয়ে দাঁড়ায়। এটাই তখন নতুন নন্দনতত্ত্বের জন্ম দেয়। উদাহরণ দেখা যাক–

মানুষ যেদিন সঙ্গীতের মিহিসুর ভুলে গিয়ে
প্লাবনের কল্লোল দেখে প্রলয়ের চিৎকার দিয়েছিল,
অথবা মানুষ যখন নিছক বর্ষণে
ভিজে-ভিজে হয়েছিল কাক,
সেদিন আমিও ছিলাম;
মানুষের সাথে মিশে আমিও সেদিন
আটটি ফুঁটোর বাঁশি, উচ্চাঙ্গের অবোধ্য সেতার
ভেঙেছি নির্জন রাতে দু'পায়ের চাপে,
সার্ট খুলে বুকে করে নিয়েছি বৃষ্টিকে
– এবং বুঝেছি হয় চিৎকার কখনও সঙ্গীত। (নির্মলেন্দু ২০১১ : ৩৫/১)

Dhaka University Institutional Repository

অনুভূতি প্রকাশের এই ভাষা ও ভঙ্গি সাধারণ সময়ের নয় একথা বলাই বাহুল্য। জাতীয় চৈতন্যের এক বিশেষ গড়ন প্রকাশের এই রূপকে বেছে নিয়েছে। একারণে ষাটের দশকের উপান্তে রচিত শামসুর রাহমানের কবিতার প্রকাশভঙ্গি বিষয়ে সমালোচক বলেছেন–

> কবি নিঃসীম আবেগ-অভিভূত রূপকথা নির্মাণে উৎসাহী না হয়ে ষাটের দশকের বিক্ষুব্ধ-পীড়িত, আত্মসচেতন এবং রাজনীতি-নিয়ন্ত্রিত পূর্ববাংলাকে চিত্রিত করেছেন মুখোশহীন সুস্পষ্ট দীপ্র প্রতিমায়। এ ক্ষেত্রে কখনও কখনও প্রচারধর্মীতা [প্রচারধর্মিতা], statement-মুখীতা [মুখিতা], উপদেশ বা সার গর্ভবাণীর সাহায্যে পাঠকমন জয়ের একটা প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় (‘ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯’, ‘ঐকান্তিক শ্রেনীহীনা’, ‘হরতাল’, ‘অজস্র মাইক্রোফোন’, ‘পার্ক থেকে পাওয়া যায়’, ইত্যাদি)।...শামসুর রাহমান এ পর্যায়ের কবিতাগুচ্ছে ক্রুদ্ধ-ক্ষুব্ধ স্বদেশবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন। (শেখ রজিকুল ২০০৭ : ৩৪৪-৩৪৫)

ষাটের উপান্তের কবিতার প্রকাশভঙ্গির আরেকটি বিশেষ দিক হচ্ছে, এই সময়ের কবিতা অকারণ আলংকারিকতা মুক্ত হয়েছে। কবিরা তাঁদের বক্তব্যকে সোজা-সাপ্টা নিরাভরণ ভাষায় সরলভাবে প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ কেজো সাহিত্যের যে বৈশিষ্ট্য তা এসময়ের কবিতায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই বিষযটি কোনো কোনো সমালোচক লক্ষ করেছেন। যেমন, আল মাহমুদের প্রথম দিককার কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোর চেয়ে ষাটের দশকের শেষ দিকে রচিত †mvbvwj Kvweb কাব্যের কবিতাগুলোয় ‘কবির প্রতিমা নির্মাণ চলেছে বর্ণলেপহীন ঋজুরেখ মুখের ভাষা প্রয়োগে।’ আবার শামসুর রাহমানের e›'x wkwei †_‡K কাব্যেও একই অবস্থা লক্ষ করা যায়। সমালোচকের ভাষায়–

> শামসুর রাহমানের আটটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে ‘বন্দী শিবির থেকে প্রতিমা-বিরল গ্রন্থ, আর যে-সকল প্রতিমার সাক্ষাৎ পাই তারাও নিরলংকার ও নিরাভরণ– কবিত্বশক্তির পরিণত মানসিকতার স্বাক্ষর এই সব কবিতায় সহজে ধরা যায়। অথচ পরবর্তী কাব্য ‘দুঃসময়ে মুখোমুখি’ এবং ‘ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা’ পুনরায় বর্ণবহুল চিত্রল। (বিপ্রদাশ ২০০৯ : ৫৫)

শুধু বাক্প্রতিমা নয় কবিতা-প্রসাধনের সকল ক্ষেত্রেই এই সারল্য অথচ ঋজুতা ষাটের শেষ দিকের কবিতায় সহজেই চোখে পড়ে। এর সঙ্গে বাঙালি জাতিসত্তার আক্রান্ত হওয়া, প্রতিরোধী হওয়া আর নির্দ্বিধ হওয়ার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এভাবে দেখা যাচ্ছে, ষাটের কবিতার প্রকাশভঙ্গি জাতীয়তাবাদী চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কবিতাকে সময়ের স্মারকে পরিণত করেছে; কবিতার প্রকাশভঙ্গি আর রাজনীতিকে সমান্তরাল করে তুলেছে।

শুধু কবিতার প্রকাশভঙ্গি নয়, চরণবিন্যাসের মধ্যেও সময়ের প্রভাবের কারণে বিশিষ্টতা লক্ষ করা গিয়েছে। ষাটের দশকের বিশেষত, দ্বিতীয়ার্ধে কবিতার এমন চরণবিন্যাসের আবির্ভাব ঘটে, যা আগে দেখা যায়নি। এমনকি আগে হয়ত কবিরা এমন চরণবিন্যাসে কবিতা রচনার প্রয়োজন বোধ করেননি। ষাটের দশকের শেষার্ধে পূর্ব বাংলা ক্রমান্বয়ে মারমুখী আর সশস্ত্র হয়ে উঠেছিল। সময়ের আর বিষয়ের এই সত্যকে কবিতার শরীরে খোদাই করে রাখতে কবিরা তাদের কবিতার চরণ বিন্যাসের মধ্যে কখনো এনেছেন অস্ত্রের অবয়ব, কখনো ধাবমান ভয়ংকর গেরিলার মূর্তি। যেমন, সৈয়দ শামসুল হকের ‘গেরিলা’ কবিতাটি। কবিতাটির চরণবিন্যাস এমনভাবে করা হয়েছে যে, দেখলে চোখে ভেসে ওঠে অস্ত্র হাতে এক

গেরিলার ছবি। অথবা, 'পিস্তল' নামের কবিতায় কবি ফুটিয়ে তুলেছেন পিস্তলের ছবি। উদাহরণ দেখা যাক–

এই এক
সংক্ষিপ্ত সরল নল ইস্পাতের জ্বলজ্বল করে
বস্তুত যা কিছু দেখি
এশিয়ায় আফ্রিকায়
অদ্ভুত ম্যাজিকে
যেন হয়ে যায়
পিস্তল পিস্তল[৭]

'পিস্তল' বা 'গেরিলা' কবিতার বিশেষ চরণবিন্যাস সম্পর্কে কবি বলেছেন, 'মুক্তিযুদ্ধের সময় কবিতার এই দৃশ্যরূপ রচনা আমার কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিলো; কবিতায় শুধু বক্তব্যই নয়, বক্তব্যের একটা ছবিও তার অক্ষরগুলোয় ধরে উঠে আমি তখন মুক্তি পেতাম আমার শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে।' (সৈয়দ শামসুল ২০০৫ : ২৬৫-২৬৬) আবার উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানে বহু লোকের সমাগমের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি এমনভাবে চরণবিন্যাস করেছেন যে, চরণবিন্যাসই বিশাল মিছিলের দ্যোতক হয়ে উঠেছে। উদাহরণ দেখা যাক–

সড়কের দুকূল-ছাপানো
লোক, শুধু লোক।
লোক,
আমাদের চোখের পাতায়
লোক।
লোক,
পাঁজরের প্রতিটি সিঁড়িতে
লোক।
লোক,
ধুকপুকে বুকের স্কোয়ারে
লোক। (শামসুর ২০১২ : ২৭৪/১)

কবিতাংশের চরণবিন্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করেছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। লোকের বিস্তার বোঝাতেই কবি এই বিশেষ চরণবিন্যাসের আশ্রয় নিয়েছেন। একই শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহারকেও নিয়ন্ত্রণ করেছে মানুষের ঢল।

পূর্ব বাংলার রুদ্র রূপাঙ্কন ও জাতীয়তাবাদী জাগরণের প্রতীকী আভাস

ষাটের কবিতায় পূর্ব বাংলার প্রসঙ্গ কবিরা যখনই এনেছেন তখনই দুটি রূপ প্রধান হয়ে উঠেছে। একটি পূর্ব বাংলার দুখিনী রূপ এবং অন্যটি এর রুদ্র বা কঠিন-কোমল রূপ। প্রথম দিককার কবিতায় দুখিনী রূপের এবং পরের দিকের কবিতায় রুদ্র বা কখনো কখনো কঠিন-কোমল রূপ লক্ষ করা যায়। এর সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

দেশকালের বাস্তবতার গভীর যোগ রয়েছে। ষাটের প্রথম দিকের স্বৈরশাসনের দাপটে আর বহুমাত্রিক শোষণে পূর্ব বাংলার যে রূপটি দাঁড়ায় তাকে এক কথায় করুণই বলতে হবে। কিন্তু ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে যখন পূর্ব বাংলার মানুষ তাদের বিদ্রোহী সত্তার পরিচয় দিতে শুরু করেছে, তাদের জাত চেনানো শুরু করেছে, তখন কবিরা তাদের কবিতায় পূর্ব বাংলার এই বিদ্রোহ-সংগ্রামকে একটি ভূপ্রাকৃতিক ভিত্তি দিতে গিয়ে পূর্ব বাংলার ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু ইত্যাদির রূপক রুদ্রমূর্তি, কখনো কখনো কঠিন-কোমল রূপ অঙ্কনের চেষ্টা করেছেন। কবিরা এর মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে, পূর্ব বাংলার প্রকৃতির মতোই এর জনগোষ্ঠী। দুটোই ভয়াল এবং অবাধ্য। উদাহরণ দেখা যেতে পারে–

> আমার নিয়তি তুমি, যতই হও না কেন
> দরিয়ার ভীষণ তুফান
> আজদাহা বান হয়ে আচম্বিতে কাড়ো লাখো প্রাণ,
> অনাবৃষ্টি আগুন ঝরিয়ে খাক করো মাটি
> ছারখার করে দাও সাজানো বাগান পরিপাটি,
> সুপ্রাচীন ক্রোধে বয়ে যাও খরতর ঝড়ের তাণ্ডবে
> উড়িয়ে ছড়িয়ে গাছ ঘরবাড়ি নির্দয় নৃশংস কলরবে। (হাসান হাফিজুর ১৯৯৪ : ১২০/১)

উদ্ধৃতাংশে পূর্ব বাংলার যে রূপ কবি অঙ্কন করেছেন তা যে শুধু বাস্তবনিষ্ঠতার পরিচয় দিতে গিয়ে করেছেন তা মনে হয় না। কারণ পূর্ব বাংলা, মানে এর মানুষের ফুসে ওঠা যে-রূপ কবি লক্ষ করেছেন এবং আশাও করেছেন, তা-ই প্রতীকে-আভাসে বাণীবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন হাসান হাফিজুর রহমান।

কবিতার প্রকরণে শ্লোগানধর্মিতা

ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ মিছিলের, আন্দোলনের আর বিক্ষোভ-প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সময়। সময় যত একাত্তরের সন্নিকটবর্তী হয়েছে পূর্ব বাংলা তত শ্লোগানে-শ্লোগানে প্রকম্পিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের মতো অনেক কবিও এসব মিছিল-শ্লোগানে অংশ নিয়েছিলেন। কারণ বাংলাদেশের আন্দোলন-সংগ্রামে পুরো পাকিস্তান আমল জুড়ে লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিকর্মীদের সক্রিয়তা ছিল বরাবরই উল্লেখযোগ্য। এমন কি ষাটের দশকের প্রথমার্ধে যখন রাজনৈতিক সংগঠনগুলো তাদের ভূমিকা পালন করতে পারেনি, তখন মূলত সাংস্কৃতিক সংগঠন আর ব্যক্তিরাই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেছে। একারণে আমরা দেখি, ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে রাজপথে থেকেছেন অনেক কবি। ফলে তাঁদের কবিতা রাজপথের উত্তাপ এবং চরিত্রকে অনেকাংশে শুষে নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। শামসুর রাহমান, যিনি কিনা কবিতায় শিল্পের প্রশ্নে শুদ্ধতাবাদী, তাঁর কবিতায়ও এসে লাগল শ্লোগানের উত্তাপ। সমালোচকের ভাষায়, 'নন্দনতাত্ত্বিক শুদ্ধতা মেনেও তাঁর ভাষায় এল তীক্ষ্ণতা'। (আবু হেনা ২০০১ : ৪০৩/১) সৈয়দ শামসুল হক বিদেশি কবিতার মায়াময় জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে রচনা করলেন মিছিলের মতো ধারালো সব চরণ। আল মাহমুদ তাঁর কবিতায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আঁটোসাটো চরণে ধারণ করলেন তীক্ষ্ণ-তীব্র সব বক্তব্য। এভাবে কবিতার প্রকরণে শ্লোগানধর্মিতা বেড়েছে। আবার কখনো কখনো শ্লোগানই উঠে এসেছে কবিতার শরীরে। অর্থাৎ ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের কোনো কোনো কবির কবিতা কখনো শ্লোগানের রূপ ধারণ করেছে আবার কখনো

Dhaka University Institutional Repository

কখনো শ্লোগান কবিতা হয়ে উঠেছে। "আমিও তো তাদের মতো প্রতিবাদে বলেছি তখন,/'প্রেমাংশুর বুকের রক্ত চাই, হন্তার সাথে আপোস কখনো নাই'।" (নির্মলেন্দু ২০১১ : ৩৬/১) কবিতার এই চরণ শ্লোগান নাকি শ্লোগানের বাণীই কবিতা হয়েছে তা বলা মুশকিল। একটি জাতির জাতীয়তাবাদী জাগরণের চূড়ান্ত সময়ে কবিতার নন্দনতত্ত্বের এই পালা বদল ঘটে যায়। অর্থাৎ আন্দোলন-সংগ্রামের তাপ কবিতার প্রকরণকে প্রভাবিত করে। তখন কবিতার প্রকরণই হয়ে ওঠে সময়ের স্মারক। যেমন– 'যতদিন লেলিহান বিশাল শৃঙ্খল/আমার মুক্তির তৃষ্ণা তুফান উত্তাল।' (আলাউদ্দিন ২০০৬ : ১৮১/১) উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া মানুষের বরাতে কবির জীবন সম্পর্কিত উপলব্ধি লক্ষ করা যাক–

জীবন মানেই
মাথলা মথায় মাঠে ঝাঁ ঝাঁ রোদে লাঙল চালানো,
জীবন মানেই
ফসলের গুচ্ছ বুকে নিবিড় জড়ানো,
জীবন মানেই
মেঘনার ঢেউয়ে ঢেউয়ে দাঁড় বাওয়া পাল খাটানো হাওয়ায়,
জীবন মানেই
পৌষের শীতার্ত রাতে আগুনে পোহানো নিরিবিলি।
জীবন মানেই
মুখ থেকে কারখানার কালি মুছে বাড়ি ফেরা একা শিস দিয়ে। (শামসুর ২০১২ : ২৭১/১)

উদ্ধৃতাংশের মানুষেরা আন্দোলনের মিছিলে থেকে জীবনের মানে সম্পর্কে যে-কথা বলেছে তা শ্লোগানের মতো সংক্ষিপ্ত এবং পুনরাবৃত্তিময়। শ্লোগানে যেমন একই শব্দবন্ধ বা একই ধরনের শব্দবন্ধ বারবার উচ্চারিত হয়, উদ্ধৃত কবিতাংশেও সেইরকম লক্ষ করা যায়। অথবা কবি যখন আন্দোলনের, বিপ্লবের, জাগরণের ভাষ্য রচনা করেছেন তখন তা বলেছেন শ্লোগানের মতোই সংক্ষিপ্ত ঋজু ঋজু বাক্যে এভাবে–

আগুন লেগেছে রক্তে মাটির গ্লোবে।
যুবক গ্রীষ্মে ফাল্গুন পলাতক,
পলিমাখা চাঁদ মিছিলে চন্দ্রহার–
উদ্ধত পথে উন্নত হাত ডাকে,
সূর্য ভেঙেছে অশ্লীল কারাগার।

প্রতীক সূর্যে ব্যাকুল অগ্নি জ্বলে,
সাম্যবাদের গর্বিত কোলাহলে
আগুন লেগেছে রক্তে মাটির গ্লোবে। (নির্মলেন্দু ২০১১ : ৩৮/১)

একই চরণের পুনরাবৃত্তি, বাক্যের সংক্ষিপ্তি আর বক্তব্যের মধ্যকার দাহ্যতা কবিতাটিকে শ্লোগানের কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছে। সংহত চরণ, দাহ্য শব্দ, স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্যের এই কবিতায়ও শ্লোগানধর্মিতার লক্ষণ স্পষ্ট–

নদীর জলে আগুন ছিলো
আগুন ছিলো বৃষ্টিতে

Dhaka University Institutional Repository

আগুন ছিলো বীরাঙ্গনার
উদাস করা দৃষ্টিতে।

আগুন ছিলো গানের সুরে
আগুন ছিলো কাব্যে।
মরার চোখে আগুন ছিলো
একথা কে ভাববে? (আসাদ ২০০৮ : ৫৪)

ছোট ছোট সংহত বাক্য, বাক্যের মধ্যে ছন্দের দিক থেকে দুইটি মাত্র পর্ব ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের অনেক কবিতাকে, বিশেষত শেষ দিককার কবিতাকে, শ্লোগানের কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছে। শ্লোগানের প্রকরণের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, এর প্রতিটি চরণে হয় দুটি পর্ব থাকে অথবা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ চরণ থাকে। আর অধিকাংশ সময় শ্লোগান হয় ছন্দোময়। মুসতাসীর মামুনের ভাষায়, 'বাংলাদেশের শ্লোগানে ছন্দোময়তা লক্ষণীয়'।[৬] তবে দুইয়ের অধিক পর্বের চরণ– যা সাধারণত প্রথাগত মাত্রাবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত ছন্দে থাকে– মিছিলের শ্লোগানের অনুপোযোগী হয়ে যায়। নিচে একটি কবিতার কয়েকটি চরণ পড়ে দেখলে সহজেই এই কবিতার মধ্যকার শ্লোগানধর্মী গুণের পরিচয় ফুটে উঠবে–

অন্ধকারে আর নহে মা
এবার তোমার সকল ছেলে
নিত্য আরো হাট বসাবে
ঘৃণার ধূপে দুঃখ জেলে। (সিকান্দার ২০১৭ : ৪৫৮)

কবিতাংশের প্রথম চরণ একক ব্যক্তির উচ্চারণে উচ্চারিত হওয়ার পরপরই দ্বিতীয় চরণটি মিছিলের সমবেত মানুষের মুখে ধ্বনিত হওয়ার জন্যে যেন উদগ্রীব হয়ে থাকে। তৃতীয় চরণ ব্যক্তির মুখে উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থ চরণ যেন সমষ্টির মুখে উচ্চারিত হওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এটাই তো মিছিল-শ্লোগানের বৈশিষ্ট্য যে, প্রথম চরণ ধাক্কা দিয়ে সমষ্টিকে নিয়ে যায় দ্বিতীয় চরণের দিকে। আর উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা– 'এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়'– চরণটি তো সমকালে রীতিমত শ্লোগানের কাজই করেছে।

কবিতায় আকাঁড়া শব্দের সংখ্যা বৃদ্ধি

ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে পূর্ব বাংলার মানুষের জাতীয়তাবাদী জাগরণ আর বিপরীতে পাকিস্তানি দমন-নির্যাতন পূর্ব বাংলার মানুষকে স্বদেশের প্রশ্নে পূর্বের যেকোনো সময়ের চেয়ে চেতনাগতভাবে স্পষ্ট করেছে। এই স্পষ্টতার প্রকাশ যেমন আন্দোলন-সংগ্রামের মারমুখিতার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি কবিদের কবিতার শব্দচয়নের মধ্যেও প্রকাশিত হয়েছে। এযেন পাকিস্তান বিষয়ে বন্ধনমুক্তির, দ্বিধামুক্তির প্রকাশ। একারণে কবিতায় আরোপিত কাব্যময়তা, কাব্যময় শব্দচয়নের প্রবণতা কমেছে। কবিতা বেশি করে কেজো বা বাস্তবনিষ্ঠ হয়েছে। কবিরা তাঁদের কহতব্যকে আকাঁড়া শব্দ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সরাসরি প্রকাশ করেছেন। প্রথাগত সামাজিক, রাষ্ট্রিক, ব্যক্তিক কাঠামোবদ্ধ সম্পর্কের সূত্র যখন ছিঁড়ে খানখান হয়ে যায়, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-অনিশ্চয়তা আর অস্তিত্ব-সংকট যখন একটি জনগোষ্ঠীকে সর্বৈবভাবে গ্রাস করে ফেলে, তখন প্রথাগত ভাষাকাঠামোটি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। ভাষার গা থেকে প্রথাগত ভদ্রতা আর মেকি

Dhaka University Institutional Repository

আভিজাত্যের খোলসটি খসে পড়ে যায়। ভাষা হয়ে পড়ে অকৃত্রিম। একারণে শামসুর রাহমানের wbR evmf‚g কাব্যগ্রন্থের রাজনৈতিক কবিতাগুলো ভাষা সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন, " 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯', 'পুলিশ রিপোর্ট', 'হরতাল', ... '– এই কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে লেগে আছে এক বিক্ষুব্ধ সময়ের ছাপ। যেমন চিন্তায়, তেমনি ভাষায় এক নতুন বেআব্রুপনা ফুটে বার হচ্ছে। যেন এক চরম অশালীন সময় ভাষার শালীনতা হরণ করেছে।" (জিল্লুর ২০১৪ : ২৫) বাংলাদেশের ষাটের দশকের শেষ দিককার কবিতার ক্ষেত্রে এই ঘটনাটি ঘটেছে। সবার সব কবিতা সম্পর্কে একথা ঢালাওভাবে বলা না গেলেও, প্রবণতা আকারে এটি যে বেড়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষত ১৯৭০-এর নির্বাচনের থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর মধ্যে রচিত অধিকাংশ কাব্যের অধিকাংশ কবিতা সম্পর্কে একথা বলা যায়। সামালোচকের ভাষায়–

> একাত্তর নামক সময়-পর্ব বাঙালি চেতনায় বিশ্বাসী সবাইকে কম বেশি গুলি, বারুদ ও রক্তের ঝাঁজালো পরিবেশে পৌঁছে দেয়, কবিতার জন্যও নির্ধারিত হয় একই নিয়তি। কবিতা ঐ খরতা-তিক্ততা রক্তে ধারণ করে, কখনো হয়ে ওঠে হনন ও নির্যাতনের অমানবিক ঘটনাবলীর চিত্ররূপ। প্রতিরোধ-যুদ্ধ থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের দুর্যোগ ও বিপর্যয়, প্রত্যাশা ও স্বপ্ন নিয়ে কবিতার যাত্রা শুরু হয়। কবিদের অধিকাংশই সে সময় স্বাধীনতা যুদ্ধকে জীবনযুদ্ধেরই প্রতিরূপ হিসাবে গ্রহণ করেন। কবিতা সাময়িকভাবে সজ্জা ও প্রসাধনের গুরুত্ব এক পাশে সরিয়ে রাখে। (আহমদ রফিক ২০০১ : ১৯৯)

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় হাসান হাফিজুর রহমানের hLb D'¨Z m½xb (১৯৭২), শামসুর রাহমানের e›'x wkwei †_‡K (১৯৭২), মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের cZb cZ¨vkv (১৩৮৪) কাব্যের m'Ðx D‡ØM অংশ, আলাউদ্দিন আল আজাদের †jwjnvb cvÐwjwc (১৯৭৫) ফজল শাহাবুদ্দীনের AvZZvqx mhv¯Í (১৯৭৫) ইত্যাদি কাব্যের কথা। যেমন–

> দুই চোখ লাখো চোখ হ'য়ে ছড়িয়েছে
> দিকে দিকে, বিশেষত বাংলার গ্রাম
> নগর বন্দর যেখানেই সত্য নাম
> যার মনে মুক্তধ্বনি, ছোটে তার পিছে :
> মীরজাফরের চোখ যাচে উৎপাটন
> শলাকা জ্বলছে তাই আরো আন্দোলন। (আলাউদ্দিন ২০০৬ : ১৭৯/১)

উদ্ধৃতাংশের শব্দগুলো প্রথাগত কাব্যিকতা মুক্ত। কথা সোজাসাপ্টা। আকাঁড়া শব্দের কিছু বিচ্ছিন্ন উদাহরণ দেখা
যেতে পারে– 'গতর', 'বেগানা', 'ন্যাংটা', 'আঁৎকা', 'জলদি', 'জোয়ান' (দ্রষ্টব্য– †jwjnvb cvÐwjwc কাব্যগ্রন্থ)। শামসুর রাহমানের e›'x wkwei †_‡K কাব্যেও অনুরূপ লক্ষ করা যায়। এমনিতে শামসুর রাহমানের কবিভাষায় বরাবরই আকাঁড়া শব্দের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বেশি। কিন্তু ষাটের দশকের উপান্তের কবিতায় একটু অন্য মেজাজের আকাঁড়া শব্দের ব্যবহার আরো বেশি ব্যবহার দেখা যায়। এসব শব্দ নিরীহ নয়। জাতীয়তাবাদী চেতনার চাপে এসব শব্দ কবিতায় আলাদা একটি রাজনৈতিক চিহ্ন বহন করেছে। একটি কবিতাংশ খেয়াল করা যাক–

> নাকি তাঁর বীর সৈনিকেরা

Dhaka University Institutional Repository

কখনো করেনি হত্যা, পোড়ায়নি শহর ও গ্রাম।
সব ঝুট হ্যায়, সব ফালতু গুজব।
সত্যের মৌরসীপাট্টা একা তাঁরই। একেই তো বলে
কসাইখানার হেকমত। মাইরি হুজুর বটে
ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

দুনিয়ার সব শৃঙ্খলিত কৃষক মজুর শোনো,
সর্বহারা নিধনের জন্যে অবিরাম
আসছে বারুদ বোমা স্বৈরাচারী শাসকের হাতে
কখনো-বা, বলিহারি যাই, গুড়া দুধ।
খাসা কূটনীতি,
চীনা ও মার্কিন কালোরাতি। (শামসুর ২০১২ : ৩৩৪/১)

e›‘x¨kwei †_‡K কাব্যের একই কবিতা ‘প্রাত্যহিক’ থেকে আরো একটি অংশ লক্ষ করা যাক—

তুমুল গাইছে গুণ কেউ কেউ কুণ্ঠাহীন খুনি
সরকারের, কেউ কেউ ইসলামী বুলি ঝেড়ে তোফা
বুলবুল হতে চায় মৃতের বাগানে।
কেউবা জমায় দোস্তি নিবিড় মস্তিতে
ভ্রাতৃঘাতকের সাথে। গদগদে দালাল,
বখাটে যুবক আর ভাড়াটে গুণ্ডারা
রটাচ্ছে শান্তির বাণী লাঠিসোটা নিয়ে।
অলিতে গলিতে দলে দলে
মোহাম্মদী বেগ ঘোরে, ঝলসিত নাঙা তলোয়ার।

নেপথ্যে মীরজাফর বঙ্কিম গোঁফের নিচে মুচকি হাসেন। (শামসুর ২০১২ : ৩৩৪-৩৩৫/১)

জাতি যখন বিপন্ন থাকে, স্বজন যখন আক্রান্ত থাকে, ধৈর্য যখন বাঁধ ভাঙে তখন স্বজাতির একজন কবির কাব্যভাষা যা হতে পারে এই কবিতার ভাষা তাই হয়েছে। উদ্ধৃতাংশের কবিতায় রাখঢাক কম। শব্দগুলো প্রতিদিনকার ব্যবহারের মতোই আকাঁড়া আর সাহসী। অর্থনৈতিক শোষণের ইঙ্গিতবহ এই কবিতাংশও লক্ষ করার মতো—

ধান নিয়ে ধানাই পানাই
গলার গান মেশিনগান—
চাল নিয়ে যেই চুলোচুলি
পান্তা বলে ‘লবণ আন’।
নুন আনতে পান্তা ফুরায়
পানতা আনতে নুন
নুনের গুণে অঙ্গ জুড়ায়
কপালে মাখ্ চুন।
লবণ লবণ ডাক পাড়ি
লবণ গেলো কার বাড়ি?

Dhaka University Institutional Repository

লঙ্কা লঙ্কা ডাক পাড়ি
লঙ্কা গেলো দেশ ছাড়ি!
আয়রে মুর্দা ঘরে আয়
দুধ-মাখা ভাত কাকে খায়। (আসাদ ২০০৮ : ৫৫-৫৬)

কবির শব্দ চয়নের এই রূপটি নির্ধারণ করে দিয়েছে দৈশিক রাজনৈতিক বাস্তবতা, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

কবিতায় দাহ্য শব্দের প্রয়োগ ও অস্ত্রের উপমা-প্রতীক

১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলায় ব্যাপকভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটে। এরপর উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে তা চূড়ান্ত বিকাশের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। এই প্রক্রিয়াটি আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে দেখেছি। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এই ধারাক্রম বাংলাদেশের কবিতার মেজাজে সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলেছে। রাজপথের উত্তাপ কবিচৈতন্যে যে তাপ সৃষ্টি করেছে তার প্রভাব পড়েছে কবিতার শরীরে। কবিচৈতন্যে আর জনচৈতন্যে যখন আগুনের হলকা, তখন কবির কবিতার শব্দও সেই অগ্নিময়তা আর রুদ্রতাকে ধারণ করে দেশকালের স্মারক হয়ে উঠেছে। একারণে দেখা যায়, ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধের কবিতায় ক্রমাগত দাহ্য, রুদ্র, ভয়ংকর, বিধ্বংসী শব্দের পরিমাণ বেড়েছে। আলাউদ্দিন আল আজাদের †jwjnvb cvÐwjc কাব্যগ্রন্থ থেকে কিছু উদাহরণ দেখা যাক– 'রক্তবীজ', 'দুর্গ', 'হিংস্র', 'আগুনমুখী', 'সংগ্রাম', 'মেঘবজ্র', 'জল্লাদ', 'পিশাচ', 'রক্তলোভী', 'ঘাতক', 'অগ্নিমশাল', 'রক্তস্রোত', 'মহাঝড়', 'ঘূর্ণিগঠন', 'মাতাল বৈশাখী'। আবার শামসুর রাহমানের e›'x wkwei †_‡K কাব্যেও আমরা লক্ষ করি সেখানে 'প্রতিবাদী সভা', 'উত্তোলিত হাত', 'প্রখর পোস্টার', 'দারুণ আক্রোশ', 'বিপ্লবের নিরুপম অরুণিমা', 'নক্ষত্রের রক্তিম স্ফুলিঙ্গ', 'ঝড় উথাল পাথাল', 'তেজী' 'সন্ত্রাসতাড়িত' ইত্যাদি শব্দ ও শব্দবন্ধ কবিতাগুলোকে যেন মুখর করে তুলেছে। একই ধরনের শব্দ লক্ষ করা যায় শহীদ কাদরীর ষাটের দশকের উপান্তে রচিত †Zvgv‡K Awfev'b wcqZgv কাব্যের কিছু কবিতায়। এই কাব্যের কিছু কবিতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে 'ডিক্টেশন', 'গ্রেনেড', 'কার্বাইন', 'গন্ধক', 'গেরিলা', 'দীর্ঘ কাঁটা বেড়া', 'একরোখা ট্যাঙ্কের কাতার', 'গোলন্দাজ', 'সাঁজোয়া-বাহিনী', 'সাইরেন', 'বেয়োনেট', 'রাজবন্দী', 'ছত্রভঙ্গ জনতা', 'স্ট্রাইক' ইত্যাদি শব্দ। কবিতায় এসব শব্দের আমদানি নিশ্চিতভাবে সময়ের অস্থির অশুভ বাস্তবতার পথরেখা ধরে উঠে এসেছে। পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী জাগরণের অস্থিরতা আর সেই সঙ্গে এর বিপরীতে রাষ্ট্রের প্রতিভূদের শক্তিপ্রয়োগের সত্য কবির চৈতন্যে এই শব্দগুলোর জন্ম দিয়েছে। ষাটের দশকের শেষ দিকের অধিকাংশ কবির কবিতার ভাষার মধ্যে এই ধরনের শব্দপ্রয়োগ দেখা যাবে। এজন্য আরো উদাহরণ চয়ন অবান্তর বলেই মনে হয়। কারণ এই প্রবণতা অন্বেষণ ছাড়াই অসাবধানী পঠনেও স্পষ্ট বোঝা যায়। একারণে এই সময়ের কবিতার শব্দ চয়ন ও প্রতীক নির্মাণ সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন–

> এ সময় কবিতা গণআন্দোলনের আলোকিত আভায় পথ চলতে শুরু করে। মিছিল, ঘেরাও, আগুন আর বারুদের মতো শব্দাবলী শুধু অনুষঙ্গ তৈরি করে শেষ হয় না, এগুলোর শব্দচিত্রে বা প্রতীকে কবিতা চেতনায় উত্তাপ ছড়াতে থাকে।...ঐ জাদুবাঁশীর ডাকে এবার সাড়া দেন অধিকাংশ প্রবীণ ও নবীন কবি। তারা হাতের কলম চুবিয়ে নেন রক্তিম কালিতে। তারা সত্তায় স্বদেশ-অন্বেষার ডাকই নয় শুধু, রক্তে স্বাদেশিকতার স্পন্দন অনুভব করেন; কেউ

কেউ সেখানে জোয়ারি কল্লোল শুনতে পান। কবিতা লেখা শুরু হয় ঐ স্পন্দন ও কল্লোলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। বিষয়ে প্রকরণে একই গুণগ্রামের মাত্রা যুক্ত হয়। (আহমদ রফিক ২০১৪ : ১২৯)

কবিতার প্রকরণে জাতীয়তাবাদী চেতনার তীব্র ছাপ সমকালীন প্রায় সব কবির কবিতায় পাওয়া যাবে। নির্মলেন্দু গুণের কবিতার কিছু চরণ লক্ষ করা যাক–

আমাকে থাকতে হতো, আমাকে থাকতে হয়,
আমাকে থাকতে হবে, আমাকে থাকতেই হবে
লালশালুঘেরা স্টেজে, বক্তৃতায়, পল্টনের
মাউথ-অর্গানে, গণসঙ্গীতের নির্যাতিত রাতে।
মারমুখো অন্যায়ের রাহুগ্রাসে আমাকেও দিতে হবে
প্রতিবাদে নৃশংস আগুন। লাঙ্গলের লাল ফালে,
বাস-ট্যাক্সি-লরীর আগুনে, হাসপাতালের উর্বর বেড়ে,
ইমার্জেন্সির নির্মম শয্যায়, মানুষের মৃত্যু-যন্ত্রণায়,
অনুর্বর বিমুখ ফাগুনে– আমাকে থাকতে হবে,
আমাকে থাকতে হয় এইসব মানুষের যেকোন আগুনে। (নির্মলেন্দু ২০১১ : ৩৪/১)

কবিরা শুধু শব্দের ক্ষেত্রে দাহ্যতাকে ধারণ করেছেন তা নয়। কবিদের উপমা চয়নেও লক্ষ করা যায় বিচিত্র প্রতিরোধী অস্ত্র এসে ভীড় করেছে। কারণ সাধারণ ভাষা, শৈল্পিক ভাষা যখন শেষ হয়ে যায়, তখন অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করা হয়। জাতীয়তাবাদী চেতনার এটি একটি ক্রম বলা যায়। বাংলার জাতীয়তাবাদী চেতনার ইতিহাস দেখলে বিষয়টি স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। বাংলার জাতীয়তাবাদী চেতনা যতই ক্রমপরিণত হচ্ছিল ততই জনগণের চেতনা তাতিয়ে উঠছিল। কবিদের কবিতার মধ্যেও চেতনার এই রূপান্তর সহজেই চোখে পড়ে। দিন যত গড়াচ্ছিল, কবিতার ভাষা থেকে শুরু করে এর অলংকারে চেতনার দাহ্যতা প্রভাব ফেলছিল। ষাটের কবিতার দিকে তাকালে দেখা যাবে, অন্তত উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের পর থেকে কবিতার উপমা-রূপকে দাহ্যতা বাড়তে থাকে। বিশেষত সত্তরের পরের কবিতায় ব্যাপকভাবে ঢুকে পড়ে অস্ত্রের উপমা-রূপক। কারণ জাতীয়তাবাদী চেতনা তখন অস্ত্রের ভাষায় প্রতিবাদ করা শুরু করেছে। কবি ঘোষণাই দিয়েছেন, 'কবিতা আমার ... প্রতিশোধ গ্রহণের হিরণ্ময় হাতিয়ার।' (নির্মলেন্দু ২০১১ : ৪০/১) চাঁদ বরাবরই কবিদের কাছে ব্যতিক্রম-বাদে এক সদর্থক উপমান হিসেবে কাব্য-কবিতায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ষাটের দশকের উপান্তে বাঙালি যখন পাকিস্তানিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে তখন চাঁদ কবিদের কাছে তার সিদ্ধরস থেকে বের হয়ে এসে সময়ের বাস্তবতাকে ধারণ করেছে। উদাহরণ লক্ষ করা যাক–

মায়াবী চাঁদ রূপালী চাঁদ রূপকথার উষ্ণতায় ভরানো
ছেঁড়া কাগজের টুকরোর মতো চাঁদ
ঝক ঝক করছে মাথার উপরে
যেন এক বিশাল উলঙ্গ তৃষ্ণার্ত বেয়োনেটের
একান্ত উজ্জ্বল ক্ষুধা– (ফজল ২০১২ : ২০৭/১)

আবার, মঞ্চে বক্তার কথা ভালো লাগছে না বলে দর্শকের প্রতিবাদ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কবি ব্যবহার করছেন অস্ত্রের উপমা। কবির ভাষায়, 'কেটে পড়ো, কেটে পড়ো মঞ্চ থেকে। যা বলছ তার ল্যাজা-

Dhaka University Institutional Repository

মুড়ো/বুঝি না কিছুই'– একজন বললেন হেঁকে নাড়িয়ে শিঙের দুটো চূড়ো,/সঙ্গিনের মতো হাত সিলিং-এর দিকে ভীষণ উঁচিয়ে।' (শামসুর ২০১২ : ২৮২/১)

এভাবে ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের কবিতা শব্দচয়নে আর উপমাচয়নে দাহ্য ও সশস্ত্র হয়ে সমকালীন জাতীয়তাবাদী চেতনার স্মারক হয়ে উঠেছে।

মিথ ও ধর্মীয় অনুষঙ্গের ব্যবহার এবং জাতীয়তাবাদের অসাম্প্রদায়িক রূপ

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে মুসলিম সংস্কৃতির ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটাতে চেয়েছে সব সময়। এর কারণ হিসেবে সমালোচক বলেছেন, 'যে দৈত্যকে তিনি (মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ) বোতলের বাইরে এনেছিলেন সে আর বোতলের ভিতরে ঢুকতে রাজি হয়নি'। (অশ্রুকুমার ২০১৪ : ২৬) একারণে রাজনীতির বাইরেও শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও ধর্মীয় চেতনার ছায়াপাত ঘটাতে সব সময় সক্রিয় ছিলেন পাকিস্তানি শাসকমহল ও পূর্ব বাংলার একই চেতনায় বিশ্বাসীরা। সাহিত্যে এই ইসলামি ইতিহাস-ঐতিহ্য-মিথ-অনুষঙ্গের প্রবেশ ঘটানোর জন্য স্বাতন্ত্র্যবাদী বা পাকিস্তানবাদী সাহিত্যিকগণ যে যথেষ্ঠ উদ্যোগ-আয়োজন করেছেন– একথা পূর্বের তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু কবিতার ভাষা থেকে শুরু করে ইতিহাস-ঐতিহ্যের ব্যবহারের প্রশ্নে স্বাতন্ত্র্যবাদীদের কর্মোদ্যোগ বাংলাদেশের কবিতায় একটি ক্ষীণধারা তৈরি করলেও ক্রমে তা একবারে ক্ষীণতম ধারায় পরিণত হয়। ষাটের দশকে এই ধারার তাত্ত্বিকরা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ফল ফলে ঠিক উল্টো। বাংলাদেশের কবিরা ভাষার মতো ইতিহাস-ঐতিহ্য-মিথ ও ধর্মীয় অনুষঙ্গের প্রশ্নেও অসাম্প্রদায়িক চেতনা জারি রেখেছেন। পূর্ব বাংলার কবিই তো এই ষাটের দশকেই ঘোষণা করেছেন, 'যেন না ঢুকতে পারে লোকধর্মে আর ভেদাভেদ।' কারণ পৃথিবীর অ-হিন্দু আর অ-বৌদ্ধ দেশগুলির মধ্যে পূর্ব বাংলা সবচেয়ে বেশি হিন্দু আর বৌদ্ধ জনসংখ্যা অধ্যুষিত। (কামরুদ্দীন ১৩৭৬ : ৯৭) এছাড়া 'ভূপ্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ বা যে কারণেই হোক বর্তমান বাংলাদেশ যে অঞ্চল নিয়ে গঠিত সেখানে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে ধর্মের আধ্যাত্মিক ও মরমী ধারায় সমর্পিত থাকতেই অভ্যস্ত।' (হায়াৎ ১৯৮৯ : ৬) পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী চেতনার সঙ্গে এই অঞ্চলের জীবন-যাপনের একেবারে গভীর থেকে উঠে আসা অসাম্প্রদায়িক চেতনার একটা গভীর সম্পর্ক সব সময়ই ছিল। এর প্রমাণ আমরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই দেখেছি। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তানকে যত ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে, পূর্ব বাংলার মানুষ তত এর থেকে সরে এসেছে। একারণে দেখা যায়, পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম সব সময়ই হিন্দু-মুসলমানের মিলিত স্বরে ঋদ্ধ হয়েছে। কবিতার ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি লক্ষ করা যায়। ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে এই বিষয়টি বেশি স্পষ্টতা পায়। বিশেষত '১৯৬৬ থেকে আমাদের কাব্যে এক নতুন অধ্যায়ের উদ্বোধন। ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক এবং গণমুখী জীবনবোধ সম্ভবত এই অধ্যায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।' (আবু হেনা ২০০১ : ৪০৩/১) মুসলিম কবিরা ষাটের দশকের কবিতায় হিন্দু মিথ ও অনুষঙ্গের ব্যবহার করেছেন। আবার হিন্দু সম্প্রদায়ের কবিরাও মুসলিম ঐতিহ্য ও অনুষঙ্গের ব্যবহার করেছেন। কবিদের এই চেতনার সঙ্গে পূর্ব বাংলার জনমানসের অসাম্প্রদায়িক চেতনার একটি গভীর যোগ রয়েছে। যেমন, আল মাহমুদের একটি কবিতাংশ লক্ষ করা যাক–

Dhaka University Institutional Repository

হে বায়ু, বরুণ, হে পর্জন্য দেবতা
তোমাদের অবিরল বর্ষণে ঘর্ষণে
যখন পর্বত নড়ে, পৃথিবীর চামড়া খসে যায়
তবু কেন রমণীর নুন, কাম, কুয়াশার
প্রাকৃতিক গন্ধ লেগে থাক?

হে বরুণ, বৃষ্টির দেবতা! (আল মাহমুদ ২০০০ : ১২২)

পূর্ব বাংলার একজন বেকার– বোধ করি কবি নিজেই– কিছু উক্ত করেছেন। উক্তিতে ব্যবহার করা হয়েছে হিন্দু মিথ–

যদি হতে পারতাম কোনো হিন্দি ফিল্মের নায়ক
পুণ্যবলে, তবে আমি ডুগডুগি বাজিয়ে ঠিক কৃতী
পুরুষ হতাম জানি। প্রেমের দেবতা যথারীতি
মেঘের আড়াল থেকে দিত ছুঁড়ে পুষ্পিত শায়ক :
হস্তিমূর্খ ধনীর দুলালী সে-ও নির্ঘাত শৌখিন
প্রেমে খেত হাবুডুবু। (শামসুর ২০১২ : ২০১/১)

একই প্রবণতা ষাটের দশকে আরো অনেক কবির মধ্যে লক্ষ করা যায়। যেমন, দিলওয়ারের কবিতায় অবচেতন মনেই কবি একের পর এক চয়ন করে গিয়েছেন সব ভারতীয় মিথ। শামসুর রাহমান তাঁর e›'X wkei †_‡K কাব্যে 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় বলেছেন– 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্যে/আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?/আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?' (শামসুর ২০১২ : ৩২৭/১) আরো একটি কবিতায় মিথের ব্যবহার লক্ষ করা যাক–

আগে আমি আনন্দিত হলে
একটি কবিতা লিখে খাতার পাতায়
সেই আনন্দের ছায়াটিকে রাখতাম ধরে।
আমার শয্যার পাশে দুঃখ কোনো দিন
হাঁটু মুড়ে বসলে নিঃশব্দে
আমি তার ছবি ছন্দে শব্দে আঁকতাম খুব
বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে। ক্রোধান্বিত হলে,
ক্রোধের গরগরে চিহ্নগুলি থাকত ছড়িয়ে
দুর্বাসার মতো জেদী পয়ারের প্রতিটি সারিতে। (শামসুর ২০১২ : ৩৩০/১)

সিকান্দার আবু জাফরের কবিতায় অবলীলায় জায়গা করে নিয়েছে ভারতীয় মিথ। কবি যখন বলেন, ''তোমার নিটোল জজ্ঘার প্রহরা আড়ালে/অনাদিকালের আবিষ্কার-অসম্ভব/কুবেরের অলুণ্ঠিতব্য ধনাগার' (সিকান্দার ২০১৭ : ১৪৬) তখন সহজেই কবির চেতনার মর্মমূলে বাস করা অসাম্প্রদায়িক চেতনাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শুধু মিথের ব্যবহার নয় অনুষঙ্গ উল্লেখেও এই অসাম্প্রদায়িক চেতনাটি সহজেই চোখে পড়ে। শামসুর রাহমান 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' কবিতায় যখন আত্মত্যাগ আর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার

Dhaka University Institutional Repository

কথা বলছেন তখন কিন্তু সমকালে জায়মান জাতীয়তাবাদী জাগরণের অসাম্প্রদায়িক রূপটি প্রকাশ করতে ভুলছেন না। তিনি সকিনা বিবির আত্মত্যাগের কথা বলার সাথে সাথে বলেছেন হরিদাসীর আত্মত্যাগের কথা। কবির ভাষায়, 'তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,/সকিনা বিবির কপাল ভাঙলো,/সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।' (শামসুর ২০১২ : ৩২৭/১) অনুষঙ্গ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক কবি তাঁর নিজস্ব ধর্মীয় সংস্কৃতি ও যাপিত জীবনের সংস্কৃতির বাইরে গিয়ে অন্য ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির ধর্মীয় অনুষঙ্গের পৌনঃপুনিক ব্যবহার করেছেন। এই ধরনের অনুষঙ্গের ব্যবহার চল্লিশের কবিতায় এমন কি পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধের কবিতায় দুর্লভ ঠেকবে। কিন্তু ষাটের দশকের কবিতায় হামেশাই এই ব্যবহার চোখে পড়ে। এর সঙ্গে দুটি বিষয়ের যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। একটি ষাটের দশকে পাকিস্তানবাদী চেতনা বাংলা কবিতায় 'হিন্দুয়ানি' বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সময় যে বিষোদ্‌গার করেছে এ তারই বিপরীত জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ। অন্যটি হচ্ছে পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠীর জীবন-যাপনের সংস্কৃতির মধ্যে এই বহুধর্মীয় উপাদানের মিশেল স্বভাবতই রয়েছে। অর্থাৎ এটি একটি সহজিয়া চেতনার কৌম জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। একারণে দেখা যায় কবিদের মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই অন্য ধর্মের অনুষঙ্গ কবিতার মধ্যে ছায়া ফেলেছে। যেমন, মোহাম্মদ রফিক (জ.১৯৪৩)-এর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ^ekvLx cvYgv (১৯৭০)-র বিভিন্ন কবিতায় অবলীলায় স্থান করে নিয়েছে মন্দির, পূজা, অঞ্জলি থেকে শুরু করে গৌতম বুদ্ধ পর্যন্ত। উদাহরণ দেখা যাক–

দূরে কোনো উদাসীন মাঠের প্রদেশে
পরিত্যক্ত দেবালয় বিরহিণী সন্ন্যাসীর মঠ
বার বার হাতছানি দেয়
ডাক দেয় আমার গভীরে,
আলোড়িত হই শুধু! আর কিছু নয়!
আমি কি কখনো যাব ওই কালিন্দীর কূলে
অথবা এসব শুধু রাতের আবেশ!

জ্যোৎস্নায় ভরে আছে পৃথিবীর প্রান্তগুলো,
নির্জনতা মুড়ে দিল সমস্ত মন্দির-দেবালয়
আমার হৃদয় শুধু কান্নায় উতলা হয়
কি এক পবিত্র অভিমানে!

তথাগত, কী আমার সম্পর্ক তোমার সাথে
এ জন্মের জতুগৃহদ্বারে! (মোহাম্মদ রফিক ২০১১ : ২১)

মহাদেব সাহার GB Mn GB mb¨vm গ্রন্থের বিভিন্ন কবিতার মধ্যেও 'মঠ', 'গীর্জা', 'মন্দির', 'নাগা সন্ন্যাসী' 'দরবেশ', 'গোরস্থান'-এর সহাবস্থান সহজেই চোখে পড়ে। আবুল হাসান (১৯৪৭-১৯৭৫)-এর ivRv hvq ivRv Av‡m কাব্যের 'পাখি হয়ে যায় প্রাণ' কবিতায় কবির ছেলেবেলার গ্রামীণ জীবনের নানা স্মৃতি বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জীবনপ্রবাহের যে বর্ণনা রয়েছে তা কবির নিঃশর্ত অসাম্প্রদায়িক চেতনারই প্রকাশ। একই ধরনের প্রয়োগ লক্ষ করি একই কাব্যের 'ঘৃণা' কবিতায়। কবিতাটি শুরুই হয়েছে 'যতই জপি আঁধার ঘরে বসে বসে হরি ওঁ'–এই বলে। 'পাখি হয়ে যায় প্রাণ' কবিতায় কবি

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর 'ফাতিমা ফুফুর প্রভাতকালীন কোরানের মর্মায়িত গান' আর 'সরজু দিদির হরিকীর্তনের বোল' একই আবেগে ধারণ করেছেন। কবির ভাষায়–

ফাতিমা ফুফুর প্রভাতকালীন কোরানের
মর্মায়িত গানের স্মরণে তাই কেন যেনো আমি

চলে যাই আজো সেই বর্নির বাওড়ের বৈকালিক ভ্রমণের পথে,
যেখানে নদীর ভরা কান্না শোনা যেত মাঝে মাঝে
জনপদবালাদের স্ফুরিত সিনানের অন্তর্লীন শব্দে মেদুর।

মনে পড়ে সরজু দিদির কপালের লক্ষ্মী চাঁদ তারা
নরম যুঁইয়ের গন্ধ মেলার মতো চোখের মাথুর ভাষা আর
হরিকীর্তনের নদীভূত বোল। (আবুল হাসান ২০১২ : ২০)

এশুধু কবিতা নয়। এটি পূর্ব বাংলার ষাটের দশকের জনচৈতন্যের এক গভীর স্মারক, যা মূলত আবহমান কাল ধরে চর্চিত হয়ে চলেছে। নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় অনুষঙ্গ নির্বাচনের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায় কবির অসাম্প্রদায়িক চেতনা। 'হুলিয়া' কবিতায় কবি বাড়ি ফিরলে তাঁর সঙ্গে যারা দেখা করতে এসেছে তাদের তালিকা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'খবর পেয়ে যশমাধব থেকে আসবে ন্যাপকর্মী ইয়াসিন/তিন মাইল বিষ্টির পথ হেঁটে রসুলপুর থেকে আসবে আদিত্য।/রাত্রে মারাত্মক অস্ত্র হাতে নিয়ে আমতলা থেকে আসবে আব্বাস।' এই যে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং যুদ্ধে অবতীর্ণ মানুষের তালিকার মধ্যে হিন্দু মুসলমানের যে অপূর্ব রসায়ন কবি ঘটিয়েছেন, এটিই পূর্ব বাংলার সমকালীন জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকৃত সুগন্ধিকে ধারণ করেছে। তাঁর কবিতায় রাবেয়া খালার মেয়ে সুফিয়া আর সেনবাড়ির বৌদি সমান মনোযোগে হাজির হয়। 'দরোজা খুলেই দেখি অহর্নিশ সমুখে দাঁড়ায়/আমারই প্রতিবেশী সদর আলী, নরেশ বাড়ই।' (নির্মলেন্দু ২০১১ : ৪৬/১) এমনকি 'আল্লা' এবং 'ঈশ্বর'-কে পাশাপাশি পঙ্ক্তিতে সাজিয়ে কবিতা লিখেছেন কবি।[৮] কারণ জাতীয়তাবাদী জাগরণের চূড়ান্ত পর্বে ভেদরেখা একবারেই উঠে গিয়েছিল।

কবিতার আঙ্গিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম

কবিতার আঙ্গিক শুধু নয়, সাহিত্যের যেকোনো শাখার আঙ্গিক কোনো নিরীহ বিষয় নয়। আঙ্গিক হচ্ছে বিষয়কে ধারণ করার এক ধরনের ছাঁচ। এই ছাঁচ দেখে ঠিকই বের করে নেওয়া যায় বিষয়ের ধরন, গভীরতা ও তাৎপর্য। একারণে দেখা যায়, একই ঔপন্যাসিকের দুটি উপন্যাসের আঙ্গিক দুই রকম হয়েছে। একই কথা খাটে কবিতার ক্ষেত্রেও। একই কবির দুটি কবিতা বিষয়ের দুই রকমতার কারণে দুটি ভিন্ন আদলপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিষয় যখন একই হয়ে ওঠে তখন আঙ্গিকের মধ্যে মিল থাকা অসম্ভব নয়। ষাটের দ্বিতীয়ার্ধ– বিশেষত ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানের পর থেকে– পূর্ব বাংলার কবিতার বিষয় মোটামুটি একই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিল। আন্দোলন-সংগ্রামে ফুঁসে ওঠা, অধিকার সচেতনতায় সরব হয়ে ওঠা, স্বাধিকার-স্বাধীনতায় উদ্বেল হয়ে ওঠা– এগুলোই ছিল পূর্ব বাংলার সাধারণ চিত্র। এই চিত্রই পূর্ব বাংলার কবিতায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। প্রমাণ হিসেবে শহীদ কাদরীর একটি কবিতা লক্ষ করা যাক, যেখানে কবি বলছেন, এতকাল কবিতাকে সযত্নে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে ভরে উঠতে দেননি। কবিতায়

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পের প্রশ্নে তিনি ছিলেন নাছোড়। কিন্তু ষাটের উপান্তে বা ১৯৭১-এ এসে কবি আর আগের মতো থাকতে পারছেন না এবং চাচ্ছেনও না। কারণ তখন সারা জাতির চেতনা এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। তখন কবিতায় প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ ধারণ করাটা জরুরি হয়ে উঠেছে। কবির ভাষায়–

> হে আমার শব্দমালা, তুমি কি এখনও বৃষ্টি-ভেজা
> বিব্রত কাকের মতো
> আমার ক্ষমতাহীন ডাইরির পাতার ভেতরে বসে নিঃশব্দে ঝিমুবে,
> তাহ'লে তোমার ধ্যানে আবাল্য দুর্নাম কিনেছি আমি
> অনর্থক বড়াই করেছি।
>
> মধ্যরাত্রি পর্যন্ত অনিদ্রা এবং অস্থির জাগরণ ছাড়া তুমি কিছু নও,
> কপালে দাও নি তুমি রাজার তিলক কিম্বা প্রজার প্রতিশ্রুতি
> তবে কেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছি তোমার পদমূলে!
>
> বরং এসো করমর্দন ক'রে যে যার পথের দিকে যাই,
> তবু আরো একবার বলি:
> যদি পারো গর্জে ওঠো ফীল্ডগানের মতো অন্তত একবার...(শহীদ ২০০০ : ৮১)

এই চেতনার প্লাবন কোনো কবিকেই স্থির থাকতে দেয়নি। সবাই প্রায় একই চেতনার রঙে রঙিন হয়ে প্রায় একই আঙ্গিকের কবিতা রচনা করেছেন। কারণ কবি তো তাঁর কাব্যের ভাব-ভাষা-আঙ্গিকের খোরাক নেন তাঁর চারপাশ থেকেই।

একারণে দেখা যায়, ষাটের দশকের শেষ দিকের কাব্য-কবিতার আঙ্গিকের একটি সাধারণসূত্র নির্দেশ করা সম্ভব।

বাংলাদেশের কবিতার আঙ্গিকের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বোধ করি ক্যাটালগধর্মিতা। একই অনুভূতিকে বোঝাতে গিয়ে বা একই অনুভূতির বিস্তার ঘটাতে গিয়ে কবি পরপর সমধর্মী বা বিভিন্নধর্মী বেশ কয়েকটি অনুষঙ্গের অবতারণা করেন। এই ক্যাটালগধর্মিতা পঞ্চাশের দশকের কবিদের হাতেই বেশ চর্চিত হয়ে ষাটের দশকের কবিদের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু ষাটের উপান্তে গিয়ে জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের চাপে সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা এক জায়গায় চলে আসার কারণে একই অনুভূতির বিস্তার ও গভীরতার প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে কবিরা ক্যাটালগধর্মী কবিতার দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েছেন। অথবা বলা যায় কবিতার বিষয় কবিদের এই আঙ্গিকের দিকে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য করেছে। বিষয় যখন একই, অনুভূতি যখন একটি, আঙ্গিকের একরূপতা সেখানে অসম্ভব নয়। আর তাছাড়া ষাটের উপান্তে জাতির গুরুত্বপূর্ণ কবিদের কাছে কবিতা তো আর ভাববিলাসিতার বিষয়ের মধ্যে নেই। কবিতা হয়ে উঠেছে কাজের, প্রতিরোধের আরেক মাধ্যম। কেজো কবিতা যা করে ষাটের উপান্তের কবিতা তাই করেছে। একারণে কবিতা কাটা কাটা কথা, শব্দ ও অনুষঙ্গ চয়নের সহজ আঙ্গিক ক্যাটালগধর্মিতার দিকে গিয়েছে। শামসুর রাহমানের ॥bR e√m f‡g কাব্যের অধিকাংশ কবিতা থেকে শুরু করে e›'x ॥k॥ei †_‡K কাব্যের প্রায় অধিকাংশ কবিতা-ই এই তালিকাভুক্ত হবে। শহীদ কাদরীর ষাটের উপান্তে রচিত দেশকালনিষ্ঠ কবিতাগুলোও এই তালিকায়

পড়বে। উদাহরণ দেয়া যাক শামসুর রাহমানের e›`x wkwei †_‡K কাব্যের বহুল পরিচিত 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতা থেকে–

স্বাধীনতা তুমি
পতাকা-শোভিত স্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল,
স্বাধীনতা তুমি ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি।
স্বাধীনতা তুমি
রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।
স্বাধীনতা তুমি
মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশি।
স্বাধীনতা তুমি
অন্ধকারের খাঁ-খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক,.. (শামসুর ২০১২ : ৩২৮/১)

ষাটের দশকের উপান্তে যেখানে কবিতা ক্যাটালগধর্মী নয়, সেখানে ক্যাটালগধর্মিতার লক্ষণাক্রান্ত। অর্থাৎ অনুষঙ্গ চয়নের দিকে কবির ঝোঁক বেশি। তবে লক্ষণীয় এই যে, এই ক্যাটালগিং করতে গিয়ে কবিরা প্রায়শই এমন সক অনুষঙ্গ বা ইমেজ ব্যবহার করেছেন যার সঙ্গে দেশকালের রয়েছে গভীর যোগ।

ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের কবিতার আঙ্গিকের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এসময়কার কবিতার চরণ সয়ম্ভূতার লক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। জাতীয় চৈতন্যে যে আত্মপ্রত্যয় দেখা দিয়েছিল সেই আত্মপ্রত্যয়ই কবিদের চৈতন্যকে সংহত করেছে। অবস্থান যখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে তখন কথা বলার প্রতিটি বাক্য সয়ম্ভূ হয়ে ওঠে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা যখন আয়ত্ত হয়ে যায়, তখন কথকের বাক্যে আসে ঋজুতা। বাক্যমাত্রই বাণী বা আপ্তবাক্যের মতো হয়ে ওঠে। যেমন–

আগুন লেগেছে রক্তে মাটির গ্লোবে।
যুবক গ্রীষ্মে ফাল্গুন পলাতক,
পলিমাখা চাঁদ মিছিলে চন্দ্রহার–
উদ্ধত পথে উন্নত হাত ডাকে,
সূর্য ভেঙেছে অশ্লীল কারাগার। (নির্মলেন্দু ২০১১ : ৩৮/১)

এই একই লক্ষণাক্রান্ত কবিতার তালিকায় সহজেই চলে আসবে আল মাহমুদের †mvbvjx Kvweb কাব্যের সবগুলো সনেট।

শুধু চরণের সয়ম্ভূতার বিষয় নয়, ষাটের উপান্তের কবিতার দিকে দৃষ্টি দিলে সহজেই চোখে পড়ে পয়ার ছন্দের ব্যবহার-বহুলতা। এর সঙ্গে আবহমান বাংলা কবিতার ছন্দের ইতিহাসের এক গভীর সম্পর্ক একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যদিও পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকের কবিদের অধিকাংশের বহুলব্যবহৃত ছন্দের নাম অক্ষরবৃত্ত, তবু সেই অক্ষরবৃত্তের পূর্বতন কবিতা আর ষাটের উপান্তের অক্ষরবৃত্ত ছন্দের গঠনগত একটি পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। এই পার্থক্য অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রতিচরণের মাত্রাসংখ্যায়। পঞ্চাশের দশকের বা ষাটের প্রথমার্ধের কবিতার অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রতিটি চরণে মাত্রাসংখ্যা এবং পর্বসংখ্যা থাকত বেশি। কারণ মনোতলের গভীর-গহন বাস্তবতা প্রকাশের জন্যে চরণের বিস্তৃতির ছদ্মবেশে গদ্যের

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগ নেয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু ষাটের দশকে– বিশেষত ষাটের দ্বিতীয়ার্ধে– এসে নতুন-পুরাতন প্রায় সব কবি চেতনার সেই জায়গা থেকে সরে এসে স্বদেশের জাতীয়তাবাদী চেতনার ভূমিতে পদার্পণ করেছেন। যেমন "শামসুর রাহমান 'নিরালোকে দিব্যরথ' থেকে নেমে এলেন 'নিজ বাসভূমে'।" আল মাহমুদ Kv‡ji Kjm থেকে †mvbvjx Kwweb-এ। হাসান হাফিজুর রহমান wegL cvšÍi থেকে AwšÍg k‡ii g‡Zv বা hLb D'¨Z m½xb-এ। নতুন-পুরাতন অধিকাংশ কবির এই রূপান্তর বা প্রত্যাবর্তনে কেবল চেতনার রূপান্তর বা প্রত্যাবর্তন ঘটল না, তাঁদের কবিতার ছন্দ ও আঙ্গিকেও পরিবর্তন ঘটল। এই পরিবর্তন লক্ষ করেই সমালোচক আল মাহমুদের †mvbvjx Kwweb কাব্যগ্রন্থে পয়ার ছন্দ গ্রহণ করা সম্পর্কে বলেছেন, 'আবহমান বাংলা কবিতার পয়ার ছন্দকেই যে তিনি এই কাব্যের অবিকল্প আঙ্গিক হিসেবে বেছে নিলেন– তা কি একান্তই আকস্মিক?' (আবু হেনা ২০০১ : ৪০৩/১) নিশ্চয়ই নয়। জাতীয় জীবনের রাজনৈতিক চৈতন্যের বিশেষ ঘাটে নোঙর করার সঙ্গে এই আঙ্গিক নিরীক্ষার নিশ্চয় গভীর সম্পর্ক রয়েছে। শুধু আল মাহমুদ নন, ষাটের উপান্তে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আওতায় হ্রস্বচরণে কবিতা রচনার সঙ্গে কবিদের রাজনৈতিক চেতনার এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

লোকজ শব্দ, লোকসংস্কৃতি ও লোকজীবন

ষাটের দশক যেহেতু জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশের চূড়ান্ত সময়, সেহেতু তখন নগরের সঙ্গে গ্রামের দূরত্ব দ্রুত ঘুচতে থাকে। গ্রাম এসে আছড়ে পড়তে থাকে শহরে। আবার শহর ছড়িয়ে পড়তে থাকে গ্রামে। পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকা তখনও গ্রামীণ চেতনালালনকারী প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের বাঙালি জনগোষ্ঠীর বসবাসে সমাকীর্ণ। গঠনোন্মুখ শহুরে চেতনার মধ্যে গ্রামীণ চেতনা-ই তখনও প্রাধান্যশীল। এতদ্বিধ কারণে গ্রামীণ ও লোকসংস্কৃতি তখনও বাঙালির চেতনাকে দারুণভাবে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করেছে। কিন্তু ষাটের দশকে এসে জাতীয়তাবাদী চেতনার অংশ হিসেবে কবি-সাহিত্যিকরা বাঙালি সংস্কৃতির গ্রামীণ-রূপটিকে, লোক-রূপটিকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে অধিক মাত্রায় তাঁদের কাব্য-কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। যেসব কবি-সাহিত্যিক শহুরে রুচিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁরাও জাতীয়তাবাদী চেতনার স্বভাবে সাড়া দিতে গিয়ে গ্রামীণ অনুষঙ্গকে তাঁদের কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। এসময়ের জাতীয়তাবাদী চেতনার চাপ চিন্তকদের মধ্যেও লক্ষ করা যায়। একারণে আমরা দেখি, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (১৯২৬-১৯৭১) তাঁর mvwn‡Z¨i be iƒcvqY (১৯৬৯) গ্রন্থে বিভিন্ন লেখায় বারবার উল্লেখ করছেন যে, 'সংস্কৃতি বস্তুটাই আঞ্চলিক'। সংস্কৃতি দেশের মাটি থেকেই জন্ম নেয়। আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তি হবে আমাদের দেশের মাটি। তিনি এও বলেছেন যে, আমাদের সাহিত্য পূর্ব বাংলার খাঁটি জীবনচিত্র রূপায়ণের মধ্য দিয়েই যাতে সত্য সার্থক হয়ে ওঠে তাই চাইছি।' (মোফাজ্জল ১৯৬৯ : ১২-১৯) এই চিন্তা ষাটের প্রেক্ষাপটে নিঃসন্দেহে জাতীয়তাবাদী চিন্তা। চিন্তার এই ধারা পূর্ব বাংলার সাহিত্যের প্রায় সব শাখাকেই কমবেশি গ্রাস করেছিল।[৯] কবিতার গ্রামীণ ও লোকসংস্কৃতির ঘাটে নোঙর করার এই চেতনাটি স্পষ্ট হয়েছে গ্রামীণ জীবনের অনুষঙ্গের উল্লেখে, লোকসাহিত্যের অনুষঙ্গ ও ঢঙের ব্যবহারে আর গ্রামীণ বা লোকজ শব্দের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। এটি ষাটের দশকের উভয় পর্বেই লক্ষ করা যায়, তবে দ্বিতীয়ার্ধে এই হার নিশ্চয় বেশি। এই প্রবণতা ষাটের কবিতার শিল্পিতাকে সাংস্কৃতিক-রাজনীতির একটি বিশেষ প্রবণতা বলেই মনে

Dhaka University Institutional Repository

হয়। ষাটের কবিতার শিল্পপ্রকরণের এই ধরন জাতীয়তাবাদী চেতনার রঙে রঙিন। এই প্রবণতা যেসব কবির মধ্যে দেখা দিয়েছে তাঁদের মধ্যে আসাদ চৌধুরী অন্যতম। আসাদ চৌধুরীর কবিতার উপর্যুক্ত বিশেষ প্রবণতা সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন–

> দেশজতা– এই একটি শব্দে আসাদের কবিতাকে চিহ্নিত ক'রে নেওয়া যায়। এদেশের লোক ঐতিহ্যকে আসাদের কবিতা খুব প্রবল-উজ্জ্বলভাবে আঁকড়ে ধরেছে : প্রাচীন লোকসাহিত্য, বৈষ্ণব পদ, লালন শাহ থেকে আসাদ তাঁর কবিতার উপকরণ খুঁজে পেয়েছেন, ঐসবের উল্লেখ তাই তাঁর কবিতার ভিটেমাটি থেকেই ('স্বীকারোক্তি', 'আয়না', 'বৃক্ষের স্বভাবচরিত' ইত্যাদি); লোক-কবিতার আরেক উপকরণ ছড়ার ব্যবহার আসাদের কবিতায় তাই পৌনঃপুনিক ('সন্দেহ', 'আয়না', 'ধান নিয়ে ধানাইপানাই', 'চোর' ইত্যাদি)। আসাদের ঐসব ছড়ায় আঞ্চল ভাষার বুনন তাই খুব স্বভাবশোভন; পূর্ব বঙ্গের লোক-ভাষার সঙ্গে আসাদ মিশিয়েছেন আবেগের আন্তরিক তাপ। (আবদুল মান্নান ১৯৯৪ : ২৮৬-২৮৭)

আসাদ চৌধুরীর কবিতার প্রকরণের ও প্রবণতার এই বিশেষ দিক দেখার জন্য উদাহরণ দেখা যেতে পারে–

> পেঁয়াজ আমার ননদী পেঁয়াজ বাটি যদি,
> নয়ন জলে আ-লো বুইন উথালপাথাল নদী।...
> হলুদ আমার সোয়ামী যতনে বাটিব
> বাটিয়া ঘসিয়া হলুদ অঙ্গেতে মাখিব।
> ধুইয়া পুছিয়া মুখে শ্বেত চন্দন লেপিব।
> যতন করিয়া চোখে কাজল মাখিব।
> তাম্বুল গুয়াতে ওষ্ঠ রাঙা যে করিব
> পড়শি আইলে রাঙা ঠোঁডে মিষ্টি হাসি দিব।
> হাসিয়া ভাসিয়া তবে নিরলে বসিব
> নিরলে বসিয়া মুখ আয়নাতে হেরিব।
> আয়না না দেখিতে গিয়া কান্দন আসে ক্যানে
> মরার আয়নার গুষ্ঠি আছড়াইয়া ভাঙিব। (আসাদ ২০০৮ : ৩৯-৪০)

উদ্ধৃতাংশের কবির চেতনায় বাঙালিত্ব কী পরিমাণে বাসা বেঁধেছে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। পাকিস্তানবাদী ঐতিহ্যের বিপরীতে কবির এই কাব্যপ্রকরণ বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার এক দারুণ প্রকাশ। কবিতার প্রকাশের এই ভঙ্গি, মধ্যযুগের বাংলা কবিতার সঙ্গে এবং ভাষা লোকায়ত ভাষার সঙ্গে পাতানো এই মিতালি আধুনিক কবির খাঁটি বাঙালিয়ানার দৃষ্টান্তকে উজ্জ্বল করেছে বৈ কি।

শামসুর রাহমান সম্পর্কে বলা হয় তিনি কবিতায় রূপদক্ষতার প্রশ্নে আপসহীন আর চেতনায় মূলত নাগরিক। কিন্তু ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে এই শামসুর রাহমানের কবিতায় লক্ষ করা যায়, তিনি সময়ের প্রয়োজনে ব্যষ্টি থেকে সমষ্টির মধ্যে নেমে এসেছেন; লোকজীবনের এবং লোকসংস্কৃতির নানা অনুষঙ্গ কবিতায় ধারণ করেছেন। তাঁর কবিতায় সহজেই উঠে এসেছে চাঁদ সদাগর, বেহুলা, লখিন্দর। আর কবিতায় তিনি একই সঙ্গে পরিভ্রমণ করেন মধ্যযুগের লোকজীবন-ঘনিষ্ঠ বৈষ্ণব পদাবলির জগতে। এমনকি উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান নিয়ে কবিতা লিখতে গিয়ে তার মধ্যে সংমিশ্রণ করিয়ে দেন বৈষ্ণব পদাবলীর চরণ–

> আমরা সবাই

Dhaka University Institutional Repository

এখানে এসেছি কেন? এখানে কী কাজ আমাদের?
কোন সে জোয়ার
করেছে নিক্ষেপ আমাদের এখন এখানে এই
ফাল্গুনের রোদে? বুঝি জীবনেরই ডাকে
বাহিরকে আমরা করেছি ঘর, ঘরকে করেছি বাহির। (শামসুর ২০১২ : ২৭১/১)

উদ্ধৃতাংশের শেষ চরণে বৈষ্ণব পদাবলির চরণের এই ব্যবহার সম্পর্কে সমালোচক যথার্থই বলেছেন—

> বলা যেতে পারে, 'বাহিরকে আমরা করেছি ঘর, ঘরকে করেছি বাহির'— এই উচ্চারণের ভেতর শামসুর রাহমানের লোকজীবনে প্রত্যাবর্তনবিন্দু (turning point) নিহিত। এই বাঁকপরিবর্তন তাঁকে ব্যষ্টি থেকে সমষ্টিতে নিয়ে যায়। যন্ত্রপীড়িত নগরচেতনা থেকে লোকজীবনের প্রাণপ্রবাহে পৌঁছে তিনি তাঁর কবি মানসের রূপান্তর ঘটান। তাই g½jKve¨, ˆeòe c'vejx, ga¨h‡Mi MxwZKweZv ও ˆgqgbwmsn-MxwZKvর বিবিধ লোক-অনুষঙ্গ তাঁর কাব্যে স্বচ্ছন্দে অনুপ্রবেশ করে। (অনু ২০০৭ : ৭৭)

আবুল হাসানের কবিতায় প্রায়শ এসেছে লোকজ সংস্কৃতির নানা অনুষঙ্গের উল্লেখ। যেমন, 'হরিকীর্তন', 'বৈষ্ণব আখড়া', 'কবিগান' ইত্যাদি লোক সংস্কৃতির নানা অনুষঙ্গ ঘুরে ফিরে তাঁর কবিতায় এসে তাঁর কবিতার মধ্যে পূর্ব বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির স্বাদ-গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে। শুধু আসাদ চৌধুরী আর আবুল হাসান নয় অন্যান্য কবির কবিতায়ও প্রায়শ উচ্চারিত হয়েছে সাঙাৎ, মিস্তিরি, বগা, জিউলী, নুন, থাপ্পড়, ধানাইপানাই, বুইন, শাউড়ী প্রভৃতির মতো অসংখ্য দেশজ, প্রাকৃত, অর্ধ-তৎসম, লোকজ শব্দ। (বায়তুল্লাহ্ ২০০৯ : ১৫৮) এমনকি ষাটের পরাবাস্তববাদী কবি বলে পরিচিত আবদুল মান্নান সৈয়দের কবিতায়ও উঁকিঝুকি দিয়েছে লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান। লোকজীবন আর লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরণে তিনি তাঁর কবিতার প্রকরণকে ঋদ্ধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য দেখা যেতে পারে—

> গ্রাম্যতাবর্জিত নগরমনস্ক এই কবি তাঁর চেতনার আধুনিক কাব্যভাষ্য দিতে গিয়ে কখনোই ঐতিহ্যচ্যুত হন নি, বরং তাঁর সৃষ্ট কাব্যভাষাজাত অন্তর্লীন আকরণের ভেতর লোকসংস্কৃতির প্রত্নছবির বীজ অঙ্কুরিত। রূপকথা-উপকথা, লোকশিল্পকলা, লোকবিশ্বাস লোকায়ত জীবনের কৃষক-ধীবর অন্ত্যজ শ্রেণী, লোকযানবাহন, লোকনারী, লোকপুরাণ ও লোকজীবনপ্রবাহের প্রাত্যহিকতার টুকরো-টুকরো অনুষঙ্গ বর্ণময় দ্যুতিতে তাঁর কবিতার অন্তর্লীন আকরণে প্রোথিত। ... রূপক-উৎপ্রেক্ষা-সমাসোক্তি অন্যাসক্ত এবং উপমানচিত্রের বৈচিত্র্যসঞ্চারী প্রয়োগে কবির চেতন-অবচেতনউত্থিত লোক-উপকরণগুচ্ছ শিল্পখচিত বর্ণগভীরতায় তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। (অনু ২০০৭ : ১৬৬)

অন্যদিকে পূর্ব বাংলার লোকজ শব্দ আর লোকসংস্কৃতির গভীর তল ব্যবহার যাঁর কবিতাকে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে রেখেছে তিনি আল মাহমুদ। তাঁর কবিতায় বিষয় আর লোকজ শব্দের হামেশা ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি আধুনিক কবিতার ধারণাকে বদলে দিয়ে কবিতাকে দেশ আর দশের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়েছেন। এই যে ষাটের দশকে ক্রিয়াশীল কবিদের কবিতায় লোকসংস্কৃতি আর লোকজীবনের প্রতি তীব্র টান, এর পরিপ্রেক্ষিতে রয়েছে কবিদের জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও আবেগের সংযোগ।

টীকা

১. †jvK †jvKvšÍi কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি রচিত হয়েছে ১৩৬১ থেকে ১৩৭০ সালের মধ্যে। আর Kv‡ji Kjm কাব্যগ্রন্থের

Dhaka University Institutional Repository

কবিতাগুলো রচিত হয়েছে ১৩৭০ থেকে ১৩৭৩ সালের মধ্যে। †mvbwj Kwweb-এর কবিতাগুলো Kv‡ji Kjm-এর পরের সময়ের রচনা।

২. এই দ্বন্দ্ব মোটামুটিভাবে দুটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে প্রকাশিতও হতো লিখিতভাবে। একটি গোলাম মোস্তফা সম্পাদিত bI evnvi এবং অন্যটি এর বিপরীতধর্মী পত্রিকা ফজলে লোহানী সম্পাদিত AMZ¨v। প্রথমটি প্রাক্তনদের; দ্বিতীয়টি তরুণদের। অন্যান্য আরো পত্রিকার মধ্যেও এই বিরোধের বিষয়টি স্পষ্টতা পেত। কিন্তু এই দুটি পত্রিকাকে বলা যায় প্রতিনিধিস্থানীয়।

৩. ষাটের দশকের কবিতায় দুইভাবে মিছিল ও আন্দোলন-সংগ্রামের অনুষঙ্গ উঠে এসেছে; প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। প্রত্যক্ষভাবে যেসব কবিতায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামের ছায়পাত ঘটেছে তা সহজেই শনাক্ত করা যায়। কিন্তু একটু গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে ষাটের দশকের, বিশেষত ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের কবিতার মধ্যে, শোণিতগতভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম তার স্বভাবসহ ঢুকে পড়েছে। যেমন, দিলওয়ারের Dw™b Djøvm কাব্যগ্রন্থের 'তাই আমি প্রতিদিন মিলে' কবিতার কথাই ধরা যাক। কবিতাটি রচিত হয়েছে ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে। কবিতাটিতে কবি তাঁর কবিতা রচনায় মিলের বা ছন্দের কথা বলেছেন। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, ছন্দ আর শব্দের মিলের কথা বলতে গিয়ে কবি আসলে মিছিলের মানুষের ক্রমাগত যোগযুক্ত হওয়ার কথা, মিলিত হওয়ার কথা, অনেকে সঙ্গে অনেকের মিলের কথা তুলে ধরেছেন; আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কারণ ১৯৬৯-এ পূর্ব বাংলার অধিকাংশ কবির চৈতন্যকে শাসন করেছিল অভ্যুত্থান। মিছিল বা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি ক্রমাগত নিজেকে বাড়িয়ে তোলে পুরাণের রক্তবীজের মতো। অধিক সংখ্যক মানুষকে ক্রমাগত যুক্ত করাই এর স্বভাব। দিলওয়ারের পূর্বোক্ত কবিতায় এই বিষয়টি লক্ষ করা যায়। কবিতাটির একটি অংশ লক্ষ করা যাক–

> মর্তলোকে প্রতিদিন তাই
> ইমনকল্যাণে বাজে মিলের সানাই,
> যে বৃক্ষে বীজের রক্ত, সেই বৃক্ষ ফের
> ছড়ায় সৃজনীবীজ ফুলের, ফলের। (দিলওয়ার ১৯৯৮ : ১৫৪/১)

কবিতাংশে মূলত মিছিল বা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামের স্বভাবই রূপায়িত হয়েছে। এভাবে ষাটের দ্বিতীয়ার্ধের কবিতার শোণিতে ক্রিয়াশীল থেকেছে জাতীয়াতবাদ।

৪. আবুল হাসানের ivRv hvq ivRv Av‡m কাব্যের 'অসভ্য দর্শন' কবিতাটি আবুল হাসান উৎসর্গ করেছেন নির্মলেন্দু গুণকে। প্রকৃতপক্ষে এই কবিতায় আবুল হাসান নির্মলেন্দু গুণের জীবনবোধ বা কবিস্বভাবের একটি দিককে তুলে ধরেছেন। তিনি নির্মলেন্দু গুণের চিন্তার মধ্যে অতিরিক্ত রাজনীতিঘনিষ্ঠতা লক্ষ করেই হয়ত বলেছেন–

> দালান উঠছে তাও রাজনীতি, দালান ভাঙছে তাও রাজনীতি,
> দেবদারু কেটে নিচ্ছে নরোম কুঠার তাও রাজনীতি,
> গোলাপ ফুটছে তাও রাজনীতি, মানুষ মরছে তাও রাজনীতি!
> বোন তার বেণী খুলছে যৌবনের অসহায় রোদে মুখ নত কোরে
> বুকের ভ্রমর হাতে রাখছে লুকিয়ে– তাও রাজনীতি...। (আবুল হাসান ২০১২ : ৪১)

৫. ষাটের দশকের সাহিত্যে রূপকের প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা বর্ণনা করেছেন পঞ্চাশের দশকের সাহিত্যিক সৈয়দ শামসুল হক। তিনি তাঁর রচিত এক গল্প সম্পর্কে বলেছেন–

> গল্পটি ছিল স্বৈরশাসক জেনারেল আইয়ুব খান প্রবর্তিত তথাকথিত নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের আওতায় নির্বাচন প্রাক্কালে এরই প্রতিবাদে লেখা, কল্পিত এক গ্রামীণ কবির প্রতিবাদী জীবনকথা ছিল ওটি, প্রথমে নাম দিয়েছিলাম Kwe Ave'i ie gbkxi Kve¨ msMn : mgÚv'‡Ki fwgKv। এহেন ছদ্ম আবরণের প্রয়োজন হয়েছিল তখনকার মার্শাল ল'য়ের করাল দাঁত এড়াবার জন্যে।' (সৈয়দ শামসুল ২০১৪ : ৮১)

৬. সিদ্দিকুর রহমান স্বপন (২০১৬)-এর লেখা evsjv‡`‡ki MY-Av‡›`vjb : †¯øvMvb cø¨vKvW I †cv÷vi গ্রন্থের ভুমিকা অংশ

দ্রষ্টব্য।

৭. সৈয়দ শামসুল হকের এই কবিতাটি কবির ভাষ্যমত তাঁর Avgvi cwZaŸwbMY (১৯৭৬) কাব্যের অন্তর্গত। আমরা এই গবেষণার জন্যে সৈয়দ শামসুল হকের KweZv mgM-1 (২০১২) গ্রন্থটি ব্যবহার করেছি। এই গ্রন্থে 'পিস্তল' কবিতাটি নেই। ফলে কবির gwR‡b gšÍe¨ (২০০৫) গ্রন্থ থেকে কবিতাংশটি উদ্ধৃত হয়েছে।

৮. দ্রষ্টব্য নির্মলেন্দু গুণের bv †cwgK bv wecøex (১৯৭২) কাব্যগ্রন্থের 'সহবাস' কবিতা।

৯. এসময়ের প্রবন্ধ সাহিত্য বা গবেষণা সাহিত্যের একটা বড় অংশ রচিত হয়েছে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে; সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে

ফিরে যাওয়ার জাতীয়তাবাদী আহ্বান জানিয়ে। গবেষকের ভাষায়, 'সামগ্রিক বিচারে বাঙালি জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক-সাংস্কৃতিক জীবনবোধই নিয়ন্ত্রণ করেছে ষাটের দশকের সাহিত্যগবেষণার মূল স্রোত।' (ভীষ্মদেব ২০০৩ : ১০২) প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ষাটের দশকের অন্যতম কবি ও সংস্কৃতিকর্মী বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের ১৯৬৯ সালে রচিত গ্রন্থ ¯‡`k I mvwnZ¨-এর কথা। জাতীয়তাবাদী চেতনার এক উত্তুঙ্গ সময়ে গ্রন্থটি ছাপা হয়েছিল বাংলা একাডেমি থেকে। গ্রন্থের শিরোনামের মধ্যেই জাতীয়তাবাদী চেতনার সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে। গ্রন্থটিতে যে কয়েকটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম দেখে নেওয়া যেতে পারে; 'বাংলাদেশের সংস্কৃতি', 'বাউলগান', 'ছড়া ও সংস্কৃতি', 'স্বদেশ ও চিত্রকলা'। বলাবাহুল্য এসব প্রবন্ধ এই সময়ে রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাঙালির লোকসংস্কৃতিকে তুলে ধরা; বাঙালি সংস্কৃতির মর্মের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর mvwn‡Z¨i be iƒcvqY গ্রন্থটির কথা। গ্রন্থটিতে লেখক বারবার দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছেন দেশজ সংস্কৃতি, লোক সংস্কৃতির দিকে। এভাবে ষাটের দশকের প্রবন্ধের দিকে দৃষ্টি দিলে এই প্রবণতা স্পষ্টভাবে বোঝা যেতে পারে।

সহায়কপঞ্জি

অনু হোসেন (২০০৭), evsjv‡`‡ki KweZv : †jvKms¯‹wZi b›`bZË, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

অশ্রুকুমার সিকদার (২০১৪), †Pv‡Li `wU Zviv : `B evsjvi KweZv, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা।

আনিসুজ্জামান (১৯৮৯), mgKvjxb evsjv mvwnZ¨ (সম্পা. খান সারওয়ার মুরশিদ), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৯৪), we‡ePbv-cbwe‡ePbv, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আবিদ আনোয়ার (২০১৫), Avgv‡`i AvaywbK KweZvi `B `kK : e‡iY¨ Kwe‡`i wbgvYKjv, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (২০১৪), Ave Rvdi Iev¨`yjøvn iPbvmgM, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আবুল হাসান (২০১২), iPbv mgM, পঞ্চম প্রকাশ, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা।

আবুল হোসেন (২০১০) Avej †nv‡m‡bi m‡½ K‡_vcK_b (সম্পা. তারেক মাহমুদ), সূচীপত্র, ঢাকা।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল (২০০১), Ave †nbv †gv¯Ídv Kvgvj iPbvejx, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আল মাহমুদ (১৯৯৫), GK‡ki wbewPZ ceÜ : 1963-1976 (সম্পা. মোবারক হোসেন), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০০০), KweZvmgM, দ্বিতীয় প্রকাশ, অনন্যা, ঢাকা।

আলাউদ্দিন আল আজাদ (২০০৬), KweZvmgM 1, গতিধারা, ঢাকা।

আসাদ চৌধুরী (২০০৮), KweZvmgM, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, অনন্যা, ঢাকা।

আহমদ রফিক (২০০১), KweZv AvaywbKZv I evsjv‡`‡ki KweZv, অনন্যা, ঢাকা।

(২০১৪), evsjv‡`‡ki KweZv : `kKfvOv wePvi, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

আহসান হাবীব (১৯৯৫), Avnmvb nvexe iPbvejx, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

কামরুদ্দীন আহমদ (১৩৭৬), ce evsjvi mgvR I ivRbxwZ, স্টুডেন্টস্ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

খান সারওয়ার মুরশিদ (২০০১), Kv‡ji K_v, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

ছিদ্দিকুর রহমান স্বপন (২০১৬), evsjv‡`‡ki MY-Av‡›`vjb : †køvMvb cø¨vKvW I †cv÷vi, দ্বিতীয় মুদ্রণ, সুবর্ণ, ঢাকা।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (১৯৭৬), k‡ãi mxgvbv, মুক্তধারা, ঢাকা।

(২০১৪), kvgmi ivngvb I eÜZ, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা।

তারেক রেজা (২০১৫) Avej †nv‡mb : Kwe I KweZv, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

দিলওয়ার (১৯৯৮), w`jIqvi iPbvmgM, প্রথম খণ্ড, কবি দিলওয়ার পরিষদ, সিলেট।

নির্মলেন্দু গুণ (২০১১), Kve¨mgM-1, চতুর্থ সংস্করণ, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা।

ফজল শাহাবুদ্দীন (২০১২), KweZv mgM-1, অনন্যা, ঢাকা।

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী (২০০৯), evsjv‡`‡ki Iv‡Ui `k‡Ki KweZv : welq I cKiY, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।

বিপ্রদাশ বড়ুয়া (২০০৯), KweZvq evKcwZgv, দ্বিতীয় সংস্করণ, সাহিত্য প্রকাশনালয়, ঢাকা।

বেগম আকতার কামাল (২০০৩), evsjv‡`‡ki cwPk eQ‡ii mwnZ¨ (সম্পা. সাঈদ-উর রহমান), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০১৩), Kwei †PZbv : †PZbvi K_KZv, ধ্রুবপদ, ঢাকা।

ভীষ্মদেব চৌধুরী (২০০৩), evsjv‡`‡ki cwPk eQ‡ii mwnZ¨ (সম্পা. সাঈদ-উর রহমান), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মহাদেব সাহা (২০১১), Kve¨mgM-1, চতুর্থ প্রকাশ, অনন্যা, ঢাকা।

মোফজ্জল হায়দার চৌধুরী (১৯৬৯), mwn‡Z¨i be i/cvqY, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৯৮), †gvnv¤§` gwbiæ¾vgvb Kve¨msMn, প্রতীতি প্রকাশনী, ঢাকা।

মোহাম্মদ রফিক (২০১১), KweZvmgM, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা।

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ (১৯৮৯), mgKvjxb evsjv mwnZ¨ (সম্পা. খান সারওয়ার মুরশিদ), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

রফিক আজাদ (২০১০), Am¤ú‡ei cv‡q, বিভাস, ঢাকা।

শহীদ কাদরী (২০০০), knx` Kv`ixi KweZv, দ্বিতীয় মুদ্রণ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

শামসুর রাহমান (২০০০), kvgmi ivngv‡bi †kô KweZv, পুনর্মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

(২০০৪), kvgmi ivngvb iPbvejx-1, ঐতিহ্য, ঢাকা।

(২০১২), KweZvmgM-1, তৃতীয় মুদ্রণ, অনন্যা, ঢাকা।

(২০১৭) 'সাহিত্য সাধনার পঁচিশ বছর', c_g Av‡jv ঈদসংখ্যা ২০১৭, ঢাকা।

শেখ রজিকুল ইসলাম (২০০৭), ceevsjvi KweZvq RvZxqZvev`wfwËK wPšÍv-†PZbvi aviv : 1947-1970, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা।

সরকার আমিন (২০০৬), evsjv‡`‡ki KweZvq wPÎKí, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সিকান্দার আবু জাফর (২০১৭), KweZvmgM, বিভাস, ঢাকা।

সৈয়দ আলী আহসান (১৯৬৯), Avgv‡`i mwnZ¨ (সম্পা. সরদার ফজলুল করিম), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০০১), AvaywbK evsjv KweZv : k‡ãi Abl‡½, গতিধারা, ঢাকা।

(২০০৯), KweZv mgM, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা।

সৈয়দ শামসুল হক (২০০৫), gwR‡b gš¿Íe¨, পরিবর্ধিত প্রথম সংস্করণ, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।

(২০১২), KweZvmgM-1, প্রথম মুদ্রণ, চারুলিপি, ঢাকা।

(২০১৪), wZb cqmvi †R¨vQbv, দ্বিতীয় মুদ্রণ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৯৪), nvmvb nwdRi ingvb iPbvejx, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

হায়াৎ সাইফ (১৯৮৯), mgKvjxb evsjv mwnZ¨ (সম্পা. খান সারওয়ার মুরশিদ), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

হেলাল হাফিজ (২০১৭), Ch R‡j Av¸b R‡j, অষ্টবিংশ মুদ্রণ, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ (২০০৮), Kve¨mgM, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

(২০১৪), kvgmi ivngvb : wbtm½ †kicv, সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বিশ শতকের ষাটের দশক বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ইতিহাসের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ একটি দশক। এই দশ বছরের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের বাঙালি জাতি নিজেকে আবিষ্কার করেছে। বাঙালি জাতির যা কিছু গৌরবের, যা-কিছু অহংকারের, তার প্রায় সবকিছুই এই দশকের রাজনীতির মধ্য দিয়ে সে আবিষ্কার করেছে ও পরিশেষে অর্জন করেছে। অর্থাৎ এই সময় পরিসরে বাঙালি জাতির মধ্যে একটি জাতিরাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখা দিয়েছে এবং নানা বন্ধুর পথপরিক্রমা শেষে তা বাস্তবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এই সময়ের রাজনীতির মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির চৈতন্যের ব্যাকরণ নির্ণীত হয়েছে। অদ্যাবধি সেই ব্যাকরণই বাঙালি জাতির পথচলাকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। বক্ষ্যমাণ অভিসন্দর্ভে দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা শেষে আমরা এই প্রত্যয়ে উপনীত হতে পেরেছি যে, ষাটের দশকের বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির স্বরূপের অন্বেষণ ছাড়া বাংলাদেশের পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাসের সঠিক পথরেখার অনুসন্ধান করা অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়ানোর শামিল।

জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মতোই বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাসেও ষাটের দশক সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সময়। কারণ, এই দশ বছরে বাংলাদেশের কবিতায় বাঙালি জাতির চৈতন্য সবচেয়ে গভীরভাবে ধরা পড়েছে। বাঙালির সংস্কৃতি আর চিন্তার সংগ্রামের চিহ্ন এই সময়ের কবিতার শরীরে এবং মর্মে খোদাই করা আছে। বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনায় স্নাত হবার সাংস্কৃতিক-রাজনীতির লড়াই-সংগ্রামের রক্তাক্ত বাস্তবতাও বহন করেছে ষাটের কবিতা। এই সময়ের কবিতার মধ্যেই ক্রমে স্ফুট হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ নামক জাতিরাষ্ট্রের চেহারা। অর্থাৎ ষাটের কবিতায় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ইতিহাস আর সাংস্কৃতিক-রাজনীতির ইতিহাস হাত ধরাধরি করে সমান্তরালে হেঁটেছে। এ-কারণে ষাটের কবিতাকে বলা যায়, ষাটের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সাহিত্যিক দলিল। কবিতা যে একটি জাতির হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে ধারণ করতে পারে, ষাটের দশকে রচিত কবিতা তার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ। ষাটের দশকের কবিতাই স্পষ্ট করেছে বাঙালি সংস্কৃতির স্বরূপকে। শুধু তাই নয়, ষাটের কবিতার গভীর পাঠ বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যের একটি রূপরেখাকেও স্পষ্ট করে। সম্ভবত যেকোনো জাতীয়তাবাদী সাহিত্যের প্রধান চারিত্র্য এই যে, এই সাহিত্যের পাঠ আর জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পাঠ সমার্থক হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে ষাটের জাতীয়তাবাদী রাজনীতি যেমন ষাটের কবিতাকে প্রভাবিত করেছে, তেমনি ষাটের কবিতাও জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে। ষাটের কবিতা ষাটের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির কাছে ঋণী, ষাটের রাজনীতিও সমকালের কবিতা ছাড়া অসম্পূর্ণ। রাজনীতি আর কবিতার এই আদান-প্রদান বাংলাদেশের কবিতায় বরাবর ক্রিয়াশীল থাকলেও ষাটের দশকে এই মাত্রা যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি এবং স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র এ-কারণে যে, এই দশকটি বাংলাদেশ নামক জাতিরাষ্ট্রের জন্মের প্রস্তুতি আর ভূমিষ্ঠ হওয়ার দশক। এই প্রস্তুতি আর জন্মের ইতিহাস ধারণ করেছে ষাটের কবিতা। তাই বর্তমান অভিসন্দর্ভে আমরা দেখিয়েছি যে, ষাটের কবিতার রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক পাঠ ছাড়া এই কবিতার পাঠ

Dhaka University Institutional Repository

সম্পূর্ণ হয় না। ষাটের দশকে পাকিস্তানি আধিপত্যের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী লড়াই-সংগ্রাম চলেছে দুটি ফ্রন্টে। এর একটি ফ্রন্টের নাম রাজনৈতিক ফ্রন্ট এবং অন্য ফ্রন্টটির নাম সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট। ষাটের কবিতা এই সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের অন্তর্গত। কবিতা যে আক্রান্ত জাতিসত্তার প্রতিরোধের অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে, 'প্রতিশোধ গ্রহণের হিরণ্ময় হাতিয়ার' হয়ে উঠতে পারে, ষাটের দশকে রচিত বাংলাদেশের কবিতা তার অন্যতম প্রমাণ। এটি এই অভিসন্দর্ভের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত।

ষাটের কবিতার রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক পাঠ আরো একটি কারণে জরুরি যে, এই কবিতার ভেতরে জাতিসত্তার চৈতন্যের যে-দিকটি প্রকাশিত হয়েছে তা উত্তর-স্বাধীন বাংলাদেশের কবিতার চৈতন্যকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। স্বাধীনতা-উত্তর কবিতার বিষয়-আশয় ষাটের কবিতার দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত। ষাটের কবিতার রাজনীতিকে মোকাবিলার অভিজ্ঞতা স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক সংকটে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বাঙালির স্বাধীনচেতা মনোভাব যখনই হুমকির মুখে পড়েছে, তখনই কবিরা ষাটের কবিতার ঐতিহাসিক ভূমিকাকে স্মরণে এনে জাতির করণীয়কে ও অভীষ্টকে কবিতায় রূপদান করেছেন।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের কবিতার শুধু বিষয় নয়, কবিতার শিল্পিতা বা প্রকরণও ষাটের কবিতা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। একারণেও ষাটের কবিতার মধ্যকার জাতীয়তাবাদী চেতনার শিল্পরূপের অন্বেষণ অত্যন্ত জরুরি ছিল। উত্তর-স্বাধীনকালে বাংলাদেশের রাজনীতি যখনই কলুষিত হয়েছে, তখনই কবিরা উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠেছেন। ফলে কবিতার ভাষা তথা উপমা, অলংকার, চিত্রকল্প, প্রকাশভঙ্গি, আঙ্গিক সবই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ উত্তরকালে যখনই কবিতা রাজনৈতিক সংকটকে ধারণ করেছে তখনই সেই কবিতার শিল্পিতার মধ্যে ষাটের দশক অভিজ্ঞতা হিসেবে ক্রিয়াশীল থেকেছে। তাই বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাসের জন্যে এবং বাংলাদেশের কবিতার বিষয় ও শিল্পরূপের মর্মশাঁস বোঝার জন্যে ষাটের দশকের কবিতার রাজনৈতিক বিবেচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে আমরা মনে করেছি।

সবশেষে বলা প্রয়োজন যে, ষাটের দশকের কবিতায় প্রতিফলিত জাতীয়তাবাদী চেতনা ও তার শিল্পরূপ নিয়ে ইতঃপূর্বে গবেষণা না হওয়ায় ওই শূন্যস্থানটি পূরণে আমরা সচেষ্ট থেকেছি। এক্ষেত্রে আমরা শুধু ষাটের দশকে আবির্ভূত নতুন কবিকুলের মধ্যে আলোচনাকে সীমাবদ্ধ না রেখে বরং ষাটের দশকে রচিত যাবতীয় কবিতায় জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা ও তার শিল্পরূপের অন্বেষণে ব্রতী হয়েছি। এই অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের কবিতার রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও নন্দনতাত্ত্বিক গবেষণায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

অজয় রায় (২০১৭), evsjv‡`‡k evgcš'x Av‡›`vjb : 1947-1971, দ্বিতীয় সংস্করণ, সাহিত্যিকা, ঢাকা।

অমলেন্দু দে (১৯৭৫), ¯^vaxb e½fwg MV‡bi cwiKíbv : cqvm I cwiYwZ, রত্না প্রকাশন, কলিকাতা।

(২০১১), evOvjx ew×Rxex I wew"QbZvev`, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

অলি আহাদ (২০১২), RvZxq ivRbxwZ : 1945 †_‡K 75, ৫ম সংস্করণ, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ঢাকা।

অশ্রুকুমার সিকদার (২০১৪), †Pv‡Li `wU Zviv : `B evsjvi KwieZv, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা।

আকবর আলি খান (২০১৫), evsjv‡`‡ki mËvi A‡š¦lv : GKwU c"Qb RwZi MwZ-cKwZi AbmÜvb (অনু. আমিনুল ইসলাম ভুইয়া), প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

(২০১৭), AevK evsjv‡`k : wewPÎ QjbvRv‡j ivRbxwZ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

আখতার ফারুক (১৯৮৮), diiæL Avng` : e¨w³ I Kwe (সম্পা. শাহাবুদ্দীন আহ্মদ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

আজীজুল হক (১৯৮৫) Aw¯ÍZ‡PZbv I Avgv‡`i KwieZv, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আতাউর রহমান খান (২০০১), ^¯ivPv‡ii `k eQi, দ্বিতীয় সংস্করণ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ (২০০০), fvlv Av‡›`vj‡bi Av_-mvgwRK cUfwg (সম্পা. আতিউর রহমান), একত্রে ৫ খণ্ড, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

আতিউর রহমান (২০১২), 'মুক্তিযুদ্ধের আর্থ-সামাজিক পটভূমি', evsjv I evOwji BwZnvm, চতুর্থ খণ্ড (তৃতীয় পর্ব), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আনিসুজ্জামান (১৯৮৯), mgKvjxb evsjv mwwnZ¨ (সম্পা. খান সারওয়ার মুরশিদ), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

(২০১৫), Kvj wbievwa, তৃতীয় মুদ্রণ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

আফসান চৌধুরী (২০০৭), evsjv‡`k 1971, দ্বিতীয় খণ্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী (১৯৫৪), †h‡nZ, নয়া দুনিয়া প্রকাশনী, ঢাকা।

আবদুর রাজ্জাক (১৯৮৭), 'বাঙলাদেশ : জাতির অবস্থা', RvZxqZvev`-weZK (সম্পা. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর), দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

আবদুল আজিজ বাগমার (১৯৯৯), ¯^vaxbZvi ¯^c : D‡b¥l I ARb, অপূর্ব সংসদ, ঢাকা।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ (২০০৬), fv‡jvevmvi mv¤úvb, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

(১৯৮৮), evsjv‡`‡ki mwwnZ¨, (সঙ্কলন উপবিভাগ কর্তৃক সঙ্কলিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(১৯৯৪), we‡ePbv-cbwe‡ePbv, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০০০) ¯§wZi †bvUeK, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা।

(২০১৫), Ave`j gvbvb ^mq` iPbvewj, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আবদুল হক (১৯৮৭), 'দ্যোদুল্যমান জাতীয়তা', RvZxqZvev`-weZK (সম্পা. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর), দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

(১৯৮৮), diiæL Avng` : e¨w³ I Kwe (সম্পা. শাহাবুদ্দীন আহ্মদ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

(১৯৯৬), †jL‡Ki †ivRbvgPvq Pvi ‘k‡Ki ivRbxwZ-cwiµgv, †cÖÿvcU : evsjv‡`k (1953-Ô93), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

(২০১৪), fvlv Av‡›`vj‡bi Aw`ce, চতুর্থ প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা।

আবিদ আনোয়ার (২০১৫), Avgv‡`i AvaywbK KweZvi ‘B `kK : e‡iY¨ Kwe‡`i wbgvYKjv, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (২০১৪), Ave Rvdi Ievq`yjøvn iPbvmgM, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আবু জাফর শামসুদ্দীন (২০১৬), AvZ¥¯§wZ, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

আবু মোঃ দেলোয়ার (২০১১) ‘ঢাকার বাইরে ভাষা-আন্দোলন’, fvlv Av‡›`vj‡bi cÂvk eQi (সম্পা. আহমদ রফিক ও বিশ্বজিৎ ঘোষ), দ্বিতীয় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আবুল কাসেম ফজলুল হক (২০১২), gyw³msMvg, চতুর্থ সংস্করণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

আবুল মনসুর আহমদ (১৯৯৯), †k‡i evsjv nB‡Z esMeÜ, পঞ্চম মুদ্রণ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

(২০০১), Avej gbmi Avng` iPbvejx, ৩য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০১৪), AvZ¥K_v, তৃতীয় মুদ্রণ, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা।

আবুল হাশিম (২০১২), Avgvi Rxeb I wefvMce evsjv‡`‡ki ivRbxwZ, প্রথম অ্যাডর্ন প্রকাশ, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা।

আবুল হোসেন (১৯৯৭), Avej †nv‡m‡bi wbewPZ KweZv, ব্যতিক্রম প্রকাশনী, ঢাকা।

(২০১০) Avej †nv‡m‡bi m‡½ K‡_vcK_b (সম্পা. তারেক মাহমুদ), সূচীপত্র, ঢাকা।

আবুল হাসান (২০১২), iPbv mgM, পঞ্চম প্রকাশ, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল (১৯৮৮), diiæL Avng` : e¨w³ I Kwe (সম্পা. শাহাবুদ্দীন আহ্মদ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

(২০০১), Ave †nbv †gv¯Ídv Kvgvj iPbvejx, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আমিনুর রহমান সুলতান (১৯৯৮), ivR‰bwZK †PZbv : evsjv‡`‡ki KweZv, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আল মাহমুদ (১৯৯৫), GK‡ki wbewPZ ceÜ : 1963-1976 (সম্পা. মোবারক হোসেন), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০০০), KweZvmgM, দ্বিতীয় প্রকাশ, অনন্যা, ঢাকা।

(২০০৩), mvÿvrKvi : Avj gvng` (সম্পা. সাজ্জাদ বিপ্লব), ঐতিহ্য, ঢাকা।

আলাউদ্দিন আল আজাদ (২০০৬), KweZvmgM 1, গতিধারা, ঢাকা।

আসাদ চৌধুরী (২০০৮), KweZvmgM, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, অনন্যা, ঢাকা।

(২০১৫), ‘সংস্কৃতির বিকাশধারা’, i³v³ evsjv (সংকলিত), ষষ্ঠ প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা।

আহমদ রফিক (১৯৯৩), fvlv Av‡›`vj‡bi ¯§wZ I wKQz wRÁvmv, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০০১), KweZv AvaywbKZv I evsjv‡`‡ki KweZv, অনন্যা, ঢাকা।

(২০০৬), ‘মুখবন্ধ’, AvjvDwÏb Avj AvRv` : KweZvmgM-1, গতিধারা, ঢাকা।

(২০১৪), evsjv‡`‡ki KweZv : `kKfvOv wePvi, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

(২০১৫), fvlv Av‡›`vj‡bi BwZnvm, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা।

আহসান হাবীব (১৯৯৫), Avnmvb nvexe iPbvejx, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

ইসরাইল খান (২০০৪), evsjv mvgwqKcÎ : cwiK¯Ívbce, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

এবিএম মূসা (২০১৫), Avgvi †ejv †h hvq, তৃতীয় মুদ্রণ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

এম আর আখতার মুকুল (২০১২), GK‡ki ‘wjj, তৃতীয় মুদ্রণ, অনন্যা, ঢাকা।

এস ওয়াজেদ আলী (২০১৭), ভবিষ্যতের বাঙালী, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

ওমর আলী (২০০২), †kô KweZv, বইপত্র, ঢাকা।

কাজী আরেফ আহমেদ (২০১৪), evOwji RvZxq ivó, ইন্টারন্যাশনাল হিস্টোরিক্যাল নেটওয়ার্ক, ঢাকা।

কামরুদ্দীন আহমদ (১৩৭৬), ce evsjvi mgvR I ivRbxwZ, স্টুডেন্টস পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

(২০০৪), evsjvi ga¨we‡Ëi AvZ¥weKvk, অখণ্ড সংস্করণ, ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন, ঢাকা।

কামাল হোসেন (২০০৫), ¯vqËkvmb †_‡K ¯vaxbZv : 1966-1971, দ্বিতীয় সংস্করণ, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা।

(২০১৬) gyw³hy× †Kb Awbevh© wQj, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও সরদার ফজলুল করিম (২০১২), Pwjø‡ki ‘k‡Ki XvKv, তৃতীয় মুদ্রণ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

খান সারওয়ার মুরশিদ (২০০১), Kv‡ji K_v, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

গোলাম মুরশিদ (২০১৭), gyw³hy× I Zvici : GKwU wb‘©jxq BwZnvm, একাদশ মুদ্রণ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

গোলাম মোস্তফা (১৯৬২), Avgvi wPšÍvaviv, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

ছিদ্দিকুর রহমান স্বপন (২০১৬), evsjv‡`‡ki MY-Av‡›`vjb : †køvMvb cø¨vKvW© I †cv÷vi, দ্বিতীয় মুদ্রণ, সুবর্ণ, ঢাকা।

জহির রায়হান (২০১৫), 'পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ', i³v³ evsjv (সংকলিত), ষষ্ঠ প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা।

জহিরুল ইসলাম (২০১২), evsjv‡`‡ki ivRbxwZ : AvIqvgx jxM I AvIqvgx jxM we‡ivax ivRbxwZ, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা।

জয়া চ্যাটার্জী (২০০৩), evOjv fvM nj, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

(২০১৬), †`kfv‡Mi ARb : evOjv I fviZ 1947-1967, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

জ্ঞান চক্রবর্তী (২০১৬), XvKv †Rjvi KwgDwb÷ Av‡›`vj‡bi AZxZ hM, নতুন সংস্করণ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (১৯৭৬), k‡ãi mxgvbv, মুক্তধারা, ঢাকা।

(২০১৪), kvgmi ivngvb I eÜZ, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ঢাকা।

তাজউদ্দীন আহমদ (২০১৪), ZvRDÏxb Avng‡`i Wv‡qwi : 1947-1948, প্রথম খণ্ড (অনু. বেলাল চৌধুরী), দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রতিভাস, ঢাকা।

তারেক রেজা (২০১৫), Avej †nv‡mb : Kwe I KweZv, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

(২০১৭), আহসান হাবীব : কবি ও কবিতা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

তোফায়েল আহমেদ (১৯৯৭), EbmË‡ii MY Af¨yÌvb I e½eÜ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

দিলওয়ার (১৯৯৮), w`jIqvi iPbvmgM, প্রথম খণ্ড, কবি দিলওয়ার পরিষদ, সিলেট।

নিতাই দাস (১৯৯৩), cwK¯Ívb Av‡›`vjb I evsjv KweZv, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০০৭), evsjv mvwn‡Z¨ cwK¯Ívb Av‡›`vj‡bi cfve : 1940-1971, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

নির্মলেন্দু গুণ (২০১১), Kve¨mgM-1, চতুর্থ সংস্করণ, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী (১৪১৭), evOvjx Rxe‡b igYx, অষ্টাদশ মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।

নীহাররঞ্জন রায় (১৪১৬), ev½vjxi BwZnvm : Avw`ce, সপ্তম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

নুরুল ইসলাম (২০০৭), evsjv‡`k RwZ MVbKv‡j GK A_bxwZwe‡`i wKQ K_v, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

নূহ-উল-আলম লেনিন (২০১৫), KwgDwb÷ cwUi BwZnvm cm½ I `wjjcÎ, ১ম খণ্ড, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

নেপাল মজুমদার (১৯৮৩), fviZ RvZxqZv I Avšÿ©RvwZKZv Ges iex›`bv_, প্রথম খণ্ড, প্রথম দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

নেহাল করিম (২০১১), RvZxqZvev` : D‡b¥l I weKvk, কৃষ্ণচূড়া প্রকাশনী, ঢাকা।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় (২০১৪), 'দ্বিতীয়বারের বাংলা ভাগ' (অনু.সাব্বির আজম), GKwesk (সম্পা. কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়), সংখ্যা ২৮, অক্টোবর ২০১৪, ঢাকা।

প্রথমা রায়মণ্ডল (১৯৯৬), evsjv‡`‡ki ew×Rxex I cMwZ-cwZwµqvi Ø›Ø, প্রতীক বুকস, কলকাতা।

ফজল শাহাবুদ্দীন (২০১২), Kve¨ mgM-1, অনন্যা, ঢাকা।

ফররুখ আহমদ (২০১২), KweZvmgM, দ্বিতীয় মুদ্রণ, অনন্যা, ঢাকা।

ফয়েজ আহ্‌মদ (২০০৬), ÔAvMiZjv gvgjvÕ, †kL gwRe I evsjvi we‡`vn, তৃতীয় মুদ্রণ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

বদরুদ্দীন উমর (২০১৫), mv¤ú`wqKZv, নবম মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

(১৯৯৫), ce evOjvi fvlv Av‡›`vjb I ZrKvjxb ivRbxwZ, প্রথমম খণ্ড, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা।

(১৯৯৫), ce evOjvi fvlv Av‡›`vjb I ZrKvjxb ivRbxwZ, ৩য় খণ্ড, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা।

(১৯৯৬), ce evOjvi fvlv Av‡›`vjb I ZrKvjxb ivRbxwZ, ২য় খণ্ড, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা।

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী (২০০৯), evsjv‡`‡ki lv‡Ui `k‡Ki Kwe Zv : welq I cKiY, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।

বিনয় ঘোষ (১৪২৩), evsjvi beRvMiY, দ্বিতীয় সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, প্রকাশ ভবন, কলকাতা।

বিপ্রদাশ বড়ুয়া (২০০৯), KwieZvq evKcÖZgv, দ্বিতীয় সংস্করণ, সাহিত্য প্রকাশনালয়, ঢাকা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৯), evsjv‡`‡ki mvwnZ¨, তৃতীয় সংস্করণ, আজকাল, ঢাকা।

বেগম আকতার কামাল (২০০৩), evsjv‡`‡ki cwPk eQ‡ii mvwnZ¨ (সম্পা. সাঈদ-উর রহমান), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০১৩), Kwei †PZbv : †PZbvi K_KZv, ধ্রুবপদ, ঢাকা।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (১৯৯৩), ¯^‡`k I mvwnZ¨, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(১৯৫৩), GK‡k †deªæqvix (সম্পা. হাসান হাফিজুর রহমান), পুঁথিপত্র প্রকাশনী, ঢাকা।

(১৯৬৯) Avgv‡`i mvwnZ¨ (সম্পা. সরদার ফজলুল করিম), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

ভীষ্মদেব চৌধুরী (১৯৯৮), Zvivkü¼i e‡›`¨vcva¨v‡qi Dcb¨vm : mgvR I ivRbxwZ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০০৩), evsjv‡`‡ki cwPk eQ‡ii mvwnZ¨ (সম্পা. সাঈদ-উর রহমান), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০০৪), বাংলাদেশের সাহিত্য গবেষণা ও অন্যান্য, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত নবযুগ সংস্করণ, ঢাকা।

মওদুদ আহমদ (২০১৫), evsjv‡`k : ¯^vqËkvmb †_‡K ¯^vaxbZv (অনু. জগলুল আলম), পঞ্চম মুদ্রণ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

(২০১৫), evsjv‡`k : ¯^vqËkvmb †_‡K ¯^vaxbZv, (অনু. জগলুল আলম), পঞ্চম মুদ্রণ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

মফিদুল হক (২০১২), †`kfvM, mv¤ú`wqKv Ges m¤úªxwZi mvabv, পুনর্মুদ্রণ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

(২০১৪) evsjv‡`‡ki gy³mvabv : UK‡iv K_vi Swc, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা।

মহাদেব সাহা (২০১১), Kve¨mgM-1, চতুর্থ প্রকাশ, অনন্যা, ঢাকা।

মহিউদ্দিন আহমদ (২০১৭), AvIqvgx jxM : DÌvbce 1948-1970, দ্বিতীয় মুদ্রণ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

মাসুদুজ্জামান (১৯৯৩), evsjv‡`k I cwðg evsjvi KweZv : ZjbvgjK aviv, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মাহবুবা সিদ্দিকী (১৯৯৩), wmKvb`vi Ave Rvdi : Kwe I bvU¨Kvi, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ (২০১৪), cwiK¯Íwb‡'i 'wó‡Z GKvËi, পঞ্চম মুদ্রণ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য (২০১০), evsjv‡'‡ki BwZnvm, নওরোজ কিতাবিস্তান, পঞ্চম সংস্করণ, ঢাকা।

মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯৯৪), gnv¤§' Ave'j nvB iPbvejx, (সম্পা. হুমায়ুন আজাদ) ৩য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান (২০১৫), evsjv mwwn‡Z¨i BwZeË (আধুনিক যুগ), দ্বাদশ মুদ্রণ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

মুহম্মদ নূরুল হুদা (২০১৬), KweZvmgM-1, অনন্যা, ঢাকা।

মুহম্মদ মজিরউদ্দীন (১৯৯৩), cm½ : RvZxqZvev' I ms¯wZ (সম্পা. আমিনুর রহমান সুলতান), নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৯৯৪), knx'jøvn iPbvejx, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (১৯৬৯), mwwn‡Z¨i be i/cvqY, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

মোরশেদ শফিউল হাসান (২০১৪), ¯vaxbZvi cUfwg : 1960 'kK, ২য় সংস্করণ, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা।

মোহাম্মদ আজম [সম্পা.] (২০১৬), wbewPZ KweZv : ˆmq' Avjx Avnmvb, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মোহাম্মদ ফরহাদ (১৯৮৯), EbmË‡ii MYAf¨Ìvb, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৯৮), †gvnv¤§' gwbiæ¾vgvb Kve¨msMn, প্রতীতি প্রকাশনী, ঢাকা।

(১৯৬৯), Avgv‡'i mwwnZ¨ (সম্পা. সরদার ফজলুল করিম), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মোহাম্মদ রফিক (২০১১), KweZvmgM, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা।

মোহাম্মদ হাননান (২০০৬), evsjv‡'‡ki QvÎ Av‡›'vj‡bi BwZnvm, ৩য় মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ (১৯৮৯), mgKvjxb evsjv mwwnZ¨ (সম্পা. খান সারওয়ার মুরশিদ), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

যতীন সরকার (২০১৩), cwiK¯Ív‡bi RbªgZ¨-'kb, চতুর্থ মুদ্রণ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

যশোবন্ত সিংহ (২০১৪), wRbv fviZ †'kfvM I ¯vaxbZv, চতুর্থ মুদ্রণ, আনন্দ, কলকাতা।

রওশন ইয়াজদানী (১৯৬০), LvZvgb bexCb, জাকারিয়া লাইব্রেরী, বরিশাল।

রণেশ দাশগুপ্ত (২০১৪), i‡Yk 'vk¸ß iPbvmgM, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

(২০১৫), 'পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের গতিপ্রকৃতি', i³v³ evsjv (সংকলিত), ষষ্ঠ প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা।

রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী (২০১২), Af¨'q, ম্যাগনাম ওপাস, ঢাকা।

রফিক আজাদ (২০১৩), Amv¤‡ei cv‡q, দ্বিতীয় সংস্করণ, বিভাস, ঢাকা।

রফিকউল্লাহ খান (২০০৭), KweZv I mgvR, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

(২০১৬), nvmvb nwdRi ingvb : Rxeb I mwwnZ¨, প্রথম বাংলাপ্রকাশ সংস্করণ, ঢাকা।

রফিকুল ইসলাম (১৯৭০), AvawbK KweZv (সম্পা. রফিকুল ইসলাম), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(১৯৭৪), 'বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : সংক্ষিপ্ত রূপরেখা', evsjv‡'k (সম্পা. মনসুর মুসা), নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

(১৯৭৪), ev0jv‡'k (সম্পা, মনসুর মুসা), নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

(১৯৮৮), diiæL Avng' : e¨w³ I Kwe (সম্পা. শাহাবুদ্দীন আহ্মদ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

(২০১৬), evsjv‡`‡ki ¯^vaxbZv msMvg, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

রফিক কায়সার (১৯৮৭), wZb cix‡li ivRbxwZ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

(২০০৯), evsjvi gwU evsjvi Rj, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪০২), iex›`ª iPbvejx, রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ সুলভ সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

(১৪০২), iex›`ª iPbvejx, রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ সুলভ সংস্করণ, ৭ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

রেজোয়ান সিদ্দিকী (২০০৬), ce evsjvi mvs¯‥wZK msMÖvb I mvs¯‥wZK Av‡›`vjb : 1947-1971, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা।

রেহমান সোবহান (২০০৭), Avgvi mgv‡jvPK Avgvi eÜ (iPbv msKjb), সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ, ঢাকা।

শওকত ওসমান (২০১৫), 'বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আন্দোলন', i³v³ evsjv (সংকলিত), ষষ্ঠ প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা।

শহীদ ইকবাল (২০১৩), evsjv‡`‡ki KweZvi BwZnvm : 1947-2000, রোদেলা, ঢাকা।

শহীদ কাদরী (২০০০), knx` Kv`ixi KweZv, দ্বিতীয় মুদ্রণ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

শহীদুল্লাহ্ মৃধা (১৯৯৯), gyRvbi ingv‡bi ^ÎgvwmK cwÎKv (সম্পা. মীজানুর রহমান), নদী সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ৯৯, ৫৮ তম খণ্ড, পঞ্চদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ঢাকা।

শামসুর রাহমান (২০০০), kvgmyi ivngv‡bi †kô KweZv, পুনর্মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

(২০০৪), kvgmyi ivngvb iPbvejx-1, ঐতিহ্য, ঢাকা।

(২০১২), KweZvmgM-1, তৃতীয় মুদ্রণ, অনন্যা, ঢাকা।

(২০১৭) 'সাহিত্য সাধনার পঁচিশ বছর', c_g Av‡jv ঈদসংখ্যা ২০১৭, ঢাকা।

শাহাদাৎ হোসেন (১৯৫০), রূপচ্ছন্দা, মখ্‌দুমী অ্যাণ্ড আহসানউল্লা লাইব্রেরী, ঢাকা।

মোবারক হোসেন [সম্পা.] (১৯৯৫), GK‡ki wbe©vwPZ ceÜ : 1963-1976, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

শেখ মুজিবুর রহমান (২০১৪), Amgvß AvZ¥Rxebx, চতুর্থ মুদ্রণ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

(২০১৬), Amgvß AvZ¥Rxebx, সুলভ সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

শেখ রজিকুল ইসলাম (২০০৭), ceevsjvi KweZvq RvZxqZvev`wfwËK wPšÍv-†PZbvi aviv : 1947-1970, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা।

শ্যামলী ঘোষ (২০০৭), Avlqvgx jxM : 1949-1971, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

সত্যেন সেন (২০০৩), KgviRxe, খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ঢাকা।

সন্‌জীদা খাতুন (২০০৪), ms¯‥wZ-K_v mvwnZ¨-K_v, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা।

সরকার আমিন (২০০৬), evsjv‡`‡ki KweZvq wPÎKí, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সাঈদ-উর রহমান (১৯৮৩), ce evsjvi mvs¯‥wZK Av‡›`vjb : 1940-1982, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা।

(২০০১), ce evsjvi ivRbxwZ-ms¯‥wZ I KweZv, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ২য় সংস্করণ, ঢাকা।

সানাউল হক (১৯৯৮), mvbvDj nK iPbvejx, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সালাহ্‌উদ্দীন আহমদ (২০১৪), BwZnvm HwZn¨ RvZxqZvev` MYZš¿ : wbe©vwPZ ceÜ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

সিকান্‌দার আবু জাফর (২০১৭), KweZvmgM, বিভাস, ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০১১), evOvjxi RvZxqZvev`, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সুনীতি কুমার ঘোষ (২০০৫) evsjv wefvR‡bi A_bxwZ-ivRbxwZ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (২০১৬), ‘জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য’, evOwji ms¯‹wZwPšÍv (সম্পা. আবুল কাসেম ফজলুল হক), তৃতীয় মুদ্রণ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

সুশোভন সরকার (১৪০৪), evsjvi †i‡bmvm, দ্বিতীয় সংস্করণ, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সৈকত হাবিব (২০১৩), Kwe KweZv I K_v, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা।

সৈয়দ আকরম হোসেন (১৯৮৫), evsjv‡`‡ki mvwnZ¨ I Ab¨vb¨ cÖm½, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০০৪), ‘বাংলাদেশ’, evsjv‡`k, (সম্পা. মনসুর মুসা), দ্বিতীয় সংস্করণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

সৈয়দ আলী আহসান (১৯৬৯), ‘পূর্ব পাকিস্তানের বিশ বছরের কবিতা’, Avgv‡`i mvwnZ¨ (সম্পা. সরদার ফজলুল করিম), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(১৯৮৩), mZZ ¯^vMZ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

(২০০১), AvaywbK evsjv KweZv : k‡ãi Abl½, গতিধারা, ঢাকা।

(২০০৯), KweZv mgM, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (২০১৩), AMÖšZ iPbv, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

সৈয়দ শামসুল হক (২০০৫), gwiR‡b gšÍe¨, পরিবর্ধিত প্রথম সংস্করণ, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।

(২০১২), KweZvmgM-1, প্রথম মুদ্রণ, চারুলিপি, ঢাকা।

(২০১০), cYxZ Rxeb, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা।

(২০১৪), wZb cqmvi †R¨vQbv, দ্বিতীয় মুদ্রণ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

সৌমিত্র শেখর (২০১১), lv‡Ui KweZv : fv‡jvevmvi kiwe× KweKj, বিভাস, ঢাকা।

হারুন-অর-রশিদ (২০১৬), ‘Avgv‡`i evPvi ‘vex© 6 ‘dv©i 50 eQi, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হাসান আজিজুল হক (১৯৮৫), ‘বায়ান্নর একুশ : ঢাকার বাইরে’, GK‡ki ceÜ : 1984, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৭৩), AvaywbK Kwe I KweZv, দ্বিতীয় সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(১৯৫৩) GK‡k †deæqvix (সম্পা.হাসান হাফিজুর রহমান), পুঁথিপত্র প্রকাশনী, ঢাকা।

(১৯৯৪), nvmvb nvwdRi ingvb iPbvejx-1, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হারুনুর রশিদ (২০০০), ivRbxwZ‡Kvl, দ্বিতীয় সংস্করণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

হায়দার আকবর খান রনো (২০১২), kZvãx †cwi‡q, তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা।

হায়াৎ মামুদ (২০১৫), evsjv‡`k : mvs¯‹wZK AvZ¥cwiPq, চন্দ্রাবতী একাডেমি, ঢাকা।

হায়াৎ সাইফ (১৯৮৯), mgKvjxb evsjv mvwnZ¨ (সম্পা. খান সারওয়ার মুরশিদ), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ (১৯৯৩), cÖm½ : RvZxqZvev` I ms¯‹wZ (সম্পা. আমিনুর রহমান সুলতান), নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা।

(২০০০), ভাষা-আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পটভূমি (সম্পা, আতিউর রহমান), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

(২০০৫), wkíKjvi wegvbweKxKiY I Ab¨vb¨ ceÜ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

(২০০৮), Kve¨mgM, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

(২০১২), wbewPZ ceÜ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

(২০১৪), kvgmyi ivngvb : wbtm½ †kicv, সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

হুমায়ুন কবির (২০১২), evsjvi Kve¨, দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।

হেলাল হাফিজ (২০১৭), ‡h R‡j Av¸b R‡j, অষ্টবিংশ মুদ্রণ, দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা।

Ahmed Kamal (2016), *State Against The Nation : The Decline of the Muslim League in Pre-independence Bangladesh, 1947-54*, First paper back edition, The University Press Limited, Dhaka.

Amalendu Dey (1974), *Roots of Separatism In Nineteenth Century Bengal*, Ratna Prakashana, Calcutta.

Aziz, K. K. (1967), *The Making of Pakistan : A Study of Nationalism*, Chatto and Windus, London.

Gooch, G. P. (1931), *Study in Modern History*, Longmans, Green and Co. London.

Hayes, Carlton J. H. (1926), *Essays on nationalism*, The macmillan Company, New York

Hyslop, Beatrice Fry (1968), *French nationalism in 1789*, Octagon books, New York

Jyoti Sen Gupta (1974), *History of Freedom Movement in Bangladesh*, Calcutta.

Keith Calldard (1957), *Pakistan : A political Study*, Allen and Unwin, London.

Khon , Hans (1945), *The Idea of Nationalism : A Study in Its Origin and Background*, scond print, The Macmillan Company, New York

Minogue, Kenneth R. (1967), *Nationalism*, Basic books, New York.

Mohammad Ayub Khan (2008), *Friends Not Masters*, The University Press Limited, Dhaka.

Nehal Karim (2004), *The Emergence of Nationalism in Bangladesh*, Adhuna prakashan, Dhaka.

Rabindranath Tagore (1918), *Nationalism*, reprint, The Macmillan company, New York

Rounaq Jahan (2015) *Pakistan : Failure in national integration*, Third impression,The University Press Limited, Dhaka.

Sargent, Lyman Tower (1981), *Contemporary Political Ideologies : A Comparative Analysis*, Dorsey press, wales

Semanti Ghosh (2017), *Defferent Nationalism : Bengal 1905-1947*, Oxford University Press, New Delhi

Snyder, Luis L. (1964), *The Dynamics of Nationalism : Readings In Its Meaning and Development*, Van Nastrand Reinhold Inc., U.S.A

Snyder, Luis L. (1968) *The New Nationalism*, Cornell University Press, New York

Sumit Sarkar (1994), *The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908*, Reprint, Peoples' publication, New Delhi.

Dhaka University Institutional Repository